ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস

ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট :: কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ২০০০

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

লেজার কম্পোজ
উষা প্রেস
৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং উষা প্রেস, ৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

নান্দী

ইটালীয় রেনেসাঁস একশো বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। ক্যাথলিক চার্চ প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে। শুরু হয়ে যায় কাউন্টার রেনেসাঁস। তার থেকে বোঝা যায় লড়াইটা আসলে ছিল ভক্তিবাদীদের সঙ্গে যুক্তিবাদীদের। যুক্তিবাদীরা বলে ধর্ম আর দর্শন এক জিনিস নয়। দর্শনও দুই ভাগে বিভক্ত : Mental and Moral Philosophy বনাম Natural Philosophy. Natural Philosophy-র পরবর্তী কালে নাম দেওয়া হয় Science—পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি। আরও পরবর্তী কালে আসে Psychology. আরও পরবর্তী কালে আসে Sociology, Anthropology. আমেরিকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে Science-এর উপর একশোটার বেশি Faculty. তারপর যুক্তিবাদীরা বলেন Mythology এবং History এক জিনিস নয়। খ্রিস্টধর্মের মিথগুলি ইতিহাসের বিচারে ভিত্তিহীন। ভক্তিবাদীরা বলতেন, সূর্য ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে আর পৃথিবী চ্যাপ্টা। আর যুক্তিবাদীরা বলতেন, পৃথিবী গোল ও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীর চারদিকে শূন্য, স্বর্গ ও নরক বলে কোনও অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে না। ক্যাথলিক চার্চ যে প্রচণ্ড খেপে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী। যুক্তিবাদীদের অনেককে পোড়ানো হয়। কেউ কেউ প্রাণে বাঁচার জন্য মত পরিবর্তন করেন। ভক্তিবাদীরা শব ব্যবচ্ছেদে বিশ্বাস করতেন না, মানব-শরীরের অস্থি-সংস্থান জানতেন না। লিওনার্ডো দ্য ভেঞ্চি গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে শব ব্যবচ্ছেদ করেন ও অস্থি-সংস্থান জেনে নেন। তাঁর চিত্রকলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অ্যানাটমির উপরে। মাইকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যও তা-ই। বতিচেল্লি ভিনাসের নগ্ন মূর্তি আঁকেন। সেটা চার্চের দ্বারা নিষিদ্ধ। অথচ রেনেসাঁস যুগের চিত্রকলা কোনও নিষেধ মানতে চায় না। নাটকেও বহু বিষয় নিষিদ্ধ ছিল। নাট্যকাররা তা অমান্য করেন। ইংল্যাণ্ডে যখন রেনেসাঁস আরম্ভ হয় তখন শেক্সপীয়রের নাটকে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে এক জায়গায় আছে 'There's a divinity that shapes our ends,/Rough-hew them how will.' তাঁর কোনও নাটকই খ্রিস্টীয় নাটক নয়। এক কথায় বলা যায়, রেনেসাঁসের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হিউম্যানিজমের যুগ।

মানুষ দোষেগুণে বিচিত্র। তার সেই বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে সাহিত্য ও সংস্কৃতি। যাঁরা সত্যকে জানতে চান তাঁদের কর্তব্য প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করা, ধর্মশাস্ত্রকে নয়। এই একই সময়ে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে। যেমন মুদ্রণযন্ত্রে বই ছাপা। প্রচুর পুস্তক মুদ্রণ। সংবাদপত্র প্রকাশ। নিরক্ষরদের সাক্ষর করা। সমুদ্রযাত্রা করে নানা দেশ আবিষ্কার। তারপরে নানা জাতির সঙ্গে পরিচয়। রেনেসাঁস যাকে বলা হচ্ছে তা এই সমস্ত ধারার সঙ্গম। এর মধ্যে অর্থনীতি ও রাজনীতিও পড়ে। তা বলে এটি একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন নয়। তার সময় পরে আসে। রেনেসাঁস যখন ইটালি থেকে ফ্রান্স হয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছয় তখন লিওনার্ডো ও মাইকেলাঞ্জেলোর মতো শিল্পী দেখা যায় না। তার বদলে আসে fresh air—মার্লো, মিলটন ইত্যাদি যুগান্তকারী কবি ও নাট্যকার। রেনেসাঁস যখন

অন্যান্য দেশে যায় তখন একই রকম হয় না। ইটালির যেটা মডেল সেটা সব দেশের মডেল নয়। রেনেসাঁসকে ইটালীয় মডেল গ্রহণ করতে হবে এরকম দাবি জার্মানিতেও ওঠেনি, রাশিয়াতেও ওঠেনি, উঠেছে কিনা বাংলা দেশে। যেন সব দেশই এক রকম, সব ভাষাই এক রকম। সেভাবে সত্যকে জানা যায় না। মুর্শিদাবাদের মাটি এক রকম, মালদহের মাটি আর-এক রকম, সেজন্য আমও দু রকম, তাদের স্বাদই আলাদা। দেশ-কাল-পাত্র এ সমস্তই বিচার করতে হবে।

বাংলার রেনেসাঁস কতকগুলি বিষয়ে দুর্বল। যেমন বিজ্ঞান, যেমন শিল্প মানে art. কিন্তু এটা মানতেই হবে যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতচন্দ্রের উত্তরসূরী নন, 'মেঘনাদ বধ' হোমার-এর 'ইলিয়াড'কে মনে করিয়ে দেয়, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'রও মডেল ল্যাটিন থেকে নেওয়া। গিরিশচন্দ্রের নাটক শেক্সপীয়রের অনুকরণ। থিয়েটার এসেছে বিদেশী আদর্শ থেকে। বাংলায় থিয়েটার আরম্ভ করেন যিনি সেই হেরেসিম লেবেডফ রাশিয়ার লোক। বাংলার থিয়েটার বাঙালির গর্ব। সেটা পুরাতন যাত্রার নতুন সংস্করণ নয়। আমরা সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছি উপন্যাসে ও লিরিক কবিতায়। একটির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যটির জন্য রবীন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয়। প্রবন্ধ আমাদের ভাষায় ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যেও না। এর জন্য আমরা ইংরেজির কাছে কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধ লেখেন রামমোহন রায়, তাঁর পরে বিদ্যাসাগর। তাঁদের প্রবন্ধে আমরা আরও অগ্রসর হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের পরে নাম করতে হয় প্রমথ চৌধুরীর ও 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর।

রেনেসাঁস বলতে আগে বলা হত বেঙ্গল রেনেসাঁস। তার মধ্যে পড়ত বাঙালির লেখা ইংরেজি রচনা। যেমন তরু দত্তের। যেমন লালবিহারী দের। অপর পক্ষে কয়েকজন ইংরেজও বাংলায় লেখেন। 'ফুলমণি ও করুণা' নামে একখানি উপন্যাস লেখেন একজন ইউরোপীয় খিস্টান মহিলা, তাঁর নাম ক্যাথেরিন মূলেন্স। সেটিই বোধ হয় প্রথম বাংলা উপন্যাস। কেরি সাহেবও বাংলায় বই লিখেছিলেন। পরে বাংলা ভাষার উপর জোর দেওয়া হয়। ইংরেজি বর্জিত হয়। তরু দত্তকে স্থান দেওয়া হয় না। লালবিহারী দেকে মান দেওয়া হয় না।

বাঙালিদের অনেক কীর্তি বাদ পড়ে যায়। যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাজ, রমেশচন্দ্র দত্তের কাজ, শ্রীঅরবিন্দের কাজ।

আমাদের দেশেও এক প্রকার কাউন্টার রেনেসাঁস হয়। তাকে বলা হয় হিন্দু রিভাইভালিজম। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে একজন হিন্দু রিভাইভালিস্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর কাজ জার্মান রেফর্মেশনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। হিন্দু রিভাইভালিজমের সঙ্গে যুক্ত স্বামী বিবেকানন্দের নাম। অথচ অনেকে তাঁকে বেঙ্গলি রেনেসাঁসের একজন নায়ক বলে মনে করেন। এই যে বিভ্রান্তি এটা আমাদের রেনেসাঁসকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। এই দ্বিধা আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। হিন্দু রিভাইভালিজম ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কার নয়। তার সঙ্গে রামমোহন প্রবর্তিত ধারার কোনও মিল নেই। ডিরোজিয়ো ও ইয়ং বেঙ্গল হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দু কলেজে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হত না। তার প্রিন্সিপাল ছিলেন খ্রিস্টান। অনেক শিক্ষকও তাই। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক। তাঁরা চেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের কলেজের মতো একটি কলেজ যেখানে 'নতুন বিদ্যা' শেখানো হবে।

আগেকার দিনে ইতিহাস পড়ানো হত না, এখন ইতিহাস পড়ানো হয়। ভূগোল পড়ানো হত না, এখন ভূগোল পড়ানো হয়। মোট কথা হিন্দু কলেজ নামে হিন্দু হলেও চরিত্রে পাশ্চাত্য। ইয়ং বেঙ্গল যাঁদের বলা হয় তাঁরা ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখতেন, তবে নতুন বিষয় নিয়ে লিখতেন। পরবর্তী কালে বাঙালি ভদ্রলোকের সন্তানরা ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতেন। তাঁদের আদর্শ হয়ে ওঠেন শেলি-কীটস-বায়রন প্রভৃতির রোমান্টিক কবিতা। আর স্কট-এর উপন্যাস।

তুষারকান্তি ঘোষ আমায় বলেছিলেন, তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে 'Stran' নামক ম্যাগাজিনের পুরাতন সংখ্যা জোগাড় করেছিলেন। তিনি দেখতে পান ইংরেজিতে যেসব ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। তার অনেকগুলি বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্প ইংরেজি ছোটগল্পের মানস সন্তান। ইংরেজি ছোটগল্প না হলে বাংলা ছোটগল্পই হত না। এটা লজ্জার বিষয় নয়। এরকম ঘটনা বিভিন্ন সাহিত্যে ঘটেছে। রাশিয়ানরা ফরাসি সাহিত্য অনুকরণ করত। রুশ অভিজাতের কাছে যেমন ফরাসি তেমনই বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে ইংরেজি। এই যে ইংরেজি চর্চা এটা স্বদেশী আন্দোলনের সময় লজ্জার বিষয় হয়। বাংলার রেনেসাঁসের দ্বিধাগ্রস্ততার এটাও একটা কারণ। বাঙালি সাহিত্যিক শিখবেন কার কাছ থেকে? মধ্যযুগের চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের কাছ থেকে? না আরও পুরাতন সংস্কৃতজ্ঞদের কাছ থেকে? না সমসাময়িক হিন্দি কবিদের কাছ থেকে? নতুন নতুন বিষয়ে লিখতে হলে ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে ফরাসি জার্মান রুশ নরউইজিয়ন প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যিকদের কাছ থেকে শিখতেই হবে। রেনেসাঁস যদি চালিয়ে যেতে হয় তবে স্বদেশী শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিকতা চাই। তাকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষা।

আমাদের রেনেসাঁসের দম ফুরিয়ে এসেছে। এখন অনেকে প্রশ্ন করছেন আদৌ রেনেসাঁস হয়েছিল কিনা। যাঁরা বলেন হয়নি তারা কী করে বোঝাবেন বাংলা কাব্য থেকে দেবদেবীর কল্পনা উঠে গেল কেন। যে কোনও পুরনো বাংলা কাব্য পড়লে দেখবেন প্রথমেই আছে গণেশ বন্দনা অথবা সেই রকম কোনও দেবদেবীর বন্দনা। একটি কবিতায় ছিল 'বন্দে মাতা সুরধনী পুরাণে মহিমাসনী'। এটি হল গঙ্গার বন্দনা। এই যে রীতি এটা আবহমান কালের বাংলা কবিতার রীতি। এই রীতি নতুন যুগের বাঙালি কবিরা অনুসরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ তো নয়ই। তাঁকে বলা হত বাংলার শেলি। ইংরেজ কবিরাও গ্রিক কবিদের অনুকরণ করতেন। ইংরেজি নাট্যকাররাও ইটালীয় নাট্যকারদের অনুকরণ করতেন। সুতরাং এটা বাঙালির অনুকরণপ্রিয়তা নয়। এর জন্য রেনেসাঁসকে একেবারে অস্বীকার করার কারণ নেই। এ-বিষয়ে পুনর্ভাবনার অবকাশ আছে।

এক কথায় বলা যেতে পারে একজনের বাতি থেকে আর-একজন বাতি ধরিয়ে নেয়, ইংল্যাণ্ডের বাতি থেকে বাংলা বাতি ধরিয়ে নেয়। বাংলার রেনেসাঁস এসেছে ইংল্যাণ্ড থেকে, ইটালি থেকে নয়, ইংরেজি থেকে, সংস্কৃত থেকে নয়। হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শেখানো হত না, তার জন্য সংস্কৃত কলেজে যেতে হত। সেখানে যেতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেরা, পরে কায়স্থের ছেলেরা। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক চেষ্টা করে নবশাখদের ছেলেদের ভর্তি করাতে পেরেছিলেন, কিন্তু সুবর্ণবণিকদের পুত্রদের কোনওমতেই না।

শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা কাওয়েল সাহেব নির্দেশ দেন যে সব জাতের ছেলেরা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারে। তখন অধ্যাপকরা বাধা দিতে পারেন না। সেটা তাঁদের ঔদার্যের জন্য নয়, ইংরেজ শাসনের নিরপেক্ষতার জন্য।

ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় অনেক যত্ন করে এই বই লিখেছেন। তাঁকে আমি আমার অভিনন্দন জানাই।

১২. ৯. ২০০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

মুখবন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণাকালে গবেষক ও গবেষণা-নির্দেশকগণের দৃষ্টিতে এখনও সর্বাগ্রে বিবেচিত হচ্ছে : ঊনবিংশ শতাব্দী তথা বঙ্গীয় রেনেসাঁস, লোকসাহিত্য ও সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ। প্রাগাধুনিক সাহিত্য নিয়েও উৎসাহ লক্ষণীয় হচ্ছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে চর্বিতচর্বনই উপজীব্য। পরিচিত ও সহজেই সংগ্রহযোগ্য কিছু বইপত্র থেকে এলোমেলো উদ্ধৃতি এবং তৎসহ সেই সব গ্রন্থলেখকের বিশ্লেষণ নিজের-নিজের মতো রূপান্তরিত করে যে-সব থিসিস খাড়া করা হচ্ছে, সেগুলি আবর্জনামাত্র। পেশাগত কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ফরমান অনুসারে ডক্টরেট ডিগ্রির চাহিদা ক্রমবর্ধমান কিন্তু শ্রমনিষ্ঠ সাধনার বড়োই অভাব। সবচেয়ে বড়ো কথা, সেই সব থিসিস প্রকাশের জন্য নির্বিচার আকাঙ্ক্ষা। সব গবেষণাকর্মই মুদ্রণ ও প্রকাশযোগ্য নয়, এই কথাটা মনে রাখলে ভালো হতো।

পক্ষান্তরে, কিছু থিসিস মুদ্রিত ও প্রকাশিত না-হলে ক্ষতি হতো। সুখের বিষয়, ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের এই অভিসন্দর্ভটি বিচ্যুতিবিহীন না হলেও সেই বিরল গবেষণাকর্মগুলির অন্যতম, যা পাঠক ও জিজ্ঞাসু মানুষের কাছে উপস্থাপিত করে গবেষক ও প্রকাশক, উভয়েই তাঁদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

প্রসঙ্গ : বঙ্গীয় রেনেসাঁস এবং ইতালীয় রেনেসাঁসের মানদণ্ডে তার তথ্যনিষ্ঠ তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ। বঙ্গীয় রেনেসাঁস প্রসঙ্গে যে-কথাগুলি আমাদের মনে জাগে, তার একটা খসড়া চেহারা আগে পেশ করছি।

বস্তুত, এক-একটা সময় আসে, যখন মানব-অভিজ্ঞতার চেতনার চৌহদ্দি (যা স্বভাবতই খুবই সীমিত এবং পর্ব থেকে পর্বান্তরে সামান্যই পরিবর্তিত হয়) হঠাৎই প্রসারিত হয়ে যায় এবং মানুষের সত্তা সেই নতুন দিগন্তকে জরিপ করতে, অধিগত ও আত্মস্থ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ্ব-ইতিহাসের এইগুলিই হলো স্মরণীয় ও মহান কালপর্ব। এ ধরনের ঘটনা অঙ্গুলিমেয়। ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিশ্রুত গ্রন্থে বিশিষ্ট সমালোচক জি. এইচ. মেয়ার 'দ্য রিনাইসেন্স' প্রসঙ্গে আলোচনায় এই ধরনের সুবর্ণযুগ হিসেবে এথেন্সে পেরিক্লিসের যুগ, য়ুরোপ যে-যুগে আত্মিক ও শৈল্পিক উৎকণ্ঠায় অন্ধকার থেকে মধ্যযুগের অভিযাত্রী, সেই স্বল্প-ব্যাখ্যাত যুগ, রেনেসাঁস ও ফরাসী-বিপ্লবের যুগের উল্লেখ করছেন—

> The Ranaissance was, and was the result of, a numerous and various series of events which followed and accompanied one another from the fourteenth to the beginning of the sixteenth centuries. First and most immediate in its influence on art and literature and thought, was the rediscovery of the ancient literatures.

স্বভাবতই তাই, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধী-নেতৃত্বকেই রেনেসাঁসের একটি পর্বেরও (১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭) একমাত্র গণনীয় ঘটনারূপে চিহ্নিত করা যায় না। ১৯২০-২১ বলতেই দু'-তিন বছর আগেই সদ্যসমাপ্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা ও বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব (অক্টোবর/নভেম্বর বিপ্লব), ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন, কলকাতা কংগ্রেস, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন-এ গান্ধীনেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা

প্রভৃতি অনেক ঘটনাই মনে পড়বে। ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে হিটলারের উত্থান, বিকাশ ও অবলুপ্তি যেমন অন্তর্ভুক্ত তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অগণিত ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের উন্মোচন, যেমন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান, পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রভৃতিও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। দাঙ্গা-দেশভাগ তো আছেই।

১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বহু ঘটনাই গুরুত্বে ও তাৎপর্যে আদৌ ন্যূন ও উপেক্ষণীয় নয়। এই ‘numerous and various series of events’ এবং তার ফলাফল নিয়েই আলোচ্য কালপর্বের চেহারা ও চরিত্র।

বস্তুত, প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অথবা হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ (যখন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র গেল পরিবর্তিত হয়ে) পর্যন্ত হতে পারে একটি পর্ব-পরিকল্পনা। কেননা, ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ কালপর্বে অসংখ্য ঘটনার, পরস্পরবিরোধীও অনেক, সমাহার। শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিচারেও এই কালপর্বের লক্ষণীয় চরিত্র গান্ধীই নয়, জিন্না ও নেতাজী সুভাষও। এই কালপর্বে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগের পাশাপাশি নেতাজীসহ বামপন্থীদের ভূমিকাও প্রণিধানযোগ্য। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ থেকে অগণিত বৈপ্লবিক ও সহিংস আন্দোলন প্রচেষ্টাও এই কালপর্বের চরিত্রদ্যোতক। তাই শুধু গান্ধীনেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনই এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের একমাত্র বা প্রধানতম ঘটনা হতে পারে না।

যে-কালপর্বটির নামকরণ নিয়ে এত বিতর্ক, কিছু কম বেশি সেই ‘একশত বৎসরের জীবনপ্রবাহ’ কি কোনোভাবেই ইতালি তথা ইউরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে ? এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হালদারের উত্তরগর্ভ প্রশ্নটি সর্বাগ্রে উপস্থাপনার যোগ্য—

কেমন করে পরাধীন জাতির মধ্যে আসবে সেই ইতালি বা ইউরোপ-ভূমির রিনাইসেন্স, আসবে ইউরোপের ১৪শ-১৬শ শতাব্দীর জিনিস ভারতবর্ষের ১৯শ শতাব্দীতে ?

বস্তুত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা শুধুই ইউরোপের ১৪শ-১৬শ শতাব্দীর রিনাইসেন্সের ফলটুকুমাত্র পেতে পারি না। যদি শুধু সেইটুকু পেতাম, তা-হলে সেই প্রাপ্তি আমাদের পক্ষে, সময়ের বিচারে তেমন মহার্ঘ্য বিবেচিত হতো না। হালদার খুব স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে ইউরোপের পঞ্চদশ, এমন-কী ষোড়শ শতাব্দীর ধ্যানধারণার উত্তরাধিকার নিয়ে পড়ে থাকলে তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হতো না।

সময়ের দান পুরোপুরি পেয়েছিলাম আমরা। ইউরোপের রেনেসাঁসের পাশাপাশি আমরা ইংরেজদের মাধ্যমে আধুনিক জীবনের তথা ‘Modern Age’-এর স্পর্শ পেয়েছিলাম গত শতাব্দীতেই। “সেই ‘মডার্ন এজ’-এর মধ্যে ইউরোপের রিনাইসেন্স রিফর্মেশন ও ফরাসি বিপ্লবের সম্পদ মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। মডার্ন এজ তখনকার মতো ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।”

“আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির রিনাইসেন্স তাই মানব-ইতিহাসের আধুনিকতম সম্পদসমূহ গ্রহণেরই প্রয়াস। এ শুধু সুকুমার শিল্পের ও জীবন-জিজ্ঞাসার বিকাশ নয়। মডার্ন এজ বা ‘আধুনিকতা’র অর্থ ফিউডাল সভ্যতা থেকে অন্তত বুর্জোয়া সভ্যতায় প্রবেশ এবং মধ্যযুগের সমাজের রূপান্তর—ভাবী সভ্যতার দিকে যাত্রা।”

১৪শ-১৬শ শতাব্দীর ইতালীয় বা যে-কোনো দেশের শিল্প-সাংস্কৃতিক রেনেসাঁস উপরতলার মানুষের উদ্যোগে ও সক্রিয় ভূমিকাতেই উজ্জীবিত ও পরিচালিত হওয়া সম্ভব, সে সব দেশে

তাই হয়েছিল—এই অভিমত ব্যক্ত করে হালদার আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মডার্ন এজ বা আধুনিক জীবনের উদ্ভব ও উজ্জীবনের স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যটি ও সমস্যার দিকটাই তুলে ধরেছেন। মডার্ন এজ বা আধুনিক জীবন উদ্ভূত হতে পারে উদ্যোগী মধ্যবিত্তের হাতে, যুগ-উদ্বোধনের দায়িত্ব অনেক সময়েই থাকে তাদেরই হাতে। 'কিন্তু মডার্ন এজ-এর প্রাণশক্তি দেশের জনসাধারণ। এই আধুনিক যুগের প্রকাশ শুধু শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনে নয় ; কীভাবে, বাস্তব জীবন-জিজ্ঞাসায়, পর পর বাস্তব উদ্যোগে, বিশেষ করে শিল্পে বাণিজ্যে, তেমনি আবিষ্কার ও জীবনযাত্রার প্রয়োগে, বিজ্ঞানের সৌকর্যে।'

উনিশের শতকে আমাদের সামনে সেই রকম পরিস্থিতি এসেছিল একটি চ্যালেঞ্জের মতো। বাঙালি মধ্যবিত্তই তার বাহন হয়েছিল। অধ্যাপক হালদারের সতর্ক ভাষা ও বিশ্লেষণে—বাঙালি মধ্যবিত্তও সমগ্রভাবে নয়—

> ......তারও একটি অংশ, প্রধানত শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক। ১৮১৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বাঙালার, তথা ভারতের ইতিহাস সেই ভদ্রলোকদেরই কীর্তি-অকীর্তির ইতিহাস। জাগরণ ব্যাপক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য পেল না। সমাজের অভ্যন্তরীণ দৈন্য ও মধ্যবিত্তের আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা প্রবল ছিল।

স্বভাবতই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে অনেক জটিল-কুটিল স্রোত ও অন্তঃস্রোত ছিল। তাই সেই নবজাগরণ সর্বদা জয়ের মুখ দেখেনি। অধ্যাপক হালদারের সাহিত্য-গুণান্বিত বিশ্লেষণে—'শেষ অবধি দেখতে পাই তার পদে পদে জয়-পরাজয়, জয়ে পরাজয় আর পরাজয়েও জয়—বিশুদ্ধ জয় নয় বা বিশুদ্ধ পরাজয় নয়।'

তবু, অধ্যাপক গোপাল হালদারের দৃষ্টিতে ও বিচারে—

> এই নবজাগরণ ভারতেতিহাসের এক অভূতপূর্ব মহোৎসব, এই কথাটিও দৃঢ় কণ্ঠেই জানাতে চাই। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই শতাধিক বৎসরের ইতিহাসে এই বঙ্গভূমিতে যে মহৎ জীবনের উদ্বোধন হয়, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন পরম উজ্জ্বল প্রতিভার দীপান্বিতা আর কখনো আসে নি।

এখন (১৪০৪ বঙ্গাব্দ) থেকে ষাট বৎসর আগে (৫ ফাল্গুন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথকৃত একটি নির্ণয়ের অন্তঃসার ও মূল্যমান উজ্জ্বলতররূপেই প্রতিভাত—

> বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই পণ্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলেফুলে তার পরিচয় আছে।

বাংলার নবজাগৃতি বা নবযুগ, রিনাইসেন্স বা রেনেসাঁস বিষয়ক এই অধ্যায়টির রচনারম্ভে তাই সুচিন্তিতভাবেই রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক নির্ণয় বেছে নিয়েছি। বাংলার এই নবজাগৃতি বা রেনেসাঁসের চেহারা-চরিত্র মেজাজ-মর্জি নিয়ে বহু আলোচনা-তর্কবিতর্ক হয়েছে এবং আরো অনেক হবে।

যদিও গোপাল হালদার নবজাগৃতি, নবযুগ, রিনাইসেন্স বা রেনেসাঁস, বঙ্গপ্রসঙ্গে কোনো

অভিধাতেই বিশেষ কোনো আপত্তি তোলেন নি, তবু, 'ইংরেজিতে তাকে Awakening বলাই নিরাপদ মনে' করেছেন।

গোপাল হালদার মনে করেছেন, 'সমগ্রভাবে দেখলে বাংলার জাগরণ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত'। —বাংলার জাগরণের কালপর্যায়কে সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় এই জাগরণের ধারাবাহিক বিকাশের সূচনা এবং ১৯২০-২১ পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটি একশো বৎসর কালব্যাপী তা প্রবাহিত। ১৯২০-২১ সালে তার খাত বদল, ভারতব্যাপী জাগরণের মধ্যে তা মিশে যেতে থাকে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগে তার প্রবাহচ্ছেদ—'একই কালে তাই তার জয় ও পরাজয়'।

তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে, ১৮১৭ থেকে ১৯২০-২১ কালপর্বের শতাব্দীব্যাপী জীবনপ্রবাহই কারও বিবেচনায় 'নবজাগৃতি', কারও মতে 'নবযুগ', ইংরেজিতে 'রিনাইসেন্স', ফরাসি ধরনের উচ্চারণে 'রেনেসাঁস'। তাঁর অভিমত : ইংরেজিতে 'Awakening' বলাই শ্রেয়, কেননা, 'রিনাইসেন্স' বা 'রেনেসাঁস' শব্দ-ব্যবহারে অনেকেরই গুরুতর আপত্তি। বিদেশী ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে যাঁরা সুপণ্ডিত, আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে তাঁরা রিনাইসেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে পান না।

'রিনাইসেন্স' বলতে কী বুঝি, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী, আমাদের বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিক যা-কিছু ঘটেছিল, সামগ্রিক বিবেচনায় তাকে আক্ষরিক অর্থে 'রিনাইসেন্স' বলতে পারি কী না : এসব নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকালে সাধারণত সে প্রশ্নটি আমরা ভুলে থাকি বা এড়িয়ে যাই, ঠিক সেখানেই গোপাল হালদার তাঁর অন্তর্ভেদী সন্ধান চালিত করেছেন। উল্লিখিত 'একশত বৎসরের জীবনপ্রবাহকে' যাঁরা রেনেসাঁস বলেন, তাঁরাও সকলেই জানেন—ইতালি তথা ইউরোপের রেনেসাঁসের একটি 'কার্বনকপি' নয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের রেনেসাঁস। তাঁরাও মনে করেন না, 'দুটি সমতুল্য'। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের উল্লেখ করেছেন গোপাল হালদার এই প্রসঙ্গে। জানিয়েছেন, অধ্যাপক সরকারও ইউরোপের রেনেসাঁস আর আমাদের রেনেসাঁসকে তুলনীয় মনে না করলেও আমাদের আলোচ্য কালপর্ব প্রসঙ্গে 'রেনেসাঁস' শব্দটির ব্যবহার 'বাতিল করে দেন নি।' অধ্যাপক হালদারও অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে সহমত। বস্তুত, ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত Notes on the Bengal Renaissance-এর লেখক অধ্যাপক সরকার পুস্তিকাটির নামকরণের মাধ্যমেই তাঁর পক্ষপাত অনাবৃত রেখেছিলেন। পুস্তিকাটির সূচনাবাক্য এই প্রসঙ্গে অদ্যাপি স্মরণীয়—

> The impact of British rule, bourgeois economy and modern western culture was felt first in Bengal and produced an awakening known usually as the Bengal Renaissance.

অধ্যাপক সরকারের সুবিদিত পুস্তিকার সূচনা অনুচ্ছেদের পরবর্তী দু'টি বাক্যেই পরিস্ফুট। বিগত প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল জুড়ে বাংলার রেনেসাঁসের যাবতীয় আলোচনায় তাঁর মূল্যায়নই প্রায়শ অক্ষুণ্ণ আছে। রেনেসাঁসের কালপর্ব এবং য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের তুলনার সূত্র কোথায় কতটুকু, সে বিষয়েই শুধু নিম্নোদ্ধৃত বাক্যদু'টি আলোকপাত করে না, স্পষ্টতর হয় রেনেসাঁস প্রসঙ্গে আলোচনায় অধ্যাপক সরকারের মূল্যায়ন মূলত অধ্যাপক হালদারেরও মনঃপূত—

For about a century, Bengal's conscious awareness of the changing modern world was more developed than and ahead of that of the rest of India. The role played by Bengal in the modern awakening of India is thus comparable to the position occupied by Italy in the history of the European Renaissance.

রেনেসাঁসের কালপর্ব, গোপাল হালদারের মতে, 'একশত বৎসরের জীবন প্রবাহ', অধ্যাপক সরকারও লিখেছেন, 'for about a century' এবং এ-ও লক্ষণীয় যে হালদার ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে একপ্রান্তে রেখে ১৯২০-২১ সালকে অপরপ্রান্তে রেখেছেন। অধ্যাপক সরকার রেনেসাঁসের সমগ্র শতবর্ষকে পাঁচটি কালপর্বে বিভক্ত করতে গিয়ে প্রথম পর্বের সূচনা বৎসরটিকে ১৮১৪ বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, রামমোহন যখন থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন, সেই ১৮১৪ সালই 'easiest starting point'। অপরপ্রান্তে সরকার রেখেছেন, 'The coming of non-co-operation and the leadership of Mahatma Gandhi.'

অধ্যাপক গোপাল হালদার বঙ্গীয় রেনেসাঁস-বিচারে বহুলাংশে অধ্যাপক সরকারের সমীপবর্তী, প্রায়শ অভিন্নমত। কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাষান্তর সত্ত্বেও রেনেসাঁসকালটিকে পর্বে-পর্বে বিভাজন ব'লে বছর পঞ্চাশেক আগে থেকে শুরু যেমন করেছেন, তেমনি শেষ সীমাটিকেও আরো পঞ্চাশ বছর প্রসারিত করে বস্তুত দু'শো বছরের বেশি সময় জুড়ে পটভূমি ও পরিণামসহ রেনেসাঁসকালের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই পর্ববিভাজন তাঁর ভাষাতেই বুঝে নোওয়া যেতে পারে—

'বাঙালি সমাজের আধুনিকতার পথে বিবর্তনে বাঙালির সৃষ্টি প্রয়াস, তার শতাধিক বৎসরের ভাবনা ও সাধনাকে আমরা কয়েকটা কালানুক্রমিক পর্বে অনুসরণ করতে চাই—বিশেষ করে তার সাহিত্যসৃষ্টির তাৎপর্য অনুধাবন করা হবে আমাদের উদ্দেশ্য। সামগ্রিকভাবে আধুনিককালের পর্বগুলি (অন্যত্রও) আমি এই ভাবেই গ্রহণ করেছি।'

•

বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় চার বছর এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর : সর্বমোট উনচল্লিশ বছর অর্থাৎ প্রায় চারটি দশকের শিক্ষকতা জীবন চলছে যখন, তখন কমবেশি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি সম্ভবত, নিজে তথাকথিত একজন সফল ছাত্র হয়েও, যে, গবেষক হিসাবে তো বটেই এমন কী ছাত্র-ছাত্রী হিসাবেও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে আমি সাধারণত মার্কশীট তথা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সচরাচর কারো বিচার করি না। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথনকালে আমি তার লব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রকৃতি নিয়েও তেমন কোনো উৎকণ্ঠা বা উচ্ছ্বাস অনুভব করি না। শিক্ষকতা জীবনে প্রায় চার দশক এবং বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র হিসাবে আমার নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী জীবন নামের পুঁথিটির কল্যাণে দেশ ও মানুষ-দেখা, এককথায় জীবনের পাঠশালায় পঞ্চাশ বছরের পড়ুয়ার অভিজ্ঞতা-অনুভবের আলোতে শুধু এইটুকু বুঝে নিতে চাই যে, সংকল্প ও সাধনার জোর থাকলে অনেক আপাত অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে।

জঙ্গীপুর কলেজে শিক্ষকতারত প্রীতিভাজন লেখক-গবেষক সুস্নাত দাশ তাঁর কলেজের সহকর্মী শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়কে কয়েক বছর আগে একদিন আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসেন।

শক্তিসাধন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সে-কোনো অপ্রত্যাশিত বা অভিনব প্রস্তাব ছিল না। শক্তিসাধনের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল বা মার্কশীট নিয়ে মাথা ঘামাই নি। একটি কলেজে অধ্যাপনা যখন করছেন, গবেষণা করার ন্যূনতম যোগ্যতা তো তাঁর ছিল-ই। তিনি বললেন, আমি গবেষণা করতে চাই। আমি বললাম, করো। তবে বাংলা সাহিত্যের কোন্ দিকে তোমার আগ্রহ, কী বিষয় নিয়ে কাজ করতে চাও, সে-সব নিয়ে চূড়ান্তভাবে মনস্থির করো, তারপর এসো, তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বিষয় চূড়ান্ত করে পড়াশোনার গভীরে যেতে হবে।

এইভাবেই বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনাকালেই আমি গবেষকের মন ও চেতনার মান বুঝে নিয়ে কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি। এই নিয়ে আলোচনা কতদিন চলবে, বিষয়-নির্বাচন কতদিনে সম্ভব হবে, তা নির্ভর করে গবেষকের সংকল্পের জোর, চিন্তার স্বচ্ছতা ও মানসিক-অ্যাকাডেমিক প্রস্তুতির 'পরে।

এই আলোচনাকালে কয়েক দিনের মধ্যেই শক্তিসাধনের একটি স্বাতন্ত্র্য আমার অনুভবে ধরা পড়েছিল। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় শক্তিসাধন নিজেই জানিয়েছিলেন, কীভাবে তিনি রেনেসাঁস প্রসঙ্গে বিস্তারিত পড়াশোনা ও আনুষ্ঠানিক গবেষণাকর্মে ব্রতী হন। আমার কাছে গবেষণার জন্য এসে থেকেই তিনি বাংলার রেনেসাঁস নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে কৃতসংকল্প ছিলেন। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর এই দৃঢ়তা ও আগ্রহের গভীরতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। যদিও সমগ্র পরিকল্পনাটি গড়ে তুলতে আমাদের কয়েকটা দিন বিস্তারিত আলোচনায় ব্যয় করতে হয়, কেননা, মূল বিষয় সম্পর্কে শক্তির বিষয়—প্রথমত : রেনেসাঁস, দ্বিতীয়ত, রেনেসাঁস এবং সর্বোপরি শেষাবধি রেনেসাঁস। শক্তির সংকল্প ও সাধনার জোরের দিকটি সত্যই তারিফ্ করার মতো। এবং নিঃসন্দেহে গবেষকগণের পক্ষে অনুসরণযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যতই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হোক না কেন, শুধু রেনেসাঁস বলতেই তেমন কিছু বোঝায় না। আমার কাছে শুধু এইটুকু স্পষ্ট হলো যে, শক্তি রেনেসাঁস নিয়ে 'তরুণ গরুড়সম' পড়াশোনার একটি মহৎ ক্ষুধায় জর্জরিত। বিষয়টিকে তিনি সম্ভাব্য সমস্তরকম দিক থেকে যাচাই করে দেখতে খুবই ব্যাকুল। তাই এই ব্যাকুলতা একালের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষার্থী গবেষকগণের মধ্যে অতীব বিরল এবং তাঁর এই জিজ্ঞাসু মনটিকে আমার যথার্থ জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে দৃষ্টান্তস্থলরূপেই ক্রমশ প্রতিভাত হলো। তাই আমি তাঁর এই পাঠব্যাকুলতাকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনপথে চালিত করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি আনুষ্ঠানিক চেহারা-চরিত্র ও অবয়ব দানের লক্ষ্যে তাঁর মনোভাব বুঝে গবেষণাকর্মটিকে 'বাংলায় রেনেসাঁস বিচার : রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ' নামে বিন্যস্ত করাই সঙ্গত বলে মনে করেছিলাম।

গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু, তার পরিসীমা এবং নামকরণ সাব্যস্ত হওয়ার পরেই শক্তিসাধন যে গভীর-নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, যে বিপুল পরিশ্রম ও মনঃসংযোগ, যে ব্যাপক পাঠ ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন সে সবই অকৃপণ প্রশংসার যোগ্য।

ভূমিকা, প্রস্তাবনা, এবং শেষভাগে গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী, পরিশিষ্ট, বিষয় নির্দেশিকা ও নির্ঘণ্ট ছাড়া শক্তিসাধনের অভিসন্দর্ভের এগারোটি অধ্যায় আর সেগুলির সুচিন্তিত বিন্যাস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এগারোটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম দু'টি অধ্যায় মূল অভিসন্দর্ভের এক-চতুর্থাংশ পরিসর দাবি

করেছে। বস্তুত এই দু'টি অধ্যায় নিয়েই একটি স্বতন্ত্র গবেষণাকর্ম সম্ভব হতে পারত। এমনকি বিদ্যমান অবয়বযুক্ত এই অংশটির ঈষৎ পুনর্বিন্যস্ত রূপের জন্যই গবেষককে ডক্টরেট উপাধি দিলে অসঙ্গত হতো না। প্রথম অধ্যায়টিতে ড. মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস : ইতিবাদী ও নেতিবাদী মতামত' সংগ্রহ করেছেন। বঙ্গীয় রেনেসাঁস প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যিনি যা বলেছেন, শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে নরহরি কবিরাজ পর্যন্ত, উনিশজন বিশেষজ্ঞের ইতিবাদী অভিমত সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করার পরে গবেষক সেগুলি পর্যালোচনা করেছেন। অতঃপর এই অধ্যায়ে নেতিবাদী রেনেসাঁস ভাষ্যকারদের অভিমতসমূহ গবেষক সংগ্রহ করেছেন। এখানে তিনি অন্যূন এগারোজন লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন এবং সেগুলির পর্যালোচনা উপস্থাপিত করেছেন। অধ্যায়টির শেষে গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রসঙ্গে ইতালীয় রেনেসাঁসের বিষয়টি আলোচকদের চেতনায় ও/বা অবচেতনায় কমবেশি থেকে যায় অথচ ইতালীয় রেনেসাঁসের অখণ্ড পরিচয় গ্রহণের উদ্যোগ এই সূত্রে কোনো পণ্ডিতই সেভাবে গ্রহণ করেন না। তাই প্রথম অধ্যায়ের শেষে লেখক 'ইতালীয় রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে' অনুপুঙ্খ পরিক্রমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। লক্ষণীয়, প্রথম অধ্যায়ের শেষে গবেষকের উল্লেখপঞ্জীতে দু'শো উনসত্তরটি সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এই উল্লেখটি প্রতিটি অধ্যায় প্রসঙ্গে এবং সমগ্র অভিসন্দর্ভটির সূত্রেও গবেষকের ব্যাপক অধ্যয়নের দৃষ্টান্তরূপে অনিবার্যত প্রণিধানযোগ্য। প্রতিশ্রুতিমতো দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে ইতালীয় রেনেসাঁসের যে পরিচয় গবেষক উপস্থিত করেছেন, তা' তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপ্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি যে-পরিসরে বিন্যস্ত, প্রায় সমসংখ্যক পরিসর জুড়ে আছে তদ্বিষয়ক দু'শো সাঁইত্রিশটি সূত্রের উল্লেখপঞ্জী।

অতঃপর রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, মুসলমান সমাজ ও রবীন্দ্রনাথ আলোচিত হয়েছেন প্রাসঙ্গিকভাবে সাতটি অধ্যায় জুড়ে। দশম অধ্যায়টিতে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ দান যে বাংলা সাহিত্য, সে বিষয়ে আলোচনা করে একাদশ অধ্যায়টিকে গবেষক ড. মুখোপাধ্যায় উপসংহার নামে চিহ্নিত করেছেন।

অধ্যায় হিসাবে বিচার করলে 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের স্বর্ণ শতদল : রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক নবম অধ্যায়টি সর্ববৃহৎ।

গবেষক ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের ব্যাপক অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণপ্রবণতা অশেষ সাধুবাদের যোগ্য হলেও অন্যূন তিনটি দুর্বল দিক তাঁর এই শ্রমসাধ্য আন্তরিক প্রচেষ্টাকে অংশত ব্যাহত করেছে বলে মনে হতে পারে। প্রথমত, অভিসন্দর্ভটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এক্ষেত্রে সংহতি গুণের কিছু অভাব অনুভূত হতে পারে। নবীন গবেষকসুলভ আতিশয্যদোষ ও প্রদর্শনস্পৃহা ড. মুখোপাধ্যায় সর্বথা পরিহার করতে পারেননি। সর্বোপরি, তথ্য ও পরিসংখ্যানের অনিঃশেষ দায় বহন করতে গিয়ে তিনি শুধু জিজ্ঞাসু পাঠকদের পরেই নয়, নিজের উপরেও বেশ কিছুটা অবিচার করে ফেলেছেন। বহু অবান্তর ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকর উল্লেখ ও উদ্ধৃতি গবেষণাকর্মটির তাৎপর্য গ্রহণের পথে অংশত অন্তরায়রূপে প্রতীত হতে পারে। সাহিত্যগত আলোচনা প্রসঙ্গে গবেষক সর্বত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিচারনিষ্ঠ থাকতে পারেননি—একথাও সাহিত্যানুরাগী কোনো-কোনো পাঠকের মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

তবু, এই গ্রন্থটির ইতিবাচক দিকগুলিও বিশেষ প্রাপ্তি। কেবল, বাংলার রেনেসাঁস নিয়ে আলোচনা কম হয় নি। অনেক বিদগ্ধ ও মনস্বী বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। রেনেসাঁস নিয়ে

নানাধরনের গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। শক্তির গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে, এ গ্রন্থে বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কিত আলোচনা একটা নতুন মাত্রার সন্ধান করেছে। তা' যদি না-ই হবে, তবে এটি গবেষণাগ্রন্থরূপে স্বীকৃতি পাবে কেন ? রেনেসাঁস-বিষয়ক আলোচনার ইতিহাসে শক্তি স্পষ্ট দু'টি পর্ব লক্ষ্য করেছেন। প্রথম পর্বে বাংলার নবজাগরণকে আতিশয্যে মহিমান্বিত করে দেখা হয়েছিল। পরে রেনেসাঁস বিষয়ে উঠে আসে অনেক সংগত কূট প্রশ্ন। বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় তার অনেক নেতিবাচক দিক ধরা পড়ে। নেতিবাদী আতিশয্য আচ্ছন্ন করে ফেলে বাংলার নবজাগরণ ও তার প্রাণপুরুষদের যথার্থ মূল্যায়ন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ডিরোজিও-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুই নন, এরকম একটি ভঙ্গি প্রাধান্য পেতে থাকে। শক্তির এই গবেষণাগ্রন্থটিতে পূর্বতন দুটি ধারার রেনেসাঁস আলোচনার আতিশয্যজনিত দুর্বলতা পরিহার করার উদ্যোগ চোখে পড়ে। রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালি। ইতালীয় রেনেসাঁসের মানদণ্ডে বাংলার নবজাগরণকে বিচার করে এখানে শক্তি নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট। তাঁর বক্তব্য, রেনেসাঁসকে বিচার করতে হবে রেনেসাঁসের মানদণ্ডে।

ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে স্বচ্ছ ও শুদ্ধ ধারণা এ গ্রন্থ আমাদের দিচ্ছে। বাংলার রেনেসাঁস আলোচনায় শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ক হবে। সকলে তাঁর বিচারের সঙ্গে সহমত না-হলেও অনুভব করবেন, তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রণিধানযোগ্য। অতঃপর বাংলার রেনেসাঁস বিষয়ক আলোচনা বা উনিশ শতকের বাংলা নিয়ে আলোচনা বা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কীর্তিমান প্রতিভাধরদের মূল্যায়নে এই গ্রন্থটি সংগ্রহযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাতে আমার সংশয় নেই। মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং তার বাইরেও কৌতূহলী ব্যাপক পাঠকমণ্ডলীর কাছে এই সারস্বত উপহারটি সমাদরযোগ্য বলে মনে করি।

এহো বাহ্য। গ্রন্থকাররূপে গবেষকের এই প্রথম আবির্ভাব ত্রুটিহীন না হলেও এই গ্রন্থটির ইতিবাচক গুণগুলি এত বেশি যে, সব জড়িয়ে বাংলা ভাষায় বঙ্গীয় রেনেসাঁস এবং তুলনীয় সূত্ররূপে ইতালীয় রেনেসাঁস নিয়ে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য শক্তিসাধন আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। এই কৃতজ্ঞতা অসীমে পৌঁছবে, যদি কখনো ছাত্রছাত্রী ও জিজ্ঞাসু পাঠকসাধারণের স্বার্থের কথা ভেবে ড. মুখোপাধ্যায় ও তাঁর প্রকাশক তাঁর সমগ্র অভিসন্দর্ভটির একটি সংক্ষিপ্ত-সংহত ও সাবলীলপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশ করতে পারেন। আপাতত যা পাওয়া গেল তার জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে মননদীপ্ত লেখকগণের অগ্রবর্তী সারিতে নিজের অবস্থানটিকে সুচিহ্নিত করেছেন বলে আমার মতো অগণিত জিজ্ঞাসু পাঠকের অকুণ্ঠিত অভিনন্দন তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য বলে মনে করি।

আশুতোষ ভবন
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০০

ভূমিকা

অনেকেই যখন একুশ শতকের দিকে পা বাড়িয়ে আমি তখন ফিরে গেলাম উনিশ শতকে। উনিশ শতকে সূচিত বাংলার রেনেসাঁসকে সঠিকভাবে বুঝে নিতে যেতে হল আরও পিছনে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালিতে। রামমোহন থেকে পেত্রার্কায়, রবীন্দ্রনাথ থেকে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিতে। কিছুদিন থেকে বলা হচ্ছিল, উনিশ শতকের বাংলায় যা হয়েছিল তা রেনেসাঁস নামেব অযোগ্য ; 'খণ্ডিত খর্বিত, পঙ্গু'; 'a distorted carricature of the same'। সত্যি কি তাই? আসল রেনেসাঁসটা কেমন? রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালি। 'মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক' হিসাবে খ্যাত ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করলে বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে কেমন লাগে দেখতে। সেই অন্বেষণেরই ফসল এই গ্রন্থ, ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস। এই গ্রন্থের উৎসে আছে রীতিমত একটি গবেষণা। এ গ্রন্থে রেনেসাঁস বিষয়ক দেশী-বিদেশী প্রায় দ্বিশতাধিক গ্রন্থের সূচক-বক্তব্যের সঙ্গে পাওয়া যাবে, ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারণা ও বঙ্গীয় রেনেসাঁস-ব্যাখ্যায় তার নিবিড় প্রয়োগ। বাংলার রেনেসাঁস নিয়ে এ ধরনের তৌলন, তাত্ত্বিক ও প্রয়োগনিষ্ঠ গ্রন্থ এই প্রথম।

জঙ্গীপুরের মতো একটি মফস্বল কলেজে বাংলা পড়াতে পড়াতে এ কাজ সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশন এ কাজের জন্য লঙ টার্ম টিচার-ফেলোশিপ মঞ্জুর করায় সুবিধা হয়। যোগ দিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে টিচার ফেলো হিসাবে। 'বাংলায় রেনেসাঁস বিচার ঃ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ'—এই শিরোনাম যুক্ত গবেষণা-কর্মের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে পি-এইচ. ডি. উপাধি দান করেন (১৯৯৬)। বর্তমান গ্রন্থটি সেই গবেষণাকর্মেরই রূপান্তরিত রূপ।

ছুটি মঞ্জুর করার জন্য জঙ্গীপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ, ফেলোশিপ মঞ্জুর করার জন্য ইউ. জি. সি. এবং পি-এইচ. ডি. উপাধিদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর কথা বিশেষভাবে বলতে হয় তিনি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ক. বি.)। কাজটি আমাকে করতে হয়েছে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। রেনেসাঁস একটা 'ডেড সাবজেক্ট', তা নিয়ে আর নতুন কিছু বলার নেই—এরকম একটা বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামতেই পারতাম না, যদি না তিনি নির্ভীক পৌরুষ ও রাজসিক ঔদার্য নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতেন এবং প্রথম দিন থেকেই আমার উপর অবিশ্বাস্য আস্থা স্থাপন করে আমাকে দিয়ে দিতেন স্বপ্নের স্বাধীনতা। তাঁর সঙ্গে প্রণাম জানাই বহির্বঙ্গ ও দেশান্তরের দুই গবেষণাপত্র-পরীক্ষককে। তাঁদের ইতিবাচক মতামতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে প্রণম্য হয়েছেন মৌখিক গবেষণা-পরীক্ষক ড. অতীশ দাশগুপ্ত (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলিকাতা)। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবৈগুণ্যে গোয়েন্দা না হয়ে গবেষকের পক্ষে জানা দুরূহ গবেষণাপত্র-পরীক্ষকদের বিস্তারিত মতামত, এমনকি তাঁদের সঠিক পরিচয়টুকু।

পরিকল্পনা ছিল একটা রিভিউ টাইপের কাজ করার। কাজ যখন প্রায় শেষ তখন ন্যাশানাল লাইব্রেরি গেলাম ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়তে। গিয়ে দেখি, রেনেসাঁস সম্পর্কিত গ্রন্থের এক বিপুল ভাণ্ডার প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি ডুবে যাই ইতালীয় রেনেসাঁসের মধ্যে। মাস দেড়েকের জায়গায় কেটে যায় বছর দেড়েক। সে এক আনন্দ-ঝঙ্কৃত অভিজ্ঞতা। আমার প্রয়োজনের পাত্র কখন উপচে যায়। স্পষ্ট বুঝতে পারি, বাংলার রেনেসাঁস আলোচনা পড়ে আছে ভিত্তিহীন অবস্থায়। মনে হয়, ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কিত এই অর্জন বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিচারে প্রয়োগ করলে বাংলায় রেনেসাঁস আলোচনা নতুন করে প্রাণ পাবে।

বাংলার রেনেসাঁস বিষয়ক গবেষণাকে আমি গ্রহণ করেছি সামাজিক কর্তব্য হিসাবে। আমার নিভৃত অর্জনকে একান্ত ব্যক্তিগত ও আত্মোন্নতির উপায় হিসাবে অবগুণ্ঠনবতী করে রাখিনি। প্রথমাবধি আমি অর্জিত জ্ঞানকে সামাজিক জীবনে সঞ্চারিত করে দিতে সচেষ্ট ছিলাম। সেজন্য বুক-রিভিউ, প্রবন্ধ রচনা, সেমিনার-পেপার পাঠ. তর্ক-বিতর্ক, বক্তৃতা-আদি সমস্ত ফ্রন্টগুলিই আমি ব্যবহার করেছি অকুণ্ঠিত চিত্তে, খানিকটা লড়াকু মেজাজে। এ ব্যাপারে যে দুটি পত্রিকা সবচেয়ে বেশি সুযোগ আমাকে দিয়েছেন তাদের নাম সর্বাগ্রে করি '*গণশক্তি*' ও '*চতুরঙ্গ*'। দৈনিক '*গণশক্তি*' পত্রিকার সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ও '*চতুরঙ্গ*' পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রউফকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। 'পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ' ও 'ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেজ' (কলিকাতা) নামক দুটি বিদ্বৎসভার নামও এ প্রসঙ্গে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইতিহাস সংসদের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশনেই আমি রেনেসাঁস বিষয়ে গবেষণা পাঠ করেছি। সংসদ প্রকাশিত '*ইতিহাস অনুসন্ধান*'-এর বিভিন্ন খণ্ডে সেগুলি সংকলিত হয়েছে। অপর পক্ষে 'স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেজ'-এর বিভিন্ন সেমিনারে উত্থাপিত পেপারগুলি স্কুলের মুখপত্র '*সমাজ সমীক্ষা*'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য '*ইতিহাস সংসদ*'-এর সভাপতি এ. ডাবলু. মাহমুদ. গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। 'সোস্যাল সায়েন্সেজ'-এর ডিরেক্টর ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক ড. নবকুমার নন্দী ও পার্থ রাহাকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

রেনেসাঁস সম্পর্কিত রচনাদি প্রকাশ করার জন্য '*যুবমানস*' পত্রিকার সম্পাদক সৌমিত্র লাহিড়ী, '*ঐকতান গবেষণা পত্রিকা*'-র সম্পাদক নীতীশ বিশ্বাস, '*অনুষ্টুপ*' পত্রিকার সম্পাদক অনিল আচার্য ও অতিথি-সম্পাদক মার্কসবাদী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ধনঞ্জয় দাশ, '*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*'র সম্পাদক ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, '*বাংলা আকাদেমি*' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে ড. বিজিতকুমার দত্ত, '*আনন্দবাজার পত্রিকা*'র সম্পাদক, '*কোরক*' পত্রিকার সম্পাদক তাপস ভৌমিক, '*সুন্দরম*' (ঢাকা) পত্রিকার সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

রেনেসাঁস বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে খ্যাতনামা বিদগ্ধ অভিনেতা উৎপল দত্ত, বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার ও আইনমন্ত্রী সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে, কখনও '*গণশক্তি*' পত্রিকায়—কখনও '*চতুরঙ্গ*' পত্রিকায়। বিতর্ক গড়িয়েছে রামমোহন থেকে দান্তে পর্যন্ত।

এর মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় রেনেসাঁস বিষয়ক পুস্তকাদি রিভিউ করতে থাকি। রিভিউ করি সুশোভন সরকার (বঙ্গানুবাদ), সুরেশচন্দ্র মৈত্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, শিবনারায়ণ রায়, অলোক রায়, অমর দত্ত, স্বপন বসু, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মজিরউদ্দীন মিয়া, জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রমুখের গ্রন্থাদি। এই সূত্রেও ব্যক্ত করতে থাকি আমার মতামত।

ধীরে ধীরে রেনেসাঁস বা রেনেসাঁস-ব্যক্তিত্ব নিয়ে বক্তৃতার আহ্বানেও সাড়া দিতে শুরু করি। বক্তৃতা দানের সুযোগ দানের জন্য *'ডিরোজিও স্মরণ সমিতি'*র সম্পাদক অধীর কুমার, *'বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি'*র উদ্যোগে পরিচালিত *'বিদ্যাসাগর মেলা'*র সভাপতি জননেতা বিমান বসু, সম্পাদক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের *'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'*-এর সম্পাদক অরুণকুমার গুপ্ত, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা জানাই।

রেনেসাঁস বিষয়ক বিভিন্ন রচনা পাঠ করে যাঁরা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে তাঁদের ইতিবাচক ও সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমাকে প্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। ইতিহাস সংসদে পঠিত 'রেনেসাঁস ও বাংলার মুসলমান সমাজ' নামক একটি গবেষণাপত্রের সূত্রে *'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ'*-এর সভাপতি এ. এফ. সালাহ্‌উদ্দীন-এর সঙ্গে একান্তে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার সুযোগ হয়। তিনি আমার বিশ্লেষণে সন্তোষ প্রকাশ করে *'বাংলাদেশ স্টাডিজ্ সেন্টার'* এ গিয়ে গবেষণা করার আমন্ত্রণ জানান। বন্ধুবর মুনতাসীর মামুন উক্ত নিবন্ধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে প্রকাশিত মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত *'সুন্দরম'* পত্রিকায় লিডিং আর্টিকল্ হিসাবে প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেন। বিভিন্ন রচনা উপলক্ষে যাঁরা উৎসাহব্যঞ্জক স্নেহ ও পরামর্শ বর্ষণ করেছেন তাঁরা অন্নদাশঙ্কর রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার, সুধী প্রধান, ধনঞ্জয় দাশ, ড. ক্ষুদিরাম দাশ, ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ড. আবীরলাল মুখোপাধ্যায়, ড. দিলীপকুমার বিশ্বাস, এ. ডাবলু. মাহমুদ, ড. বরুণ দে, ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, মহাদেবপ্রসাদ সাহা, ড. অমলেন্দু দে, ড. পবিত্র সরকার, ড. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, ড. অতীশ দাশগুপ্ত, ড. রঞ্জিত সেন, ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ড. মানস মজুমদার, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী, ড. সত্যনারায়ণ দাশ, ড. সুমিতা চক্রবর্তী, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সুধীর চক্রবর্তী, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্র মিত্র, ড. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, অমর দত্ত, রবীন পাল, অমিতাভ চন্দ, ড. বিপ্লব চক্রবর্তী, ড. অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অঞ্জন বেরা, ড. লিলি দত্ত, ড. মঞ্জুশ্রী দাসসামন্ত, প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়, পুলকনারায়ণ ধর, সুজিৎ ঘোষ, অনাথবন্ধু দে, মৈত্রেয়ী সরকার, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. প্রদীপ ঘোষ, সৌমিত্র সিনহা, অরুণাভ ঘোষ, ঘনশ্যাম চৌধুরী, আবদ্ সাত্তার, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, ড. নীলরতন ঘোষ, সমীরণ চক্রবর্তী, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, ..রায়ণচন্দ্র আশ, পরিমল মুখোপাধ্যায়, বিমল সরকার, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিনতি মুখোপাধ্যায়, মারিয়া চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত জাটী।

অধ্যাপক থেকে গবেষক, গবেষক থেকে পুস্তক সমালোচক-নিবন্ধকার, নিবন্ধকার থেকে গ্রন্থকার হওয়ার পথে বিভিন্ন জোড়মুখে যাঁরা সেতুবন্ধন করেছেন তাঁদের জানাই কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা—সহকর্মী সুস্নাত দাশ, হিতার্থী মেহবুব আলম, অধ্যাপক

সুজিৎ ঘোষ, বন্ধুবর ড. প্রবীরকুমার লাহা, সম্পাদক আবদুর রউফ এবং আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ।

এই সুযোগে শ্রদ্ধা জানাই আমার বিভিন্ন পর্বের প্রাণসঞ্চারী শিক্ষকদের—চিররঞ্জন চক্রবর্তী, অনিমেষ গুহ, বৈদ্যনাথ সেন, কালীপদ সিংহ, ড. সত্যনারায়ণ দাশ, অবন্তীকুমার সান্যাল, ড. বিজিতকুমার দত্ত, ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ।

আমার ভাঙা-চোরা জীবনের বিভিন্ন সংকট-পর্বে যাঁরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি। মামা গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী যিনি দায়িত্ব না নিলে স্কুলের মধ্যপর্বেই ইতি ঘটত আমার পড়াশুনার ; ত্রিপুরাচরণ স্মৃতিতীর্থ যিনি বিজয় চতুষ্পাঠীতে আশ্রয়ের বন্দোবস্ত না করলে দুরূহ হতো কলেজে পড়া, ড. সত্যনারায়ণ দাশ যিনি যোগাড় করতে না পারা টাকাটা হাতে গুঁজে না দিলে এম. এ.-তে ভর্তি হওয়া যেত না। অগ্রজাধিক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ও সিতাংশু রক্ষিত যাঁরা দুর্দিনে উৎসাহের সঙ্গে টাকাও যোগাতেন, ড. নারায়ণচন্দ্র ঘোষ যিনি ছিলেন দুঃসর্ময়ের কর্মদাতা—তাঁরই ডিসপেনসারিতে হোমিওপ্যাথি কম্পাউন্ডারি দিয়ে শুরু করেছিলাম আমার অনন্যোপায় কর্মজীবন। কম্পাউন্ডারি করতে করতেই এম. এ. টা পড়া। ড. সচ্চিদানন্দ ধর যিনি পুরিয়া থেকে প্রিয়ডে তুলে আনেন। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য যিনি কলেজ থেকে বাড়তি এক বছরের ছুটির বন্দোবস্ত না করলে যে গবেষণাকর্ম শেষ করা যেত না, এবং অগ্রজাধিকা নমিতা আশ যিনি কলকাতায় আশ্রয়ের প্রাথমিক বন্দোবস্ত না করলে অথৈ জলে পড়তাম।

স্বীকার করি জঙ্গীপুর কলেজের সহমর্মী সহকর্মী *'বাণীকণ্ঠ'* পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক আশিস রায়, ড দিলীপ ঘোষ. ড. অসীমকুমার মণ্ডল, অঞ্জনা সেন চক্রবর্তী, শ্রীমতী মজুমদার, ড. বাসুদেব চক্রবর্তী, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভট্টাচার্য, ঊষারঞ্জন পাল, সৌরীন দাশ, অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দুকিশোর গুপ্ত, সুস্নাত দাশ, ড. ইন্দ্রাণী ঘোষ, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী, ড. অভয়শঙ্কর চক্রবর্তী, সত্যব্রত সরকার প্রমুখের উষ্ণ আগ্রহের কথা। এঁদের সঙ্গে বল্টু লালা মৈত্রেয়ী লালা দম্পতি ও বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও মনে করতে হয়। স্বীকার করি খিদিরপুর কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অন্তরঙ্গ সহমর্মিতার কথা—অধ্যক্ষ ড. শামসুল আলম, ড. উত্তম দাশ, ড. অসিত মুখোপাধ্যায়, রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু শেখর রায়, ড. রুমা চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ মিশ্র, অসিতকুমার মন্ডল, মানোয়ারা খাতুন, রূপা গুপ্তা, রণেশ রায়, ড. আবু বক্কর জিল্লানী, সুদক্ষিণা রায়, ড. সুব্রত বাগচী, ড. মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, ড. মঞ্জুষা তরফদার, সুনন্দা মুখার্জী প্রমুখদের সঙ্গে সেই সব প্রবীণ অধ্যাপকদের কথা যাঁদের শুভেচ্ছা আমার নিত্যসঙ্গী।

মনে পড়ে কলকাতায় *'চতুরঙ্গ'* পত্রিকার দপ্তরে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী 'সংহতি' আসরে ; বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-এর সিঁড়িতে *'সংস্কৃতি'* পত্রিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে গবেষক-বন্ধু অর্চন চট্টোপাধ্যায়, নিঃসীম পাল, সুমন্তকল্যাণ পাল, আশবিকা গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ চক্রবর্তী, রতনকুমার দাস, দুলালচন্দ্র রায় প্রমুখের সঙ্গে কতদিন উত্তেজনার আগুন পুইয়েছি ; C U R S A-র ঘরে, 'সোস্যাল সায়েন্স', *'গণশক্তি'* পত্রিকার 'রবিবারের পাতা'র আসরে কত বিকেল, সন্ধ্যা কাটিয়েছি ; ঝাপানডাঙ্গা সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের সূত্রে নিখিলদা, চঞ্চল, সমীরণ, নারায়ণ, রামপদ, হিমাংশু, পূর্ণেন্দু, তারক, বিনয় এদের

ঘিরে কেটেছে কত কর্মব্যস্ত প্রহর।

সামাজিক সম্পর্কের আলো হাওয়ার সঙ্গে দরকার হয় রস সংগ্রহের নিভৃত ভাণ্ডার। যে সব পাঠাগার থেকে আমি সংগ্রহ করেছি আমার রসদ—জাতীয় গ্রন্থাগার (কলিকাতা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা), এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা), মুজাফফর আহমদ পাঠাগার (কলিকাতা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ-এর গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (বর্ধমান), বাংলা বিভাগীয় ডি. এস. এ. লাইব্রেরি (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), আমেরিকান লাইব্রেরি (কলিকাতা), টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট (কলিকাতা), পাঁচড়া পাঠাগার (বর্ধমান), ঝাপানডাঙ্গা সাধারণ পাঠাগার (বর্ধমান), জঙ্গীপুর কলেজ গ্রন্থাগার (মুর্শিদাবাদ), ধনঞ্জয় দাশের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার।

আমাদের পারিবারিক জীবন মৃত্তিকার মতো। তাই উল্লেখ করি তাঁদের কথা যাঁদের মাধুর্যমণ্ডিত ত্যাগস্বীকার ছাড়া এ কাজ শুরুই করা যেত না, শেষ তো দূর অস্ত্। আমার মা নমিতা মুখোপাধ্যায়, স্ত্রী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়, বোন কবিতা মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ করি তাঁদের কথা যাঁরা আমার অনেক শূন্যতা স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন কৃষ্ণা মিশ্র, রবীন্দ্রনাথ মিশ্র, শর্মিষ্ঠা মিশ্র, ও অগ্রজাধিক শরদিন্দুকিশোর গুপ্ত। আর সেই ঝর্নার কলপ্রবাহ, পাখির গান পাথরের মতো নিমগ্ন অচঞ্চল আমাকে ঘিরে সদা নৃত্যছন্দিত আমার কন্যা কস্তুরী মুখোপাধ্যায়।

বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে কবে যেন দরবার করেছিলাম একটুকরো আশীর্বাণীর জন্য। বইটির প্রুফকপি দেখে তিনি প্রত্যাশার পাত্র উপচে পূর্ণ করে দিয়েছেন আমার সৌভাগ্য। শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্তের সৌজন্যে শেষমুহূর্তে হাতে এল সেই লেখা।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর কমল মিত্রের কথা। এই বিপুলায়তন গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিজে থেকে এগিয়ে এসে গ্রহণ না করলে বিভিন্ন ফ্রন্টে তরঙ্গাভিঘাতের যে প্রক্রিয়া চালু করেছিলাম তা সুসংবদ্ধ আকার পেতো না। নিভৃত অর্জন ও তৃষিত প্রত্যাশার মধ্যে এ গ্রন্থ রচনা করবে সেতুবন্ধন। প্রগ্রেসিভের নীরব নেপথ্যকর্মী শ্যামল রায়চৌধুরীর সঙ্গে ঊষা প্রেসের কর্ণধার শুভেন্দু রায় ও কর্মীবন্ধুরা আমার নানা উপদ্রব হাসিমুখে সহ্য করে পালন করেছেন মুদ্রণের দায়িত্ব আর শিল্পী পার্থপ্রতিম বিশ্বাস যিনি প্রচ্ছদ অঙ্কনের প্রয়োজনে আগ্রহের সঙ্গে বুঝে নিয়েছিলেন গ্রন্থটির থিম তাঁকেও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। এ গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে আমি শুধু এটুকু বোঝাতে চেয়েছি, উনিশ শতকে সূচিত বাংলার রেনেসাঁস অসহনীয় বোঝা হয়ে আসেনি; এসেছিল ভেলা হয়ে, একুশ শতকের যাত্রীদের জন্যেও যাতে আছে আশ্রয়ের নিশ্চিত অভী।

মহালয়া, ১৪০৭ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৩ডি, সরশুনা মেইন রোড

সরশুনা

কলকাতা-৭০০০৬১

দূরভাষ : ৪৯৩-৩০৬০

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের বাংলায় রামমোহন যে আধুনিকতাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, বিভিন্ন মননশীল ও সৃজনশীল প্রতিভার দানে যা সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের মতো বৈশ্বিক প্রতিভার মধ্যে যার চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক সমুন্নতি লক্ষ করা যায়, তাকে রেনেসাঁস বলা যায় কিনা—তা নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু ইতোপূর্বে প্রায় কেউই প্রকৃত রেনেসাঁস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে অগ্রসর হননি। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃত রেনেসাঁস সম্পর্কে ভিত্তিগত ধারণার আলোকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে বিচার করা।

রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালি। আমাদের রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের কেউ-কেউ প্রথমদিকে ইতালীয় রেনেসাঁসের কথা তুললেও, তাকে যথার্থ গভীরতা দানের দায়িত্ব কেউ পালন করেননি। রেনেসাঁস আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় সেই ভিত্তিমূলক কাজটুকু আমরা সাধ্যমত করার চেষ্টা করেছি। ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়নের সূত্রে আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি তার মৌলিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলি। তাতে দেখা যায়, আমাদের পূর্ববর্তী রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের রেনেসাঁস সম্পর্কিত ধারণার গোড়ায় গলদ। ফলে তাঁদের রেনেসাঁস আলোচনাও হয়েছে প্রায়ই ভিত্তিহীন। এখানে আমরা ইতালীয় রেনেসাঁস বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন-সূত্রে অর্জিত তথ্য ও তত্ত্বসূত্রগুলি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছি, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সময়কালে বাংলায় যা হয়েছিল, তা রেনেসাঁসই। যে-সব ত্রুটির ভিত্তিতে বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে নাকচ করা হয়, সে-সব ত্রুটি ইতালীয় রেনেসাঁসেও ছিল।

আমাদের এই অনুসন্ধাননিষ্ঠ গ্রন্থটি পালন করছে ত্রিবিধ দায়িত্ব। এর দ্বারা প্রকটিত হচ্ছে ইতোপূর্বে স্তূপীকৃত বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কিত অধিকাংশ ভাষ্যের অন্তঃসারশূন্যতা ; গড়ে উঠছে প্রকৃত রেনেসাঁস সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারণা ; উদ্ভাসিত হচ্ছে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রকৃত গৌরবের দিকগুলি।

আমাদের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ফসল আমরা বিন্যস্ত করেছি এগারোটি অধ্যায়ে। **প্রথম অধ্যায়ের** শিরোনাম ঃ 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিচার ঃ ইতিবাদী ও নেতিবাদী মতামত'. এখানে আমরা দেখিয়েছি রেনেসাঁস বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী ভাষ্যকারদের মতবৈচিত্র্যগুলি। প্রকৃত রেনেসাঁস সম্পর্কে ধারণাহীনতাই এই মতবৈচিত্র্যের কারণ। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** আমরা অগ্রসর হয়েছি 'রেনেসাঁস সম্পর্কে ভিত্তিগত ধারণার উৎস সন্ধানে'। রেনেসাঁস সম্পর্কে আমাদের ভাষ্যকারদের ইউটোপীয় ধারণাগুলি নস্যাৎ করে, আমরা এখানে রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালির রেনেসাঁস সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ও যতদূর-সম্ভব যথাযথ ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি । দেখিয়েছি, 'মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক' হিসাবে খ্যাত সেই রেনেসাঁস ছিল বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের প্রত্যুষ ফসল। আধুনিকতার সূচনাকারী সেই রেনেসাঁস অর্থবহ বা সার্থক হয়েছিল বহু অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক

ব্যক্তিপ্রতিভার উদ্ভবে। গ্যারিনের ভাষায়, এঁরা ছিলেন 'নিউ টাইপ অব ম্যান'। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রতিভূ-স্থানীয় কয়েকজন প্রতিভাধরের মননশীল ও সৃজনশীল সক্রিয়তা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখিয়েছি, তাঁদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল রেনেসাঁসের মৌলিক লক্ষণগুলি। **তৃতীয় অধ্যায়ে** দেখানো হয়েছে, কেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি' বা 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' থেকে নয়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা ধরতে হবে রামমোহন থেকে। রামমোহনের রচনাবলী ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে, তাঁর মধ্যেই প্রথম প্রস্ফুটিত হয়েছিল রেনেসাঁসের বিশিষ্ট চরিত্রগুলি। **চতুর্থ অধ্যায়ে** আমাদের আলোচ্য হিন্দু কলেজ, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল। ইতালীয় রেনেসাঁসের স্কুল, তার শিক্ষক ও হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে, বঙ্গসংস্কৃতির নবায়নে এঁরা পালন করেছিলেন রেনেসাঁসোচিত ভূমিকা। মাতৃভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে এঁদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে-সম্পর্কে বিশ্লেষণনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়ে** আমরা এনেছি বিদ্যাসাগরের কথা। রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের আলোকে এবং তৌলন আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি বিদ্যাসাগরের মতো এমন হিউম্যানিস্ট ইতালীয় রেনেসাঁস চোখে দেখেনি। **ষষ্ঠ অধ্যায়ে** এসেছে নবযুগের কবি মাইকেলের কথা। যেমন ব্যক্তিগত জীবন, তেমনি সাহিত্য সাধনা—তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিল রেনেসাঁসের চারিত্র্য। প্রথম জীবনে তীব্র পাশ্চাত্যানুরাগ, পরবর্তী পর্যায়ে মাতৃভাষায় আত্মনিবেদন—প্রবাস ও প্রত্যাবর্তনের এই দ্বিমুখী নাটক ইতালিতেও দেখা গিয়েছিল। **সপ্তম অধ্যায়ে** দেখানো হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের পা রেনেসাঁসে থাকলেও মাথা ছিল রিফরমেশনে। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের মতো বঙ্কিম প্রাচীনবিদ্যার অনুরাগী, শিল্পীদের মতো সৌন্দর্যস্রষ্টা হলেও, তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল রিফরমিস্ট-সুলভ নীতিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবন প্রয়াস। জার্মান রিফরমেশনের প্রসঙ্গ এনে তাঁর স্বদেশ ও স্বধর্মকে একাকার করে দেখার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষপাদে স্ফুটতর হয়েছিল রিফরমেশনের ঝোঁক। বঙ্কিমে সেই দ্বৈততা স্পষ্ট। 'একই বৃন্তে দুইটি কুসুম' অভিধেয় **অষ্টম অধ্যায়ে** আমরা আলোকপাত করেছি প্রায় অনালোচিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ। এখানে দেখানো হয়েছে, দেরীতে হলেও মুসলমান সমাজে ধীরে-ধীরে জাগরণ এসেছিল। প্রসঙ্গটিকে অধিকাংশ রেনেসাঁস-আলোচনায় হয় উপেক্ষা করা হয়েছে, নয় ভুলভাবে দেখানো হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, বেগম রোকেয়া প্রমুখ সেই জাগরণের প্রতিভূ। **নবম অধ্যায়ে** আমরা এসে দাঁড়িয়েছি 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের স্বর্ণ-শতদল' রবীন্দ্রনাথের সামনে। দেখানোর চেষ্টা করেছি, রামমোহন থেকে সূচিত এবং বিভিন্ন মননশীল ও সৃজনশীল মনীষার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রেনেসাঁসের নানা লক্ষণযুক্ত, বহু ধারাময়ী নদী কীভাবে রবীন্দ্রসঙ্গমে এসে মিলেছিল। দেখানো হয়েছে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের চলৎকালের মধ্যে ঘনীভূত 'অ্যান্টি-রেনেসাঁস' উপাদানগুলি তিনি কীভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন বিপরীতকে এনে বেঁধেছিলেন অদৃষ্টপূর্ব সামঞ্জস্য-সূত্রে। অনন্য, বহুমুখী

ও বৈশ্বিক প্রতিভার অধিকারী হিসাবে ইতালীয় রেনেসাঁসের 'Fullest Man' লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের অবদান কম কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সমাপ্তি বিষয়ক প্রশ্নটির একরকম সমাধান করা হয়েছে। **দশম অধ্যায়ে** আমরা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছি, স্বদেশ-চেতনা বা স্বধর্মের গৌরবময় পুনরুজ্জীবন নয়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ দান বাংলা সাহিত্য। ইতালীয় রেনেসাঁসে যেমন চিত্রকলা, বঙ্গীয় রেনেসাঁসে তেমনি সাহিত্য। রেনেসাঁসের সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য বাংলা সাহিত্যে এসে বৈচিত্র্যঘন প্রকাশ লাভ করেছিল। **একাদশ অধ্যায়ে** আমরা নিবেদন করেছি এই সিদ্ধান্ত যে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে পালাবদলের প্রথম রূপকার হিসাবে ইতালীয় রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও সঠিক বিচারে, ইতালীয় রেনেসাঁসের তুলনায় বঙ্গীয় রেনেসাঁস অনেক দিক থেকেই ছিল মহত্তর।

প্রথম অধ্যায়	বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিচার ঃ ইতিবাদী ও নেতিবাদী মতামত

বাংলার রেনেসাঁস আলোচনার দু'টি মেরু। কেউ যদি বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে জানতে চান, তবে তাঁকে দাঁড়াতে হবে সেইরকম একটি দু'মাথার মোড়ে, যার একদিকে সাইনবোর্ড টাঙানো আছে, 'truly a Renaissance'[১]; অন্যদিকে, 'বাঙলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা'।[২] সাদা কথায় আলোচনা দু'রকম—রেনেসাঁস হয়েছে ও রেনেসাঁস বলে সেরকম কিছু হয়নি।

হ্যাঁ-মূলক আলোচনা

প্রথমেই যদি রেনেসাঁস-জিজ্ঞাসু পথিক হ্যাঁ-মূলক আলোচনার পথ ধরে হাঁটেন, তবে সে পথে যাঁদের সঙ্গে দেখা হবে তাঁরা হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী,[৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার,[৪] অমিত সেন,[৫] বিনয় ঘোষ,[৬] যোগেশচন্দ্র বাগল,[৭] অরবিন্দ ঘোষ,[৮] মোহিতলাল মজুমদার,[৯] সুশীলকুমার গুপ্ত,[১০] অন্নদাশঙ্কর রায়,[১১] অতুলচন্দ্র গুপ্ত,[১২] কাজী আবদুল ওদুদ,[১৩] ডেভিড কফ,[১৪] কালীকিঙ্কর দত্ত,[১৫] এইচ. সি. ই. জ্যাকেরিয়া,[১৬] শিবনারায়ণ রায়,[১৭] অমলেশ ত্রিপাঠী,[১৮] নরহরি কবিরাজ[১৯] প্রমুখ রেনেসাঁস-ভাষ্যকারগণ।

ইতিবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের যে-সব বক্তব্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসু-পাঠকের পরিচয় ঘটার সম্ভাবনা তা এইরকম—

১. "It was truly a Renaissance, wider, deeper and more revolutionary than that of Europe, after the fall of Constantine."

—J. N. Sarkar[২০]

২. "The role played in the modern awakening of India is thus comparable to the position occupied by Italy in the story of the European Renaissance."

—S. Sarkar[২১]

৩. "উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা নিঃসন্দেহে বাংলার 'ফ্লোরেন্স', বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ-কেন্দ্র।"

—বিনয় ঘোষ[২২]

৪. "বাংলার রেনেসাঁস তাই ইটালির অনুরূপ হয়নি তা সত্ত্বেও রেনেসাঁস বলে তাকে চেনা যায়।....আসলে আমাদের রেনেসাঁস ইয়োরোপের চার শতাব্দীর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ও বিমিশ্র অনুবর্তন।"

—অন্নদাশঙ্কর রায়[২৩]

৫. "আমার মনে হয় উনিশ শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে বঙ্গদেশের মানসজীবনে যা ঘটেছিল তাকে সেই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে *(ইওরোপীয় রেনেসাঁস সম্পর্কিত ধারণা—শ. মু.)* রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত।"

—শিবনারায়ণ রায়[২৪]

৬. "It was indeed a Renaissance, nothing short of a new birth that

happened to Bengal in the Nineteenth Century."

—K. A. Wadud[২৫]

৭. "I want to make it crystal clear that I believe Bengal did have Renaissance in the 19th Century." —D. Kopf[২৬]

৮. "Modern India evolved out of the awakening of Nineteenth Century is a historic truth and it was Bengal which was the centre of this awakening." —N. S. Bose[২৭]

৯. "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতিক চেতনা, দেশপ্রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সমুদয় উন্নতি বাঙ্গালীকে গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠাইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার বিন্দুমাত্র সূচনা বা সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। এই সমুদয় গুরুতর পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং যাহা ক্রমে সমুদয় ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া নবীন ভারত গঠন করিয়াছে, পৃথিবীর যে-কোন দেশের ইতিহাসে তাহা এক গৌরবময় অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।" —রমেশচন্দ্র মজুমদার[২৮]

১০. "....there is a silver lining to every cloud. Even in this period (*19th Century—S.M.*), when atmosphere was surcharged with thickening mist, there appeared passages of coming revolutions in all phases of Indian life. Here was indeed the dawn of the New India."

—K. K. Dutta[২৯]

১১. "বাঙলার জাগরণ গালগল্প নয়, এটি ঐতিহাসিক সত্য।" —নরহরি কবিরাজ[৩০]

হ্যাঁ-মূলক রেনেসাঁস-ভাষ্যের পর্যালোচনা

হ্যাঁ-মূলক রেনেসাঁস-ভাষ্য মানে সব মিলিয়ে মোটামুটি একটিই মত—এরকম ভাবলে ভুল করা হবে। ক. রেনেসাঁসের কখন শুরু, কখন শেষ? খ. রেনেসাঁসের কারণগত উপাদান; গ. রেনেসাঁসের যথার্থ প্রতিফলন ক্ষেত্র ; ঘ. রেনেসাঁসের প্রতিভূ-ব্যক্তিত্ব—এইসব প্রশ্নের নির্ণয়ে ইতিবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা যে-সব মতামত পোষণ করেন, তা বিচিত্র রকমের। সেই সব মতবৈচিত্র্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে—

ক. কবে শুরু, কবে শেষ

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা কবে থেকে—এই প্রশ্নের উত্তরে যে সাল-তারিখগুলি বিভিন্ন ইতিবাদী-ভাষ্যকারদের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়, তা মোটামুটি এইরকম—১৭৫৭, ১৭৮৪, ১৮০০, ১৮১৫, ১৮১৭, ১৮১৮, ১৮২৬, ১৮৩৫।

১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয় ও ইংরাজ রাজত্বের সূচনা থেকেই আধুনিক যুগের শুরু—এ বক্তব্য যদুনাথ সরকারের।[৩১] ১৭৮৪ সালে উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা থেকে রেনেসাঁসের সূচনাকাল—এ বক্তব্য রেখেছেন

ডেভিড কফ।[৩২] ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে রেনেসাঁসের সূচনা ধরতে চেয়েছেন সুশীলকুমার গুপ্ত,[৩৩] যোগেশচন্দ্র বাগল,[৩৪] রমেশচন্দ্র মজুমদার[৩৫] প্রমুখ। ১৮১৫-তে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতা বাস শুরু করলে নব্যযুগের সূত্রপাত হয়—এ মত ব্যক্ত করেছেন সুশোভন সরকার,[৩৬] আবদুল ওদুদ,[৩৭] নিমাইসাধন বসু,[৩৮] অন্নদাশঙ্কর রায়,[৩৯] শিবনারায়ণ রায়[৪০] প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে এ ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন কালীকিঙ্কর দত্ত,[৪১] দিলীপ চট্টোপাধ্যায়[৪২] প্রমুখ। এ এফ সালাহউদ্দীন এ ব্যাপারে ১৮১৮ সালের পক্ষে।[৪৩] ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজে ডিরোজিও শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলে শুরু হয় উত্তাল জিজ্ঞাসার যুগ—স্বপন বসু এরকম মত পোষণ করেছেন।[৪৪] ১৮৩৫ সালে মেকলের উদ্যোগে সরকারীভাবে ইংরাজি-শিক্ষানীতি গ্রহণকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন যাঁরা, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন।[৪৫]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সমাপ্তি-বিন্দু নিয়েও মতবৈচিত্র্যের অভাব নেই। এ-প্রসঙ্গে যে বক্তব্য বা সাল তারিখগুলির কথা বলা হয়, সেগুলি এইরকম—১৮৩৫, ১৮৫৬, ১৮৬০, ১৮৮৫, বিবেকানন্দ পর্যন্ত, ১৯০৫, ১৯১১, ১৯১৯, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, চল্লিশের দশকের গোড়া, আমাদের রেনেসাঁস চলছে-চলবে।

১৮৩৫ সালে পাশ্চাত্য-শিক্ষানীতির সূচনা 'এশিয়াটিক সোসাইটি' থেকে সূচিত প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে একরকম সমাপ্তিরেখা টেনে দেয়। ডেভিড কফের মতে, এখানেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সমাপ্তি ঘটে।[৪৬] ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে 'বিধবা বিবাহ' আইন পাস হয়। এরপর সমাজ প্রগতির পক্ষে নতুন কিছু হয়নি, এ মত স্বপন বসুর।[৪৭] সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর নবজাগরণের আলোচনা প্রসারিত করেছেন ১৮৬০ সাল পর্যন্ত।[৪৮] ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে রেনেসাঁসের সুবর্ণ পরিণাম হিসাবে দেখতে চেয়েছেন যোগেশচন্দ্র বাগল।[৪৯] মোহিতলাল মজুমদার মনে করেন, 'বাংলার নবযুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই একরূপ সমাপ্তিলাভ করিয়াছে'[৫০] বিশেষ করে বিবেকানন্দের পরে বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কিত আলোচনা টেনে নিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা তিনি দেখতে পাননি। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে রমেশচন্দ্র মজুমদার সীমান্তরেখা বলে উল্লেখ করেছেন।[৫১] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,[৫২] নরহরি কবিরাজ,[৫৩] রাখালচন্দ্র নাথ[৫৪] ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯১১ সালকে পরিণাম-রেখা হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সুশোভন সরকার রেনেসাঁস আলোচনাকে ১৯১৯-এর পর আর টানতে চাননি। তিনি বলেছেন, "বাংলার রেনেসাঁসকেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে টেনে আনবার সার্থকতা দেখি না, যদিও তার জের আজ পর্যন্ত অপ্রতিহত।"[৫৫] শিবনারায়ণ রায়ের মতে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত রেনেসাঁসের প্রসার। তারপর তাতে অবসন্নতা নামে।[৫৬] অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন,

> "প্রথম রেনেসাঁস এখনো অসমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ধানে সে নিঃশেষিত হয়নি। ...তাই আমাদের রেনেসাঁস চলছে, চলবে।"[৫৭]

লক্ষ করলে দেখা যাবে, ডেভিড কফের রেনেসাঁস-প্রকল্প যেখানে শেষ, সুনীল

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সেখানে রেনেসাঁসের শুরু। রেনেসাঁসের শুরু ও শেষ নিয়ে ইতিবাদী ভাষ্যকারদের মতারণ্যে পথ হারিয়ে ফেলা বিচিত্র কিছু নয়।

খ. কারণগত উপাদান

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কারণগত-উপাদান সংক্রান্ত আলোচনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতই সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু এই সূত্রটিকেও বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নভাবে গ্রহণ ও পেশ করেছেন। উপরন্তু অন্যরকম মতামতও ব্যক্ত করেছেন কেউ-কেউ।

১. ভারতবিদ্যার বিদেশী-পথিকরা ব্রিটিশ প্রশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচ্যবিদ্যার নিবিড় চর্চা শুরু করলে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা হয়। এ তত্ত্ব ডেভিড কফের।[৫৮]
২. খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের মধ্যে দিয়ে উপ্ত হয়েছিল রেনেসাঁসের বীজ। সুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এরকম একটা বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।[৫৯]
৩. পাশ্চাত্য-শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শনের প্রসারই বঙ্গীয়·রেনেসাঁসের মূল কারণ। এ বক্তব্য মেকলে, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ অনেকের।

মেকলের বক্তব্য ছিল এইরকম—

"What the Greek and Latin were to the contemporaries of Thomas More and Roger Ascham, our tongue is to the people of India. The literature of England is now more valuable than that of classical antiquity."[৬০]

যদুনাথ সরকার লিখেছেন,

"The greatest gift of the English....is the Renaissance which marked our 19th Century. Modern India owes everything to it."[৬১]

সুশোভন সরকারের ভাষায়—

"The impact of British rule, bourgeoise economy and modern western culture was felt first in Bengal and produced an awakening known usually as the Bengal Renaissance."[৬২]

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন,

"আমাদের রেনেসাঁস ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটেছে কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ধারাবাহিকতার সূত্রে আসেনি। ইউরোপের ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হয়েছে।"[৬৩]

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *'বঙ্গীয় রনেশাঁসে পাশ্চাত্যবিদ্যার ভূমিকা'* গ্রন্থে লিখেছেন—

"সুষ্ঠু ইংরেজী চর্চার মাধ্যমেই মূলতঃ ইয়োরোপের সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। অতঃপর এই নূতনতর বিদ্যার সংস্রব ও সাযুজ্যে আমাদের সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্তে বস্তুতঃ বৈপ্লবিক প্রসার, প্রস্ফুরণ ও সৌষ্ঠব সম্ভবপর হয় এবং যা কার্যতঃ গড়ে তোলে এদেশীয় রনেশাঁসের পটভূমি।"[৬৪]

৪. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারকে মূল কারণ হিসাবে না দেখে কেউ-কেউ একে সহায়ক উপাদান হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে শিবনারায়ণ রায় বলেছেন, "বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে কলকাতা শহরের উদ্ভব ও বিকাশ.....এ সবই বাঙালির মানস উজ্জীবনে এবং ভারতব্যাপী প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এ-সব তথ্যের দ্বারা ঐ উজ্জীবনের মূল্য বা প্রভাবের অস্তিত্ব অভিগ্রস্ত হয় না।"[৬৫]

৫. মোহিতলাল মজুমদারের মতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষ চিকিৎসায় আসে নবযুগ। তিনি মনে করেন,

"এই নবজাগরণ সম্ভব হইয়াছিল একটিমাত্র কারণে, জাতির (*বাঙালী—শ. মু.*) দেহও যেমন সুস্থ ছিল, তেমনি তাহার প্রাণশক্তিও ছিল অটুট; যেন বহুকাল সঞ্চিত শারীরিক শক্তি ও হৃদয়বল একটা অভাবনীয় সুযোগে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।"[৬৬]

৬. একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ, অন্যদিকে প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যার চর্চায় সম্ভব হয় এই রেনেসাঁস। নিমাইসাধন বসু, অমিতাভ মুখার্জী, সুশীলকুমার গুপ্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কালীকিঙ্কর দত্ত, সুশীল জানা প্রমুখ এই বক্তব্য রেখেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ছাড়াও দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এই রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ বিষয়ে নিমাইসাধন বসু লিখেছেন,

"Besides it, there was an another very important factor—an inspiration from true ancient traditions and the country's glorious past."[৬৭]

অমিতাভ মুখার্জীও একই রকম অভিমত পোষণ করেছেন,

"A pride in the country's past which proved to be an important factor in the national awakening of India."[৬৮]

সুশোভন সরকার বঙ্গীয় রেনেসাঁসে দু'টি ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে, উভয়-ধারার মধ্যে কোনো মিলন সংঘটিত হয়নি। 'Conflict within the Bengal Renaissance' নামক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন,

"It may be suggested that the correct concept in our case is not synthesis but the interpenetration of opposites."[৬৯]

সুশীলকুমার গুপ্ত বলেছেন, বাংলায় নবজাগরণ বলতে যা বোঝায় তা,

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও মর্মগত বিরোধের ফল।"[৭০]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরোধ-তত্ত্বকে অতিক্রম করে কেউ কেউ মিলন-তত্ত্বের কথা এনেছেন। সুশীলকুমার জানা 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নবজাগরণ' নামক নিবন্ধে এ বিষয়ে লিখেছেন,

'বস্তুত আমাদের নবজাগরণের চরিত্র বিচারে রবীন্দ্রোক্ত *'মিলনতত্ত্ব'-টিকে* গুরুত্ব না দিয়ে কেবলি পাশ্চাত্য প্রভাবের অনুসন্ধান করা ঠিক নয়।....আমরা শিল্প সাহিত্যের

ক্ষেত্রে এই মিলনতত্ত্বকেই দেখি।"[৭১]

কালীকিঙ্কর দত্ত রেনেসাঁসকে দেখেছেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনতত্ত্বের আধারে।

"Indeed Renascent India has been the product of a splendid blending of the new and the old of the progressive cultural treasures of the nineteenth century west and the revived classical lore of India as it had been in the days of her ancient greatness."[৭২]

এই মিলনতত্ত্বের কথা এইচ. সি. ই জ্যাকোরিয়া বলেছেন কিম্ভূত-ভাষায়,

"the quientessence and very strengthful of the R E N A S C E N T I N D I A lies just in the fact, that it has indeed ancient Hindusthan for its mother, but modern England for its father."[৭৩]

৭. বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে পশ্চিমী-দৃষ্টিকে সুশোভন সরকার, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখ কেউ-কেউ প্রাচ্যাভিমানের উপরে স্থান দিয়েছেন। সুশোভন সরকার বলেছেন,

"বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে পশ্চিমী-দৃষ্টিকে আমি প্রাচ্যাভিমানের উপরে স্থান দিই দুই কারণে। প্রথমত, এই জাগরণের মূল প্রেরণা আসে নূতনের আগমনে ; প্রাচীন রক্ষণশীলতা ঠিক তার আদি উৎস ছিল না....রেনেসাঁসের গঠনকার্যে প্রাচ্যাভিমানের দান অস্বীকার না করেও বলা চলে যে তার প্রাণসঞ্চার হয়েছিল পশ্চিমী চিন্তার আবাহনে। দ্বিতীয়ত....যে সমাজবাদ আমাদের কাম্য, ন্যায্যত তার সাক্ষাৎ পাই প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে ; যে-পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও পরিণতি।"[৭৪]

৮ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণমূলক আতিশয্য ক্ষতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, ভারতীয় ঐতিহ্য বা আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণ দিয়ে কোনো রকমে ভারসাম্য আনা গেছে এবং সফল হয়েছে রেনেসাঁস—এ বক্তব্য অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, নিমাইসাধন বসু, শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমুখের। প্রণবরঞ্জন ঘোষ লিখেছেন,

"আধুনিকযুগের যে সব সমালোচক রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি প্রগতিবাদের সপক্ষে যুক্তিস্থাপন উপলক্ষে তাঁদের অধ্যাত্ম-প্রেরণার কথা বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞান বা মানবিকতার কষ্টিপাথরে উনিশ শতকের চিন্তাধারার সার্থকতা বিচার করতে যান, তাঁরা উনিশ শতকের একটি মৌল সত্য বিস্মৃত হন।....রামমোহন যেমন ভারতীয় দর্শনের প্রধান সূত্রটি গ্রহণ করেছেন বেদান্ত থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি ভক্তি সাধনার বিচিত্র পন্থার অভিযাত্রী হয়েও শেষ অবধি অদ্বৈতবাদের অধিষ্ঠান-ভূমিতেই আধ্যাত্মিকতার পরম উত্তরণ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত করেছেন।"[৭৫]

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত গ্রন্থে[৭৬] বা শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থগুচ্ছে[৭৭] প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা বা সংস্কৃতির সমালোচনা করে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিজয়কে বড় করে দেখিয়েছেন। নিমাইসাধন বসু লিখেছেন,

রামমোহনের কণ্ঠ কিছু বুদ্ধিজীবীর কাছে পৌঁছেছিল মাত্র, কিন্তু

"Vivekananda's was the voice of the soul. It went into the heart of the nation."[৭৮]

৯. রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

....(পশ্চিমী) সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল, অমনি বাংলা দেশ সচেতন হয়ে উঠল।"

এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তিনি *'ভারতের নবজন্ম'* গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন ইওরোপীয় প্রভাবের বন্যা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। ঘুলিয়ে দিয়েছে তার নিজস্বতাকে। একে অতিক্রম করতে পারলে আসবে নবজন্মের সম্ভাবনা।[৭৯]

১০. যদুনাথ সরকার[৮০] বা রমেশচন্দ্র মজুমদার[৮১] তাঁদের গ্রন্থে রেনেসাঁস-প্রকল্পকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছেন যাতে বলা হয়েছে মধ্য-যুগে মুসলিম শাসন ও সংস্কৃতি এনেছিল অন্ধকারযুগ। বৃটিশ-শাসন তার সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ ঘটিয়ে এনেছে রেনেসাঁসের আলো। রেনেসাঁসের আলোক-তত্ত্বের বিপরীত মেরুতে তাঁরা ঐস্লামিক শাসনকে স্থাপন করেছেন। কিন্তু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম কারণগত উপাদান হিসাবে ঐস্লামিক ঐতিহ্যের কথা সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ, অমলেন্দু দে, সুমিত সরকার প্রমুখ। অমলেন্দু দে একটি নিবন্ধে রামমোহন রায়কে দারা শিকোহ্‌র উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখিয়েছেন।[৮২] সুমিত সরকার 'Rammohun Roy and the break with the past' নামক নিবন্ধে বলেছেন,

"It would be quite unhistorical, however, to attribute Rammohun's rationalism entirely to a knowledge of progressive western culture."[৮৩]

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখিয়েছেন, তাঁর 'তুহ্‌ফাৎ'-এ রয়েছে অষ্টম শতাব্দীর মুতাজিলা ও দ্বাদশ শতাব্দীর মুওহাহিদ্দিন আন্দোলনের ঐস্লামিক যুক্তিবাদের প্রভাব।[৮৪]

গ. প্রতিফলন ক্ষেত্র

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের যথার্থ প্রতিফলন-ক্ষেত্রের প্রশ্নে বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নরকম সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।

১. অনেকেই বলেছেন, রেনেসাঁস নতুন করে গড়ে দিয়েছিল উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল নবজাগরণের বাঁধভাঙা প্রবাহ। রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশীলকুমার গুপ্ত সেই মর্মেই তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *'বাংলা দেশের ইতিহাস'* গ্রন্থে লিখেছেন,

"উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতিক চেতনা, দেশপ্রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সমুদয় উন্নতি বাঙ্গালীকে গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠাইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার বিন্দুমাত্র সূচনা বা সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। এই সমুদয় গুরুতর পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে নবজাগরণের

সূত্রপাত হইয়াছিল এবং যাহা ক্রমে সমুদয় ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া নবীন ভারতকে গঠন করিয়াছে, পৃথিবীর যে-কোন দেশের ইতিহাসে তাহা এক গৌরবময় অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।"[৮৫]

কেউ কেউ এই রেনেসাঁসকে বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের বক্তব্যে আছে তার সচেতন ঘোষণা। মোহিতলাল *'বাংলার নবযুগ'* গ্রন্থে বলেছেন,

"উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসই এ যুগের সারা ভারতের ইতিহাস।"[৮৬]

অনেকের মতে—

"নবজাগৃতি শেষপর্যন্ত হিন্দু জাগৃতি ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। জাতিকে সর্ববিষয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ করাই ছিল এই নবজাগৃতির লক্ষ্য। এই হিন্দু জাগৃতির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুজাতিকে অধঃপতন হইতে তুলিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী জাতিসমূহের পাশে একই মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা।"[৮৭]

কেউ বা বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে দেখেছেন নবীন বা আধুনিক ভারতের গৌরবময় যাত্রা-বিন্দু হিসাবে। জওহরলাল নেহেরু তাঁর *'Discovery of India'* গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৮৮] কে. কে. দত্ত তাঁর *'Dawn of Renascent India'* বা নিমাই সাধন বসু তাঁর *'Indian Awakening and Bengal'* গ্রন্থে বঙ্গীয় রেনেসাঁস থেকেই যে নবীন ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন।

২. সামন্ততন্ত্রের জোয়াল ফেলে দিয়ে আধুনিক জীবনবাদ গ্রহণই ছিল রেনেসাঁসের কাম্য লক্ষ্য। বঙ্গীয় রেনেসাঁস সেই উদ্দেশ্য সাধন করেছিল অনেক পরিমাণে—এদিক থেকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে দেখতে চেয়েছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায়, নরহরি কবিরাজ প্রমুখ। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রধান দান 'Social reform, rationalism, secular humanism'.[৮৯]

সুশোভন সরকার লিখেছেন,

"This was indeed the expression, in theory at least of the brightest side of the bourgeois culture of the west."[৯০]

বিনয় ঘোষ *'বাংলার নবজাগৃতি'* গ্রন্থে বলেছেন,

"বৃটিশ ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দান হল, প্রাচীন ভারতীয় সামন্তপ্রথার ভিত শিথিল করে দিয়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুকূল বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করা।"[৯১]

অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন,

"রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে সর্বদেশে সর্বপ্রকারে মুক্ত করতে। শাস্ত্রের হাত থেকে, দেবতার হাত থেকে, গুরুর হাত থেকে, পুরোহিতের হাত থেকে, কুসংস্কারের হাত থেকে, কুপ্রথার হাত থেকে, অধীনতার হাত থেকে, অসাম্যের হাত থেকে।"[৯২]

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে—

"The essence of the Renaissance Movement was a critical outlook on history. It was a revolt against authority. It was replacement of faith by reason."[১৩]

শিবনারায়ণ রায় প্রায় একই রকম মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন,

"শাস্ত্রবচন, গুরুবাদ এবং অপরোক্ষানুভূতির জায়গায় রেনেসাঁস যুক্তিকে জ্ঞান এবং নীতিবোধের মুখ্য নির্দেশক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।"[১৪]

"পশ্চিমের প্রাণবন্ত ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে উনিশ শতকে এদেশে দেখা দেন আধুনিক ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা। এঁরা প্রথার উপরে স্থান দেন যুক্তিকে, শাস্ত্রের উপর ব্যক্তির বিবেককে।"[১৫]

এঁদের মতে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উজ্জ্বলতর সময়।

৩. অনেকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সার্থকতা দেখেছেন ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে। এঁরা রেনেসাঁস বা নবজন্ম বলতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের জাগরণকে বুঝিয়েছেন। সেদিক থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এঁদের অনেকের মতে রেনেসাঁসের সিদ্ধিকাল। অরবিন্দ ঘোষ, মোহিতলাল মজুমদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নিমাইসাধন বসু, অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কাজী আবদুল ওদুদ, রাখালচন্দ্র নাথ প্রমুখ এই ধরনের বক্তব্যের পক্ষপাতী। অরবিন্দ ঘোষ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের পুনরুজ্জীবনকে প্রকৃত ও প্রত্যাশিত রেনেসাঁস বলে মনে করেছেন।

'ভারতের নবজন্ম' গ্রন্থে তিনি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন। প্রণবরঞ্জন ঘোষ লিখেছেন,

"বেদান্ত বা অধ্যাত্ম উপলব্ধি-ভিত্তিক মানবিকতাই ভারতীয় মানবিকতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। এদিক থেকে উনিশ শতকের চিন্তাধারায় বিদ্যাসাগরের চেয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দান অনেক বেশি।"[১৬]

রাখালচন্দ্র নাথ লিখেছেন,

"বাংলার জাগরণযুগ বিশেষভাবে ধর্ম-জিজ্ঞাসার যুগ।"[১৭]

নিমাইসাধন বসু বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, ভূদেব প্রমুখদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'হিন্দু রিভাইভ্যালিজম' শব্দের পরিবর্তে 'Hindu Awakening' শব্দটিই গ্রহণযোগ্য।

"It is certain that these writers comtributed to the growth and strengthening of a new spirit of self confidence which laid emphasis on Hindu religion, culture and tradition."[১৮]

কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ ছিল চরিত্রগত ভাবে ধার্মিক।

"The true nature of the Awakening that Bengal and India had in the 19th Century : We mean to say that it was essentially religious. Of the front rank leaders after Rammohun, Debendranath,

Keshabchandra, Ramkrishna, Vivekananda and Rabindranath were frankly of religious desposition."[৯৯]

৪. অনেক রেনেসাঁস-ভাষ্যকাবেব মতে বাংলার জাগরণ সার্থকতা লাভ করেছে স্বদেশী বা স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে। রমেশচন্দ্র মজুমদার, নিমাইসাধন বসু, সুশোভন সরকার, যোগেশচন্দ্র বাগল, নরহরি কবিরাজ, রাখালচন্দ্র নাথ সেই মর্মে বক্তব্য রেখেছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

"উনিশ শতকের বাংলার যে জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হয় তাহার প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য—জাতীয়তাভাবের স্ফূরণ ও রাজনৈতিক-চেতনার উদ্বোধন।"[১০০]

সুশোভন সরকার[১০১] বা নরহরি কবিরাজ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

"স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে বাঙলার জাগরণ সার্থক পরিণতি লাভ করে।"[১০২]

যোগেশচন্দ্র বাগল *'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত'* গ্রন্থে লিখেছেন,

"দীর্ঘ পঁচাশি বৎসর যাবৎ ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালী, যে একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক সাধনা করেছিল তাব একদিক মাত্র কংগ্রেসে রূপ পেল।....কংগ্রেস ভারতের নবজাগরণের প্রতীক।"[১০৩]

৫. বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল বাংলা সাহিত্য। এ বক্তব্য রেখেছেন শিবনারায়ণ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী আবদুল ওদুদ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সুশোভন সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নিমাইসাধন বসু এঁরাও রেনেসাঁসের বহুমুখী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন,

"অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে উনবিংশ শতাব্দীই বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ।"[১০৪]

কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন,

"It was indeed a Renaissance, nothing short of a new birth that happened to Bengal in the nineteenth century, the impress of which modern Bengali literature is proud to bear."[১০৫]

মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, রামমোহনের আগমনে বাংলার যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী-সাধনা ও মাইকেলের সাহিত্য-সাধনার তা ঐশ্বর্যময় দীপ্তি লাভ করে। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে তার চরমোৎকর্ষ লক্ষ করা যায়।

"জাতি হিসাবে বাঙালীর যে নবজাগরণ সে যুগের সাধনার শেষ ও শ্রেষ্ঠফল তাহার নিদর্শন বঙ্কিম-সাহিত্য।"[১০৬]

শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন, 'বাংলার রেনেসাঁস' নিবন্ধে

"ইতালীয় মানসের প্রকাশ ঘটেছিল মুখ্যত চিত্রকলায়, বাঙালী মানসের মুখ্যত

কবিতা ও কথাসাহিত্যে। বঙ্কিম থেকে মাণিকে, মাইকেল থেকে জীবনানন্দে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও অনবচ্ছিন্ন প্রসার বিস্ময়কর।"[১০৭]

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন সাহিত্যেই নবজাগ্রত বাঙালী রেখেছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যগত যে আধুনিকতা বাঙালীর মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করল তাতেই তার মুক্তি, তার কল্যাণ, তার সর্বসংশয় মোচন। এদিক থেকে সে আগন্তুক য়ুরোপকে বরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু কুলের বন্ধন ছেঁড়েনি।....য়ুরোপ তার খৃষ্টান ধর্মের দ্বারা নয়, তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা, তার জীবনরস সমৃদ্ধ সাহিত্যের দ্বারা, তার গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বিচিত্র মানবিকীবিদ্যা, বিজ্ঞানের অযুত ঐশ্বর্যের দ্বারা উনিশ শতকের বাঙালীর মনকে জয় করেছিল। বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনা, সমাজের নানা সংস্কার, ইংরাজী শিক্ষার প্রতিক্রিয়া বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হল। বস্তুত বাঙালীর এই প্রাণময় সাহিত্য-সাধনা তাকে বর্মের মত রক্ষা করেছে, য়ুরোপীয় জীবনপ্রবাহের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের বন্যাবেগ বুক পেতে গ্রহণ করেছিল। তা না হলে এদেশে একটি কবন্ধ ফিরিঙ্গী সভ্যতা সৃষ্টি হত। তা যে হয়নি তার কারণ বাঙালী উনিশ শতকের আধুনিকতাকে নিজ ভাব ও ভাবনার অনুকূলে পরিবর্তিত করে গ্রহণ করতে পেরেছিল। সে ব্যাপারে....সাহিত্যই তার চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।"[১০৮]

৬. অরবিন্দ ঘোষ মনে করেন, বাংলার রেনেসাঁসের উজ্জ্বলতম প্রতিফলন ঘটেছে তার চিত্রকলায়, সাহিত্যে নয়।[১০৯]

৭. উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন একাডেমিক প্রতিষ্ঠান বা বিদ্বৎসভার মধ্যে রেনেসাঁসের শক্তি বা সত্যকে সজীব হয়ে উঠতে দেখেছেন বিনয় ঘোষ, যোগেশচন্দ্র বাগল, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

"নতুন যুগের বণিক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে নগরে নগরে সাহিত্যসভা, দর্শনসভা, বিজ্ঞানসভা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্বৎসভার প্রতিষ্ঠা হতে লাগল। বিত্তবান ও বিদ্বানরা এই সভায় মিলিত হয়ে নবযুগের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। লাইব্রেরী ও বিতর্ক-সভার বিস্তার হতে লাগল। নবজাগরণ ও নতুন সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠলো এই সভাগুলি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে, প্রধানত কলকাতা শহরে, সভা-সমিতির যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য দেখা যায়, তা সত্যিই বিস্ময়কর। কেবল এই সভা-সমিতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে।"[১১০]

'বঙ্গ সংস্কৃতির কথা' গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, প্রথমে তাঁর উনিশ শতকের নবজাগরণ সংক্রান্ত গবেষণাকার্য—

"প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। ক্রমে বুঝিতে পারি ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তি-সমষ্টির দ্বারা আরব্ধ বহু কার্য্য আমাদের জীবনকে তখন প্রবলভাবে নাড়া দেয়।"[১১১]

সেই কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিষয়ে তিনি গবেষণা করতে উদ্যোগী হন। গৌতম চট্টোপাধ্যায় মূলত এই দর্শন নিয়েই 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র তথ্যাদি সন্ধান করে সম্পাদিত আকারে প্রকাশ করেন *'Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century'* গ্রন্থটি।[১১২] দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনের রূপরেখাটি সভা-সমিতির ইতিহাস ধরে আঁকতে চেয়েছেন।[১১৩]

৮. অনেকে দেখিয়েছেন, এ সময় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল বাংলার জাগরণের প্রকাশময় ব্যাকুলতা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,[১১৪] বিনয় ঘোষ,[১১৫] নরহরি কবিরাজ[১১৬] প্রমুখ উনিশ শতকের জাগরণের ইতিহাস সন্ধান করেছেন সাময়িকপত্রের পাতায়-পাতায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, স্মরজিৎ চক্রবর্তী[১১৭] প্রমুখ গবেষণা করেছেন পত্র-পত্রিকা নিয়েই। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস'।[১১৮] তিনি দেখিয়েছেন ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত প্রকাশিত ৭১টি বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত বা জড়িত ছিলেন রামমোহন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলার সকল বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীই। স্বপন বসু[১১৯] বা সালাহ্উদ্দীন[১২০] একই রকম অভিমত পোষণ করেছেন।

৯. বিনয় ঘোষ,[১২১] প্রদীপ সিংহ,[১২২] প্রমুখ গবেষকদের কেউ কেউ দেখাতে চেয়েছেন, বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই নবজাগরণের কালে কি ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। বিনয় ঘোষ *'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'* গ্রন্থে 'গ্রাম্য সমাজের পরিবর্তনের গতি', 'নাগরিক সমাজের রূপায়ণ' প্রভৃতি অধ্যায়ে দেখিয়েছেন গ্রাম্য সমাজের নিরেট পিরামিডের মূলে এসময় কিছুটা আঘাত লেগেছিল।

"গ্রাম্যসমাজের শ্রেণীগত রূপের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল, পিরামিডটা একটু টলে উঠেছিল, কিন্তু সেটা ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি অথবা গ্রাম্য সমাজের কোন মৌল রূপান্তর হয়নি অথচ গ্রাম্য সমাজ-জীবনে বিত্ত-প্রাধান্যের জন্য পরস্পর-বিরোধী অনেক স্রোত সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং তার ফলে ঘূর্ণাবর্তেরও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবন পুরাতন ও নতুন স্রোতের টানাটানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।"[১২৩]

'নাগরিক সমাজের রূপায়ণ' অধ্যায়ে তিনি বলেছেন,

"আধুনিক সমাজের অন্যতম ঐতিহাসিক গতি হল নগর-রূপায়ণের (urbanisation) দিকে। ইংরেজ আমলের ঊষাকালে গঙ্গাতীরের কয়েকটি গ্রামে বাংলাদেশে এই নাগরিক রূপায়ণ ও জনকুণ্ডলায়ণের (urban agglomeration) সূচনা হয়।"[১২৪]

ধনবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলাতে বিশেষ করে কলকাতা শহরে বুর্জোয়া-শ্রেণী, মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। অর্থনৈতিক শাসনের ভরকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ থেকে চলে আসে কলকাতায়। বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

"নতুন যুগের নতুন মহানগরে যুগমানসের অভিব্যক্তির সূত্রপাত হয়েছে। বিজ্ঞান ব্যক্তিস্বাধীনতা সংস্কারমুক্তি গণতন্ত্র ও শিক্ষার নতুন ভাবাদর্শের আমদানি হচ্ছে

পণ্য দ্রব্য ও কাঁচমালের সঙ্গে কলিকাতার বন্দরে। অর্থনৈতিক সংঘাতের সঙ্গে আদর্শ-সংঘাতও দেখা দিচ্ছে মহানগরে। অনিবার্য ঐতিহাসিক নিয়মে নবযুগের বাংলার নবজাগৃতিকেন্দ্র হচ্ছে কলিকাতা।"[১২৫]

ঘ. রেনেসাঁসের প্রতিভূ-ব্যক্তিত্ব

রেনেসাঁস ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণের যুগ। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রতিভূ-ব্যক্তিত্বের সন্ধান ও বিচারে নেমে আমাদের ভাষ্যকাররা ভিন্ন-ভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। স্বরচিত রেনেসাঁস-তত্ত্বের পরস্পর বিরোধী আলো ও অন্ধকারের যুদ্ধভূমিতে নবজাগরণের বঙ্গীয় পথিকদের অবস্থা অবর্ণনীয়। একজন ভাষ্যকার যাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, অন্যজন তাঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন বধ্যভূমিতে।

'British Orientalism and the Bengal Renaissance' গ্রন্থের লেখক ডেভিড কফ 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সূত্রে সূচিত প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চার নিবিড় প্রকল্পকেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রকৃত অধিষ্ঠান বলে যে-তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, তাতে উইলিয়াম জোন্সকে তিনি এই রেনেসাঁসের সূচনা-পুরুষের সম্মান দিতে চেয়েছেন।[১২৬] প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চার পোষকতার জন্য হেস্টিংসের ভূমিকারও প্রশংসা করেছেন তিনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের কথা বলতে গিয়ে উইলিয়াম কেরীর প্রশংসাও করেছেন বিশেষভাবে। লর্ড ওয়েলেসলি কারো কারো প্রশস্তিতে লাভ করেছেন ইতালীয় রেনেসাঁসের মেদিচি সদৃশ সম্মান।[১২৭] উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজনদের গৌরবময় অবদানের কথা আলোচনা করেছেন সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।[১২৮] মানবিক সমাজদৃষ্টি ও শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য আলেকজাণ্ডার ডাফ, রেভারেন্ড জেমস লঙ প্রমুখ মিশনারীদের কথা অনেকেই বলেছেন। জেমস লঙ সম্পর্কে বিনয়ভূষণ রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[১২৯] ভারতবিদ্যার বিদেশী পথিক, প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষক বা মিশনারীদের অবদানগত ভূমিকা যাই হোক না কেন, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রতিভূ ব্যক্তিত্ব তাঁদের বলা চলে না, সে প্রশ্নও কেউ কেউ তুলেছেন। কেননা জ্ঞানচর্চা বা সামাজিক হিতৈষণার চারিত্র্য তাঁরা বহন করে এনেছিলেন সুদূর ইওরোপ থেকে।

শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায় উনিশ শতকে বহু সংখ্যক 'স্ববশ, অনন্যতন্ত্র, সিসৃক্ষু, অমিত-কৌতূহলী মহোদ্যোগী ব্যক্তিত্ব'[১৩০] বাংলার রেনেসাঁসকে অর্থবহ করেছিল। যে সব মানুষ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বহমান ধারা থেকে স্বতন্ত্র, রেনেসাঁসের বিশিষ্ট চরিত্র লক্ষণ নিয়ে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন ও বাংলার রেনেসাঁসকে গতিদান করেছেন, তাঁদের মূল্যায়নেও বিচিত্র সব মতামত পাওয়া যায়। নবভারতের সূচনাকার হিসাবে রামমোহনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জনক হিসাবে রামমোহনকে যেমন স্বীকার করেছেন বহু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকার, তেমনি তাকে কঠোর সমালোচনা, এমনকি নস্যাৎও করেছেন কেউ-কেউ। রামমোহনের পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু মতামত বা উদ্ধৃতি তুলে আনা যায়।

পক্ষে

১. "বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন কবিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বসবাস করিতেছি।"
—রবীন্দ্রনাথ[১৩১]

২. "The New Bengal had its mentor in Raja Rammohun Roy."
—K. A. Wadud[১৩২]

৩. "We have dealt at such length on Ramhohun Roy because of his pioneering position in relation to the Bengal Renaissance."
—S. Sarkar[১৩৩]

৪. "অসামান্য অস্মিতার জন্য রামমোহন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আদিপুরুষ।"
—শিবনারায়ণ রায়[১৩৪]

৫. "তাঁহাকে *(রামমোহনকে—শ.মু.)* এই নবযুগ বা নবজাগরণের (Renaissance) সৃষ্টিকর্তা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না।" —রমেশচন্দ্র মজুমদার[১৩৫]

৬. "In the midst of the darkness that prevailed all over the country the man to see the vision of a New India was Raja Rammohun Roy. He is called the inagurator of the Modern Age in India."
—N. S. Bose[১৩৬]

বিপক্ষে

১. "রামমোহন নবযুগ সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ঐ যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ ছিলেন।"
—রমেশচন্দ্র মজুমদার[১৩৭]

২. "Rammohun's achivements as a moderniser were thus both limited and extremely ambivalent". —Sumit Sarkar[১৩৮]

৩. "শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মসংস্কার প্রয়াসের জন্য রামমোহন যদি আধুনিক ভারতের জনক হন, তবে শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য এবং বিবেকানন্দ কোন অভিধায় ভূষিত হবেন?"
—কুমুদকুমার ভট্টাচার্য[১৩৯]

৪. "বাংলার যে রেনেসাঁসের তিনি পথিকৃৎ, তার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত সামগ্রিক চিন্তাধারা ও কার্যক্রম জন্ম দিয়েছে খণ্ডিত, খর্বিত ও বিকৃত এক 'আধুনিকতা'র প্রহসনের।" —দীপঙ্কর চক্রবর্তী[১৪০]

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক ব্যক্তিত্ব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—কৃষ্ণকৃপালনী, ব্লেয়ার বি. ক্লিং,[১৪১] রঞ্জিৎকুমার চক্রবর্তী। কেউ দেখিয়েছেন তাঁর মহত্ত্ব, কেউ তাঁর ব্যর্থতা। কৃষ্ণকৃপালনী দ্বারকানাথ সম্পর্কে গ্রন্থ-রচনার নেপথ্য কারণটি এইভাবে বলেছেন—

"মহর্ষি-প্রভাবের মোহিনী মায়ার আবরণ অপসারণ করে আমি দেখতে চেয়েছিলাম ঠাকুর-পরিবারে পূর্বসূরীদের কেউ কি এমন ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে অন্তত অংশতও

সম্ভবপর করে থাকবেন? এই সন্ধিৎসু অবস্থায় আমি যেন আচমকা ধাক্কা খেলাম দ্বারকানাথের গায়ে লেগে।''....দ্বারকানাথ আসলে ছিলেন এক কর্মীপুরুষ—কাজের কাজী।"[১৪২]

রঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী দ্বারকানাথকে রামমোহন রায়ের সহযোগী ও বাংলার রেনেসাঁসের প্রাথমিক স্ফুরণের এক কীর্তিমান পুরুষ-রূপে স্বীকার করেও মন্তব্য করেছেন,

"সম্ভাবনাপূর্ণ এক বিপুল প্রাণশক্তির আধার কিভাবে নিঃশেষিত হয়েছে দ্বারকানাথ তার দৃষ্টান্ত।"[১৪৩]

ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলদের মূল্যায়নে প্রশংসা ও ধিক্কার দুই-ই পাওয়া যায়। প্রশংসা করেছেন কিশোরীচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পল্লব সেনগুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আবার বিরূপ সমালোচনা করেছেন অমলেশ ত্রিপাঠী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নিমাইসাধন বসু, পবিত্রকুমার ঘোষ, সুমিত সরকার প্রমুখ।

পক্ষে

১. "রামমোহনের পরে এবং বিদ্যাসাগরের আগে এদেশে নবযুগের হিউম্যানিস্ট চিন্তাধারার অন্যতম প্রবর্তক ডিরোজিও।" —বিনয় ঘোষ[১৪৪]

২. "The Youthful band of reformers who had been educated at the Hindoo College, like the tops of Khanchunjunga, were the first to catch and reflect the dawn." —K.C. Mitra[১৪৫]

৩. "They (*Young Bengal....S. M.*) were no servile creatures. ....the glorious Young Bengal were despite all there limitations the first to 'catch and reflect the dawn' of the modern age in India." —G. Chattopadhyay[১৪৬]

বিপক্ষে

১. "They (*Derozions—S. M.*) have been described as the 'intellectual aliens' of the age, who blinded by the dazzling lights of western learning and civilization, could not see the values of Indian learning, culture and heritage." —N. S. Bose[১৪৭]

২. "The Young Bengal tried to dethrone the cult of the east and to enthrone the cult of the west, without knowing much of the either." —A. Tripathi[১৪৮]

৩. "ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের ব্যর্থতা এইখানে যে দেশের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হতে পারেননি, বায়বীয় স্তরেই তাঁরা বিচরণ করেছেন এবং বাঙালী সমাজের সঙ্গে তাঁরা অনাত্মীয়ের মতো আচরণ করে গিয়েছেন। তাঁরা কিছুই রচনা করে যেতে পারেননি—না সাহিত্যে, না সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, না রাজনীতিতে। ইয়ংবেঙ্গল যতটা গর্জন করেছিল, ততটা বর্ষণ করেনি।" —পবিত্রকুমার ঘোষ[১৪৯]

৪. "Its (*Young Bengal's—S. M.*) impact on Bengali Society as a whole

a distinct from its intelligentsia crust, was very nearly nil."

—Sumit Sarkar[১৫০]

অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সূত্রে এক বিন্দুতে এলেও প্রকৃতিগতভাবে উভয়ে ছিলেন পরস্পর বিপরীত মেরুর মানুষ। যুক্তিবাদী ভাষ্যকাররা প্রশংসা করেছেন অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার, কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা তাঁর সম্পর্কে কিছুটা নীরব। আবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্মল আধ্যাত্মিক চেতনা রবীন্দ্রনাথের কাছে উজ্জীবনী-উৎসের স্বীকৃতি পেলেও, যুক্তিবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা তাঁর সম্পর্কে প্রায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। অরবিন্দ পোদ্দার, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখ ভাষ্যকাররা অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক, সেকুলার মননের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন,

> "Akshay Kumar was a man of wonderful and versatile intellectual interests....He was yet rooted to the soil, and never lost himself in the clumsy noise of anglophilism....he gave his society a share of his own enlightenment and thus enriched and revitalised it."[১৫১]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সমালোচনা তুলনামূলকভাবে কম। অধিকাংশ মনস্বী ও ঐতিহাসিক বিদ্যাসাগরকে নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ মনে করেন। অমলেশ ত্রিপাঠী,[১৫২] বিনয় ঘোষ,[১৫৩] বদরুদ্দীন উমর,[১৫৪] মোহিতলাল মজুমদার,[১৫৫] শিবনারায়ণ রায়[১৫৬] ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁদের সদর্থক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। ইন্দ্র মিত্র,[১৫৭] সন্তোষকুমার অধিকারী[১৫৮] তাঁর জীবন ও জীবনীর খুঁটিনাটি তথ্য উদ্ধার করেছেন। কিন্তু কুণ্ঠা তাঁর সম্পর্কেও আছে। অশোক সেন,[১৫৯] পরমেশ আচার্য,[১৬০] প্রণবরঞ্জন ঘোষ,[১৬১] পবিত্রকুমার ঘোষের[১৬২] বিদ্যাসাগর-মূল্যায়নে সেই কুণ্ঠা ব্যক্ত। সত্তরের দশকে বিদ্যাসাগরের মূর্তিরও মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছিল।[১৬৩] স্বপন বসু *'সমকালে বিদ্যাসাগর'* নামক একটি গ্রন্থে সমকালীন সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত তথ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর ছিলেন যে কোন মানুষ।[১৬৪] বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রশস্তি ও সমালোচনামূলক কিছু অভিমত উদ্ধার করি—

প্রশস্তি

১. "বিদ্যাসাগর চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালী জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।"

—রবীন্দ্রনাথ[১৬৫]

২. "দুই চতুস্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই চূড়া অতিক্রম বা স্পর্শ করে।"

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী[১৬৬]

৩. "ভাগীরথীর পশ্চিমে সবস্বতী নদীর তীরে সূর্য অস্ত গেল। একটা যুগের সূর্য। তার নাম মধ্যযুগ। ভাগীরথীর পূর্বে নতুন যুগের সূর্যোদয় হল কলকাতা শহরে। নবযুগের জ্যোতির কনকপদ্ম কলকাতা।.....নবযুগের সূর্যোদয়কে যাঁরা অভিনন্দন জানালেন, তাঁদেব মধ্যে প্রধান হলেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

—বিনয় ঘোষ[১৬৭]

৪. "উনিশ শতকের বাঙলাদেশের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর প্রগতিশীলতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" —বদরুদ্দীন উমর[১৬৮]

সমালোচনা

১. "বিদ্যাসাগর মানবিকতা অধ্যাত্ম-আদর্শ-মুক্ত বলেই মহত্তম কিছু নয়।"

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ[১৬৯]

২. "কিন্তু বিদ্যাসাগরেরও সীমাবদ্ধতা ছিল, কারণ বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলন এই সীমাবদ্ধতা অচল ও অটল বলে মেনে নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল আর বিদ্যাসাগর তার মধ্যেই নিজেকে আটকে রেখেছিলেন।" —পবিত্রকুমার ঘোষ[১৭০]

মাইকেল সম্পর্কে দু'রকম মূল্যায়নই আছে। অনেকে যেমন তাঁকে নবজাগরণের বিদ্যুৎঝলকিত অবিস্মরণীয় প্রতিভা বলেও মনে করেন, তেমনি কেউ-কেউ তাঁকে 'ইংলন্ড প্রেমের শহীদ' বলেও বর্ণনা করেছেন। নবযুগের কবি হিসেবে মাইকেলের সদর্থক মূল্যায়ন করেছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র,[১৭১] রবীন্দ্রনাথ,[১৭২] পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদার,[১৭৩] নীরেন্দ্রনাথ রায়,[১৭৪] উৎপল দত্ত[১৭৫] প্রমুখ। বঙ্কিম লিখেছিলেন,

> "বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়। সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।"[১৭৬]

পুরাতনের আগল ভেঙে ঝড়ের পিঠে বাংলা কাব্যকে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর *'কবি শ্রীমধুসূদন'* গ্রন্থে লিখেছেন,

"যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে humanities বা মানববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরে স্থান পাইয়াছিল। এবং মনুষ্যজীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা humanism-ই মানুষকে এক নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল—আমাদের পক্ষেও তাহা সঞ্জীবন মন্ত্রের কাজ করিয়াছিল।"[১৭৭]

মাইকেল সেই 'হিউম্যানিজম' আখ্যাত নবচেতনার কবি। কাজী আবদুল ওদুদ মাইকেলের দান সম্পর্কে লিখেছেন,

> "ইয়োরোপের যে কাব্য-কলার দিকে বাঙালী কাব্য-রসিকরা একদিন তাকাচ্ছিলেন আনন্দে আর গভীর বিস্ময়ে, সেই কাব্যকলা মধুসূদনের প্রতিভার পথ বেয়ে এল যেন বাংলার মর্যাদাদায়ী বধূ হয়ে। বিচিত্র মানসিক সংকীর্ণতা ও অদ্ভুতত্ব ছিল যাদের পরিচয় তাদের নিয়ে এক অপূর্ব আত্মবিশ্বাসে রামমোহন শুরু করেছিলেন মহত্তর জীবনচর্যা আর বিশ্বমৈত্রীর সাধনা। বাঙালীর সেই সব সংকীর্ণতা নিয়ে

যেন ছিনিমিনি খেললেন মধুসূদন, আর দিলেন সে সব নিঃশেষে ঘুচিয়ে।"[১৭৮]

নীরেন্দ্রনাথ রায় 'মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজ-বাস্তবতা' নিবন্ধে লিখেছেন,

"মধুসূদনের প্রতিভা নবাগত বুর্জোয়া চেতনার শঙ্খধ্বনি হইয়া বাংলা ভাষার মজা খাতে বহাইয়া দিল নতুন প্রাণকল্লোল, সৃষ্টি হইল 'মেঘনাদবধ'-এর বহু ধ্বনিত আরাব, মধুসূদনের অপূর্ব কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দ।"[১৭৯]

উৎপল দত্ত মাইকেল প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন ইওরোপীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে।[১৮০]

মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যকে ব্যর্থতার নজির হিসাবে দেখেছেন অরবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ। শ্রীপোদ্দার লিখেছেন—

"ইংল্যান্ড প্রেমের শহীদ হয়ে মধুসূদন আমাদের রেনেসাঁসের উদ্‌ভ্রান্তির প্রবলতম সাক্ষ্য স্থাপন করে গেছেন নিজ জীবনে।[১৮১]

চিত্ত সিংহ লিখেছেন,

"হঠাৎ বিস্মিত বিপর্যয় ঘটল বাংলা সাহিত্যে। রাতারাতি আসর মাৎ করল 'মেঘনাদবধ'। সাহিত্যের ইতিহাসে এত বড় উল্লম্ফন অভাবিত।....এবং ইংরেজ-পোষ্য বেনিয়ারা তাঁর পৃষ্ঠপোষক ; ইংরেজ-প্রীতিপোষ্য শিকড়হীন মধ্যবিত্তরা তাঁর সমঝদার।....পশ্চিমীয়ানাকে চাপিয়ে দেওয়া হল প্রগতির মুখোশ পরিয়ে।"[১৮২]

বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে মতান্তর আরও তীব্র । মোহিতলাল প্রমুখ যেমন তাঁকে বঙ্গীয় জাগরণের তুঙ্গ প্রতিভা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বদরুদ্দীন উমর তেমনি তাঁকে স্থাপন করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল মেরুতে। প্রশংসা ও নিন্দার এক জটিল ছেদবিন্দুতে তাঁর অবস্থান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

"রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন-দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ চালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলা ভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে।"[১৮৩]

মোহিতলাল মজুমদার তাঁকে 'নবযুগের জীবনমন্ত্রের দ্রষ্টা-ঋষি' হিসাবে দেখেছেন,

"সে-যুগের যুগনায়ক রূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধনা—সে-যুগের সকল উৎকণ্ঠাকে জাতির হইয়াই চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করা, এবং মুক্তির একটা প্রশস্ত পন্থা নির্ধারণ—তিনি যেমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে কেহ তেমন করেন নাই।"[১৮৪]

নিমাইসাধন বসু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন—

...."the greatest figure of the second phase of the Bengal Renaissance."[১৮৫]

বঙ্কিম-প্রতিভার বিসংবাদিত মূল্যায়ন আমরা পাই অরবিন্দ পোদ্দারের *'বঙ্কিম মানস'*-এ অসিতকুমার ভট্টাচার্যের *'বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা'*[১৮৬] গ্রন্থে।

অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন,

"বঙ্কিমের মন ছিল পশ্চাতে, কিন্তু চোখ ছিল সম্মুখে।....বঙ্কিম মানসে এক ঘোরতর

সংকট সমুপস্থিত। একদিকে যুক্তিহীন আবেগ, অপরদিকে নির্মোহ যুক্তিবাদ, এই দুই পরস্পর-বিরোধী প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার মন ভয়ংকর আলোড়িত হইতেছে।"[১৮৭]

কাজী আবদুল ওদুদ, শিবনারায়ণ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ ভাষ্যকাররা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম ও মুসলিম রিভাইভ্যালিজমের পরস্পর বিরোধী উত্থানে বঙ্কিমকে দেখেছেন ত্রুটিপূর্ণ অবস্থানে। ওদুদ লিখেছেন, "শিল্পীরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্ব অবিসংবাদিত, চিন্তানেতারূপে তাঁর ত্রুটি সত্যিই বড়ো রকমের।"[১৮৮] অন্যত্র লিখেছেন,

"There was a sharp conflict so it seems, in the personality of Bankimchandra. He is spontaneously bent towards knowledge and humanism and at the same time passionately devoted to propaganda for the Hindu."[১৮৯]

অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, বঙ্কিমের—"'*আনন্দমঠ*' থেকে '*গোরা*' পর্যন্ত সময়টা ছিল রিভাইভালবাদের মধ্যাহ্নকাল।"[১৯০]

বঙ্গীয় জাগরণের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে **রামকৃষ্ণদেব** ও **বিবেকানন্দের** কথা যাঁরা উচ্চকণ্ঠে বলেছেন তাঁরা হলেন মোহিতলাল, নিমাইসাধন বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, চিত্ত সিংহ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রমুখ। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মতের পোষণকারীরা হলেন শিবনারায়ণ রায়, সুশোভন সরকার, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিনয় ঘোষ, নরহরি কবিরাজ প্রমুখ। প্রণবরঞ্জন ঘোষ লিখেছেন,

"বেদান্ত বা অধ্যাত্ম উপলব্ধিভিত্তিক মানবিকতাই ভারতীয় মানবিকতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। এদিক থেকে উনিশ শতকের চিন্তাধারায় বিদ্যাসাগরের চেয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দান অনেক বেশি।"[১৯১]

চিত্ত সিংহের মতে রেনেসাঁসের নামে প্রগতির মুখোশ পরিয়ে পশ্চিমীয়ানা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে। সেই দো-আঁশলা বুদ্ধিজীবীদের ভিড়ে রামকৃষ্ণ ছিলেন যথার্থ খাঁটি।

"রামমোহন নয়, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, এমনকি বিবেকানন্দও নয়, বাঙালীর যথার্থ প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ।"[১৯২]

নিমাইসাধন বসু বলেছেন,

"The new age inagurated by Raja Rammohun Roy, in a sense, reached its climax during Swami Vivekananda's life time."[১৯৩]

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে,

"সমাজ ও ধর্মের দিক দিয়া দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বাংলাদেশে যে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছেন এবং কালে ইহার প্রভাব যে সুদূর-স্পর্শী হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।"[১৯৪]

মোহিতলাল '*বাংলার নবযুগ*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন রামমোহনে যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, তা বিবেকানন্দে এসে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।[১৯৫] শঙ্করীপ্রসাদ বসু '*বিবেকানন্দ ও*

সমকালীন ভারতবর্ষ নামক সুবিপুল গ্রন্থগুচ্ছে অঙ্কন করেছেন, শুধু বাংলা বা ভারতের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিতে তাঁর সমুজ্জ্বল মূর্তিটি।[১৯৬] গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন,

> "যে কোন দিক দিয়া বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শত বৎসরের জাতীয় চাঞ্চল্য, যাহা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহা শতাব্দীর শেষভাগে নানাদিক ও কেন্দ্র হইতে আহৃত ও সংহত হইয়া বাণীলাভ করিয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। স্বামী বিবেকানন্দ একটা জাতির এক দীর্ঘ বিচিত্র বিক্ষিপ্ত শতাব্দীর যোগফল।"[১৯৭]

কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সৌজন্যে যে ধর্মমনস্কতা ও নব্যহিন্দুত্ববাদের সূচনা হয়েছিল তা অনেক প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করেননি। শিবনারায়ণ রায় এ সম্পর্কে লিখেছেন,

"মোদ্দা ফল দাঁড়ালো, কি হিন্দু, কি মুসলমান বুদ্ধিজীবী নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রমেই হয়ে উঠলেন রক্ষণশীল, এবং তাতে যে শুধু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়ে দাঁড়ালো তাই নয়, যে আত্মসমালোচনা উনিশ শতকে এদেশে রেনেসাঁসের সূচনা ঘটিয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে এল।"[১৯৮]

সুশোভন সরকার লিখেছেন,

> "Religious revivalism also began to lift up his head and protested against the impact from the west. This was the age of Keshab Chandra Sen and the young Brahmos on the one hand, and on the other....of beginnings of Neo Hinduism, and Ramkrishna Paramhansa."[১৯৯]

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা শুধু বঙ্গ-সংস্কৃতির ইতিহাসে নয়, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে সুদুর্লভ। রেনেসাঁসের ঐতিহাসিকরা তাঁর সম্পর্কে সপ্রশংস হবেন এটাই স্বাভাবিক। নিমাইসাধন বসু, সুশোভন সরকার, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভন সোম[২০০] প্রায় সকলেই তাঁকে মেনেছেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসাবে। ইতিবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের কিছু বক্তব্য এখানে প্রসঙ্গত তুলে আনা যায়—

১. "The Bengal Renaissance or indeed the Indian Awakening reached its culmination in Rabindranath who was the very symbol of a Renascent Century and the beacon light of a new one."

—N. S. Bose[২০১]

২. "বাংলা নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে দুইদিক থেকে দেখা চলে। উনিশ, শতকের উত্তাল তরঙ্গের তিনি শীর্ষমণি, তাঁরই মধ্যেই সেই প্রেরণার সকল অঙ্গ যেন তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পেয়েছিল, তার সকল সম্পদকে তিনি গৌরবান্বিত করতে পেরেছিলেন। আমাদের রেনেসাঁসের পরিপূর্তি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথে।"

—সুশোভন সরকার[২০২]

৩. "আমাদের রেনেসাঁসের পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার। তাতে করে প্রমাণ হয় যে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বলে একটা কিছু আছে আর বাংলা সাহিত্য সেই স্ট্যান্ডার্ডে উপনীত হয়েছে।" —অন্নদাশঙ্কর রায়[২০৩]

৪. "বঙ্গীয় তথা ভারতীয় রেনেসাঁস তার পরিপূর্ণ প্রকাশ অর্জন করে রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিম প্রতিভায়।....লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং গোএটেকে বাদ দিলে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় বৈশ্বিক ও বিচিত্রমুখী প্রতিভা পৃথিবীর ইতিহাসে চোখে পড়ে না।" —শিবনারায়ণ রায়[২০৪]

৫. "রবীন্দ্রনাথ বাংলার জাগরণের এবং বাংলা তথা ভারতের চিরন্তন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ।" —ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২০৫]

কিন্তু বিদূষণ ও উপেক্ষা থেকে তিনিও রেহাই পাননি। রেনেসাঁসের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যাঁরা তাঁর সম্পর্কে আপত্তি ব্যক্ত করেছেন মোহিতলাল মজুমদার, চিত্ত সিংহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের বক্তব্য এইরকম—

১. "রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত অভ্যুদয় বিংশ শতকের প্রথম পাদে। তাঁহার সাধনা এতই স্বতন্ত্র যে নবযুগের ধারার সঙ্গে তাঁহাকে যুক্ত করিলে রবীন্দ্রনাথ ও নবযুগ উভয়কেই বোঝা দুষ্কর হইবে।....আমি যাহাকে বাংলার নবযুগের সাধনা বলিয়াছি তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে পৃথক রাখাই কর্তব্য মনে করি।" —মোহিতলাল মজুমদার[২০৬]

২. "যিনি বাংলা সাহিত্যের সার্বভৌম তিনি দিকভ্রষ্ট হলেন। বাঙালীত্ব অনাবিষ্কৃত রইল; তিনি প্রথমে ভারতপথিক, অন্তিমে বিশ্বপর্যটক। তিনি আকাশে স্বর্গ রচনা করলেন, ছিনিয়ে আনলেন শিরোপা, বাহবার ঝড় বইল, অদ্যাবধি বহমান।....এবং রবীন্দ্রনাথ যে সর্বনাশ ডেকে আনলেন, যা তাঁর পূর্বসূরীদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না, তা হল বাঙালীর স্বভাব-বিরোধী ভিকটোরিয়ান শুচিতা ও ঔপনিষদিক শুদ্ধতা।....কাকসমূহের দাঁড়কাকী মানসিকতার চরম পরাকাষ্ঠা। এও রবীন্দ্র অবদান।" —চিত্ত সিংহ[২০৭]

না-মূলক আলোচনা

পাঠক যদি নেতিবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যের পথ ধরে হাঁটেন, তাহলে সে-পথেও দেখা হবে বহু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকারদের সঙ্গে। এখানে এমন দু'একজন ভাষ্যকারের দেখা মিলবে, যাঁদের সঙ্গে ইতিবাদী রেনেসাঁসের পথে দেখা হয়েছিল। পূর্বতন মত বদল করে এঁরা পরবর্তীকালে নেতিবাদী বক্তব্য রেখেছেন (বিনয় ঘোষ,[২০৮] সুশোভন সরকার[২০৯])। নেতিবাদী ভাষ্যকারদের সকলেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেছেন তা নয়, তবে এই রেনেসাঁসের ত্রুটি ও ভিত্তিগত-বিচ্যুতি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছেন। সেই রকম নেতিবাদমূলক রেনেসাঁস-ভাষ্যের কিছু নিদর্শন আমরা তুলে আনি—

১. "ইয়োরোপীয় মডেলের কোনো আধুনিক নবজাগরণ বাংলাদেশে অথবা বাঙালী সমাজে হয়নি। আমরা ইয়োরোপীয় বিদ্যা ইংরেজের আমলে শিক্ষা করে সবকিছুই

সেই বিদ্যার আলোকে দেখতে ও বিচার করতে শিখেছি। তাই সোডার বোতলের উচ্ছ্বসিত বুদবুদের মতো খানিকটা সাময়িক আদর্শগত চিত্তচাঞ্চল্য এদেশের কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করে এবং রেলগাড়ির বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শব্দ আর কয়েকটি ক্ষুদে কারখানার ভোঁ শুনে আমরা ভেবেছি আমাদের দেশে ইয়োরোপের মতো রেনেসাঁসের হাওয়া বইছে। আমাদের ভাবনা ভুল, সাদৃশ্যবোধ ভুল। হাওয়া বয়েছিল সমাজের উপরতলার চিলেকোঠার একটি ছোট আধখোলা জানালা দিয়ে। সেই হওয়া কারো গায়ে লাগেনি। মনে তো নয়ই। যা লেখা হয়েছে, এখনও লেখা হয়, তা অতিকথা।" —বিনয় ঘোষ[২১০]

২. "The RENAISSANCE in Bengal lacked the tremendous sweep and vital energy of the many sided upsurge in the midst of which was shaped its European prototype." —S. Sarkar[২১১]

৩. "বাঙলার 'রিনাইসেন্স' ছিল 'কলোনিয়াল রিনাইসেন্স'—পরাধীন জাতির রিনাইসেন্স এবং যে স্বাধীন নয় তার সত্যকার রিনাইসেন্স হবে কি করে? বাঙালী সমাজের বিকাশে বা বিপ্লবে সেই রিনাইসেন্স উদ্ভূত হয়নি।" —গোপাল হালদার[২১২]

৪. "বঙ্গভূমে যে করেই হোক ফরাসী renaissance কথাটা খুব চালু হয়ে গেছে।.....পশ্চিম য়ুরোপীয় renaissance-এর সঙ্গে আমাদের উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবনের কোনো মিল নেই।" —নীহাররঞ্জন রায়[২১৩]

৫. "England having been its wet nurse, it was as it were an English Renaissance in quiet a different grab enacted on India's soil." —A. Poddar[২১৪]

৬. *(Bengal Renaissance—S.M.)*....."not of full blooded bourgeois modernity but of a weak and distorted caricature of the same which was all that colonial subjection permitted." —Sumit Sarkar[২১৫]

৭. "উনিশ শতকের নতুন বাঙালী সংস্কৃতির সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য এত বেশি যে তাকে বাঙলায় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ আখ্যা দেওয়ার অর্থই হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নিদারুণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।" —বদরুদ্দীন উমর[২১৬]

৮. "বাংলার রেনেসাঁস মোটামুটি ইংরেজের আরোপিত ভূমিব্যবস্থাজাত জমিদার—তালুকদার ইংরেজের বেতনভুক কর্মচারীদের দ্বারা সৃষ্টি। এইসব শক্তির যোগে রেনেসাঁস ঘটে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।" —চিত্ত সিংহ[২১৭]

৯. "বাংলার রেনেসাঁ সম্পর্কে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি আছে। একটির মতে এই রেনেসাঁ ছিলো মূলতঃ সার্থকনামা ও সফল। অন্যটির মতে এই রেনেসাঁ ছিলো মূলতঃ একটি আরোপিত ব্যাপার, এ দেশের সমাজ বাস্তবতা থেকে, সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে, আলো-জল হাওয়া থেকে এই রেনেসাঁ উৎসারিত হয়নি। যদি এভাবে উপস্থাপিত হয় তবে আমি দ্বিতীয় মতটিকেই সমর্থন করবো।" —বরুণ দে[২১৮]

১০. "এই নবজাগরণকে অনেক সময় ভুল করে রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ....প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি শহরের বাইরে বিশাল বঙ্গদেশে কোনো অস্তিত্ব ছিল না এই 'রেনেসাঁস'-এর।" —অশোক মিত্র[২১৯]

১১. "ইউরোপীয় মডেলের রেনেসাঁস এদেশে হয়নি. হওয়াটা বাস্তবত সম্ভবই ছিল না। যা হয়েছিল তা ছিল বহিরাগত ও আরোপিত ভাব-সংঘাতের ফলশ্রুতিতে বহিরঙ্গের কিছু সীমাবদ্ধ আলোড়ন মাত্র, বৃটিশ বুর্জোয়াদের স্বয়ম্ভু গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক ধ্যানধারণার শূন্যগর্ভ প্রতিধ্বনির ঐক্যতান মাত্র।"—দীপঙ্কর চক্রবর্তী[২২০]

না-মূলক রেনেসাঁস-ভাষ্যের পর্যালোচনা

নেতিবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের অভিমতগুলি একনজরে এইরকম—

১. বাংলার রেনেসাঁস ছিল **'কলোনিয়াল রিনাইসেন্স'**। যে স্বাধীন নয় তার 'রিনাইসেন্স' কিভাবে হবে?[২২১] —এই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন গোপাল হালদার, সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ, সুমিত সরকার, অরবিন্দ পোদ্দার. বদরুদ্দীন উমর, দীপঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। সুশোভন সরকারের মতে বাংলার রেনেসাঁসের তিনটি প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে,

> "The majority of the representations of our awakening identified progress with rule, ignoring the fact that the British held us in the straight-jacket of semi-colonial subjection and imperialist exploitation."[২২২]

সুমিত সরকার লিখেছেন,

> "....entire Bengal Renaissance has remained prisoner to a kind of 'false consciousness' bred by colonialism."[২২৩]

অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন. ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এই রেনেসাঁসের অধিপতি বিধাতা।[২২৪] কলকাতাকে কেন্দ্র করে এই রেনেসাঁসের বিস্তার। বাণিজ্যিক শহর কলকাতা ইংরেজদের ঔপনবেশিক শহর হিসাবেই বেড়ে ওঠে। কলকাতার শিক্ষিত. উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুৎসুদ্দি ও দালাল অথবা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দাস মাত্র ছিলেন। ফলে মানসিক বা সাংস্কৃতিকভাবে যাঁরা প্রাগ্রসর ছিলেন. তাঁরা অতিক্রম করতে পারেননি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সীমা। রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর এদের সকলকেই কোথাও না কোথাও ঠেকে যেতে হয়েছিল। অমিত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মাইকেল অনেকাংশে ব্যর্থ হলেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় মাইকেল প্রতিভার এই পরিণাম বিশ্লেষণ করে লিখেছেন. "পরাধীন দেশের প্রতিকূল পরিবেশে মধুসূদনের বিপ্লবী কবিপ্রতিভা অস্তমিত হইল এই করুণ পরিণতিতে।"[২২৫] অশোক সেন তাঁর *'Iswar Chandru Vidyasagar and his Elusive Milestones'* গ্রন্থে দেখিয়েছেন. বিদ্যাসাগরের পরাক্রমশীল বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল উপনিবেশবাদী পরিস্থিতির কারণে।[২২৬] অরবিন্দ পোদ্দার[২২৭] বা অসিতকুমার ভট্টাচার্য[২২৮] বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈততার ব্যাখ্যা খুঁজেছেন উপনিবেশবাদী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে।

২. রেনেসাঁস হচ্ছে '....full-blooded bourgeois modernity'.[২২৯] এদেশে **শিল্পবিপ্লব হয়নি**। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এ দেশের উঠতি ধনিক-বণিকদের বাণিজ্য-লব্ধ বাড়তি পুঁজি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জমিতে। সম্ভাব্য বুর্জোয়ারা জমিদার হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ রেনেসাঁসের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক ভিত্তিই এখানে তৈরী হয়নি। তাই প্রকৃত রেনেসাঁস হয়নি। যা হয়েছে, তা হচ্ছে 'weak and distorted caricature of the same'.[২৩০] এ ধরনের বক্তব্য রেখেছেন বদরুদ্দীন উমর,[২৩১] সুমিত সরকার, বিনয় ঘোষ, সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ,[২৩২] উৎপল দত্ত,[২৩৩] দীপঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ।

বুর্জোয়া বিপ্লবের যে সম্ভাবনা ছিল তা ঘটনাগতভাবে অসমাপ্ত থেকে যাওয়ায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েন উঠতি ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বিনয় ঘোষ *'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'* গ্রন্থে দেখিয়েছেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদ্যোগী বিচিত্রকর্মা পুরুষও কিভাবে জমিদারী কিনে জমিদার বনে গিয়েছিলেন।[২৩৪] জমিদারী ক্রয় করেছিলেন কলকাতার বহু বিশিষ্ট ধনিক পরিবার। ধনতন্ত্রের অবরুদ্ধ পরিবেশে ফিউডাল জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ তাঁদের সঙ্গী হয়েছিল। রঞ্জিৎকুমার চক্রবর্তী দ্বারকানাথের জীবনী[২৩৫] বা নীরেন্দ্রনাথ রায় *'মেঘনাদবধ কাব্যের'* সমাজ বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রত্যাশিত সাফল্যের পক্ষে এই পরিস্থিতি কতদূর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

> "বুর্জোয়াদের সহিত ফিউডালবাদের সংঘর্ষের কাহিনীতে বুর্জোয়াদের বিচারে যাহা হইতে পারিত বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী এক বিরাট এপিক, তাহা হইয়া দাঁড়াইল দুইটি ফিউডালবাদী পরিবারের অকারণ কলহের চিত্র।"[২৩৬]

৩. এই জাগরণ হয়েছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, সমাজের 'upper stratum'-কে কেন্দ্র করে। **কলকাতা নগরীর বাইরে** এই জাগরণের অস্তিত্ব ছিল না। গ্রাম ও দেশের বিশালসংখ্যক জনগণ এর বাইরে থেকে গিয়েছিল। সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ, বদরুদ্দীন উমর, অশোক মিত্র, সুপ্রকাশ রায়,[২৩৭] সুমিত সরকার প্রমুখ বঙ্গীয় রেনেসাঁসের এই সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

> "The elite in our Renaissance were gulf apart from the common masses of our people and lived in a world of their own."[২৩৮]

বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

> "অনেক প্রশ্ন জাগল মনে, অনেক প্রশ্ন। শহর থেকে গ্রামের দিকে তাকাবার ইচ্ছা হল প্রবল। কলকাতা শহর যদি 'নবজাগৃতি কেন্দ্র' হয়, যদি রেনেসাঁসের সূর্য 'জ্যোতির কনকপদ্মে'র মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও, কেন অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার?"[২৩৯]

ভারতের প্রথম সেন্সাস কমিশনার অশোক মিত্র তাঁর রিপোর্টে বলেছেন,

> "এই 'রেনেসাঁস'-আন্দোলন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আদৌ স্পর্শ বা প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি শহরের বাইরে বিশাল বঙ্গদেশে কোনো অস্তিত্বই ছিল না এই 'রেনেসাঁস'-এর।"[২৪০]

৪. এই রেনেসাঁস ছিল **'হিন্দু-এলিট'দের মুভমেন্ট।**[২৪১] বাংলার মুসলমান সমাজ থেকে গিয়েছিল রেনেসাঁসের বাইরে। এই রেনেসাঁসের পথ ধরে মাথা তুলেছিল হিন্দু-জাতীয়তাবাদ, যা প্রত্যাখ্যান করেছিল বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে। এর পরিণাম আমাদের জাতীয় জীবনে শুভ হয়নি। সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ, সুমিত সরকার, অরবিন্দ পোদ্দার, আবদুল ওদুদ, আহমদ শরীফ এবিষয়ে আলোচনা করেছেন।

সুশোভন সরকার লিখেছেন,

> "The Hindu bias usually prevalent in the awakened gentlemen of our movement could not but alienate the Muslim consciousness, which has unfortunate consequences, much to the gratification of our alien British rulers."[২৪২]

কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন,

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার প্রবল হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ।"[২৪৩]

বঙ্গীয় রেনেসাঁস হিন্দুকেন্দ্রিক হওয়ার জন্য জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময় তা হিন্দুত্ববাদী হয়ে ওঠে। ফলে বঙ্কিমের *'আনন্দমঠে'* এমন সংলাপ চলে আসে, যা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়-বুদ্ধিকে উত্তেজিত করে।[২৪৪]

পাশ্চাত্য-শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে এগিয়ে-পেছিয়ে থাকার জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে যে ভারসাম্যহীন দূরত্বের সৃষ্টি হয় সে-সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বা এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন[২৪৫] বলেছেন,

> "উনিশ শতকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাসে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের এই পারস্পরিক সামাজিক দূরত্ব অনেক দিক থেকে বাঙালী জীবনে পরবর্তী কালে যে দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।"[২৪৬]

৫ **মধ্যযুগীয় সামাজিক ভিত্তির** অন্তর্গত কাঠামোগুলি অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। বিনয় ঘোষ বলেছেন,

> "যে-ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গড়নের পরিবর্তন ব্রিটিশ আমলে দেখা গেল, তাতে সমাজের যে 'institutional-power-structures' যেমন আমাদের জাতিবর্ণভেদ, ধর্ম-সম্প্রদায়ের বৈষম্য ইত্যাদি—তার কোনো উন্নতিশীল পরিবর্তন কিছু হল না। যে কোনো সমাজের স্থায়িত্ব ও শক্তির প্রধান উৎস হল institutions এবং আমাদের দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের power structures যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে অন্যতম হল যৌথ পরিবার (joint family), জাতিভেদ প্রথা (caste systerm), বিবাহপ্রথা, ধর্ম ইত্যাদি। উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারকদের যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও (গাছের গোড়ায় জল দিয়ে ডাল কাটার মতো) এবং সংস্কার-আন্দোলন মধ্যে মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, শেষ পর্যন্ত পূর্বোক্ত কোনো সামাজিক ইনস্টিটিউশনের পরিবর্তন হয়নি।"[২৪৭]

নীহাররঞ্জন রায় রেনেসাঁস সম্পর্কে বলেছেন,

"প্রথমতঃ য়ুরোপীয় রেনেসাঁস মধ্যযুগীয় য়ুরোপের ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও

সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কার্যকারণ শৃঙ্খলাগত পরিণতি ; সে বিবর্তন ও কার্যকারণ শৃঙ্খলা য়ুরোপীয় সমাজের ভেতর থেকেই উদ্ভূত। উনিশ শতকে বঙ্গভূমে ও ভারতবর্ষে যা ঘটেছিল তাকে বাঙালী ও ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের কার্যকারণ-শৃঙ্খলাগত পবিণতি বলা যায় না ; সমাজের ভেতর থেকে তা উদ্ভূত হয়নি।"[২৪৮]

৬. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ এ সময় দেখা গিয়েছিল। কারো-কারো মতে এ রেনেসাঁস বিদেশী মদ্য ছাড়া কিছু নয়।[২৪৯] অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, একে বঙ্গীয় রেনেসাঁস না বলে বলা উচিত, 'English Renaissance'.[২৫০] এ রেনেসাঁস উপনিবেশবাদের স্বার্থরক্ষাকারী, সুবিধাভোগী, জনবিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় ভদ্রলোক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দাপাদাপি মাত্র। বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

"বাংলার নবজাগরণ মূলত নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য বিদ্যা-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিটের মস্তিষ্কের আন্দোলন, দেশের মানুষের আন্দোলন নয়।"[২৫১]

মেকলে বলেছিলেন,

"We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect."[২৫২]

অরবিন্দ পোদ্দারেব ভাষায় রেনেসাঁসের আমলে নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'সেফটি-ভালভে' পরিণত হয়েছিল।[২৫৩]

৭. রেনেসাঁসের শিক্ষা-দীক্ষা এদেশের মানুষকে স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল।

"Education created an unbridgeable gulf between themselves and others who did not receive it."[২৫৪]

রেনেসাঁসের আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীরা শুধু **জনবিচ্ছিন্ন** নয়, ছিলেন সংগ্রাম-বিমুখ। বিদেশী শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তাঁরা আর্থ-সামাজিক কোন সংগ্রাম করেননি। উপরন্তু কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানগুলির দিকে তারা পিছন ফিরেছিলেন। সুপ্রকাশ রায়,[২৫৫] স্বপন বসু,[২৫৬] দীপঙ্কর চক্রবর্তী[২৫৭] সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্,[২৫৮] অমলেন্দু দে,[২৫৯] রণজিৎকুমার সমাদ্দার[২৬০] এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষকশ্রেণী হারালো তাদের ভূমিস্বত্ব। জমিদার হয়ে উঠলো জমির মালিক। অনুপস্থিত জমিদাররা খাজনা আদায়ের জন্য পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সের-পত্তনিদার, গাঁতিদার প্রভৃতি নানা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করলো।[২৬১] শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সব স্তরের মধ্যে পেয়ে গেলো তাদের আর্থিক স্বার্থের আশ্রয়। পিরামিডের মতো বাংলার কৃষক সমাজের বুকের উপর এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী চড়ে বসলো। তাদের সমবেত শোষণের কেন্দ্রবিন্দু হলো কৃষক। এই উপস্বত্বভোগী বা **মধ্য-স্বত্বভোগী শ্রেণীই** হলো রেনেসাঁসের ধারক-বাহক। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার এবং দুর্দশাজাত নিরুপায় বিদ্রোহের সঙ্গে সুতরাং তাঁদের কোন সম্পর্ক রইলো না। এঁরা ইংরাজ-রাজত্বকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য করে গণ-অসন্তোষ ও প্রজাবিদ্রোহের সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পর্কিত থেকে গেলেন। সুপ্রকাশ রায়, স্বপন বসু, রণজিৎকুমার সমাদ্দার তাঁদের গ্রন্থে এবিষয়ে

আলোকপাত করেছেন।

৮. এ-রেনেসাঁসের ফলে বাঙালী আধুনিক, বলিষ্ঠ, উন্নত জাতিরূপে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। বাঙালীর জাগরণ হিসাবেও ব্যর্থ এই রেনেসাঁস। চিত্ত সিংহ **বাঙালীর অবক্ষয়ের উৎস** সন্ধানে নেমে পৌঁছেছেন রেনেসাঁসে। তাঁর মতে,

> "আমাদের তথাকথিত রেনেসাঁস সেই বিদেশী মদ্য, তাৎক্ষণিক সচলতা ও সতেজতার মোহে যা পান করে আমাদের বরেণ্য পূর্বপুরুষরা সময়ের নিশ্চিত পক্ষপাতে সতেজ ও সপ্রাণ হতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ কি তথাকথিত সতেজতা ও সচলতা এসেছিল ; কিন্তু মদ্যপানের কুফল সদ্য ধরা পড়ে না, পানাভ্যাসের অনাচার অন্তিমে সর্বনাশ ডেকে আনে। আমরা এক্ষণে সেই সর্বনাশের মুখোমুখি।"......
>
> "এই সর্বমান্য তথাকথিত রেনেসাঁস আমাদের কি কি দিয়েছিল? যথাক্রমে
>
> ❑ পশ্চিমী শিক্ষার মোহে অন্ধ ও আচ্ছন্ন এক অভিনব মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়
> ❑ খ্রীষ্টধর্মের বেনামী তাৎক্ষণিক একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্ম,
> ❑ ক্ষমতান্ধ জাতীয়তাবাদ,
> ❑ অন্ধ স্বাজাত্যবোধে মগ্ন একদল ধর্মান্ধ রক্ষণশীল,
> ❑ শাসনের প্রয়োজনে আমদানী করা ভেদবুদ্ধি,
> ❑ বিরাট ব্যবধানযুক্ত অর্থনৈতিক অসাম্য,
> ❑ জাতীয় জীবনচর্যায় শিকড়হীন মানসিকতা,
> ❑ নিরন্তর কলম করা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি,
> ❑ তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির লোভে ত্বরিৎ বিক্রিত হবার দাস্যতা।"[২৬২]

৯. অন্য এক অবস্থানবিন্দু থেকেও বলা হয়েছে রেনেসাঁস জন্ম দিয়েছে—

> "খণ্ডিত, খর্বিত ও বিকৃত এক **'আধুনিকতা'র প্রহসনের,** যার পরিণতিতে একুশ শতকের পথযাত্রী 'আধুনিক' ভারতের গভীরে আজও প্রকৃত অর্থে প্রাধান্যের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত রয়ে গেছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিজ্ঞান-বিরোধী মানসিকতাবিশিষ্ট, জাত-পাত-ধর্ম সম্প্রদায়-গোষ্ঠী-জাতিসত্তাবিভক্ত ও সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিকতাময় এক মধ্যযুগীয় ভারত।"[২৬৩]

তাই জনৈক সমালোচক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন,

> "জন্মের পর পর ছয়টি দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন যে এখনও অন্ধের মতো সঠিক পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে, তার পেছনের অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে এই 'রেনেসাঁস'-এর মুখ্য ও প্রাথমিক দিকগুলির ঐতিহ্য। এই অসহনীয় বোঝা নির্মোহভাবে ছুঁড়ে ফেলতে না পারলে সেই একই চোরাবালিতে আজও আমাদের নিমজ্জিত থাকতে হবে।"[২৬৪]

উপসংহার

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ভাষ্যকারদের অভিমতগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রেনেসাঁস সম্পর্কে এক-একজন এক-এক রকম ধারণা বা মানদণ্ড নিয়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিচারে

প্রবৃত্ত হয়েছেন। কারো মতে রেনেসাঁস হচ্ছে 'full blooded bourgeois modernity'.[২৬৫] কারো কারো মতে নবজাগরণ গণ-জাগরণের নামান্তর—রেনেসাঁস দেশের জনসাধারণের অবস্থা পরিবর্তনের বিপ্লব। রেনেসাঁস তার আলোকপ্রাপ্তদের দেয় আর্থ-রাজনৈতিক সংগ্রামের দীক্ষা, সমাজের ভিত্তিগত স্তরে রেনেসাঁসের ফলে আসে আমূল পরিবর্তন। রেনেসাঁসের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকরা কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের বন্ধন ও শোষণ মুক্তির সংগ্রামের সামিল হন। ফলে রেনেসাঁসের কাজ কৃষক, শ্রমিক-সহ সকল মানুষের হাতে মুক্তির সনদ এনে দেওয়া। যেহেতু বঙ্গীয় রেনেসাঁসে তেমনভাবে এসব হয়নি, সেই কারণে এই জাগরণ তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণের যোগ্য।[২৬৬] উপস্থিত-বিচারে রেনেসাঁসের এই নেতিবাদী-ভাষ্যের পাল্লাই ভারী। মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলে রেনেসাঁসের এই নেতিবাদী বক্তব্যই প্রায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

রেনেসাঁস সম্পর্কে ইতিবাচক মূল্যায়ন যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যেও মত-বৈচিত্র্য কিছু কম নয়। কারো কাছে রেনেসাঁস পাশ্চাত্য সভ্যতাগত আধুনিকতার নামান্তর ; কারো কাছে অনুকরণহীন ভারতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা। তার ফলে একদল মনে করেন, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষা ও জীবনাদর্শের আলোকে যে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মধ্যেই ছিল রেনেসাঁসের মূল সূত্রগুলি ; উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেই রেনেসাঁসের আলোকিত যাত্রা অনেকখানি ব্যাহত হয়। অন্যদল বলেন, প্রথমার্ধের অন্ধ পাশ্চাত্যানুসরণ বিচলিত করেছিল বঙ্গীয় জাগরণের অন্তঃস্থ স্রোতটিকে ; উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে কেউ দেখেছেন বাঙালীয়ানার সবল উত্থান হিসাবে, কেউ বা দেখেছেন হিন্দু-জাগৃতির দিক থেকে। ভাষ্যকারদের সন্তোষ ও উষ্মার কারণ নিহিত আছে তাঁদের দৃষ্টিকোণের ভিন্নতার মধ্যে।

রেনেসাঁস সম্পর্কে যাঁরা ইতিবাচক বক্তব্য রেখেছেন এবং যাঁরা কঠোর সমালোচনা করে এই রেনেসাঁসকে প্রায় নস্যাৎ করতে চেয়েছেন, আপাতবিচারে, তাঁরা দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হলেও উভয়পক্ষের ভাষ্যকারদের (দু'একজন ব্যতিক্রম) মধ্যে একটি বিষয়ে বিশেষ মিল আছে, সেটি হচ্ছে প্রকৃত রেনেসাঁস সম্পর্কে তাঁদের ভিত্তিগত ধারণা প্রায় নেই বললেও চলে। যাঁরা মনে করেন শিল্প-বিপ্লব (Industrial revolution) না হলে সত্যকার রেনেসাঁস হওয়া সম্ভব নয় ; সুতরাং বাংলার জাগরণকে রেনেসাঁস বলা চলে না। বা মনে করেন বহিরাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত প্রকৃত রেনেসাঁসের সম্ভাবনাকে এখানে বিচলিত করেছিল, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হচ্ছে রেনেসাঁস। তাঁদের বক্তব্যে যত জোরই থাক রেনেসাঁস সম্পর্কে ভিত্তিগত ধারণা উভয়পক্ষেরই নেই। যাঁরা বলেছেন, রেনেসাঁস হয়েছে, তাঁদের মতামতের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোনো ইতিহাস-সম্মত সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড তাঁদের অনেকের হাতেই ছিল না। ছিল না বলেই, যে যাঁর নিজের মতো করে বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রয়োজনে বা পরিবর্তিত সময়ের চাপে তাঁদের কেউ কেউ ইতিবাচক বক্তব্যের শিবির পরিত্যাগ করে চরম নেতিবাদী শিবিরে পৌঁছেছেন। বিনয় ঘোষ, যিনি একদা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে বাঙালী পাঠকদের বুঝিয়েছিলেন বাংলায় দারুণ রেনেসাঁস হয়েছে, সেই অনুসারে লিখেছিলেন, *'বাংলার*

সামাজিক ইতিহাসের ধারা' 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' প্রভৃতি অসাধারণ গ্রন্থ, তিনিই পরবর্তীকালে লিখলেন,

> "পণ্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলার যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা বলেন, সেটা কি পদার্থ? কোথায় এবং কখন জাগরণ হল?"[২৬৭]

এতটা না হলেও সুশোভন সরকারও তাঁর পূর্বতন ইতিবাদী মত অনেকখানি বদল করেছিলেন। এরকম হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, রেনেসাঁস আলোচনার বস্তু বা তত্ত্বভিত্তিক ইতিহাস এবং বিজ্ঞান-সম্মত ভিত্তি তাঁরা অবলম্বন করেননি—আগেও না, পরেও না। আমাদের রেনেসাঁস-আলোচনা কী ধরনের বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে রয়েছে, তা বোঝা যাবে বিনয় ঘোষের *'বাংলার নবজাগৃতি'* (ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ) গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়লে। গ্রন্থের প্রথম দিকে দেখানো হয়েছে, বাংলায় কী দারুণ রেনেসাঁসই না হয়েছিল। —এটি গ্রন্থকারের পূর্বতন মত। গ্রন্থের শেষের দিকে অন্যরকম মানদণ্ড এনে বোঝানো হয়েছে, ব্যাপারটা কতদূর ভুয়া। বইটি পড়ে পাঠক বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করবেন, তা এককথায় শূন্য। রেনেসাঁসের মনগড়া ব্যাখ্যায় নেতিবাদী ভাষ্যকাররা এককাঠি এগিয়ে আছেন। তাঁদের রেনেসাঁস সম্পর্কিত বক্তব্য মূল রেনেসাঁসের থেকে এতটাই দূরবর্তী যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

আমাদের প্রগতিশীল রেনেসাঁস-বিচারকরা রেনেসাঁস বলতে বুঝেছেন—চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের ইতালি থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী পাঁচশো বছর ধরে মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে পৃথিবীর যেখানে যতরকম সদর্থক আন্দোলন হয়েছে—যতরকম উদারনৈতিক, প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক-দর্শন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সব ভাবধারা ও মূল্যবোধের ঘনীভূত নির্যাসকে। ইতালিতে রেনেসাঁসের পর জার্মানিতে ঘটেছে রিফরমেশন, ফরাসি দেশে এনলাইটেনমেন্ট, ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব, রাশিয়ায় ও চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বাংলার রেনেসাঁস-বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের বিচারকরা বিশ্ব-ইতিহাসের সেই পাঁচশো বছরের সুদীর্ঘ ঘটনাধারা ও ভাবাধারার আদর্শায়িত ধারণার এক ইউটোপীয় মানদণ্ড নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন পর্বে সংঘটিত প্রগতিশীল আন্দোলনের সবটুকুর নির্যাস তাঁরা প্রত্যাশা করেছেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পটভূমিতে। দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে বিভিন্ন দেশে ও কালে যা ঘটেছে বঙ্গদেশের ন্যূনাধিক একশো বছরের ইতিহাসে তা খুঁজতে গেছেন তাঁরা। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মধ্যে সেসব লক্ষণ দেখতে না পেয়ে তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং একে নস্যাৎ করেছেন। ইতালিতে, যেখানে রেনেসাঁসের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, সেখানে প্রথম এক-দেড়শো বছরের মধ্যে সেসব লক্ষণের টিকি পর্যন্ত দেখা যায়নি, দেখতে পাওয়া সম্ভবও ছিল না। তা সত্ত্বেও সভ্যতার পালাবদলের ইতিহাসে ইতালীয় রেনেসাঁস বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে।[২৬৮] ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ থেকে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রে ক্রান্তিকালীন সেই সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণকে স্বয়ং এঙ্গেলস অভিনন্দন জানিয়েছেন এই ভাষায়—

> "আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব....।"[২৬৯]

রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালির সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের একটা ইতিহাসসম্মত সমান্তরালতা

আছে। যদুনাথ সরকার বা সুশোভন সরকার দুই রেনেসাঁসের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করলেও উভয়ের কেউই সে আলোচনাকে যথার্থ গভীরতা দানের দায়িত্ব পালন করেননি। ফলে বাংলার রেনেসাঁস আলোচনা শেষ পর্যন্ত এক ধরনের ইউটোপীয়ায় পরিণত হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ রেনেসাঁস-ভাষ্যকারই রেনেসাঁস বলতে ফরাসি বিপ্লব বা শিল্প বিপ্লবোত্তর প্রগতিশীল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন, এমনকি রাশিয়ায় সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবাদর্শকে গ্রহণ করেছেন মানদণ্ড হিসাবে। মজার কথা হচ্ছে, এই মানদণ্ডে বিচার করলে বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় রেনেসাঁসও সম্পূর্ণই নস্যাৎ হয়ে যেত। রেনেসাঁস বিচারের প্রশ্নে সেই বিভ্রান্তিকর পথের যাত্রী না হয়ে শুদ্ধতর মানদণ্ডের সন্ধানে আমরা বরং প্রবেশ করব ইতালীয় রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে। আমরা দেখে নেব রেনেসাঁসের আমলে সেখানে কি-হয়েছিল, না-হয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. Jadunath Sarkar, *The History of Bengal*, vol. II. The University of Dacca, 1948, pp. 497-499

২. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লঙ্ম্যান সংস্করণ, ১৯৭৯

৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, বিশ্ববাণী সং, ১৯৮৩

৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (আধুনিক যুগ), ২য় সং, মাঘ ১৩৮১ ; *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, 1960 ; *British Paramountcy and Indian Renaissance*, part-II, 1965

৫. Amit Sen, *Notes on the Bengal Renaissance*, Calcutta, First Published in 1946

৬. বিনয় ঘোষ, *তদেব*

৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত*, ১৩৭৯; *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা*, ১৯৪১ ; *বঙ্গসংস্কৃতির কথা*, ১৯৭১

৮. অরবিন্দ ঘোষ, *ভারতের নবজন্ম*, ২য় সং, ১৩৩৯

৯. মোহিতলাল মজুমদার, *বাঙলার নবযুগ*, ১৯৬৫

১০. সুশীলকুমার গুপ্ত, উনবিংশ শতাব্দীতে *বাঙ্গালার নবজাগরণ*, ১৯৫৯

১১. অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস*, ১৯৭৪

১২. A. C. Gupta (ed.), *Studies in the Bengal Renaissance*, Jadavpur, 1958

১৩. কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, ১৩৬৩ ; *Creative Bengal*, 1950

১৪. D. Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Berkerley, 1969 ; *Nineteenth Century Bengal and Fifteenth Century Europe*, Calcutta, 1963

১৫. K. K. Dutta, *Dawn of Renascent India*, Nagpur University, 1949

১৬. H. C. E. Zacharias, *Renascent India from Rammohun Roy to Mohandas Gandhi*, London, 1933.
১৭. শিবনারায়ণ রায়, *কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা*, ১৩৭৩ ; *গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়*, এপ্রিল ১৯৮১ ; স্রোতের বিরুদ্ধে, ১৯৮৪
১৮. A Tripathi, *Vidyasagar : The Traditional Moderniser*, 1974
১৯. নরহরি কবিরাজ (সম্পা), *উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক*, ১৯৮৪
২০. J. N. Sarkar, *Ibid*, pp. 491-499
২১. S. Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, 1979 edition, p. 13
২২. বিনয় ঘোষ, *তদেব*, পৃ. ৩৬
২৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, *তদেব*, ভূমিকা, পৃ. ৬
২৪. শিবনারায়ণ রায়, *স্রোতের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১০০
২৫. K. A. Wadud, *Creative Bengal*, p. 1
২৬. D. Kopf, *Nineteenth Century Bengal and Fifteenth Century Europe*, p. 22
২৭. N. S. Bose, *Indian Awakening and Bengal*, 1969, Preface to the first edition
২৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (আধুনিক), পৃ. ১১১
২৯. K. K. Dutta, *Ibid*, p. 8
৩০. নরহরি কবিরাজ, *তদেব*, ভূমিকা
৩১. "When the Sun dipped into the Ganges behind the blood-red field of Plassy.......On 23 June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began." J. N. Sarkar, *Ibid*, p. 497
৩২. D. Kopf, *Ibid*
৩৩. সুশীলকুমার গুপ্ত, *তদেব* ।
৩৪. "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতবাসী প্রথম ইংরেজের সংস্পর্শে আসে। এই সময়েই ভারতবর্ষে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়।" যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত*, ভূমিকা
৩৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (আধুনিক যুগ), ২য় সং, ১৩৮১
৩৬. "The easiest starting point is, of course, the date 1815, when Rammohun Roy seettled down in calcutta and took up seriously his life's wrok" S. Sarkar, *Ibid*, p. 13-14
৩৭. "বাংলার এই জাগরণের সূচনা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বসাধক রামমোহন রায়ের কলকাতায় বসবাস থেকে....।" কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২
৩৮. N. S. Bose, *Ibid*, p. 13
৩৯. অন্নদাশঙ্কর রায়, *তদেব*, পৃ. ৫
৪০. শিবনারায়ণ রায়, 'বাংলার রেনেসাঁস', *স্রোতের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১১০
৪১. K. K. Dutta, *Ibid*

৪২. D. K. Chattopadhyay, *Dynamics of Social Changes in Bengal 1817-1851, 1990*
৪৩. A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social changes in Bengal 1818-1935,* Calcutta, 1976.
৪৪. স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস,* ১৯৭৫
৪৫. সুনীলকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গীয় রনেশাঁসে পাশ্চাত্যবিদ্যার ভূমিকা,* মাঘ ১৩৮৬, পৃ. ৫২-৫৪
৪৬. D. Kopf, *Ibid,* p. 7
৪৭. স্বপন বসু, *তদেব*
৪৮. সুশীলকুমার গুপ্ত, *তদেব*
৪৯. যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত,* ১৩৭৯
৫০. মোহিতলাল মজুমদার, *তদেব,* পৃ. ১৬৮
৫১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *তদেব*
৫২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙলার জাগরণের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। (ক) অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ১৭৬৫—সূচনা, (খ) ১৭৬৫-১৮০০—প্রস্তুতি পর্ব, (গ) ১৮০০-১৮৫০—গঠনকাল, (ঘ) ১৮৫০-১৯১১—শ্রেষ্ঠ পর্ব, সার্থক পরিণতি, (ঙ) ১৯১১-১৯৪৭—অবক্ষয়, (চ) ১৯৪৭ থেকে অধঃপতন। মোটামুটিভাবে ১৮০০-১৯১১ এই সময়-কালটিকে তিনি বাঙলার জাগরণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'The Changing Culture of Calcutta, Periodisation of Calcutta, Culture of Modern India', *"Bengal past and Present",* Jan.-June, 1968
৫৩. নরহরি কবিরাজ, *তদেব*
৫৪. রাখালচন্দ্র নাথের মতে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত ব্যাপ্ত স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে জাগরণের যে উদ্দীপ্ত বিচ্ছুরণ দেখা গিয়েছিল ১৯১১-র পর তা ক্ষীয়মান হতে থাকে। রাখালচন্দ্র নাথ, *উনিশ শতক ঃ ভাব সংঘাত ও সমন্বয়,* ১৯৮৮
৫৫. সুশোভন সরকার, *বাংলার রেনেসাঁস,* অনুবাদ ঃ অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীপায়ন সংস্করণ, পৃ. ১৬১
৫৬. "কিন্তু বর্তমানে এক সার্বিক অবসাদ প্রকট। চল্লিশ পরবর্তী সময়ের ধূমিত নৈরাশ্য পূর্ববর্তী প্রোজ্জ্বল ও উন্মুখ মানসের তুলনায় বিসদৃশ।" শিবনারায়ণ রায়, 'বাংলার রেনেসাঁস', *স্রোতের বিরুদ্ধে,* পৃ. ১১৭
৫৭. অন্নদাশঙ্কর রায়, *তদেব,* ভূমিকা
৫৮. D. Kopf, *Ibid*
৫৯. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন,* ১৯৭৪, পৃ. ৫
৬০. H. Sharp, *Selections from Educational Rocords,* Part-1, Calcutta, 1920, p. III
৬১. J. N. Sarkar, *Ibid*
৬২. S. Sarkar, *Ibid,* p. 13

৬৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, *তদেব,* পৃ. ৫
৬৪. সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৫৩-৫৪
৬৫. শিবনারায়ণ রায়, 'বাংলার রেনেসাঁস', *স্রোতের বিরুদ্ধে,* পৃ. ১০৭-১০৮
৬৬. মোহিতলাল মজুমদার, *তদেব*
৬৭. N. S. Bose, *Ibid,* p. 16
৬৮. A Mukherjee, *Reform and Regenaration in Bengal* (1774-1823),1968, p. 84
৬৯. S. Sarkar, *Ibid,* p. 74
৭০. সুশীলকুমার গুপ্ত, *তদেব* পৃ. ১৬
৭১. নরহরি কবিরাজ (সম্পা), *তদেব,* পৃ. ২৪০
৭২. K. K. Dutta, *Ibid,* p. 9
৭৩. H. C. E. Zacharias, *Ibid,* Concluding part
৭৪. সুশোভন সরকার, *'বাংলার রেনেসাঁস,* (অনু) অসীমকুমাব চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ১৪৪-১১৫
৭৫. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য : রাজা রামমোহন রায় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব,* কার্তিক ১৩৭৫, পৃ. ২২৮-২২৯
৭৬. A. Tripathi, *Ibid,* p. 196
৭৭. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ,* ১ম-৭ম খণ্ড, ১৩৮২, ১৩৮৩, ১৩৮৫, ১৩৮৭, ১৯৮১, ১৯৮৫, ১৯৮৮
৭৮. N. S. Bose, *Ibid,* p. 196
৭৯. অরবিন্দ ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৪২-৪৩
৮০. "There was a general deterioration in the Hindu society....Long subjection to foreign rule, lack of contact with the progressive forces of the world", R. C. Majumdar, *Glimpses of Bengal in Nineteenth Century,* p.14
৮১. J. N. Sarkar, *Ibid,* pp. 497-499
৮২. অমলেন্দু দে, 'দারা শিকোহ ও রামমোহন রায়', *রামমোহন স্মরণ,* রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি রক্ষা-সমিতি, মৃত্যু-সার্ধশতবর্ষপূর্তি সংকলন, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ২৯২-৩০৮
৮৩. Sumit Sarkar, *A Critique of Colonial India,* 1985, p. 3
৮৪. ১৯২৪, ২৭ সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোরে রামমোহন জন্মবার্ষিকীতে প্রদত্ত বক্তৃতা, অনুবাদ : কালিসাধন মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন স্মরণ, তদেব,* পৃ. ৩৭২-৩৯০, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, *Rammohun : The Universal Man*
৮৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (আধুনিক), পৃ. ১১১
৮৬. মোহিতলাল মজুমদার, *তদেব,* পৃ. ১
৮৭. সুশীলকুমার গুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ২৫৫
৮৮. J. L. Nehru, *Discovery of India,* Calcutta, 1946, p. 342
৮৯. S. Sarkar, *Ibid,* p. 73
৯০. S. Sarkar, *Ibid,* p. 72

৯১. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ. ১৬
৯২. অন্নদাশঙ্কর রায়, *তদেব,* পৃ. ৪৯
৯৩. M. N. Roy, *Indian Renaissance Movement, Three Lectures,* Indian Renaissance Institute, 2nd Ed. 1988, p. 35
৯৪. শিবনারায়ণ রায়, 'উদারতন্ত্রের অবক্ষয়', *গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়,* পৃ. ১৩
৯৫. শিবনারায়ণ রায়, *তদেব,* পৃ. ১৭২
৯৬. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১৪৬
৯৭. রাখালচন্দ্র নাথ, *উনিশ শতক ঃ ভাব সংঘাত ও সমন্বয়,* ১৯৮৮, ভূমিকা (Viii)
৯৮. N. S. Bose, *Ibid,* p. 177
৯৯. K. A. Wadud, *Ibid,* p. 65
১০০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (আধুনিক), পৃ. ৪৯৬
১০১. S. Sarkar, *Ibid,* p. 70
১০২. নরহরি কবিরাজ, *তদেব,* পৃ. ২০৩
১০৩. যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুক্তির সন্ধানে ভারত,* ভূমিকা (IV), পৃ. ২৮
১০৪. অন্নদাশঙ্কর রায়, *তদেব,* পৃ. ৪৬
১০৫. K. A. Wadud, *Ibid,* p. 1
১০৬. মোহিতলাল মজুমদার, *তদেব,* পৃ. ১৫৮-১৫৯
১০৭. শিবনারায়ণ রায়, *রেনেসাঁস,* ১৯৯২, বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৪৭
১০৮ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা,* ১৯৮৩, পৃ. ৪০-৪১
১০৯. অরবিন্দ ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৭৬
১১০. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ,* ১৯৭৩, পৃ. ৫৮, ৬১, ৬২
১১১. যোগেশচন্দ্র বাগল, *বঙ্গসংস্কৃতির কথা,* ভূমিকা
১১২ G. Chattopadhyay (ed), *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century,* vol. 1, 1965
১১৩. D. K. Chattopadhyay, *Ibid*
১১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র,* ১ম-২য় খণ্ড, ১৩৭৭, ১৩৮৪
১১৫. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* ১ম-৪র্থ খণ্ড, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৬
১১৬. নরহরি কবিরাজ, *তদেব*
১১৭. Smarajit Chakraborti, *The Bengali Press (1818-1868), A Study in the Growth of Public Opinion,* 1976
১১৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৫),* ১৯৭৭
১১৯. A. F. Salahuddin Ahmed, *Ibid*
১২০. স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস,* ১৯৭৫
১২১. বিনয় ঘোষ, বাংলার *সামাজিক ইতিহাসের ধারা* ১৮০০-১৯০০, নভেম্বর ১৯৬৮
১২২. P. Sinha, *Nineteenth Century Bengal,* 1965
১২৩. বিনয় ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১১
১২৪. বিনয় ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৫৯

১২৫. বিনয় ঘোষ, বাংলার *নবজাগৃতি,* পৃ. ৩৮

১২৬. D. Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance,* Ibid

১২৭. "Patron of Asia's long neglected lore
Like the fam'd Medici in days of yore!
Mornington : yourself of Arts the grace,
Encourage learning with a fond embrace,
Cherish her toilsome sons—a drooping train.
—And call the days of Leo o'er again"!
John Collegin *"The Asiatic Annual Register"*-1801, London, 1802, p. 113

১২৮. "একদিকে শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক হতাশার চিত্র এবং নিপীড়িত গরীব জনসাধারণের মুখ বুজে মার খাওয়া, আর অপরদিকে অত্যাচারী বলশালীর অবাধ লুণ্ঠন—এই ছিল বাংলাদেশের অবস্থা, যখন নবচেতনার বাণী বহন করে মিশনারীরা এদেশে পদার্পণ করেন এবং এই পটভূমিরই ওপর কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও তার পরিজনেরা পরবর্তীকালের নবজাগরণের বীজ রোপণ করেন।" সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৫

১২৯. বিনয়ভূষণ রায়, 'সমাজবিজ্ঞানী জেমস লঙ', *"এক্ষণ",* শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃ. ২০৪-২৫১

১৩০. শিবনারায়ণ রায়, *রেনেসাঁস, তদেব,* পৃ. ৪৪

১৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় ১২৯১ সালের ৫ মাঘ সিটি কলেজ গৃহে পঠিত, *রবীন্দ্র রচনাবলী*-একাদশ (পঃ বঃ সঃ), ১৯৮৯, পৃ. ২১৯

১৩২. K. A. Wadud, *Ibid,* p. 4

১৩৩. S. Sarkar, *Ibid,* p. 22

১৩৪. শিবনারায়ণ রায়, *তদেব,* পৃ. ৪৩

১৩৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (আধুনিক), পৃ. ১৬৩

১৩৬. N. S. Bose, *Ibid,* p. 31

১৩৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *রাজা রামমোহন,* এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতামালা, (অনুবাদ) ছায়া বিশ্বাস, জুন ১৯৭৬, পৃ. ৬৪

১৩৮. Sumit Sarkar, *Ibid,* p. 13

১৩৯. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, *রামমোহন-ডিরোজিও মূল্যায়ন,* ১৯৮৫, পৃ. ১৭

১৪০. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, *বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন,* ১৯৯০, পৃ. ৭৯

১৪১. Blair B. King, *Partner in Empire, Dwarakanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India,* University of California Press, 1976

১৪২. কৃষ্ণ কৃপালনী, *দ্বারকানাথ ঠাকুর—বিস্মৃত পথিকৃৎ,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লী, ১৯৮৪, ভূমিকা

১৪৩. রঞ্জিৎকুমার চক্রবর্তী, *দ্বারকানাথ ঠাকুর ঃ ঐতিহাসিক সমীক্ষা,* ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, উপসংহার

১৪৪. বিনয় ঘোষ, *বিদ্রোহী ডিরোজিও,* ১৯৬১, পৃ. ১২৮-১২৯
১৪৫. K. C. Mitra *'The Hindoo College and its Founder'* উদ্ধৃত বিনয় ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১৪৭-১৪৮
১৪৬. G. Chattopadhyay (ed), *Ibid,* pp. xxi, Liv.
১৪৭. N. S. Bose, *Ibid,* pp. 89-90
১৪৮. A. Tripathi, *Ibid,* p. 37
১৪৯. পবিত্রকুমার ঘোষ, *বাংলার রেনেসাঁস স্বপ্ন, মায়া না মতিভ্রম,* শিকড়ের খোঁজে গ্রন্থমালা-২, ৩০ জানুয়ারী ১৯৮১, পৃ. ১০
১৫০. Sumit Sarkar, *Ibid,* p. 36
১৫১. A. Poddar, *Renaissance in Bengal : Quests and Confrontations* (*1800-1860*), 1970, pp. 149-171
১৫২. A Tripathi, *Ibid*
১৫৩. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯
১৫৪. বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ,* প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮০
১৫৫. মোহিতলাল মজুমদার, *তদেব*
১৫৬. শিবনারায়ণ রায়, *তদেব*
১৫৭. ইন্দ্র মিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* ডিসেম্বর ১৯৬৯
১৫৮. সন্তোষকুমার অধিকারী, *বিদ্যাসাগর,* ১৯৭০ ; *বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি,* ১৯৮৫
১৫৯. Asok Sen, *Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones,* Calcutta, 1977
১৬০. পরমেশ আচার্য, *'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর', "অনুষ্টুপ",* একবিংশতি বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৬
১৬১. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *তদেব*
১৬২. পবিত্রকুমার ঘোষ, *তদেব*
১৬৩. অমল ঘোষ, *মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর,* ১ অক্টোবর ১৯৭৯
১৬৪. স্বপন বসু, *সমকালে বিদ্যাসাগর,* জানুয়ারী ১৯৯৩
১৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *"বিদ্যাসাগর চরিত্র"* ১৩ শ্রাবণ, ১৩০২, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* একাদশ (পঃ বঃ সঃ), ১৯৮৯, পৃ. ১৭২
১৬৬. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, *'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', প্রসঙ্গ ঃ বিদ্যাসাগর* (বিমান বসু সম্পা), ১৯৯১, পৃ. ৮৮
১৬৭. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* ২য় খণ্ড, ১৩৬৪, পৃ. ১
১৬৮. বদরুদ্দীন উমর, *তদেব*
১৬৯. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১৪৬
১৭০. পবিত্রকুমার ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১১
১৭১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', *'বঙ্গদর্শন',* ভাদ্র ১২৮০ পৃ. ২০৯-২১০
১৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আধুনিক সাহিত্য,* রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম (পঃ বঃ সঃ), ১৯৮৯
১৭৩. মোহিতলাল মজুমদার, *তদেব,* পৃ. ১৭

১৭৪. নীরেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্য-বীক্ষা,* ১৮৮৩
১৭৫. উৎপল দত্ত, *আশার ছলনে ভুলি,* পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৯৯৪
১৭৬. দ্রষ্টব্য ১৭১
১৭৭. মোহিতলাল মজুমদার, *কবি শ্রীমধুসূদন,* (বিদ্যোদয়), ১৯৬০, পৃ. ১৭
১৭৮. কাজী আবদুল ওদুদ, *'বাংলার জাগরণ', কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫৫-৫৬
১৭৯. নীরেন্দ্রনাথ রায়, 'মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজবাস্তবতা', *সাহিত্য-বীক্ষা,* ১৮৮৩, পৃ. ৪৬
১৮০. উৎপল দত্ত, 'বাংলার নাটকের আদিপর্বে য়ুরোপের প্রভাব', 'মাইকেল বিদ্রোহ' *আশার ছলনে ভুলি, তদেব*
১৮১. অরবিন্দ পোদ্দার, 'বাংলা রেনেসাঁস ও মধুসূদন ঃ একটি মূল্যায়ন', *রেনেসাঁস ও সমাজ মানস,* ১৯৮৩, পৃ. ৩৮-৩৯
১৮২. চিত্ত সিংহ, *'বাঙালী অবক্ষয়ের উৎস সন্ধানে',* শিকড়ের খোঁজে গ্রন্থমালা—১, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮১, পৃ. ৬
১৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র', *আধুনিক সাহিত্য,* ১৯০৭, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম (পঃ বঃ সঃ), ১৯৮৯, পৃ. ২১৬
১৮৪. মোহিতলাল মজুমদার, *বাংলার নবযুগ,* পৃ. ৮৭, ৯১
১৮৫. N. S. Bose, *Ibid,* p. 348
১৮৬. অসিতকুমার ভট্টাচার্য, *বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা,* জানুয়ারী ১৯৬৪
১৮৭. অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিম-মানস,* ১৯৫১; উদ্ধৃত নীরেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্য-বীক্ষা,* পৃ. ৬৮
১৮৮. কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ, তদেব,* পৃ. ৭২
১৮৯. K. A. Wadud, *Ibid,* p. 95
১৯০. অন্নদাশঙ্কর রায়, *তদেব,* পৃ. ৫৯
১৯১. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১৪৬
১৯২. চিত্ত সিংহ, *তদেব,* পৃ. ৯
১৯৩. N. S. Bose, *Ibid,* p. 195
১৯৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (আধুনিক), পৃ. ২২৮
১৯৫. মোহিতলাল মজুমদার, *তদেব,* পৃ. ১৪৭
১৯৬. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ* (৭খণ্ড), *তদেব*
১৯৭. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, *স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় ঊনবিংশ শতাব্দী,* ১৩৬৩ সং, পৃ. ১০
১৯৮. শিবনারায়ণ রায়, *গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়,* পৃ. ১৭৪
১৯৯. S. Sarkar, *Ibid,* p. 44
২০০. শোভন সোম, 'বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র', *"দেশ",* ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮
২০১. N. S. Bose, *Ibid,* p. 355
২০২. সুশোভন সরকার, 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ', *বাংলার রেনেসাঁস,* (অনু) অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীপায়ন সং, পৃ. ১৩৮
২০৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস,* পৃ. ৪৯-৫০

২০৪. শিবনারায়ণ রায়, 'রেনেসাঁস, রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন বাঙলা কবিতা', *"জিজ্ঞাসা"*, দ্বাদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৯৮, পৃ. ৩৫০

২০৫. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার *রেনেসাঁস ও রবীন্দ্রনাথ,* ১৯৮৬, পৃ. ১৭৮

২০৬. মোহিতলাল মজুমদার, *তদেব,* পৃ. ১৭১

২০৭. চিত্ত সিংহ, *তদেব,* পৃ. ৭

২০৮. ১৩৫৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত *'বাংলার নবজাগৃতি'* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

'বাঙলার নবজাগৃতি' প্রকাশিত হল। ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পর পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে চারিদিকের পুঞ্জীভূত সংকট ও পর্বত-প্রমাণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যে নবজাগৃতির সূচনা হয়েছিল, এবং যে-নবজাগৃতির ধারা তরঙ্গায়িত হয়ে বিচিত্র পথে আজও এক বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, *'বাঙলার নবজাগৃতি'* গ্রন্থে তারই ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করেছি।" (পৃ. ৮)

১৯৭০ সালে 'বাংলার নবজাগরণঃ সমীক্ষা ও সমালোচনা' এবং ১৯৭৮ সালে 'বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা' নামক দুটি প্রবন্ধে (যা ওরিয়েন্ট লঙ্ম্যান প্রকাশিত *'বাংলার নবজাগৃতি'* বৈশাখ ১৩৮৬ সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে, তাতে) তিনি বিপরীত মত জ্ঞাপন করেছেন।

২০৯. ১৯৪৬ সালে সুশোভন সরকার, অমিত সেন ছদ্মনামে লিখিত *'Notes on Bengal Renaissance'* নামে একটি পুস্তিকায় বাংলার রেনেসাঁসকে ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সংযোজনী টীকার সাহায্যে তিনি পূর্বতন মত বদল করে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতাগুলির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে সাদৃশ্য 'is only an analogy not a replica' (p. 164)। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত *On the Bengal Renaissance* গ্রন্থের প্যাপিরাস সংস্করণে তার পূর্বতন ও পরিবর্তিত মতামত সংবলিত রচনাগুলি একত্র প্রাপ্তব্য।

২১০. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ. ১৭৬

২১১. S. Sarkar, *Ibid,* p. 69

২১২. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি,* ১৩৬৩, পৃ. ৩২

২১৩. নীহাররঞ্জন রায়, *"জিজ্ঞাসা",* বৈশাখ ১৩৮৭

২১৪. A. Poddar, *Ibid,* p. 245

২১৫. Sumit Sarkar, *Ibid,* p. 13

২১৬. বদরুদ্দীন উমর, *তদেব,* পৃ. ২০

২১৭. চিত্ত সিংহ, *তদেব,* পৃ. ১৮

২১৮. বরুণ দে, 'বাংলার পুনর্জন্ম',*"অনীক",* বাংলার রেনেসাঁস সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৮৩, পৃ. ৪২

২১৯. A. Mitra, *Govt. of India : Census Report*, 1951, vol. VI, Part-IA, p. 435

২২০. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, *বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন রায়,* ১৯৯০, পৃ. ৩০
২২১. গোপাল হালদার, *তদেব,* পৃ. ৩২
২২২. S. Sarkar, *Ibid,* Supplementary notes, p. 165
২২৩. Sumit Sarkar, *Ibid,* p. 2
২২৪. A. Poddar, *Ibid,* p. 245
২২৫. নীরেন্দ্রনাথ রায়, *তদেব,* পৃ. ৬৯
২২৬. Asok Sen, *Ibid*
২২৭. অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিম-মানস, তদেব*
২২৮. অসিতকুমার ভট্টাচার্য, *বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, তদেব*
২২৯. Sumit Sarkar, *Ibid,* p. 13
২৩০. Sumit Sarkar, *Ibid*
২৩১. বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলা দেশের কৃষক,* ১৯৭৩
২৩২. *সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্,* চিঠিপত্র, *"গণশক্তি",* ২৭ জুন ১৯৯২
২৩৩. উৎপল দত্ত, 'সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল?' *"গণশক্তি",* ২৮ মে '৯২
২৩৪. বিনয় ঘোষ 'বাঙালীর শিল্পোদ্যম', *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* পৃ. ৯৭-১৬২
২৩৫. রঞ্জিৎকুমার চক্রবর্তী, *তদেব*
২৩৬. নীরেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্য-বীক্ষা,* পৃ. ৫৯
২৩৭. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*-১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬৬, পৃ. ১৫৯-২২০
২৩৮. S. Sarkar, *Ibid,* p. 165
২৩৯. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ. ৬৪
২৪০. A. Mitra, *Ibid*
২৪১. S. Sarkar, *Ibid,* p. 157
২৪২. S. Sarkar, *Ibid* p. 165
২৪৩. কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ, তদেব,* পৃ. ১১৭
২৪৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ,* বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃ. ৭৩২

"বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়ে মার!"
—এই ধরনের রচনা গোঁড়া মুসলমান লেখকদের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায়—
"কবি হেমচন্দ্র তাঁহার *'বীরবাহু'* কাব্যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার *'আনন্দমঠে'* এবং রঙ্গলাল তাঁহার *'পদ্মিনী'*তে মোছলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার বা নির্মূল করিয়া দিবার যে উদ্বোধন ও উত্তেজনা, হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন,—তাহার আদর্শে, অনুকরণে ও অনুসরণে হিন্দু সাহিত্যে মোছলেম হিংসার বান ডাকিয়াছে।" —'ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মোছলমানের কর্তব্য', সিরাজী, *"ছোলতান"* ৮ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩

২৪৫. A. F. Salahuddin Ahmed, *Ibid,* p. 19

২৪৬ বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* পৃ ২২৩
২৪৭. বিনয ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ. ১৫৩
২৪৮. নীহাররঞ্জন রায় 'উনিশ শতকীয় বাঙালীর পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পুনর্বিবেচনা', *"জিজ্ঞাসা',* বৈশাখ ১৩৮৭
২৪৯. চিত্ত সিংহ, *তদেব,* পৃ. ৩
২৫০. A. Poddar, *Ibid,* p. 245
২৫১. বিনয় ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১৫৪
২৫২. Quoted A. Poddar, *Ibid,* p. 36
২৫৩. A. Poddar, *Ibid,* p. 39
২৫৪. A. Poddar, *Ibid.* p. 35
২৫৫. সুপ্রকাশ রায়, *তদেব*
২৫৬. স্বপন বসু, *গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ,* ১৯৮৪
২৫৭. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, *তদেব*
২৫৮. সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্, 'প্রসঙ্গ ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল', *"গণশক্তি",* ২৭ জুন ১৯৯২
২৫৯. অমলেন্দু দে, *বাংলার বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সংকট,* আগষ্ট ১৯৮৭
২৬০. রণজিৎকুমার সমাদ্দার, *বাংলার গণ-সংগ্রামের পটভূমিকা,* ১৯৯১
২৬১. সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ জমিদার-কৃষক সম্পর্ক', *"সংস্কৃতি",* প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৪
২৬২. চিত্ত সিংহ, *তদেব,* পৃ. ৪
২৬৩. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, *তদেব,* পৃ. ৭৯
২৬৪. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, *তদেব,* পৃ. ৫৫
২৬৫. Sumit Sarkar, *Ibid,* p. 13
২৬৬. *"গণশক্তি"* পত্রিকায় রেনেসাঁস-বিতর্ক ঃ
"গণশক্তি", ২৮ মে,'৯২ ('সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল'?—উৎপল দত্ত);
"গণশক্তি", ৯ জুন '৯২ (চিঠিপত্র—শ. মু.) ;
"গণশক্তি", ২৭ জুন '৯২ (ঠিঠিপত্র—সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্) ;
"গণশক্তি", ১০ জুলাই '৯২ (চিঠিপত্র—শ. মু.)
২৬৭. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* পৃ. ১৬৪
২৬৮. *'চতুরঙ্গ"* পত্রিকার শ্রী দীপঙ্কর চক্রবর্তী রচিত *'বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন'* গ্রন্থটির লেখককৃত সমালোচনা-সূত্রে রেনেসাঁস-বিতর্ক ঃ *"চতুরঙ্গ",* ফেব্রুয়ারী '৯১ (মার্কসবাদী মূল্যায়নের নামে রামমোহনের চরিত্র-হননই কি লেখকের উদ্দেশ্য? —শ.মু.) ; *"চতুরঙ্গ",* জুন '৯১ (মতামত নরেন সরকার) ; *"চতুরঙ্গ',* জুলাই '৯১ (মতামত—শ.মু.)
২৬৯. ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, *ডায়লেকটিকস্ অব নেচার,* পৃ. ১-৩, (মোটা হরফ আমার—শ.মু.)

দ্বিতীয় অধ্যায় | রেনেসাঁস সম্পর্কে ভিত্তিগত ধারণার উৎস সন্ধানে : ইতালীয় রেনেসাঁস

রেনেসাঁসকে বলা হয়েছে 'মানব সভ্যতার প্রথম বসন্ত'।[১] রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালি। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক জুড়ে ইতালিতেই রেনেসাঁসের উজ্জ্বল সূচনা ও শুদ্ধ বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে জার্মানিতে রিফরমেশন, ফরাসি দেশে ফরাসি-বিপ্লব, ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব প্রভৃতি পৃথক পৃথক আন্দোলন মানব সভ্যতার প্রগতিশীলতার ইতিহাসে নতুন-নতুন মাত্রা যোগ করে। ইতালিতে সূচিত রেনেসাঁসের মৌলিক উপাদান সূত্রগুলির অনেক হেরফের হয়ে যায়। ইতালিতে যেখানে সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য-চর্চা পেয়েছিল কেন্দ্রীয় বিষয়ের মর্যাদা, জার্মানিতে সেখানে রিফরমেশনের সময় জোর পড়ে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার উপর ; মধ্যযুগে ধর্ম যে-জায়গায় অধিষ্ঠিত ছিল, রেনেসাঁস সে-জায়গায় বসায় সংস্কৃতিকে ; বেকন, গ্যালিলিও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেন মুখ্য ভূমিকায়।[২] সুতরাং সাধারণভাবে এই সব আন্দোলনকে রেনেসাঁসের অন্তর্ভুক্ত করলেও তার আদি ও শুদ্ধ রূপটির সন্ধানে আমাদের তাকাতে হবে ইতালির দিকেই।

বঙ্গীয় রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের অনেকে মনে করেন, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের ইতালি থেকে এ-তাবৎ কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ-ছ'শো বছর ধরে দেশে-দেশে যত রকম প্রগতিশীল আন্দোলন হয়েছে রেনেসাঁস হচ্ছে তার ঘনীভূত নির্যাস। বিগত পাঁচ-ছ'শো বছর সময়কালের মধ্যে শিল্পবিপ্লবের সূত্রে শুধু বুর্জোয়া বিপ্লবই ঘটেনি ; রাশিয়া বা চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও সম্পন্ন হয়েছে। পাঁচ-ছ'শো বছরের বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতির নির্যাস বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অল্পাধিক একশো বছরের ইতিহাসে খুঁজতে চাইলে বিচারের নামে অবিচারের সম্ভাবনাই বাড়ে। কারণ পরবর্তীকালে বিকশিত বহু প্রগতিশীল আন্দোলন ও ভাবধারা মূল ইতালীয় রেনেসাঁসেও অদৃষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও, সে-রেনেসাঁস বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের ক্রান্তিকালীন পর্বে সংঘটিত, ইতালীয় রেনেসাঁসের দেড়-দু'শো বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, উনিশ শতকে সূচিত বঙ্গীয় জাগরণের কিঞ্চিদধিক শতবর্ষের বিচ্ছুরণময় ইতিহাসকে দেখলে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের একটি ন্যায়সঙ্গত বিচার সম্ভব।

ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রসঙ্গে ইতালীয় রেনেসাঁসের কথা যদুনাথ সরকার[৩] বা সুশোভন সরকার[৪] প্রথমদিকে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই সাদৃশ্যকে গভীরতা দানের দায়িত্ব তাঁরা পালন করেননি। পরবর্তীকালে, সুশোভন সরকার ইতালীয় মডেল ছেড়ে রুশ মডেলের কথা পাড়েন।[৫] অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা 'It would be worse than useless or quite misleading......'[৬] অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, উভয়ের মধ্যে সমান্তরাল আলোচনা টানার যুক্তিধারা পরিহার করাই সঙ্গত।

কেননা ইতালিতে সজীব সভ্যতার উপর মৃত সভ্যতার অভিঘাত আর বাংলায় মৃত সভ্যতার উপর সজীব গতিশীল সভ্যতার অভিঘাত—দু'টো এক নয়।[৭] সুশোভন সরকারের পরবর্তী মত অনুসারে "The Renaissance in Bengal lacked the tremendous sweep and vital energy of the manysided upsurge..."[৮]

অন্যদিকে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড কফ, শিবনারায়ণ রায়, অমলেশ ত্রিপাঠী—এঁরা ইতালীয় রেনেসাঁসের কথা মনে রেখেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আলোচনায় প্রবেশ করতে চেয়েছেন। যদিও তাত্ত্বিকভাবে এঁরা পৃথক-পৃথক পথের অভিযাত্রী। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ইতালিতে হিউম্যানিস্টদের প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যার চর্চা যে ভূমিকা পালন করেছিল, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করেছে পাশ্চাত্যবিদ্যা।[৯] ডেভিড কফ মনে করেন, উইলিয়াম জোন্স প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী বিদেশী পথিকদের উদ্যোগে এদেশে প্রাচ্যবিদ্যার পুনরুদ্ধার ও নিবিড়-চর্চাই 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'।[১০] অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন, 'আমাদের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—গ্রীক-লাতিনের বদলে সংস্কৃতের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন।'[১১] তাঁর তাত্ত্বিক ধারণাটি এইরকম—

> "ইতালীয় র‍্যনেশাঁস মডেলে বাংলার সাহিত্য শিল্পসৃষ্টিকে বা ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকে না দেখে ঐতিহ্য বা আধুনিকতার প্রসঙ্গে দেখা উচিত। একে বলা যেতে পারে ঐতিহ্য-সম্মত আধুনিকীকরণ 'traditional modernisation"।[১২]

শিবনারায়ণ রায় মনে করেন, ধর্মের প্রাধিকার থেকে মানুষের মুক্তি শুরু হয়েছিল ইতালীয় রেনেসাঁসে। সেখানে অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা দিয়েছিল বহু সিসৃক্ষু, জিজ্ঞাসাপরায়ণ, মহোদ্যোগী, প্রতিভাশালী ব্যক্তি, বাংলাতেও তাই হয়েছিল।[১৩] পাশ্চাত্যবাদী ও প্রাচ্যবাদী (ওরিয়েন্টালিস্ট), সেকুলারবাদী ও অধ্যাত্মবাদী, আধুনিকতাবাদী ও ঐতিহ্যবাদী (ট্রাডিশনালিস্ট) ব্যাখ্যাতারা যে যার মতো ব্যাখ্যায় রেনেসাঁসকে দেখেছেন। এঁদের সঙ্গে আছেন সেই সব রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা, যাঁরা মনে করেন রেনেসাঁস হচ্ছে, 'full blooded bourgeois modernity',[১৪] বা আপামর জনসাধারণের অবস্থা-পরিবর্তনের বিপ্লব। ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা ও ইতিহাসসম্মত মানদণ্ডই একমাত্র পারে, বঙ্গীয় রেনেসাঁস-বিচারকে প্রচলিত বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তি দিতে।

রেনেসাঁস এক-রগ্গ সংস্কৃতি নয়

'রেনেসাঁস' শব্দটি ফরাসি। 'রিনাসচিতা'-র অর্থ পুনর্জন্ম। ইতালিতে একে বলা হয় সিনকোসেন্টো। জার্মানিতে রিফরমেশন। যা এক সময় ছিল, তারই পুনর্জন্ম। প্রাচীন গ্রীসে মানব সভ্যতার যে উজ্জ্বল বিকাশ ঘটেছিল, মধ্যযুগে তা আবার অন্ধকারের দ্বারা কবলিত হয়। রেনেসাঁস এক অর্থে 'রিভাইভ্যাল অব ক্লাসিক্যাল লার্নিং'।[১৫] গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন রোমান বিদ্যার নিবিড় চর্চায় নিরত হন পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালির বিদ্বজ্জন ও শিল্পীরা। ফলে চার্চশাসিত গতানুগতিক জীবনধারায় দেখা দেয় নতুন জীবনস্পন্দন, নতুন জীবনবোধ।

কেন তাঁরা প্রাচীন গ্রীক-বিদ্যা ও লাতিন-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন? তার

উত্তরে বলা হয়েছে, চার্চ-শাসিত মধ্যযুগ ধর্মীয় বিধি-নিষেধের নিগড়ে মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে রজ্জুবদ্ধ করে ফেলেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে চাইছিল তার থেকে মুক্তি। প্রাচীন গ্রীক-সংস্কৃতির মধ্যে সে দেখতে পেল মুক্ত মানবতার আদর্শ।[১৬] মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়োজনে সে হাত বাড়াল প্রাচীন-বিদ্যার দিকে।[১৭] মধ্যযুগ জুড়ে মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল এই দর্শন যে, 'মানুষ হচ্ছে পতিত, জীবন অনুশোচনার জন্য, সৌন্দর্য পাপের ঠুলি।'[১৮] জিজ্ঞাসা নয় বিশ্বাস, সংঘাত নয় অনুগমন, সম্ভোগ নয় দারিদ্র্য. বিস্তার নয় সংক্ষেপ, আনন্দ নয় বিষাদ। মধ্যযুগ মানুষের সামনে এনে দিয়েছিল বিশাল এক 'না'। সেখানে রেনেসাঁস সমস্ত হৃদয় ও শৌর্য্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে একটি 'হ্যাঁ'-মূলক জীবনবাদ উপস্থাপিত করে।[১৯] নেতিবাদী মধ্যযুগ থেকে ইতিবাদী আধুনিক যুগে উত্তরণের ক্রান্তিকালীন সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণের নামই রেনেসাঁস।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের ক্রান্তিকালীন সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ[২০] বলে রেনেসাঁসের মধ্যে পাওয়া যায় দুই বিপরীতের অদ্ভুত সমাবেশ ও অভিঘাত। দুই বিপরীত মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনের অভিঘাত ও টানাপোড়েন দিয়ে রেনেসাঁসের বস্ত্র বয়ন হয়েছিল। রেনেসাঁস তাই কোনো এক-রঙা সরল সংস্কৃতি নয়। এর মধ্যে রচিত হয়েছে আলো-আঁধারের সেতু। হিউম বলেছেন, রেনেসাঁস হচ্ছে 'সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ঊষাকাল।'[২১] এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'এ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব।'[২২] আবার হুইজিঙ্গার মতে 'রেনেসাঁস মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় ছাড়া কিছু নয়।'[২৩] ভিক্টর হুগোর মতে 'রেনেসাঁস আসলে সূর্যাস্তকাল, সমগ্র ইওরোপ একেই ঊষাকাল বলে ভুল করেছিল।'[২৪] অপসৃয়মান মধ্যযুগের শেষাংশ হিসাবে রেনেসাঁসকে গুরুত্বহীন মনে করা এবং বিজ্ঞান ও সভ্যতার দিক থেকে বিশুদ্ধ আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা— এই দু'রকম মূল্যায়নই অতিকথন দোষে দুষ্ট। অধ্যাপক ফার্গুসন বলেছেন,

> "রেনেসাঁস হচ্ছে একটা ক্রান্তিকালীন ব্যাপার, যার মধ্যে মধ্যযুগীয় উপাদান ও আধুনিক যুগ-লক্ষণ উভয়ই বিদ্যমান। উভয়প্রকার উপাদানের সংমিশ্রণজনিত কারণেই এর মধ্যে বৈপরীত্য, বৈচিত্র্য এবং বিস্ময়-উদ্রেককারী প্রাণময়তা লক্ষ করা যায়।"[২৫]

রেনেসাঁসে কি হয়নি

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অধিকাংশ ভাষ্যকার রেনেসাঁস সম্পর্কে একটি সর্বোদয় জাতীয় ইউটোপীয় ধারণা পোষণ করে থাকেন। সেদিকে লক্ষ রেখে, প্রথমেই আমরা ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে কতকগুলি অতিরঞ্জিত ও ভ্রান্ত ধারণার দিকে আলোকপাত করব।

ক. রেনেসাঁসের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি

ইতালীয় রেনেসাঁসের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে দু'টি একপেশে ধারণা চালু আছে। এক, রেনেসাঁস হচ্ছে 'full blooded bourgeois modernity'.[২৬] দুই, ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে রেনেসাঁসের সম্পর্ক অপ্রতিষ্ঠিত।[২৭] এ-বিষয়ে বহু গভীর ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা

হয়েছে। তার ফলাফলগুলি সূত্রাকারে লিখলে এইরকম দাঁড়ায় :

১. রেনেসাঁস পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ফসল, কোনো স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়।
২. রেনেসাঁসকালীন ধনতন্ত্র শিল্পীয়' (industrial) ধনতন্ত্র নয়, বাণিজ্যিক (merchantile) ধনতন্ত্র।
৩. অর্থনৈতিক মন্দার দ্বারা গ্রস্ত সেই ধনতন্ত্র রুগ্ন অবস্থার মধ্যে পড়েছিল।
৪. ধনতন্ত্রের বাধাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে ভূমিনির্ভর অর্থনীতি ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চলেছিল ইতালির বুর্জোয়ারা।[২৮]

বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের ফসল

ইতালির নাগরিক সমৃদ্ধির প্রধান জোগানদার ছিল ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসা আর বাণিজ্যতন্ত্র। বার্ডি (Bardi), পেরুজ্জি (Peruzzi), মেদিচি (Medici) প্রভৃতি পরিবারের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা ছড়িয়েছিল গোটা ইওরোপ জুড়ে। ইতালীয় রেনেসাঁসে পৃষ্ঠপোষকদের শিরোনামে মেদিচি-পরিবার। তাদের অর্থাগমের প্রধান উৎস ছিল ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসা। আটলান্টিক দেশগুলি মাথা তোলবার আগে (১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) ভূমধ্যসাগর-এলাকা বাণিজ্যিক দুনিয়ার মধ্য-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল।[২৯] সেই বাণিজ্যলব্ধ মূলধন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ইতালির বিভিন্ন বন্দর-নগরে। ভেনিসের বন্দরে পেত্রার্কা বিশ্ববিজয়ী বাণিজ্য-তরণীর যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা এই রকম—

> "আমি ভাসমান জাহাজগুলিকে দেখতে পাচ্ছি। সেগুলি ভেনিসের বিশাল প্রাসাদের মতোই। জাহাজগুলি দুঃসাহসিক অভিযানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলে যায়— ইংল্যান্ডে নিয়ে যায় মদ ; রাশিয়ায় মধু ; বস্ত্র তেল প্রভৃতি নিয়ে যায় আসিরিয়া, আর্মেনিয়া, পারস্য, আরবে ; মিশরে, গ্রীসে নিয়ে যায় কাঠ ; আর তারাই ফিরে আসে জাহাজ ভর্তি বিভিন্ন বস্তুসম্ভার নিয়ে। আবার সেগুলিকে চালান দেয়।"[১৩০]

মার্কো দাতিনি, জিওভান্নি রুচেল্লি, অগাস্তিনো চিগি, কোসিমো দ্য মেদিচি প্রভৃতি বণিকরা রেনেসাঁসের আমলকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। চিগির শতাধিক বাণিজ্য জাহাজ তোলপাড় করে বেড়াত বিভিন্ন সমুদ্রপথ, কড়ি হাজারের বেশি লোক কাজ করত তাঁর অধীনে। বিখ্যাত 'ফারনেসিনা ভিলা' তাঁরই তৈরী।[৩১] কোসিমো শুধু বণিকই ছিলেন না, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্লোরেন্স হয়ে ওঠে রেনেসাঁসের প্রধান কেন্দ্রস্থল।[৩২] ব্ল্যাক ডেথের সময় (১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) দাতিনির সম্বল ছিল ছোট একটি বাড়ি, আর ৪৭ ফ্লোরিন মাত্র ; পরিবর্তিত সময়ের দৌলতে তিনি হয়ে উঠলেন ইতালির বিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যিক ব্যক্তিত্ব।[৩৩] ব্রুকার তাঁর *'দ্য প্যাটার্ন অব সোস্যাল চেঞ্জ'* নামক লেখায় এঁদের 'জেন্টু নুভা'[৩৪] এবং মার্টিন ভন তাঁর *'সোশিওলজি অব দ্য রেনেসাঁস'* নামক গ্রন্থে এঁদের 'হুটে বুর্জোয়া' নামে চিহ্নিত করেছেন। এম. এম. প্যাস্টন[৩৫] আর মার্টিন ভন তাঁদের গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ইতালিতেই প্রথম শুরু হয়েছিল 'মানি ইকনোমি'-র যুগ। তার ফলে 'The tempo of life was increased.'[৩৬] স্থির, স্থাণু, পূর্ব-নির্ধারিত সামাজিক জীবনের ভিত্তি খসে গিয়ে শুরু হয়েছিল বিত্ত, বিদ্যা ও সংস্কৃতিগত যোগ্যতার

অবাধ কর্ষণের যুগ। এ-সময় সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের ভরকেন্দ্র সরে গিয়েছিল শহরে। সমাজের শ্রেণীগত বিন্যাসে একটা নতুন ছক তৈরি হয়েছিল, যাতে পরিস্ফুটিত হয়েছিল বুর্জোয়াদের উত্থান। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মানচিত্রের প্রায় মধ্য-ভূমিতে ইতালির অবস্থান হওয়ায় যথেষ্ট সম্পদ সেখানে সঞ্চিত হতে পেরেছিল। সেই সম্পদ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল রেনেসাঁসের জৌলুস। উইল ডুরান্টের ভাষায়, 'Wealth transmuted into beauty'.[৩৭] মরিস ডব রেনেসাঁসকালীন ইতালীয় ধনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্টই বলেছেন, শিল্পীয় ধনতন্ত্রের সঙ্গে একে ঘুলিয়ে ফেললে হবে না। এটা ছিল বাণিজ্যিক ধনতন্ত্র।

> "The money economy of the twelfth century to the sixteenth century as a merchant capitalism should not be confused with industrial capitalism."[৩৮]

পিটার বার্ক বলেছেন, ফ্লোরেন্সে শতকরা ৩৬টি পরিবার বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু সে শিল্প ধনতান্ত্রিক পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।[৩৯] শিল্পীয় ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে অনেক পরে, প্রথম ইতালিতে নয়, অন্যত্র। অর্থাৎ শিল্পীয় ধনতন্ত্রের পটভূমিকা ছাড়াই বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় রেনেসাঁস সম্ভব হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে ইতালীয় রেনেসাঁসের উত্থানের সঙ্গে তার পতনের ইতিহাসও তার বাণিজ্যিক দুনিয়ার পতনের সঙ্গে জড়িত।[৪০]

অর্থনৈতিক মন্দা

ইতালীয় রেনেসাঁসের ভিত্তি ছিল এক সুবর্ণময় অর্থনৈতিক যুগ ; ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের মধ্যে রেনেসাঁসের সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল—এই ধারণাটিকে টলিয়ে দেন আর. এস. লোপেজ। 'লোপেজ-থিয়োরি' নামে বিখ্যাত একাধিক তথ্যভিত্তিক নিবন্ধে দেখানো হয়, রেনেসাঁসের আমলে ইতালিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ অবাধ ছিল—এ ধারণাটি ঠিক নয়। *'হার্ড টাইমস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট'*[৪১] ও *'ইকনোমিক ডিপ্রেশন অব দ্য রেনেসাঁস'*[৪২] নামক নিবন্ধে লোপেজ ও মিসকিমিন দেখান ১৩৪৮ সালের 'ব্ল্যাক ডেথ'এর পর ইতালির অর্থনৈতিক অবস্থা নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে পড়ে।

> "After 1348 the Italian economy entered upon an unchecked downward spiral for several centuries."[৪৩]

দান্তের সময় (১২৬৫-১৩২১) ফ্লোরেন্সের জনসংখ্যা ছিল এক লক্ষ, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর সময় (১৪৭৫-১৫৬৫) তা দাঁড়ায় সত্তর হাজারে। চোদ্দ শতকের গোড়ার দিকে যেখানে বস্ত্রখণ্ডের বাৎসরিক উৎপাদন ছিল আশি হাজার, পঞ্চাশ বছর পরে তা চব্বিশ হাজার বস্ত্রখণ্ডে নেমে যায়। ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই মন্দা দেখা যায়। বার্ডি, পেরুজ্জিদের সময় ব্যাঙ্কিং শিল্পে যা আয় ছিল, মেদিচিদের সময় তা কমে যায়। কোসিমো দ্য মেদিচির আমল থেকে লরেঞ্জো দ্য মেদিচির আমলে আয়ের নিম্নগতি বা অবক্ষয় স্পষ্টতর। আর. ডি. রুভার *'দ্য রাইজ অ্যান্ড ডিক্লাইন অব দ্য মেদিচি ব্যাঙ্ক* ১৩৯৭-১৪৯৪' নামক গ্রন্থে তুলে এনেছেন সেই অর্থনৈতিক অধঃপাতের চিত্র। *'হার্ড*

টাইমস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' নামক নিবন্ধে লোপেজ দেখিয়েছেন, রেনেসাঁসের সময় বণিকরা খুব ব্যস্ত ও ব্যাপৃত ছিলেন না। তার ফলে সময় ও অর্থ তারা অনেকটাই সংস্কৃতির জন্য ব্যয় করতে পেরেছিলেন।[৪৪] এ বিষয়ে মার্টিন ভন, অধ্যাপক ফিয়ামি, সিপোল্লা, ফার্গুসন[৪৫] প্রমুখ সমর্থনসূচক বক্তব্যই উপস্থাপিত করেছেন। লোপেজ 'অর্থনৈতিক মন্দা'-র তত্ত্ব আনলেও এক ধরনের গুণগত অগ্রগতির কথাও বলেন, যাতে 'অর্থনৈতিক সুবর্ণযুগ' ও 'অর্থনৈতিক মন্দা'—এই দুই বিপরীত তত্ত্বের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভব হয়। তিনি বলেন,

> "সঙ্কুচিত বাজার, অল্পতর লাভ ও তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে ইতালির বাণিজ্যিক দুনিয়ায় যুক্তিগ্রাহ্য ও উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। এর ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন একটা গুণগত ঔৎকর্ষ দেখা যায়, যা ষোড়শ শতাব্দীর ইওরোপীয় অর্থনীতির সম্প্রসারিত ও পরিমাণগত ঔৎকর্ষকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়।"[৪৬]

তথাপি বিভিন্ন তথ্যনিষ্ঠ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে অর্থনৈতিক সুবর্ণযুগের সমৃদ্ধিময় পরিবেশে ইতালীয় রেনেসাঁসের গৌরবময় বিকাশ হয়েছিল এই সরল ধারণাটি ঠিক নয়।[৪৭] 'full blooded bourgeois modernity' বলতে যা বোঝায়, ইতালীয় রেনেসাঁস তা ছিল না।

কৃষিতে বিনিয়োগ

ধনতন্ত্রের বিকাশ যেখানে বাধাগ্রস্ত, সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও ভূমি-ব্যবস্থাকে আদৌ উপেক্ষা করা হয়নি। পি. জি. জোনস্ তাঁর *'ফ্লোরেনটাইন ফ্যামিলিজ্ অ্যান্ড ফ্লোরেনটাইন ডায়েরিজ্'* নামক লেখায়[৪৮] ও অ্যান্টনি মালহো তাঁর *'সোশ্যাল অ্যান্ড ইকনোমিক ফাউন্ডেশন অব দ্য ইটালিয়ান রেনেসাঁস'* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শহর ও গ্রাম উভয় স্থানের বাসিন্দাদের আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল জমি।

> "Land always remained one of the source of revenue for all Italians whether urban or dwellers and that it was considered a proper source of capitalistic exploitation."[৪৯]

জিওভান্নি ভিল্লানি তাঁর *'দ্য গ্রেটনেস অব ফ্লোরেন্স'* নামক ইতিহাসনিষ্ট রচনায় দেখিয়েছেন ফ্লোরেন্সের ধনী ও অভিজাত মানুষরা অধিকাংশই সপরিবারে বছরে অন্তত চার মাস, কেউ বা তার চেয়ে বেশিদিন গ্রামে কাটাতেন। শহরে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁরা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক কখনোই চুকিয়ে দেননি।[৫০] ফ্রেডরিখ আন্তাল তাঁর *'ফ্লোরেনটাইন পেইন্টিংস অ্যান্ড ইটস্ সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড'* নামক নিবন্ধে লিখেছেন, রেনেসাঁসের অধিকাংশ চিত্রকলায় গ্রামীণ-দৃশ্য ও কৃষি-ভূমির একটি সমৃদ্ধসুন্দর প্রসারিত ল্যান্ডস্কেপ বা পরিপ্রেক্ষিত দেখা যায়—যার আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যটি উপেক্ষণীয় নয়।[৫১] অ্যান্টনি মালহো লিখেছেন,

> "ফিউডাল লর্ডরা যেমন শহরে প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, শিল্প-বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করতেন আবার তেমনি শহরের নবোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনিক-

বণিকরা গ্রামে বানাতেন ভিলা এবং কৃষিতে তাঁরা মূলধন বিনিয়োগ করতেন।"[৫২] সুতরাং বেনেসাঁসেব সংস্কৃতি অবিমিশ্র বুর্জোয়া সংস্কৃতি এবং কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না—এ ধারণাটি অমূলক ও অতিরঞ্জিত। মার্টিন ভন এই সব কারণেই রেনেসাঁসকালীন বুর্জোয়াদের সম্পর্কে সমালোচনার সুরে লিখেছেন, 'Bourgeoise became untrue to its original driving power.'[৫৩] সামন্ততন্ত্র ও নোবল-তন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়ারা গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। পি. জে. জোনস্ এ বিষয়ে বলেছেন,

> "Strong ties between city and country surely mark one of the most important and unique aspects of Italian culture from year 1000 until the 16th and early 17th Century."[৫৪]

খ. রেনেসাঁস ও ধর্ম

চার্চ-নিয়ন্ত্রিত মধ্যযুগীয় ধর্মের অনুশাসন থেকে বেনেসাঁস মানুষের মুক্তির অবতরণিকা রচনা করেছিল এ-সত্য স্বীকার করেও বলা যায় চার্চ ও ধর্মেব দিক থেকে এই সংস্কৃতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এ-ধারণাটি অতিরঞ্জিত। ধর্ম বা চার্চের সঙ্গে সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতার অবকাশ তৈরী হয়েছিল সে-সময়। রেনেসাঁসের নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পোপেরাও যোগদান করেছিলেন।[৫৫] নিকোলাস-৫ম থেকে লিও-১০ম এঁরা রেনেসাঁস-পোপ নামেই খ্যাত।[৫৬] নিকোলাস-৫ম বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট পোগ্নিওকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রেনেসাঁসকে অভ্যর্থনা জানাতে রোম প্রস্তুত।[৫৭] পোপ পায়াস-২য় তো নিজেই হিউম্যানিস্ট ছিলেন। জুলিয়াস-২য় খ্যাত হয়েছিলেন 'যোদ্ধা পোপ' হিসাবে। রাজন্যক ও বণিক মেদিচি-পরিবারের সন্তান লিও-১০ম পোপের আসনে বসলে সমগ্র রোম যেন বলে উঠেছিল,

> "Let us enjoy the papacy since God has given it to us."[৫৮]

বিখ্যাত শুদ্ধতাবাদী নেতা স্যাভোনারালা রেনেসাঁসের নান্দনিক ও ভোগবাদী আন্দোলনে পোপ ও চার্চতন্ত্রের যোগদান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পোপ আলেকজান্ডারের নির্দেশে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। উইল ডুরান্ট লিখেছেন,

> "Savonarala was the Middle Ages surviving into the Renaissance and Renaissance destroyed him."[৫৯]

কিন্তু স্যাভোনারালার মতো মধ্যযুগের আত্মা রেনেসাঁসের ভিতরে নিঃশব্দে কাজ করে গিয়েছিল। ওয়াল্টার উলমান তাঁর *'মিডিয়াভ্যাল ফাউন্ডেশন অব রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের পৃথিবী থেকে রেনেসাঁস খুব একটা সরে আসেনি।[৬০] ও. পি. ক্রিস্টেলার[৬১] বা হুইজিঙ্গাও[৬২] প্রায় একই রকম বক্তব্য রেখেছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থোপার্জন, সুদ (ব্যাঙ্কিং ব্যবসার মূল ভিত্তি), অবাধ বাণিজ্য সংক্রান্ত ট্যাবুগুলি নবোদ্ভূত ধনিক-বণিকরা যেমন অস্বীকার করলেন, তেমনি সেগুলি তারা পুষিয়ে দিতে থাকলেন নতুন-নতুন চার্চ, ধর্মীয় চিত্রাদির পৃষ্ঠপোষকতা করে। জোত্তোর

আঁকা এক ছবিতে দেখা যায় এনরিকো স্ক্রোভেগ্নি নামে এক বণিক পিতার সুদের কারবার-জনিত ঐশ্বর্যের পাপস্খালনের জন্য *'এরিনা চ্যাপেল'* নির্মাণ করে যাজকদের তা উৎসর্গ করছে।[৬৩] রেনেসাঁসের আমলে কত গির্জা তৈরী হয়েছিল তার হদিশ নিতে গেলে অবাক হতে হয়। রেনেসাঁসকালীন স্থাপত্যের বিশ্ববিমোহী নিদর্শন *'সেন্ট পিটার গির্জা'র* কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। ই. আর. মেল তাঁর *'দ্য আর্লি চার্চেস ইন রোম'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> "What the Renaissance was : it was antiquity enobled by Christian faith."[৬৪]

জি. আর. পটারের ভাষায়

> "Renaissance Art is first and foremost a religious art."[৬৫]

রেনেসাঁসের চিত্রকররা চার্চের দেওয়ালে, ছাদে, চ্যাপেলে শত-শত ধর্মীয় ছবি এঁকেছিলেন। চিত্রকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল চার্চ। চিত্রের প্রধান কাজই ছিল সাধারণ মানুষের সামনে ধর্মের গল্প বিশ্বাসযোগ্য ও সুন্দর করে উপস্থাপিত করা। রেনেসাঁসের চিত্রীরা এঁকেছিলেন— 'ঘোষণা', 'জন্ম', 'স্তব', 'উপহার', 'পলায়ন', 'রূপান্তরণ', 'শেষভোজ', 'ক্রুশারোহণ', 'সমাধিকরণ', 'পুনরুত্থান', 'স্বর্গারোহণ', 'শহীদ দৃশ্য'-র মতো শত শত ধর্মীয় ছবি। ভার্জিন, মেরী, যিশু রেনেসাঁসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রাজত্ব করে গেছে।[৬৬] অ্যাঞ্জেলোর 'আদমের জন্ম', টিশিয়ান বা রাফায়েলের 'রূপান্তরণ', লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'ভার্জিন অব দ্য রক' ছবি দেখলে এ কথা বলা সম্ভব নয়, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে রেনেসাঁসের শিল্প আধুনিকতার দিকে যাত্রা করেছিল।[৬৭]

রেনেসাঁসের সংস্কৃতিকে রূপায়িত করার দায়িত্ব একদিক থেকে যেমন গ্রহণ করেছিলেন শিল্পীরা, তেমনি অন্যদিক থেকে রেনেসাঁসের বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে এসেছিলেন। এঁরা হিউম্যানিস্ট হিসাবে খ্যাত। কিন্তু আধুনিক অর্থে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না তাঁরাও।[৬৮] তাঁরা চার্চের সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু চার্চকে পরিত্যাগ করেননি। পোগ্গিও, লিওনার্দো ব্রুনি, লরেঞ্জো ভাল্লা—এঁরা পোপের সেক্রেটারির চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় সব হিউম্যানিস্টই গভীরভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমের জনক হিসাবে খ্যাত পেত্রার্কা বলেছিলেন,

> "The true Philosopher is a lover of god."[৬৯]

তিনি 'ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিজম'-এর প্রবক্তা হলেও রেনেসাঁসের শেষের দিকে তা 'ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিজমে' পরিণত হয়। 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' হিসাবে সুখ্যাত এরাজমুস বলেছিলেন,

> "All studies, Philosophy, Rhetoric are followed for this one object, that we may know Christ and honour Him. This is the end of all learning"......[৭০]

লুথারের সঙ্গে এরাজমুসের মতবিরোধের কারণ অন্য কিছু নয়, এরাজমুস চেয়েছিলেন রোমান চার্চের ভিত্তি বজায় রেখে রিফর্মেশন ঘটাতে ; লুথার চেয়েছিলেন রোমান চার্চকে বাদ দিতে। ডগলাস বুশের মতে রেনেসাঁস হচ্ছে, "Mediaval fusion of classical

wisdom with Christian faith".[৭১] ভিনসেন্ট ক্রোনিন তাঁর *'ফ্লাওয়ারিং অব দ্য রেনেসাঁস'* গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন 'রেনেসাঁসে শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানিটির।'[৭২] এ বক্তব্যে আতিশয্য থাকলেও রেনেসাঁসের সংস্কৃতি চার্চ ও ধর্ম-বিযুক্ত একটি সেকুলার-সংস্কৃতি এ-ধারণা অনেকাংশে ভিত্তিহীন।

গ. রেনেসাঁস ও বিজ্ঞান

রেনেসাঁস থেকে শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ; র‍্যাশানালিজম বা যুক্তিবাদ ছিল রেনেসাঁসের বীজমন্ত্র—এরকম একটা ধারণা পোষণ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান জগৎ-চিন্তার চালিকা-শক্তির আসনে বসে সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইতালীয় রেনেসাঁসের কার্যকাল শেষ হবার পর। যুক্তির যুগ ('এজ অব রিজন') আসে তাকেই অনুসরণ করে।

স্টিলম্যান ড্রেক একটি নিবন্ধে বলেছেন, গ্রীক সভ্যতা থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের ইতিহাস ছিল একই ধারার অনুবর্তী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।[৭৩] আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি পর্যবেক্ষণ-নির্ভরতা। গ্যালিলিও থেকে এর সূত্রপাত। হার্বার্ট বাটারফিল্ড তাঁর *'অরিজিনস্ অব মডার্ন সায়েন্স'* গ্রন্থে বলেছেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটে, তা রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনকে তুচ্ছ গল্পে পর্যবসিত করে দেয়।[৭৪]

রেনেসাঁস ছিল মৌল অর্থে 'রিভাইভাল অব লার্নিং'। তার বুদ্ধিজীবীরা বলেছিলেন, 'The Modern world should catch up the ancient.'[৭৫] বিজ্ঞানের ব্যাপারে সেই জ্ঞান-তাপসদের অবদান কতটুকু? এল. এল. স্নাইডার তাঁর *'দ্য মেকিং অব মডার্ন ম্যান'* গ্রন্থে তার উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, 'নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর'—'On Science the humanistic impulse was negligible.'[৭৬] প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানচিন্তা হিউম্যানিস্টদের অতীতমুখী দর্শন পরিত্যাগ করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। ডগলাস বুশ খুব সুন্দর বলেছেন,

> "বিজ্ঞানের প্রবক্তারা বলতেই পারতেন, হিউম্যানিস্টরা ছিলেন বিপরীত পথের যাত্রী, তাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায় স্বরূপ।"[৭৭]

বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট মঁতেন বলেছেন, অন্তর্গত শক্তি ও বোধের চর্চা করে মানুষ সমস্ত কিছুর উপর জয়ী হবে ; বেকন বললেন, মানুষ জয়ী হবে বাইরের প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে—পর্যবেক্ষণ-নির্ভর বিজ্ঞানের হাত করে।[৭৮] প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান হিউম্যানিজমের সন্ততি নয়, শত্রু। 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' আখ্যাত এরাজমুস বিজ্ঞানকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না ('was even hostile to science')।[৭৯] সত্যি বলতে কি, এরাজমুসের বিজ্ঞান-বিরোধিতা বা মঁতেনের অন্তর্দর্শন নয়, গ্যালিলিও ও বেকনের পর্যবেক্ষণের পথ ধরেই পরবর্তী তিনশো বছরের বিজ্ঞানের ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে হিউম্যানিস্টরা চলে গিয়েছিলেন ভুল পথে—এমন কথাও কেউ কেউ লিখেছেন।[৮০]

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে 'র‍্যাশানালিজম' বা যুক্তিবাদের কথা এসে পড়ে। সাইমন্ডস বলেছেন, রেনেসাঁসের বীজমন্ত্রের নাম 'রিজন' নয়, 'রিভিলেশন'।[৮১] হিউম্যানিস্টদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও তর্কময় মানসিকতা দেখা দিয়েছিল ঠিকই, তবে 'র‍্যাশানালিজম'কে তাঁরা কেন্দ্রীয় দর্শনের

মর্যাদা দিতে নারাজ ছিলেন। ঈশ্বরকেই তাঁরা সমস্ত কিছুর উৎস ও পরিণাম বলে মনে করতেন। 'ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট' হিসাবে খ্যাত ভাল্লা বলেছেন,

"We stand by faith, not by the probabilities of reason."[৮২]

জ্যোতিষবিদ্যা সে সময় জ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখার মর্যাদা পেত। নগর-রাষ্ট্রের রাজন্যকদের অধিকাংশেরই গৃহচিকিৎসকের মতো নিজস্ব জ্যোতিষী ছিল।[৮৩] ১৩৬২ সালের পিসার যুদ্ধে ফ্লোরেন্সবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করেছিল প্রভূত অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত জ্যোতিষী-নির্ধারিত দিনক্ষণ অনুসারে। প্রখ্যাত দার্শনিক ফিকিনো ছিলেন জ্যোতিষ-বিশ্বাসী। তাঁর বিচার করে দেওয়া দিনক্ষণ অনুসারে *'ভিলা দ্য ফিলিপ্পো স্ট্রোজি'র* ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৪৮৯ সালের ১৬ আগষ্ট।[৮৪] কুসংস্কার ও অপবিশ্বাস তখন কি পরিমাণে রাজত্ব করত, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় বুর্খহার্ডট-এর রেনেসাঁস সংক্রান্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে।[৮৫] রবার্ট এস. কিন্সম্যান সম্পাদিত *'দি ডার্কার ভিসন অব দ্য রেনেসাঁস'* নামক গ্রন্থেও এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।[৮৬]

বিশ্বাস ও যুক্তির তুলাদণ্ডে চাপালে রেনেসাঁসের আমল যে বিশ্বাস ও অন্ধ-বিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্লেগের মতো ভয়ঙ্কর মহামারীর মধ্যে বসবাস করতে করতে সেকালের মানুষ হয়ে পড়েছিল অযুক্তির দাস।[৮৭] এল. এল. স্নাইডার রেনেসাঁস ও হিউম্যানিজমের অবস্থান বিন্দুটি নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, এটা দাঁড়িয়েছিল, 'between medieval scholasticism and eighteenth century rationalism'.[৮৮] রেনেসাঁসকে কোনো অর্থেই 'এজ অব রিজন' বলা যায় না।

ঘ. রেনেসাঁস ও সামাজিক মানবতাবাদ

রেনেসাঁসের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা হিউম্যানিস্ট অভিধা অর্জন করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যার চর্চা দিয়ে এঁরা বদল করে দিয়েছিলেন রেনেসাঁসের বৌদ্ধিক আবহটি। কিন্তু হিউম্যানিজম বলতে আমরা যে সমাজমুখী মানবতাবাদী দর্শনের কথা ভাবি, রেনেসাঁস হিউম্যানিজম আদপেই সেই জিনিস ছিল না।[৮৯] হিউম্যানিজম বলতে বোঝাতো ক্লাসিক্যাল বিদ্যার চর্চা। এল. ডাবলু. স্পিৎজ-এর ভাষায় হিউম্যানিজম হচ্ছে, 'একটি বিশেষ শিক্ষাদর্শন যা প্রাচীনবিদ্যার প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী।'[৯০] 'স্তুদিয়া হিউম্যানিতিজ' বলতে বোঝাতো—'ব্যাকরণ, ভাষণদানবিদ্যা, কাব্য, ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্র এই পাঁচটি বিষয়ের চর্চা।'[৯১] ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা নীতিশুষ্ক মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য জীবনবাদী প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যার পুনরুদ্ধারের কাজটি করেছিলেন।[৯২] পেত্রার্কা, বোক্কাচিও, সালুতাতি, ব্রুনি, ক্রাইসোলরস, গুয়ারিনো, ভাল্লা, মানেত্তি, ভিত্তোরিনো, ফাইলেলফো, ফিকিনো, আলবের্তি, পোজ্জিও, বেম্বো, পিকো প্রমুখ হিউম্যানিস্টদের কর্ষণে ক্লাসিক্যাল-বিদ্যার চর্চা পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়ে ওঠে।[৯৩] মানুষের আছে এক সৌন্দর্য ও সম্ভোগময় উজ্জ্বল অতীত ও মানুষ অনন্ত সম্ভাবনাময়—এই অভিজ্ঞান ও প্রত্যয়টি হিউম্যানিস্টদের দান। কিন্তু সামাজিকভাবে রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা নীতিনিষ্ঠ, আদর্শবান ও সমাজমুখী

মানবতাবাদের প্রবক্তা—এই ধারণাটি ভিত্তিহীন।

ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা মূলত ছিলেন জনবিচ্ছিন্ন ও শ্রেণীচ্যুত মানুষ। বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে এঁরা সমাজের যে কোনো স্তর থেকে উঠে আসতেন রাজন্যক-বণিক পোপ-জাতীয় পৃষ্ঠপোষকদের সভায়-খাবার টেবিলে বা ভিলায়। এঁরা বিত্তবান বণিক, ক্ষমতাশালী পোপ ও ক্ষমতাশীল রাজন্যকদের উপগ্রহে পরিণত হয়েছিলেন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, পরাশ্রয়ী এই হিউম্যানিস্টরা সমাজের ভালোমন্দ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। প্রাচীন বিদ্যাচর্চার আতিশয্যের দ্বারা এঁরা এমন একটি বৌদ্ধিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিলেন, যার সঙ্গে প্রবহমান জনজীবনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। দান্তের লেখা একজন মেষপালক অনায়াসে বুঝতে পারতেন ; বেম্বোর রচনার কোনো আবেদন সাধারণ মানুষের কাছে ছিল না। সাইমন্ডস তাই লিখেছেন, "Scholarship was left in mournful isolation."[৯৪]

ইতালির অধিকাংশ হিউম্যানিস্ট সম্পর্কেই এই অভিযোগ করা হয়, তাঁরা ছিলেন 'man of letter, not of action'.[৯৫] নীতি এবং আদর্শ ছিল এঁদের কাছে চ্যুত বসনের মতো। 'ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট' হিসাবে খ্যাত ভাল্লা নেপলসের রাজা আলফানসোর আশ্রয়ে থাকাকালে পোপের বিরুদ্ধে এদের পর এক বিষোদগার করেছিলেন। কিন্তু সহিষ্ণু পোপ নিকোলাস-৫ম যেই তাঁকে সেক্রেটারির চাকরি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম শিকেয় উঠল। আরেতিনো চরিত্রহননে এমনই ওস্তাদ ছিলেন যে রাজন্যকরা ভয়ে তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন।[৯৬] 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক' পেত্রার্কা লেখায় মুক্তির জয়গান করলেও অর্থ ও যশের লোভে সন্ত্রাসবাদীর দাসত্ব স্বীকার করতে পিছপা হননি।[৯৭] কাস্তিলিওনের 'জেন্টলম্যান'-কালচারও প্রচ্ছন্নভাবে স্বৈরতন্ত্রেরই সমর্থক। *'কোর্টিয়ার'* গ্রন্থের একটি চরিত্র অত্তাভিয়ানো প্রসঙ্গত বলছে,

> "আমি জানি, আমার যা মনে হয় খোলা মনে যদি তা বলি, তা হলে রাজন্যকের প্রসাদ বা পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তৎক্ষণাৎ আমি বঞ্চিত হবো (৪.২৬)—একথা শুনে সকলেই হেসে ওঠে।"[৯৮]

সংগ্রাম বা সংঘাত তো দূরের কথা ভোগবাদী জীবনের দাসত্ব স্বীকার করে এঁরা বিবেক বা নীতি-দুর্নীতিরও ধার ধারতেন না। রাফায়েল একের পর এক সুন্দরীদের গ্রহণ করেছেন তার চিত্রের মডেল হিসাবে, কিন্তু কাউকেই পত্নীর সম্মান দান করেননি।[৯৯] পোজ্জিও প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে ভাজ্জিয়া দ্য বন্দেলমেন্তি নামে এক অষ্টাদশী তরুণীকে বিয়ে করে সুখে জীবন-যাপন করতে থাকেন, কিন্তু বিস্মৃত হয়ে যান তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের মিসট্রেসের কথা, যিনি তাঁর সঙ্গে যৌথ জীবন-যাপনের সূত্রে ১২টি পুত্রসন্তান ও ২টি কন্যার জননী হয়েছিলেন।[১০০] স্বার্থ ও মর্যাদা দখলের লড়াইতে প্রায়ই এক হিউম্যানিস্ট অন্য হিউম্যানিস্টের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও চরিত্র হননে লিপ্ত হতেন। ফাইলেলফো পোজ্জিওর বিরুদ্ধে শতাধিক ছত্রে কুৎসামূলক ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখলে পোজ্জিও তাকে বোকা পাঁঠা সম্বোধন করে লেখেন—

> "Thou stinking he-goat ! Thou horned master ! Thou father of lies and author of discord !".......[১০১]

এরিস্তো তাঁর পুত্রদের হিউম্যানিস্টদের কাছে পড়াতে চাননি, তাদের সংসর্গে পুত্ররা খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়ে।[১০২] এর থেকে অনুমান করা যায়, হিউম্যানিস্টদের কতদূর অধঃপতন হয়েছিল শেষদিকে।

পেত্রার্কা তাঁর 'ফেমিলিয়ারিজ'-এ (৮, ১, ১৮) লিখেছিলেন রেনেসাঁসের ব্যক্তিমুখীনতার কেন্দ্রীয় দর্শন—"If you have yourself, that is enough."[১০৩] আলবের্তি যদিও লিখেছিলেন, 'মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যত বেশি সম্ভব মানুষের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠা'[১০৪] ; সে আদর্শ ফলবান রূপ গ্রহণ করেছিল রেনেসাঁসোত্তর 'বুর্জোয়া লিবারলিজম'-এর জয়যাত্রার কালে।[১০৫] রেনেসাঁসের আমলে হিউম্যানিস্টরা তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সমাজমনস্কতার পরিচয় দেননি। হুইজিঙ্গার এই অভিযোগই তাই মেনে নিতে হয়, সে সময়, 'the sense of social responsibility was largely lacking'.[১০৬]

ঙ. রেনেসাঁস ও সাধারণ মানুষ

সমাজ প্রগতির ইতিহাসে রেনেসাঁস বিভিন্ন দিক থেকে আধুনিকতার সূচনাকারী হলেও নীচুতলার শ্রমজীবী মানুষ ও গ্রামীণ কৃষকদের জীবন এই রেনেসাঁসের দ্বারা রঞ্জিত (coloured) ও পরিবর্তিত হয়েছিল এমন কথার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।[১০৭]

রেনেসাঁসের সংস্কৃতি ছিল উপরতলার সংস্কৃতি। রাজন্যক-ধনিক-বণিক-পোপ-কার্ডিনালদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীদের প্রতিভাক্ষেপে যে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রায় কোনো সম্পর্ক ছিল না। একজন মন্তব্য করেছেন,

> "সাধারণ মানুষ রেনেসাঁসের উজ্জ্বল ও চলমান চরিত্রগুলির অন্ধকার পশ্চাৎপটের অংশ মাত্র ছিল।"[১০৮]

রেনেসাঁসের অর্থনৈতিক ভিত্তি বা পরিস্থিতি নিয়ে বহু শ্রমসাধ্য গবেষণা হয়েছে। তাতে সেকালের শ্রমিক ও কৃষকের আর্থিক উন্নতির কোনো ছবি পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ফার্গুসন তাঁর *'রেনেসাঁস ইকনোমিক হিস্ট্রিওগ্রাফি'*তে পরিষ্কার বলেছেন, 'এসময় ধনী আরো ধনবান ও দরিদ্র দরিদ্রতর হয়েছিল।'[১০৯] জেনে. এ. ব্রুকার সে-সময়কার গিল্ড-রেকর্ড, জুডিসিয়াল রেকর্ড ও কর-আদায় সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, অসংগঠিত ও দরিদ্র মজুরদের অবস্থা ছিল, 'শ্রমিক আইন পাস হবার আগে উনিশ শতকের লাঙ্কাশায়ার সূতাকলের শ্রমিকদের মতোই করুণ।'[১১০] ফ্লোরেন্স নগরীর সমাজবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনায় ব্রুকার দেখিয়েছেন, সেখানে চারটি স্তরের মানুষ ছিলেন। ১. অভিজাত, ২. নবোদ্ভূত ধনিক-বণিক (জেন্টু নুভা), ৩. পাতি-বুর্জোয়া (গিল্ডের সভ্য, হস্তশিল্পী, দোকানদার, শিক্ষক প্রভৃতি), ৪. অসংগঠিত ও দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ। চতুর্থ স্তরের মানুষরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। রেনেসাঁসের জৌলুসময় বৃত্তের বাইরে ছিল তাদের অবস্থান। খোদ ফ্লোরেন্সে এস. স্পিরিতো ও এস. ক্রোচে নামক দু'টি বস্তি এলাকার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে অসংগঠিত ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষরা দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বসবাস করার জন্য নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

জে. আর হেল সম্পাদিত *'এ কনসাইজ এনসাইক্লোপেডিয়া অব দ্য ইটালিয়ান রেনেসাঁস'* নামক গ্রন্থে একটি সূত্রাত্মক মন্তব্য আছে—'No city, no Renaissance.'[১১১] রেনেসাঁস নগরকেন্দ্রিক একটি সংস্কৃতির নাম। অর্থাৎ গ্রাম নামক একটি বিশাল ভূখণ্ড ইতালিতেও পড়েছিল রেনেসাঁসের বাইরে। কত মানুষ থাকতেন গ্রামে? জেরোম ব্লাম তাঁর *'দি পেজেন্ট্রি ফ্রম দি থারটিন্থ সেঞ্চুরি'* নামক গবেষণাকর্মে দেখিয়েছেন ১৮০০ সালেও ইওরোপীয় দেশগুলির মোট জনসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ছিলেন কৃষিনির্ভর।[১১২] রেনেসাঁসের আমলে ইতালির অবস্থা ঈষৎ অন্যরকম ছিল। শতকরা তেরো ভাগ মানুষ তখন ছিলেন শহরবাসী। বাকি সাতাশি ভাগ মানুষ থাকতেন গ্রামে। মুখ্যত তাঁরা ছিলেন কৃষিজীবী।[১১৩] কেমন ছিলেন তাঁরা সে-সময়? এল. এল. স্নাইডার সে-সম্পর্কে লিখেছেন,

> "Badly clothed, wretchedly fed, ill housed he lived in ignorance, squalor and misery."[১১৪]

ই. আর. চেম্বারলিন তাঁর *'এভরিডে লাইফ ইন রেনেসাঁস'* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন,

> "যে জমি তাঁরা চাষ করতেন তাতে তাঁদের কোনো স্বত্ব ছিল না। জমির মালিকানা নানা ভাগে-উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু করের বোঝা তাঁদেরই বইতে হতো।"[১১৫]

গ্রামের জীবনে নতুন মালিকশ্রেণীর আবির্ভাব ও নতুন ব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন কৃষকরাই। চেম্বারলিন বলেছেন, ইওরোপে তখন নতুন এক ভূমিহীন, ভবঘুরে-শ্রেণীর ক্ষেতমজুরের উদ্ভব ঘটে ('the landless workers vagabond')। ভোর পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তারা পেটভরা রুটির সংস্থান করতে পারতো না। অর্থবান, বণিক, জমিদাররা যখন অপর্যাপ্ত দামি-দামি খাবার খেতো তখন কৃষকদের দিন কাটতো অর্ধাহারে-অনাহারে।[১১৬] চেম্বারলিন তাই লিখেছেন,

> "মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনাবর্ষগুলি নীচুতলার বিশাল সংখ্যক মানুষের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের দ্বারাও চিহ্নিত হতে পারতো।"[১১৭]

জ্ঞানের রাজ্যে রেনেসাঁস বিপ্লব এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার বাইরেই থেকে গিয়েছিল। পল. এফ. গ্রেন্ডলার রেনেসাঁসের শিক্ষাজগৎ সম্পর্কে যে গবেষণাকর্ম আমাদের উপহার দিয়েছেন,[১১৮] তাতে দেখা যাচ্ছে যাঁদের বেতন দেবার সামর্থ্য ছিল, লেখাপড়ার অধিকার ছিল শুধু তাঁদের সন্তানদেরই। রেনেসাঁসের শিক্ষাচিত্রটির সারমর্ম গ্রেন্ডলারের ভাষায় এইরকম—

> "However free public education in the modern meaning of the term did not exist in the Renaissance Europe."[১১৯]

'লাতিন কারিকুলাম'-যুক্ত স্কুলে ধনী ও সম্পন্ন পরিবারের সন্তানরা গ্রীক-লাতিন প্রভৃতি উচ্চমানের শিক্ষা গ্রহণ করতেন, অপরদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে অশিক্ষার অন্ধকার বেশ পরিব্যাপ্ত আকারেই ছিল। চেম্বারলিন সেজন্য মন্তব্য করেছেন,

> "The intellectual spirit of the Renaissance was itself a tragic cause of degradation of the ordinary workman."[১২০]

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা নানা বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত সব প্রস্তাব লিখেছিলেন ; কিন্তু তাঁদের রচিত প্রস্তাবের জঙ্গল হাতড়েও তৎকালীন সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী, কৃষক-সাধারণের সমস্যা বা মুস্কিল আসান বিষয়ক কোনো রচনা পাওয়া যায় না। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্গতি নিয়ে চিন্তার কোনো বলিরেখা তাঁদের কপালে ছিল না। জনসাধারণ সম্পর্কে প্রথিতযশা রাষ্ট্রনীতিবেত্তা ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল, তা টের পাওয়া যায় মেকিয়াভেলির *'দি প্রিন্স'* বা গুইচারদিনির *'রিকর্ডি'* পড়লে। মেকিয়াভেলি লিখেছেন, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ককে শুরু করতে হবে এই ধারণা নিয়ে যে, 'সব মানুষই খারাপ'।[১২১] আধুনিক হিস্ট্রিওগ্রাফির জনক হিসাবে কথিত গুইচারদিনি লিখেছেন,

> "জনগণ সম্পর্কে বলতে গেলে, সত্যি বলতে কি উন্মত্ত, বিভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ; রুচিহীন, উপলব্ধিহীন, স্থিরতাহীন একটি জান্তব অস্তিত্বের কথা বলতে হয়।"[১২২]

শিল্পগত নান্দনিক উৎকর্ষের জন্য রেনেসাঁস বিশ্বখ্যাত। তার চিত্রকলায় অনেক নগ্ন ভেনাস, উজ্জ্বল ম্যাডোনা, বিষণ্ণ মেরী, পবিত্র ভার্জিন, নৃত্যরতা মিউজ আছে ; অনেক রাজপুরুষ, বণিক ও ফার-পরিহিতা বরবর্ণিনীর প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু দুঃস্থ, রুগ্ন, পরাজিত, শোষিত সেকালের গরিষ্ঠসংখ্যক সাধারণ মানুষের ছবি কোথায়? মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর অসমাপ্ত কাজ পিছমোড়া করে বাঁধা *'বন্ডেড লেবার'*, টিশিয়ানের *'ট্রান্সফিগারেশন'*-এর সামনে সমবেত জনতার বিস্ফারিত চক্ষু, *'ম্যাসাকার অব দ্য ইনোসেন্ট'* ছবিতে গণশিশু-হত্যার মধ্যে মায়েদের আর্তমুখ, পোলায়ুয়ালোর এনগ্রেভিং-এ যুদ্ধরত নগ্ন মানুষের হিংস্রতা, তিনতরেত্তোর *'পুল অব বেথেসদা'* ছবিতে মুক্তিস্নানের জন্য অপেক্ষারত বিকৃতদেহী বিশাল জনতার অধৈর্য্য রেনেসাঁসের পশ্চাৎপটের একটা আবছা কিন্তু যন্ত্রণাময় ছবি আমাদের সামনে এনে দেয়।

মেদিচি পরিবারের এক সন্তান লিও-১০ম পোপের চেয়ারে আসীন হলে ফ্লোরেন্সে তাঁকে এক রাজকীয় সংবর্ধনা দেবার আয়োজন হল। দেশে সুবর্ণযুগ আসছে এটা বোঝানোর জন্য একটি অনাথ ছেলেকে আপাদমস্তক সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পনার অভিনবত্বে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। ঘটনাটিকে গ্রহণ করা যায় রেনেসাঁস ও সাধারণ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীক হিসাবে।[১২৩]

এই প্রসঙ্গে রেনেসাঁসের মহিলাদের কথা বলা আবশ্যক। বুর্খহার্ডট যদিও লিখেছেন, "রেনেসাঁস-মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষ মর্যাদা পেয়েছিল,"[১২৪] তথাপি তথ্যনিষ্ঠ গবেষণাগুলি আমাদের জানাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বার মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। রেনেসাঁস আমলে কোনো মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট পেরোয়নি। মেয়েরা যেটুকু লেখাপড়া শিখতো তা 'ট্রাডিশনাল'।[১২৫] তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ঘরসংসার করা বা নান হওয়া। ইতালির প্রথম মহিলা ইলিয়া করনারো পিসকোপিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান ১৬৭৮ সালে।[১২৬] নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের বিয়ে সত্যি একটা সমস্যা ছিল। ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মন্তে দেল্লা দোতি' নামে একটি পণভাণ্ডার (dowry fund) গঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এস. বার্ণাদিনো নামে এক সিয়েনাবাসী আওয়াজ তুলেছিলেন, স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে মেয়েদের স্বাধীনতা বা মতামত স্বীকার করতে হবে। এর থেকে আন্দাজ

করা যায়, বিয়েটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। এল. মার্টিন[১২৭] বা সি. ফাই[১২৮]-এর রচনা থেকে জানা যায়, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালিতে মেয়েদের নিয়ে অন্তত চল্লিশটি প্রস্তাব লেখা হয়েছিল—সবই পুরুষদের লেখা। কোনো মহিলার লেখা এই ধরনের বিতর্কমূলক রচনার কাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ।[১২৯] ফ্লোরেন্সে শতকরা ১২ ভাগ মহিলা ছিলেন নান ; শতকরা ১৫ ভাগ পরিবারে একজন করে বিধবা থাকতেন, প্রতি ৩০০ জন পিছু একজন করে গণিকা।[১৩০] ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মনগরী রেমে রেজিষ্টার্ড গণিকা ছিলেন ৬,৮০০। তখন রোমের জনসংখ্যা ৯০,০০০।[১৩১] মিসট্রেস ও অভিজাত রূপোপজীবিনীদের গল্প জড়িয়ে আছে ধনিক-বণিক-শিল্পী-হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে। পুরুষপ্রধান সমাজে শুধু নৈতিক দুর্বলতা নয়, নারীর পণ্যময়তার ছবিটিও এতে স্ফুটতর। দান্তে বিয়াত্রিচের প্রেমে নবজীবন লাভ করে লিখে ফেলেন একটি পুরোদস্তুর কাব্য। কিন্তু উপেক্ষিত থেকে যান তাঁর নিজের স্ত্রী জেম্মো দোনাতি।[১৩২] ইতালীয় রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজন্যক লরেঞ্জোর বিদ্যা ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতা ছিল অবিসংবাদিত, কিন্তু তার স্ত্রী ম্যাডোনা ক্লারিসা সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'her literary merit was nil.'[১৩৩] রেনেসাঁসের মহিলাদের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে এক গবেষক তাই প্রশ্ন তুলেছেন—'Did woman have any Renaissance ?'[১৩৪] রেনেসাঁসের আনন্দযজ্ঞে ডাক পড়েনি, এমন মহিলার সংখ্যা রেনেসাঁস আমলে ছিল বহুগুণ বেশি, তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে রেনেসাঁসের আমলে ইতালির পৃথিবীও ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। রাজন্যক-ধনিক-বণিক-হিউম্যানিস্ট-শিল্পীরা যে সাংস্কৃতিক মানচিত্রের বাসিন্দা ছিলেন, দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক সাধারণ মানুষ এবং সাধারণভাবে মহিলারা সেই মানচিত্রের বাসিন্দা ছিলেন না।

চ. রেনেসাঁস, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

রেনেসাঁসের দেশ ও তার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে আরো কিছু ইউটোপীয় ধারণা পোষণ করা হয়, যা প্রকৃত বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী। মনে করা হয়, রেনেসাঁসের আমলে ইতালিতে যে 'ইন্টেলেকচুয়াল জায়েন্ট'দের আবির্ভাব হয়েছিল, তার কারণ সে-দেশ ছিল রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন এবং পরিবেশ ছিল গণতান্ত্রিক। উনিশ শতকের বাংলার মতো ইতালি পরাধীনতাগ্রস্ত না হলেও, স্বাধীন দেশ হিসাবে তার অবস্থা খুব সুবিধাজনক ছিল না। উইল ডুরান্ট বলেছেন,

> "ইতালি খুব সমৃদ্ধ সুন্দর, কিন্তু দুর্বল একটি উপদ্বীপ মাত্র";[১৩৫]
> ......"লুজ বান্ডিল অব পেটি স্টেটস্।"[১৩৬]

এবং তা ছিল বিদেশের কাছে আধা-পদানত। দক্ষিণ ইতালি হয়েছিল স্পেনের অধীন, আর উত্তর ইতালি ফ্রান্সের।[১৩৭] মেকিয়াভেলি ইতালির রাজনৈতিক অবস্থা চিত্রিত করতে গিয়ে বলেছেন,

> "ইতালির অবস্থা হিব্রু-ভাষীদের থেকে দাসত্বপূর্ণ, পারস্যের চেয়ে অত্যাচারিত, এথেনীয়দের তুলনায় ছন্নছাড়া ও বিশৃঙ্খল।"[১৩৮]

ডুরান্ট লিখেছেন,

"ইতালি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐক্যের জন্য একজন বিজেতার অপেক্ষায় ছিল।"[১৩৯]

রেনেসাঁসের ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ ইতিহাস সত্ত্বেও ইতালি ক্রমশ পরাধীনতার দিকেই এগিয়ে গিয়েছিল। ইতালির ঐক্যও শেষ পর্যন্ত বিদেশীর পায়ের তলাতেই সম্পন্ন হয়।[১৪০] গুইচারদিনি মৃত্যুর আগে তিনটি জিনিস দেখে যেতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—'বর্বর আক্রমণকারীদের হাত থেকে ইতালির মুক্তি'।[১৪১] বলা বাহুল্য, তাঁর সে-প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে রোম যেভাবে বৈদেশিক আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তাতে মনে হয় না রাজনৈতিকভাবে স্বাদেশিকতা বা স্বাধীনতার ন্যূনতম চর্চা সেখানে বিদ্যমান ছিল। রেনেসাঁসের শেষ দিকে লেখা মেকিয়াভেলির *'প্রিন্স'* বা *'হিস্ট্রি অব ফ্লোরেন্স'* গ্রন্থে আছে, স্বাধীনতা বা স্বাদেশিকতার অ-চর্চার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও জাতি-সংগঠনের একটি স্বৈরতান্ত্রিক প্রকল্পনা। স্বদেশ ও স্বধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রথম উঁচু করে তুলে ধরেন রিফরমেশনের প্রবক্তারা।[১৪২] রেনেসাঁসের সংস্কৃতি সেই অর্থে স্বাদেশিক ছিল না।

সাইমন্ডসের ভাষায় ইতালি ছিল 'এজ অব ডিসপট'। [১৪৩] এক-একটি নগর-রাষ্ট্রে চালু ছিল পরিবারভিত্তিক শাসন। এ. ভেন্তুরা লিখেছেন,

"রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার পেতেন তিনি, যিনি রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা এবং যাঁর পূর্বপুরুষ কখনো মেকানিকাল আর্ট বা কায়িক পরিশ্রম করেননি।"[১৪৪]

খোদ ফ্লোরেন্সে ৬০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ভোটাধিকার ছিল মাত্র ৩,২০০ জন পুরুষ নাগরিকের।[১৪৫] স্নাইডার তাই লিখেছেন,

"The peasants whether free, half free or half serf, had no voice in their governments."[১৪৬]

সিটি-স্টেটগুলির রাজন্যকদের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব কি-পর্যায়ের ছিল তা বোঝা যাবে বেরনাভো ভিসকন্তি নামক এক রাজন্যকের উক্তিতে—

"আমার রাজ্যে আমিই পোপ, সম্রাট এবং ঈশ্বর। আমার অনুমতি ছাড়া এখানে কারোর কিছু করার নেই, এমনকি ঈশ্বরেরও নয়।"[১৪৭]

মেকিয়াভিলির 'প্রিন্স'-এ যে আদর্শ রাষ্ট্রনায়কের স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে, তা চরিত্রগতভাবে ফ্যাসিস্ট। গুইচারদিনি স্বপ্ন দেখতেন, একদিন দেশে 'Well ordered republic' প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৪৮] তাঁর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল।

ছ. রেনেসাঁসের বিষাদাত্মক পরিণাম

মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছেদ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের রেনেসাঁস ইতালিকে স্বাধীন, স্বয়ম্ভর, সর্বোজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের নায়ক করে দিয়েছিল, একথা সত্যি নয়। রেনেসাঁসের কার্যকাল শেষ হবার আগেই ইওরোপে মাথা তোলে এক 'জার্মান হারকিউলিস'।[১৪৯] তাঁর নাম মার্টিন লুথার। রেনেসাঁস মানুষকে যে সম্ভোগময় নান্দনিক জীবনের দীক্ষা দিয়েছিল, রিফরমেশন তার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনতে চায় নীতিশুদ্ধ

পবিত্রতার পথে। পেত্রার্কায় যে হিউম্যানিজম ছিল 'ক্লাসিক্যাল', এরাজমুসে এসে তা 'ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিজমে' পরিণত হয়েছে।[১৫০] পেত্রার্কায় জীবন সম্পর্কে যে আলোকিত আশার দীপ্তি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এরাজমুসে তা এসে বিষণ্ণতায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে, খ্রীষ্ট জন্মের পর থেকে তাঁর সময়টাই খারাপতম।[১৫১] বিদেশীদের আক্রমণে রোম বিধ্বস্ত, উত্তর ইতালি ফ্রান্সের অধীন ও দক্ষিণ ইতালি স্পেনের। সালুতাতি ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর থাকাকালে 'লিবার্টি' শব্দটিকে জাতীয় পতাকায় পরিণত করে দিয়েছিলেন।[১৫২] বারো টন ওজনের বিশাল ঘণ্টাধ্বনি একদিন রোমের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত শোনা যেত। আক্রমণকারী স্পেনীয়রা সে ঘণ্টা নামিয়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে। আর্তকণ্ঠে তখন কে যেন লেখেন,

"আমরা মুক্তির মধুর ঘণ্টাধ্বনি আর কখনও শুনতে পাবো না।"[১৫৩]

পোপ ক্লিমেন্ট-৭ম বহিরাক্রমণে বিধ্বস্ত রোমে (১৫২৭) ফিরে এসে আর খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁর হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীদের। ধ্বংসের স্রোত কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাঁদের।[১৫৪] শিল্পে-সংস্কৃতিতে এসে গেছে 'ম্যানারিজম'। ভাস্কর্যের নামে পাথরের প্রাণহীন পুতুল বানাচ্ছেন ভাস্কররা। রাফায়েল, অ্যাঞ্জেলো, ভিঞ্চির কাল শেষ। তাঁর অনুবর্তীরা তখন মৃত সিংহের চামড়া গায়ে পরে ভাবছেন, তাঁরাও গর্জন করতে পারেন।[১৫৫] বাণিজ্য-দুনিয়ার মধ্য-মর্যাদা থেকে ইতালি ততদিনে বিচ্যুত। ইতালীয় রেনেসাঁসের শেষ দৃশ্যটি ঐতিহাসিকের কলমে এই রকম—

"......each section has to end in lamentation, servitude in the sphere of politics, literary feebleness in scholarship, decadence in Art."[১৫৬]

রেনেসাঁসে কি হয়েছিল

রেনেসাঁস সম্পর্কে সর্বোদয় জাতীয় একটি ইউটোপীয় ধারণা বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিচারের ক্ষেত্রে এমনভাবে রাজত্ব করছে যে তা বলার কথা নয়। সেজন্যে রেনেসাঁস সম্পর্কে সঠিক ধারণার আলোচনা আমাদের শুরু করতে হলো বিরোধের কণ্ঠে। এবারে আমরা প্রবেশ করব রেনেসাঁসে কি হয়েছিল—সেই ইতিবাচক আলোচনায়।

মানব-সভ্যতা যখন চার্চ-শাসিত সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ থেকে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের দিকে পাশ ফিরছিল, সেই ক্রান্তিকালীন সময়ে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালিতে যে অবিস্মরণীয় সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ ঘটে, এককথায় তাকেই বলে রেনেসাঁস। পরিবর্তিত সমাজ-পরিস্থিতিতে ইতালির সাংস্কৃতিক আবহ বদলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মূলত দু'টি শ্রেণীর মানুষ—হিউম্যানিস্ট ও আর্টিস্ট। হিউম্যানিস্টরা যা করেছিলেন তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি বিনিয়োগ করে, তাঁদের বাক্-যন্ত্র ও লেখনী দিয়ে ; আর্টিস্টরা তা করেছিলেন তাদের ছেনি-হাতুড়ি, রঙ-তুলি দিয়ে। একদল গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধিক পৃথিবীর দায়, অন্যদল নান্দনিক ভুবনের। ইতালিতে শুরু হয়েছিল 'Intellectually supported money economy'-র যুগ।[১৫৭] ইতালির নবোদ্ভূত ধনিক-বণিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা মধ্যযুগের

নীতি-শুষ্ক, অনুতাপময়, নেতিবাচক জীবনবোধের পরিবর্তে সম্ভোগ ও সৌন্দর্যময় জীবনবাদী মেধাবী একটি সাংস্কৃতিক আবহ রচনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

রেনেসাঁস-হিউম্যানিজম

রেনেসাঁসে 'হিউম্যানিজম' বলতে বোঝাত প্রাচীন বিদ্যার চর্চা। পেত্রার্কা ইতালির মুখ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন প্রাচীন রোমান-বিদ্যার দিকে। তিনি লিখেছেন, 'আমি যদি লিভির যুগে জন্ম নিতাম কি ভালোই না হতো!'[১৫৮] তিনি হতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ের সিসেরো। বলা হয়েছে, 'পেত্রার্কা যদি রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক হন, তাহলে সিসেরো হচ্ছেন তার পিতামহ।'[১৫৯] '*ফেমিলিয়ারিজ*-এ পেত্রার্কা ব্যক্ত করেছেন তাঁর অতীত-তৃষ্ণার কথা,

> "আমি ভার্জিল, ফ্লাক্কাস, সেভারিনাস, তুল্লিয়াস প্রমুখ প্রাচীন লাতিন লেখকদের লেখা একবার নয়, অসংখ্যবার পড়েছি।.......সকালে সেগুলি গোগ্রাসে গিলতাম, সন্ধ্যায় হজম করতাম। বালকের মতো গ্রহণ করতাম, বয়স্ক মানুষের মতো আত্মস্থ করতাম। তাঁদের রচনাগুলি শুধু স্মৃতিতে নয়, মজ্জায় চলে যেত।"[১৬০]

চলমান মধ্যযুগকে পেত্রার্কা অন্ধকারযুগ আখ্যা দিয়ে আলোকিত প্রাচীন সংস্কৃতির দ্বারস্থ হতে বলেন। পেত্রার্কাকে তাই 'ক্লাসিক্যাল হিউম্যানিজম'-এর প্রবক্তা বলা হয়। বোক্কাচিও আসেন গ্রীকবিদ্যার প্রতি আগ্নেয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহাভিযানে তিনি নেমে পড়েন অদম্য আগ্রহ নিয়ে। জি. ই. সান্ডিজ তাঁর *'হিস্ট্রি অব ক্লাসিক্যাল স্কলারশীপ*-২য় খণ্ড' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন সেই বিবরণ। এক মঠের পুঁথিশালায় ঢুকে বোক্কাচিও দেখলেন, চাবি-তালা তো দূরের কথা দরজাও দেওয়া নেই। জানালায় ঘাস উঁকি-ঝুঁকি মারছে। বই যা আছে, পুরু ধূলোর তলায় ঢাকা। তিনি উল্টোতে লাগলেন প্রাচীন ও গ্রীকভাষায় রচিত পুঁথিগুলি। তাদের অনেকগুলির পাতা নেই। অধিকাংশই বিনষ্ট-প্রায়। কী দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে মহামূল্যবান বইগুলি! তাঁর দু'চোখ ভরে জল এল।[১৬১] নষ্ট-প্রায় পুঁথিগুলি থেকে তিনি উদ্ধার করলেন ওভিদ ও তাসিতাসের কিছু রচনা। কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে ক্রাইসোলরস এলেন ইতালিতে। গ্রীক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন সালুতাতির আমন্ত্রণে। তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেলেন ভাল্লা, রোবার্তো, পোঞ্জিও, ফাইলেলফো, ব্রুনি প্রমুখ পরবর্তীকালের বিখ্যাত হিউম্যানিস্টরা। গুয়ারিনো ফেরারায় গ্রীক-বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। তাঁর সম্পর্কে এক প্রশস্তিমূলক কাব্যে লেখা হয়েছে, 'তিনি যেন এক হারকিউলিস, his weapon is not the sword or the cross but the pen.'[১৬২] ভিত্তোরিনো দ্য ফেলতর নামে এক শিক্ষকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে-বিদেশে। *'লা কাসা জিওকোসা'* নামে তাঁর স্কুলে পড়তে আসত বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের রাজন্যক ও শাসকদের পুত্র-কন্যারা।[১৬৩] লিওনার্দো ব্রুনি, পোজ্জিও, ভাল্লা এঁরা ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর বা পোপের সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত হন। ফ্লোরেন্সে গড়ে ওঠে '*প্লেটোনিক একাডেমি*'। ফিকিনো সেখানে প্লেটোর দর্শন পড়াতেন। পম্পোনাজ্জিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এরিস্টটল-চর্চার কেন্দ্র। মুদ্রণ-ব্যবসায়ী অলডো ম্যানুটিয়াসের বাড়ি প্রায় গ্রীক কলোনিতে পরিণত হয়।[১৬৪]

গ্রীক-পণ্ডিতদের দ্বারা কৃত হোমার, এরিস্টটল, সোফোক্লিস, হেরোদোতাস, পিন্ডার, হিপোক্রিটস প্রমুখদের রচনা মুদ্রিত আকারে তিনি ইতালিবাসীদের হাতে তুলে দেন। ফাইলেলফো বললেন,

"গ্রীসের মৃত্যু হয়নি, ফ্লোরেন্সে তা আবার নতুন করে জেগে উঠছে।"[১৬৫]

লাতিন-চর্চার অনুপাতও সেখানে কম ছিল না। লরেঞ্জো ভাল্লা লাতিন ভাষার সপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রচনা করেন। তিনি বললেন,

"আমি নিশ্চিত যে রোমান ভাষা বিকাশ লাভ করবে, গোটা শহর জুড়ে, তার সমস্ত সম্পদ সহ।"[১৬৬]

লাতিন শুধু ইতালি নয়, গোটা ইওরোপের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হয়ে ওঠে। ইতালিতে গড়ে ওঠে দু'রকম স্কুল—'ভার্ণাকুলার কারিকুলাম' ও 'লাতিন কারিকুলাম'। হিউম্যানিস্টরা একের পর এক গ্রীক পুঁথিগুলির লাতিন সংস্করণ প্রকাশ করেন। বলা হয়েছে রেনেসাঁসের সাহিত্য 'four fifths of it Latinistic.'[১৬৭]

গ্রীক ও লাতিন বিভিন্ন পুঁথির উদ্ধার, সঠিক সম্পাদনা, অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলে গোটা রেনেসাঁস জুড়ে। সেই কারণে, রেনেসাঁসকে বলা হয়েছে 'রিভাইভ্যাল অব লার্নিং'।[১৬৮] শুধু গ্রীক-লাতিন নয়, আরব্য ও হিব্রু-বিদ্যার দিকেও তাঁদের সর্বগ্রাসী-জ্ঞান-পিপাসা ধাবিত হয়েছিল। বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট পিকো দেল্লা মিরানদোল্লো তাঁর সমন্বয়বাদী মানবদর্শনের রসদ অনেকটাই সংগ্রহ করেছিলেন এক ইহুদির কাছে সংগৃহীত '*কাবালা*' গ্রন্থ থেকে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে ইতালির হিউম্যানিস্টরা ছিলেন ভাষাবিৎ, প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধারক। কিন্তু যে-পরিস্থিতিতে ও যে-উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রাচীন বিদ্যার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন, তার তাৎপর্যটি ভুলে গেলে চলবে না। ওয়াল্টার উলমান বলেছেন,

"হিউম্যানিস্টরা প্রাচীন বিদ্যার প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন এই জন্য নয় যে এটা প্রাচীন, তাঁরা গ্রীক ও লাতিন বিদ্যার দিকে বিশেষভাবে প্রধাবিত হয়েছিলেন কারণ এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্ট-ধর্ম ও তার ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত একটা বিদ্যা।"[১৬৯]

পরিবর্তিত সমাজ-পরিস্থিতিতে প্রবহমান মধ্যযুগীয় চার্চ-তান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা ছিল তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এমন এক সংস্কৃতি ও বিদ্যার চর্চা করা, যা জীবনবাদী। প্রাচীন বিদ্যার শস্ত্রশালায় তাঁরা প্রবেশ করেছিলেন আধুনিক যুগের প্রয়োজনে। অন্যতর জীবনবাদী সংস্কৃতিকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন স্বদেশ ও সমকালকে সমৃদ্ধ করার জন্য।

ইউজিন গ্যারিন হিউম্যানিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁরা শুধু ব্যাকরণবিদ ছিলেন না ; তাঁরা ছিলেন 'নিউ টাইপ অব ম্যান'।[১৭০] এই নতুন ধরনের মানুষরা রাজন্যকদের সভায়, পোপের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায়, ধনিক-বণিকদের ভিলায়, রিপাবলিকের চ্যান্সেলারিতে, বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায়, বিভিন্ন একাডেমিতে প্রবেশ করে ইতালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহটি বদলে দেন। এমনভাবে বদলে দেন, যাতে ইতালি হয়ে ওঠে আধুনিক সভ্যতার সূচনা-ভূমি। মার্টিন ভন বলেন,

> "Humanists stood to the bourgeois society as the monk did to the mediaeval hierarchy."[১৭১]

ক্রিস্টলার তাঁদের সম্পর্কে সদর্থক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, হিউম্যানিস্টরা বিশ্বাস করতেন,

> "ক্লাসিক্যাল-বিদ্যার পঠন-পাঠনজনিত জ্ঞান মানুষকে মুক্ত ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তোলে।"[১৭২]

হিউম্যানিজমের শিক্ষাদর্শন মানুষকে এই প্রত্যয় দিয়েছিল যে,

> "মানুষ ইচ্ছামতো নিজেকে রচনা করতে পারে।"

পিকোর *'অরেশন অন ডিগনিটি অব ম্যান'*-এ এই প্রত্যয় ব্যক্ত।[১৭৩] হিউম্যানিস্টরা প্রাচীন বিদ্যাকে 'রিপ্রোডিউস' করতে চেয়েছিলেন তা নয়, তাঁরা চেয়েছিলেন 'রি-ক্রিয়েট' করতে। মধ্যযুগের চিন্তাবিদ্‌রা মনে করতেন, প্রাচীনকালের কয়েকজন দার্শনিক বা সন্ত সত্যকে নিঃশেষে ব্যক্ত করেছেন, সকলের কাজ তাঁদের মেনে চলা। হিউম্যানিস্টরা প্রশ্ন তুলতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। পরিপ্রেক্ষিত বদল হলে পুরাতন বক্তব্যের ব্যাখ্যাও বদল হবে। এবং এই ইতিহাস-চেতনা তাঁরা নির্মাণ করলেন, 'মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা'।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র তাঁদের বিচারাধীন হয়েছিল। চারপাশের পৃথিবীকে তাঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের রচিত প্রস্তাবগুলি অনুধাবন করলেই টের পাওয়া যায়। পারিবারিক জীবন, সরকারী প্রশাসন, ছবি আঁকা, বিবাহ, জীবন-যাপনের আদর্শ, মানুষের মুক্ত-ইচ্ছা—সবই এসেছিল তাঁদের বিবেচনার এক্তিয়ারে। হিউম্যানিস্টরা শুধু গ্রীক ও লাতিন পুঁথির পুনরাবিষ্কার ও সটীক সম্পাদনা করেছিলেন তা নয়। লরেঞ্জো ভাল্লা *'দ্য ভোলাপটেট'* (অন প্লেজার) নামে উপভোগবাদের উপর একটি প্রস্তাব রচনা করেন। ফিরেনজুয়েলা লেখেন নারী-সৌন্দর্যের উপর *'বিউটি অব উওম্যান',* গেলেশিও লেখেন সুভদ্র ব্যবহার বিষয়ক প্রস্তাব *'বুক অব গুড ম্যানার',* সালুতাতি লেখেন *'অন সোবার লাইফ',* বলদাসর কাস্তিলিওনে 'কোর্টিয়ার', পিকো *'অন দ্য ডিগনিটি অব ম্যান',* পল ভার্গেরিও লেখেন শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব—*'দ্য ইঞ্জুনিউস মরিবুস',* লিওনার্দো ব্রুনি *'অন স্টাডিজ অ্যান্ড লেটার্স',* এরাজমুস *'অন ফ্রি উইল'*।

রেনেসাঁসে দেখা দিয়েছিল দু'ধরনের মানুষ, 'ক্রিটিক্যাল' ও 'জেন্টল'। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন বহুমান্য নানা বিষয় নিয়ে। লরেঞ্জো ভাল্লা 'ক্রিটিক্যাল ম্যান' হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন *'অন ডোনেশন অব কনস্টানটাইন'* নামক প্রস্তাবে পোপের পার্থিব রাজত্বের ভিত্তি খসিয়ে দিয়ে।[১৭৪] 'জেন্টলম্যান'-এর আদর্শ পাওয়া যায় বলদাসর কাস্তিলিওনে রচিত *'কোর্টিয়ার'* গ্রন্থে। একজন ভদ্রলোককে হতে হবে লাতিন ও গ্রীক জানা, সুরসিক, ক্রীড়াবিদ, সুবক্তা, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পবোদ্ধা ও মার্জিত চরিত্রের মানুষ।[১৭৫]

রেনেসাঁসে দু'রকম কথাই বলা হয়েছিল—'ভিতা কনতেমপ্লেতিভা' ও 'ভিতা একতিভা'। মানুষ হবে আত্মস্থ, অন্তর্মুখী। পেত্রার্কা বলেছিলেন 'ভিতা কনতেমপ্লেতিভা'র কথা—

> "তুমি যদি নিজেকে জানো তা হলেই যথেষ্ট।"[১৭৬]

শুধু অন্তর্মুখী হলে চলবে না, সক্রিয় হতে হবে। নইলে লোহার তরবারির মতো মরচে জমে যাবে—একথা বলেছিলেন অলডো।[১৭৭] পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখা একটি প্রস্তাবে আলবের্তি লিখেছেন,

> "মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যত বেশি সম্ভব মানুষের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠা।"[১৭৮]

রেনেসাঁস যেমন জোর দিয়েছিল 'সেলফ্ কাল্টিভেশনে'র উপর, তেমনি গ্যারিনের ভাষায় 'হিউম্যানিজম' এমন একটা জীবনবাদী শিক্ষাদর্শন "যার লক্ষ্য নতুন সমাজ ও নতুন বিশ্বরচনা।"[১৭৯]

রেনেসাঁসের শিল্প-ভুবন

রেনেসাঁসের সংস্কৃতিকে আরেক দল মানুষ সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তুলেছিলেন, তাঁরা হলেন আর্টিস্ট। হস্ত-শিল্পের সীমানা ডিঙিয়ে এঁরা এসেছিলেন স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার জগতে। মধ্যযুগে হস্ত-শিল্পকে যান্ত্রিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো। রেনেসাঁসের আমলে এঁরা পেলেন শিল্পীর মর্যাদা। রেনেসাঁস-সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিচ্ছুরণ ধরা পড়েছিল তার শিল্প ও সৌন্দর্যচর্চার মধ্যে।[১৮০] আজকের দিনে যেমন বিজ্ঞান, রেনেসাঁসে তেমনই শিল্প। একজন বলেছেন,

> "The Renaissance gave its soul to Art."[১৮১]

স্থাপত্য

গথিক শিল্পের হাত ছাড়িয়ে রেনেসাঁসের স্থাপত্য এগিয়ে চলেছিল মিলনধর্মী মুক্তির দিকে। প্রাচীন রোমান যুগের স্থাপত্যাদির ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন রোমান স্থপতি ভিতরুভিয়াসের (খ্রীষ্টপূর্ব ২৫) *'ট্রিটিজ দ্য আর্কিটেকচুরা'*-র প্রভাব স্বীকার করে দেখা দিলেন ব্রুণেলেস্কি, আলবের্তি, মিচেলেজ্জো, ব্রামান্তে, পেরুজ্জি, সানসুভিনো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো প্রভৃতি বিশ্রুত স্থপতিরা। মধ্যযুগের প্রাসাদগুলির ঝোঁক ছিল সুবক্ষার দিকে। স্তূপীকৃত পাথরের ব্লক দিয়ে বানানো হতো প্রাসাদগুলি। একালে পাথরের ব্লকগুলি কেটে নিয়ে আসা হল হীরকের কৌণিক আদল। ক্লাসিক্যাল পৌরুষ ও সারল্যের মধ্যে নিয়ে আসা হল সামঞ্জস্যের সুষমা ও অলঙ্করণের ঝঙ্কার।[১৮২] শুদ্ধ রুচি ও দৃঢ় বিচারবুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত অনুপাত-সামঞ্জস্য আনায় স্থাপত্যকলায় এল নতুন চারিত্র্য। স্থাপত্যকর্মকে দেখা হতে থাকল মানবদেহের অনুপাত-সামঞ্জস্যের সমান্তরালে। একটি অট্টালিকা যেন একটি মানুষ।[১৮৩] মধ্যযুগের চার্চগুলি ছিল ক্রুশচিহ্ন মাফিক। রেনেসাঁসের যুগে তা বৃত্তাকৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাথায় দেওয়া হয় গম্ভীর গম্বুজ। গির্জার মূল অংশে, ছাদে, চ্যাপেলে যাতে শোভা পেতে পারে 'হাই রিলিফ', 'ফ্রেস্কো' বা 'স্টাকো'র কাজ, সে-ব্যবস্থা হল। ব্রুণেলেস্কি নির্মিত '*ফ্লোরেন্স ক্যাথিড্রাল*', মিচেলেজ্জো নির্মিত '*মেদিচি প্রাসাদ,*' পেরুজ্জি নির্মিত '*ভিলা ফারনেসিনা*', মাইকেল অ্যাঞ্জেলো রচিত '*লরেন্সীয় লাইব্রেরী*', এবং বহু স্থপতির মেধা ও সক্রিয়তায় প্রায় দু'শো বছর ধরে নির্মিত '*সেন্ট পিটার গির্জা*' রেনেসাঁস স্থাপত্যের বিস্ময়কর ঐশ্বর্য বহন করে।

বিস্ময়কর ঐশ্বর্য বহন করে। একালে নির্মিত গির্জাতে যে আলো ও খোলামেলা পরিসরের ব্যবস্থা হল ; অর্ধবৃত্তাকার ছাদ, স্তম্ভ, দেওয়াল ও চ্যাপেলে যেসব নয়নাভিরাম অলঙ্করণের ব্যবস্থা হল ; তাতে মানুষ শুধু ধর্মের নয়, যেন মুক্তির স্বাদ পেল। র‍্যাবলে তাই লিখলেন,

"Thank God. We are out of Gothic night."[১৮৪]

ভাস্কর্য

গ্রীক সভ্যতায় ভাস্কর্যের যে মর্যাদা ছিল, খ্রীষ্টধর্মের আমলে তা থাকার কথা নয়। ভাস্কর্য মুখ্যত একটি শারীরিক শিল্প। গ্রীসেব দেবতারা ছিলেন পূর্ণ মানবিক ব্যক্তিত্বে অন্বিত। তাদের বীরেরা ছিলেন সজীব, শক্তিশালী ও পেশল। শরীরের শক্তি ও সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে খ্রীষ্টীয়-দর্শন প্রবেশ করেছিল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের জগতে। "It was the life of soul."[১৮৫] প্রাচীন গ্রীসে মন্দিব নির্মাণ করা হতো দেবতাদের জন্য। কিন্তু চার্চ ছিল সমবেত প্রার্থনার জায়গা। চার্চে মূর্তি প্রবেশাধিকাব পেতো গৌণ অলঙ্করণের প্রয়োজনে।

রেনেসাঁসে চলেছিল ভাস্কর্যেব একটি নিগূঢ় উদ্ধার-প্রকল্প। প্রথম দিকে ভাস্কর্য সেখানে আত্মপ্রকাশ করে স্থাপত্য-শিল্পের অধীন ও অনুগামী শিল্প হিসাবে, পরের যুগ চিত্রানুগামিতার, শেষে আসে 'নিও-প্যাগান' যুগ।[১৮৬] পিসানো থেকে আন্দ্রিয়া হয়ে ঘিবার্তিতে মেলে সেই তালফেরতা মুক্তির ইতিহাস। ঘিবার্তি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন 'পেন্টাব ইন ব্রোঞ্জ'।[১৮৭] তাঁর '*ব্যাপটিসরি ব্রোঞ্জ-গেট*' একটি অনুপম সৃষ্টি। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ভাষায়, 'স্বর্গের প্রবেশদ্বার'।[১৮৮] এর পর এলেন দোনাতেল্লো, ভেরোচ্চিও প্রমুখ। দোনাতেল্লোর '*গাত্তামেলাত্তা*', '*ডেভিড*' দেখা দিলো তাদের পৌরুষ-দৃপ্ত রূপ নিয়ে। ভেরোচ্চিও-ব বিখ্যাত সৃষ্টি অশ্বারূঢ় সেনাপতির মূর্তি '*চেল্লোয়নি*'তে এসে মিলল 'ফ্লোরেন্সীয় বিজ্ঞান ও ভেনেসীয় উৎসাহ'।[১৮৯] প্রকৃতির মধুরতম সৌন্দর্য দিয়ে মূর্তি রচনা করলেন লুক্কা দেল্লা রোবিয়া, রোসেল্লিনো ; পাশবিক বন্যতা ও দানবিক পৌরুষ দিয়ে ভাস্কর্যকে মহিমান্বিত করলেন পোলায়ুয়ালো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো হলেন 'মাস্টার অব লিভ স্টোন'।[১৯০] দেহকে তিনি আত্মার আয়নায় পরিণত করেছেন। দেহের ভঙ্গি, পেশল পৌরুষ ও অস্থি-র নানা মোচড় দিয়ে তিনি নিঙড়ে বের করে এনেছেন যন্ত্রণাদীর্ণ এক জীবন। মধ্যযুগে ভাস্কর্যগত অলঙ্করণের গতিবিধি ছিল চার্চকেন্দ্রিক। অ্যাঞ্জেলোর '*জুলিয়াস টম্ব*', '*মেদিচি চ্যাপেল*' উৎসর্গিত হয়েছিল মর-মানুষের স্মৃতিতে। পুরো মধ্যযুগ জুড়ে যে-শিল্প বন্দী হয়েছিল গির্জার কুলুঙ্গিতে, রেনেসাঁসে তারা পূর্ণ মর্যাদায় স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রকাশ্য উদ্যানে ও পার্কে। *অ্যাঞ্জেলোর 'ডেভিড'* ও *ভেরোচ্চিও-র 'চেল্লোয়নি'* স্থাপিত হয় প্রকাশ্য ময়দানে। এতদ্‌সত্ত্বেও ভাস্কর্য রেনেসাঁসের ইতালিতে একটি গৌণ শিল্পই।[১৯১]

চিত্রকলা

"Painting was the art of arts of Italy."[১৯২]

গ্রীক-সভ্যতায় যেমন ভাস্কর্য, ইতালিতে তেমনি চিত্র। রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ দান তার চিত্রকলা। রেনেসাঁসের মধ্যে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও প্যাগান জীবনবাদের একটি নিবিড় মৈত্রী-সংগ্রাম চলেছিল।

ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যবোধ ও খ্রীষ্টীয় পবিত্রতাবাদ—বেনেসাঁস-চিত্রশিল্প দুইকেই গুরুত্ব দিয়েছে। আধুনিকতার প্রত্যুষ-ফসল হিসাবে রেনেসাঁসের চিত্রকলায় মূর্ত হয়ে ওঠে বিশ্বাসের-বিস্ময়ের-ভালোবাসার-শক্তির-সৌন্দর্যের-কখনও বা যন্ত্রণার ঘনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি।

চিত্রকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক চার্চ। চিত্রের প্রধান কাজই ছিল মানুষের সামনে ধর্মের গল্প বিশ্বাসযোগ্যভাবে সুন্দর করে উপস্থাপিত করা।[১৯৩] রেনেসাঁসের চিত্রীরা চার্চের দেওয়ালে ছাদে এঁকেছিলেন শত-শত ধর্মীয় ছবি।

ইতালীয় রেনেসাঁসের বিষয়গত গল্প এখানেই শেষ হয়নি। হিউম্যানিজমের অনিবার্য প্রভাবে ধীরে-ধীরে তার মধ্যে প্রবেশ করে ক্লাসিক্যাল যুগের শক্তি ও সৌন্দর্যের রূপময় ছন্দ। ভার্জিনের ছবিতে আফ্রোদিতি, সেবাস্তিয়ানের ছবিতে অ্যাপোলো ছায়া ফেলতে থাকে। ......"the muses and graces challenged the rule of the Virgin."[১৯৪] অগাস্তিনো চিগির মতো বণিক, লরেঞ্জো বা লোডোভিকোর মতো রাজন্যক, বা লিও-১০ম-এর মতো 'জলি পোপ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় ছবির সমান্তরালে আঁকা হতে থাকে *'ভেনাস ও আরিয়াডেন', 'দফনে ও ডায়না'* প্রভৃতি ছবি। ম্যাডোনার পশ্চাৎপটে নগ্ন মানুষের ছবি এঁকে সিগনোরেলি 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'-এর সূত্রটি তুলে ধরলেন যেন।

রেনেসাঁসের চিত্রকররা ধর্মীয় ও প্যাগান বিষয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে আরেক ধরনের ছবি এঁকেছেন—পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি জাতীয় ছবি। "The potrait was the characteristic product of the Renaissance."[১৯৫] ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি রেনেসাঁসের বিশিষ্ট লক্ষণ। টিশিয়ানের আঁকা *'ইসাবেলা দ্য এস্তে', 'সম্রাট চার্লস-৫ম'*, রাফায়েলের আঁকা *'জুলিয়াস-২য়'*, লিওনার্দোর আঁকা *'আত্মপ্রতিকৃতি', 'মোনালিসা'* এগুলি বিখ্যাত পোর্ট্রেট।

রেনেসাঁসের চিত্রকররা যে পর্যবেক্ষণশীল ও অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় মেলে দু'দিক থেকে। মানবদেহকে তাঁরা চিনে নিতে চেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক কৌতূহল দিয়ে। সিগনোরেলি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো এঁরা হাসপাতালে ও কবরখানায় গিয়ে মানুষের অ্যানাটমি নিয়ে কৌতূহল মেটাতেন। লিওনার্দো মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের যে অভ্যন্তর চিত্র এঁকেছেন, তাতে মনে হয় না, তিনি মানবদেহ সম্পর্কে চিকিৎসকদের চেয়ে কম জানতেন।

আর এক দিকে চিত্রীদের দৃষ্টি পড়েছিল, তা হচ্ছে প্রকৃতি। মধ্যযুগের গুরুমুখী বিদ্যার গতানুগতিকতা থেকে চিত্রকলাকে নতুন চারিত্র্য দিয়েছিলেন যিনি, সেই জোত্তো গিয়ে বসেছিলেন প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।[১৯৬] লিওনার্দো বলতেন, 'প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের নিতে হবে শিল্পের সঞ্জীবনী পাঠ।'[১৯৭] মানুষ যে বহুধা-বিস্তৃত প্রাকৃতিক জীবন-শৃঙ্খলের কেন্দ্রীয় চরিত্র-স্বরূপ—এই দর্শন থেকে তাঁরা উপজীব্য চরিত্রগুলিকে স্থাপন করেছিলেন প্রকৃতির বিশাল-পটভূমি মধ্যে। পারস্পেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত রচনার দ্বারা, রেনেসাঁসের চিত্রীরা বিশাল-বিস্তৃত প্রকৃতিকে আহ্বান করেছিলেন তাঁদের শিল্পের জগতে। লিওনার্দোর *'ভার্জিন অব দ্য রক'* ছবিতে রহস্যময় পার্বত্য-পরিবেশের যে-প্রেক্ষিত আছে লক্ষণীয়। জর্জিনোর *'জিপসি অ্যান্ড দি সোলজার'* ছবিতে দেখা যায় সন্তানের পরিচর্যারত এক অন্যমনস্ক নারীকে। তার পিছনে রোমান-আর্চ, সেতু, টাওয়ার, আনত-গাছ, বিদ্যুতের ঝলকানি।

এরই মধ্যে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মেষপালক। সে ভুলেই গেছে আকাশে মেঘ জমেছে ঘন হয়ে। যে কোনো সময় ঝড় উঠবে বা নামবে বৃষ্টি।

রেনেসাঁসের চিত্রকলায় যেমন ব্যক্ত হয়েছে পেশল-পৌরুষ, তেমনি পেলব-কমনীয়তা। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ছবিতে আছে 'সেন্স অব ট্র্যাজেডি' ও 'টেরিবেলিটা', আর রাফায়েল-টিশিয়ানের ছবি দেখে মনে হয়, 'All is beauty and joy'.[১৯৮] মাইকেল অ্যাঞ্জেলো অঙ্কিত সিস্টিন-চ্যাপেল-ফ্রেস্কোমালায় আমরা পাই, যন্ত্রণাদীর্ণ আত্মার পেশল অভিব্যক্তি, যা 'over burdened with the message of God'.[১৯৯] জর্জিনোর *'স্লিপিং ভেনাস'* তার অপাবৃত অনিন্দ্য দেহ-সৌন্দর্য নিয়ে শুয়ে থাকে পাপ-পুণ্যের অতীত এক 'নো ম্যানস্ ল্যান্ড'-এ। করেরিজ্জোর *'এডুকেশন অব এরস'*, বেল্লিনির *'ফিস্ট অব গড'*, বা রাফায়েলের *'গ্যালেতা'র* মধ্যে দীপ্ত হয় প্যাগানসুলভ অনুরাগের সুরঞ্জিত শিখা। নবীন গ্রীসের আত্মা রাফায়েলের ছবিতে যেন নতুন করে জেগে ওঠে।

রেনেসাঁসের চিত্রকলা কোনো একমাত্রিক পৃথিবী নয়। জীবনকে রেনেসাঁসের শিল্পীরা বিভিন্ন চোখ দিয়ে দেখেছেন, এঁকেছেন বিভিন্ন রঙ দিয়ে। যিনি *ট্রান্সফিগারেশন*-এর মতো অলৌকিক বিশ্বাসের ছবি এঁকেছেন, তিনিই এঁকেছেন *'ভেনাস ও কুপিড'*-এর মতো 'frankly a riot of feminine flesh'.[২০০]

খ্রীষ্টীয় বিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে প্যাগান জীবনবাদকে তাঁরা সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা যেমন ভিনদেশীয় বলে গ্রীক-বিদ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখেননি, রেনেসাঁসের চিত্রকররাও তেমনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন অনুরাগতপ্ত হৃদয়ে। রাফায়েলের *'স্কুল অব এথেন্স'* ছবিটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের মেধাবী রূপটি। একজন বলেছেন,

"All in all such a parliament of wisdom had never been painted."[২০১]

অর্ধবৃত্তাকার এই ছবিতে আলোচনারত জ্ঞানীদের মধ্যভূমিতে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল দাঁড়িয়ে আছেন। একজনকার আঙুল ঊর্ধ্বাভিমুখী, অন্যজনের হাত মাটির পৃথিবীর দিকে নীচু করা। টিশিয়ানের *'স্যাকরেড় অ্যান্ড প্রফেন লাভ'* ছবিতে যে-সৌন্দর্যের ছবি আছে, তা শুধু 'স্যাকরেড' নয়, 'সেকুলার'ও। লিওনার্দো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা দিয়ে জীবনকে দেখেছেন, বিষয় নির্বাচন করেছেন বিশ্বাসী খ্রীষ্টানের মতো এবং আলো ও অন্ধকার, রূপ ও রহস্যের মাঝখানে সেই ছবিকে দাঁড় করিয়ে তাতে দান করেছেন বিশ্বসৌন্দর্যের অপার রহস্য। পরিচ্ছন্ন বিজ্ঞানবোধ ও নিখুঁত বস্তু-দৃষ্টিকে তিনি ঢেকে দিয়েছেন অপার সৌন্দর্য-রহস্যের আচ্ছাদনে। সৌন্দর্যকে রেনেসাঁস তুলে এনেছিল শোকের প্রস্তাবে, শ্রদ্ধার অঞ্জলিতে, শুচি-শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতায় এবং সম্ভোগের উৎসবে। রেনেসাঁসের ইতালি চিত্রকলার প্রদীপেই জ্বেলে ধরেছিল তার জীবন-বন্দনার বর্ণময় আলোকশিখা। সৌন্দর্যকে এবং দেহ-সৌন্দর্যকে রেনেসাঁস কি চোখে দেখেছিল, তার একটি স্মরণযোগ্য উদাহরণ পাওয়া যায় সিগনোরেলির জীবনীতে। অপঘাতে মারা গেলেন শিল্পীর প্রিয়তম পুত্র। পূর্ণ যুবক, সুন্দর সুঠাম দেহ। শোকাতুর পিতা নিজের হাতে অপাবৃত করে দিলেন তার পরিচ্ছদ। হাঁটু মুড়ে বসলেন রঙ-তুলি আর ইজেল নিয়ে। তুলির পর তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুললেন তার নগ্ন-নিরাবরণ দেহের রূপ। কোনো

আর্তি নয়, চোখের জল নয়, শিল্পী পিতার শোকাগুলি রঙে ও রেখায় পুত্রের নগ্ন সৌন্দর্যের অনশ্বর রূপ-চিত্রণে।[২০২]

পৃষ্ঠপোষকতা

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা ছিলেন পৃষ্ঠপোষক-সেবিত। রাজন্যক-ধনিক-বণিক-পোপের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা নিবিড় বিদ্যাচর্চা ও নিরুপম শিল্পচর্চার কাজ করতেন। ভাসারি বলেছেন,

> "এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, রাজন্যকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া রেনেসাঁসের শিল্প এভাবে বিকাশ লাভ করত না।"[২০৩]

১৩৪১ সালের ৮ এপ্রিল রোমান সিনেটর অরসো সিংহাসন থেকে নেমে পেত্রার্কাবে নিজের হাতে পরিয়ে দেন লরেল পাতার মুকুট।[২০৪] রাজন্যক লরেঞ্জো পালসির সঙ্গে হিউম্যানিস্ট, পলিজিয়ানোর সঙ্গে কবি, ল্যান্ডিনোব সঙ্গে বিদ্বান, ফিকিনোর সঙ্গে দার্শনিক, পিকোর সঙ্গে মরমীয়াবাদী, বতিচেল্লির সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক, স্কোয়ারসিয়ালুপ্পির সঙ্গে সঙ্গীত কার, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে শিল্পবোদ্ধা হতে পারতেন।[২০৫] পলিজিয়ানো তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

> "পূর্বে আমি ছিলাম কণ্ঠহীন, তুমি আমাকে সঙ্গীতমুখর করে তুলেছ।"[২০৬]

জাঁকজমক

রেনেসাঁসের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যেসব রাজন্যক-ধনিক-বণিক ও পোপ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের জীবনযাপন ছিল আভিজাত্যপূর্ণ ও সম্ভোগময়। ভিলা এবং প্রাসাদের স্থাপত্যকর্মে, উদ্যান ও চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায়, পোষাকে ও উৎসবে, গৃহসজ্জা ও ভোজসভায় তাঁরা পরিশীলিত রুচি ও জাঁকজমকপূর্ণ ব্যাপারকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। সিয়েনার বিখ্যাত বণিক চিগি তাঁর ফারনেসিনা ভিলায় যে ভোজ দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর নির্দেশ ছিল অতিথিদের এক পাত্রে দু'বার খাওয়ানো হবে না। রুপোর দামি-দামি বাসনপত্র অতিথিদের চোখের সামনেই টাইবার নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।[২০৭] পৃষ্ঠপোষকদের এই আভিজাত্যপূর্ণ জীবনযাত্রা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীদের জীবনযাপনেও। ফারের কোট পরে রাফায়েল জেনারেলের মত রোমের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন,[২০৮] আরেতিনো সোনার চেন গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতেন রাজন্যকদের দরবারে দরবারে। এ. ভেঞ্চুরা তাই লিখেছিলেন, 'রেনেসাঁসে আসলে জয় হয়েছিল অ্যারিস্টোক্রাসির।'[২০৯]

কসমোপলিটান

রেনেসাঁসের সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদী নয়, কসমোপলিটান।[২১০] ইতালি রাজনৈতিক অর্থে প্রাকার-বিভক্ত, পরস্পর বিবদমান, বহুতর সিটি-স্টেটের সমাহার হলেও বিকাশমান বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের অভ্যন্তর তাগিদে ইতালিতে সে-সময় যে সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল, তা কোনো অর্থেই ভৌগোলিক সংকীর্ণতার দ্বারা খণ্ডিত ছিল না। ইতালির হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা বিদ্যা ও শিল্পচর্চার তাগিদে সমকালকে অতিক্রম করে প্রবেশ করেছিলেন গ্রীক

ও রোমান সভ্যতার মর্মকেন্দ্রে। বিদেশী বলে গ্রীক-বিদ্যার চর্চায় তাঁরা নিরস্ত হননি। প্রাচীন বলে রোমান বিশ্বকে তাঁরা এড়িয়ে চলেননি। পরদেশী বলে রাফায়েল তাঁর 'স্কুল অব এথেন্স' ছবিতে প্লেটো বা অ্যারিস্টটলকে বর্জন করেননি। ফাইলেলফো লক্ষ্য করেছিলেন, 'ফ্লোরেন্সে নতুন করে মাথা তুলছে গ্রীস'।[২১১]

হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধির রসদ নিয়ে এক সিটি-স্টেট থেকে অন্য সিটি-স্টেটে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতেন। কোনো খণ্ড ভূগোল-প্রীতি তাঁদের স্থবির করেনি। রেনেসাঁসের মানুষ ছিল গতিশীল। যে কোনো সীমানা ভেঙে সে হতে চেয়েছিল 'ইউনিভার্সাল ম্যান'।[২১২] 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিস'-আখ্যাত এরাজমুসের জন্ম নেদারল্যান্ডে, শিক্ষা ফ্রান্সে, শিক্ষকতা ইংলন্ডে, ভ্রমণতীর্থ ইতালিতে, বসবাস ব্যাসেলে, কথা বলতে ভালোবাসতেন প্রাচীন জার্মানিতে, ওল্ড-টেস্টামেন্টের গ্রীক-সংস্করণ প্রকাশ করেন, লাতিন ছিল তাঁর মাতৃভাষার মতো। প্রকৃতপক্ষে ......"he belonged to no nation."[২১৩] সন্ধিৎসু মানুষ নতুন-নতুন পথের অভিযাত্রী হওয়ার দীক্ষা পায় রেনেসাঁস থেকে। আমেরিকা আবিষ্কার এই সময়েরই ঘটনা। রেনেসাঁস প্রকৃতপক্ষে মানুষকে বৃহত্তর পৃথিবীর বাসিন্দা করে দেয়।

তীব্র স্বদেশপ্রীতি বা স্বধর্মপ্রীতি প্রকৃতপক্ষে অ্যান্টি-রেনেসাঁস ব্যাপার।[২১৪] এই অ্যান্টি-রেনেসাঁস শ্লোগান প্রথম তোলেন একজন 'জার্মান হারকিউলিস'। তাঁর নাম মার্টিন লুথার। রিফরমেশন নামধেয় ধর্মীয় শুদ্ধতাবাদের নেতা হিসাবে বিখ্যাত হলেও তাঁর আন্দোলনের প্রেক্ষিত রচনা করেছিল এক ধরনের উগ্র জার্মান-জাতীয়তাবাদ। তাঁর *'অ্যাড্রেস টু দি জার্মান নোবিলিটি'* জাতীয় প্রস্তাবে পাওয়া যাবে তার আগ্নেয়-প্রভাষণ।[২১৫] সিকিঞ্জেন, হটেন প্রমুখ জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মেলানো ছিল তাঁর হাত।

'জন্ম হউক যথা তথা'

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জন্ম-পরিচয় নির্ধারণ করে দেয়, একটি মানুষের অবস্থান ও পরিণাম, কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদয়ে ভেঙে যায় সেই ব্যবস্থা।[২১৬] জন্মপরিচয় নয়, বিত্ত ও সংস্কৃতির জোরে অনেকে মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থানে পৌঁছুতে সমর্থ হন।[২১৭] রেনেসাঁসের অধিকাংশ চিত্রশিল্পী, স্থপতি ও ভাস্কর সমাজের নিম্নতল থেকে উঠে এসেছিলেন। একটি নমুনা সমীক্ষায় জানা গেছে, ১৪২০ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৩৬ জন শিল্পীর মধ্যে ৯৬ জন ছিলেন দরিদ্র হস্তশিল্পী অথবা দোকানদারের ছেলে।[২১৮] হিউম্যানিস্টদের অনেকেই উঠে আসেন অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে। সালুতাতি (ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর ছিলেন ২১ বছর) ছিলেন চালচুলোহীন শরণার্থী পরিবারের সন্তান।[২১৯] নিকলো নিকলি (হিউম্যানিস্ট) প্রায় নিঃস্ব ও অশিক্ষিত পরিবার থেকে বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী হিসাবে কোসিমো দ্য মেদিচির প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ভাসারি লিখেছেন, আন্দ্রিয়া ম্যানতেগ্না (শিল্পী) প্রথম জীবনে পশুচারণের কাজ করতেন। পায়াস-২য় প্রথম জীবনে কৃষক, পরে হিউম্যানিস্ট শেষে পোপের পদাভিষিক্ত হন।[২২০] সাহিত্যিক আরেতিনোর বাবা ছিলেন মুচি। তিনি নিজেও

কর্মজীবন শুরু করেন বই বাঁধাইয়ের কাজ দিয়ে। পলিজিয়ানো (হিউম্যানিস্ট ও কবি) উঠে এসেছিলেন অখ্যাত, অজ্ঞাত অবস্থা থেকে।[২২১]

প্রতিযোগিতা

রেনেসাঁসের পৃথিবী ছিল অবাধ প্রতিযোগিতার পৃথিবী। 'মানি-ইকোনমি'র যুগে বিদ্যা-বিত্ত ও বিভিন্ন গুণের অবাধ কর্ষণ ও প্রতিযোগিতায় তখন একে অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় নেমে পড়েন।[২২২] সেখানে এক নগর-রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেক নগর-রাষ্ট্রের, এক রাজন্যকের সঙ্গে আরেক রাজন্যকের, এক বণিকের সঙ্গে আরেক বণিকের প্রতিযোগিতা। পেট্রনের সঙ্গে পেট্রনের এই প্রতিযোগিতায় বিদ্বান ও শিল্পীরাও নিজেদের সেই প্রতিযোগিতায় সামিল করেছিলেন। ১৪০১ সালে 'ব্যাপটিসরি ব্রোঞ্জ গেট' নির্মাণের বরাদ দেওয়ার জন্য যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়, তাতে দোনাতেল্লো, দেল্লাক্রোসা, ব্রুণেলেস্কি, ঘিবার্তি প্রমুখ শিল্পীরা হাজির ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঘিবার্তি ৩০,৭৯৮ স্বর্ণ ফ্লোরিনের বিনিময়ে সেই কাজটির বরাদ্দ পান।[২২৩] সব শিল্পীই সম্ভাব্য মহত্তর শিল্পীর সঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রতিযোগিতার মধ্যে শঙ্কিত ও সজাগ শিল্পী-জীবন যাপন করতেন। রেনেসাঁসের রাজন্যক, হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীদের গুণগত ঔৎকর্ষের প্রকৃত রহস্য নিহিত ছিল এই প্রতিযোগিতার পরিবেশের মধ্যে।

ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণ

জর্জ ভাসারি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে *'চিমাবুয়ে থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত ইতালির মহৎ স্থপতি চিত্রকর ও ভাস্করদের চরিতাবলী'* নামে একটি জীবনীমূলক গ্রন্থে 'রেনেসাঁস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।[২২৪] এ গ্রন্থে তিনি চিমাবুয়ে থেকে অন্তত কুড়িজন অনন্যসাধারণ শিল্পীর জীবনী ও তাঁদের কীর্তির কথা তুলে ধরেন। এর দ্বারা তিনি রেনেসাঁস বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ধরিয়ে দেন। কোনো সমাজে বা দেশে কাছাকাছি কালে বহু খ্যাত-কীর্তি প্রতিভার উপস্থিতি বা প্রস্ফুটনই রেনেসাঁস। ভাসারি প্রদত্ত এই সূত্রটিকেই বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করে প্রায় দু'শো বছর পরে রেনেসাঁস বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করেন বুর্খহার্ডট।[২২৫] পরবর্তীকালে রেনেসাঁস আলোচনা নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এসেছে বিচিত্র রকমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। জোর পড়েছে সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তন ও প্রেক্ষিতের উপর। ব্যক্তিপ্রতিভার জাগরণের দিকটি কমবেশি সকলেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বুর্খহার্ডট থেকে কাসিরার,[২২৬] ভাসারি থেকে ক্রিস্টলার[২২৭] এঁরা ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণের উপর যতটা জোর দিয়েছেন, তার সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতটিকে ততটা গুরুত্ব দেননি। মার্টিন ভন, এঙ্গেলস,[২২৮] স্পিৎজ—এঁরা বলেছেন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রে উত্তরণের সূচনা-মুহূর্তে বিদ্যা ও বিত্তের অবাধ কর্ষণ শুরু হয়েছিল। প্রতিযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভূতপূর্ব পরিবেশ বিদ্বান ও শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে। এসময়ে আমরা পাই লরেঞ্জো, লোডোভিকো, মন্তেফেলত্রোর মতো রাজন্যকদের, যাঁরা পূর্বতন রাজন্যকদের থেকে আলাদা;[২২৯] পাই নিকোলাস-৫ম, জুলিয়াস-২য়, লিও-১০ম-এর

মতো পোপ, যাঁরা পূর্বতন পোপেদের মতো নন ; পাই কোসিমো, বুচেল্লি বা চিগির মতো নতুন চরিত্রের বণিকদের। এ সময় ঝাঁকে-ঝাঁকে দেখা যেন ফাইলেলফো, ভাল্লা, পিকো, ব্রুনি, পোম্লিও, ফিকিনো, পম্পোনাজ্জি, পলিজিয়ানো, ভিত্তোরিনোর মতো অসাধারণ সব হিউম্যানিস্ট ; হস্তশিল্পীদের সীমানা ডিঙিয়ে উঠে আসেন জোত্তো, বতিচেল্লি, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল, জর্জিনো, টিশিয়ানের মতো মহাশিল্পীর দল। রেনেসাঁসের মধ্যে দেখা দেন অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক মানুষ।[২৩০] এঁরা ছিলেন সব 'নিউ টাইপ অব ম্যান'।[২৩১]

চলমান প্রবাহের গতানুগতিকতা ভেঙে ভঙ্গিল পর্বতের মতো এঁরা শীর্ষচূড় হয়ে উঠেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার উদাহরণ আলবের্তি দ্য বাতিস্তা।[২৩২] কি পারতেন না তিনি? তিনি ছিলেন দৈহিক কসরতে পারদর্শী—লাফ দেওয়া, তীর ছোঁড়া, বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া, সাঁতার কাটায় সমান দক্ষ ; ছিলেন আসারণ সঙ্গীতশিল্পী ; দার্শনিক ও কমেডি-লেখক ; চিত্রশিল্পী, স্থপতি, ভাস্কর ; চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের উপর অন্তত দশখানি নির্ণায়ক গ্রন্থের রচয়িতা ; ছিলেন কারিগর, ডোবা জাহাজ তুলে আনার যন্ত্র-নির্মাতা; ইতালীয় ভাষায় বিশুদ্ধ গদ্য-রচয়িতা ইত্যাদি। ল্যান্ডিনো বলেছিলেন, 'আলবের্তিকে কোন গোত্রে ফেলবো?'[২৩৩] বৈশ্বিক মানুষ বা 'ইউনিভার্সাল ম্যান' হিসাবে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন 'ফুলেস্ট ম্যান অব দ্য রেনেসাঁস।' সেল্লিনি লিখেছেন, লিওনার্দোর চেয়ে বেশি জানা মানুষ পৃথিবী দেখেনি।'[২৩৪] শুধু সঙ্গীতবিদ্যার যোগ্যতা দিয়ে তিনি যে কোনো রাজন্যকের সভায় আসন করে নিতে পারতেন। চিত্রশিল্পে তাঁর সম্মান বিশ্বশ্রেষ্ঠের। প্রায় সতেরো হাজার স্কেচ ও ড্রাফট এঁকেছেন। লিখেছেনও প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা। ভাবুক ও দার্শনিক এই মানুষটিকে 'উইজার্ড অব দ্য রেনেসাঁস' বলা হয়।[২৩৫] কারিগরী ও যন্ত্রবিদ্যায় তাঁর আবিষ্কারক-প্রতিভা শিল্পী-প্রতিভার তুলনায় কম ছিল না। মিলানের রাজন্যকের একজন করে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি ও সামরিক প্রযুক্তিবিদ দরকার জেনে, লিওনার্দো চার রকম পদের জন্যই নিজের উপযুক্ততা দাবি করে ১৪৮২ সালে যে আবেদনপত্রটি প্রেরণ করেছিলেন, তা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অন্তত দশরকম বিষয়ে নিজের পারদর্শিতা বিবৃত করে লিখেছিলেন, প্রতিটি বিষয়েই যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তিনি খোলা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে প্রস্তুত।[২৩৬] মননশীলতা ও সৃজনশীলতার দিক থেকে ব্যক্তিপ্রতিভার এই বিস্ফোরণের যুগটিকে এঙ্গেলস এই ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন,

> "আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব। এ যুগের প্রয়োজন ছিল অসাধারণ মানুষের এবং তার সৃষ্টিও হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন চিন্তাশক্তি, নিষ্ঠা, সার্বজনীনতা ও বিদ্যায় অসাধারণ......সে-সময় প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করতেন, প্রায় সকলেই চার-পাঁচটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন, প্রায় প্রত্যেকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কেবলমাত্র একজন মহান চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ, কুশলী যন্ত্রবিদ ও ইঞ্জিনীয়র।......সেই

সময়ের মহান মানুষেরা তখনও তাঁদের উত্তরসূরিদের মতো শ্রমবিভাগের দাসত্ব বন্ধনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে একদেশদর্শী হয়ে ওঠেননি।......চরিত্রবৈভব এবং চরিত্র-শক্তির গুণে এঁরা প্রত্যেকেই হয়ে উঠতেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ।"[২৩৭]

রেনেসাঁসের মানুষ ক্রিটিক্যাল ও জেন্টল, বিদ্বান ও সুরসিক, আধ্যাত্মিক ও ইহবাদী, অন্তর্মুখী ও পর্যবেক্ষণশীল, মননশীল ও সৌন্দর্যবাদী, স্বাদেশিক ও কসমোপলিটান, 'ভিতা কনতেমপ্লেতিভা' ও 'ভিতা অ্যাকতিভা'র দ্বৈতযাত্রী। অতীতের অস্ত্রাগারে সে প্রবেশ করেছিল ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য। জীবনকে সে নিবিড় করে অনুভব করেছিল বলেই, রত হয়েছিল সুন্দরের সাধনায়। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় তার গঠনশীল নির্মাণপ্রতিভা ও বর্ণবিভাবিত সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ। অনুসন্ধিৎসা, অনুভব ও প্রকাশের ঐশ্বর্যে রেনেসাঁস পেরিয়ে গিয়েছিল মধ্যযুগের অতি-নিরূপিত সীমা। উত্তুঙ্গ ব্যক্তিপ্রতিভার উত্থান ও তাঁদের মননশীল সক্রিয়তা ও সৃজনশীল বর্ণ-বৈভব দিয়ে সাজানো রেনেসাঁসের সংসার।

উপসংহার

ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে বিস্তরিক এই আলোচনায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, কি ঘটেনি ও কি ঘটেছিল সেখানে।

সভ্যতার পট-পরিবর্তনের ইতিহাসে ইতালীয় রেনেসাঁসের মৌলিক অবস্থান-বিন্দু, তার যৌগিক চরিত্রের কথা স্মরণ রেখে উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিচারে অগ্রসর হওয়া যায়। ধনবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলায় যে জাগরণের সূচনা হয়েছিল দেখা যায়, নানা রকম প্রতিকূলতা ও ঊনতামূলক প্রতিবেশ সত্ত্বেও ন্যূনাধিক শতবর্ষের মধ্যে বেধ ও বিস্তারের দিক থেকে এমন একটি প্রাণ-সংবেগযুক্ত মননশীল ও সৃজনশীল প্রহরের সূচনা সে করে, যার তুলনা মেলে ইতালীয় রেনেসাঁসে। চলমান মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য, ইতালির হিউম্যানিস্টরা যেমন প্রাচীন গ্রীক-লাতিন আদি অন্যতর সংস্কৃতির হাত ধরেছিলেন, বঙ্গীয় রেনেসাঁসেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা এবং আধুনিক জীবনবাদী ইওরোপীয় সংস্কৃতিকে সাগ্রহে বরণ করা—এই দু'য়ের মধ্যে দিয়ে সে বঙ্গ-সংস্কৃতিকে মধ্যযুগ থেকে সরিয়ে এনে আধুনিকতার মর্মকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করে এবং বিশ্বমানে পৌঁছে দেয়। গ্রীক-লাতিন আদি অন্যতর সংস্কৃতির চর্চা ইতালিতে বিক্ষিপ্ত ও অনুকরণমূলক বাহ্যিক ব্যাপার হয়ে থাকেনি, তাকে সৃজনময়ও করেছিল। বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির অভিঘাত বাইরে থেকে পুঁতে দেওয়া গোঁজ হয়ে থেকে যায়নি, তা শস্যবীজের মতো অঙ্কুরিত ও ফলনময় হয়েছিল। ইতালির মতোই স্বল্পকালীন সময়গত দৈর্ঘ্যের মধ্যে বহু অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক প্রতিভা এখানে মাথা তোলে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে মেলে সেইসব সিংহ-হৃদয়, অনন্য-সাধারণ, রেনেসাঁস-ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ।

ইতালীয় রেনেসাঁসে কি হয়নি—সে-সম্পর্কে যে-বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আমরা করেছি, তার সামনে বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিষয়ে বহু প্রতিষ্ঠিত অথচ ভ্রান্ত বিচার বা বক্তব্য অহেতুক বলে প্রমাণিত হবে, বা আলোর সামনে অন্ধকার যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনি ভাবে

মিলিয়ে যাবে। ইতালীয় রেনেসাঁসের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে একই উদ্দেশ্যে। ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্য যে কেবলমাত্র বাহ্যিক নয়, একই সূত্র দুই রেনেসাঁসের মধ্যে কিভাবে কাজ করে গিয়েছিল—তা দেখানোর জন্য এবারে আমরা আসব বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নির্বাচিত কয়েকটি চরিত্রের মননশীল ও সৃজনশীল ভূমিকার অন্তর্বিশ্লেষণে। বিশ্লেষণকে গভীরতা দানের জন্য সূচনা থেকে পরিণাম পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি মাত্র চরিত্রকে আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এছাড়াও বহু মননশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব বঙ্গ-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। 'উপলক্ষণে তৃতীয়া' নামে সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি সূত্রে বলা হয়েছে, ধূম দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় পর্বত বহ্নিমান। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমপাদ জুড়ে বাংলায় যা হয়েছিল, তাকে রেনেসাঁস বলা যায় কিনা—তা নির্ণয় করার জন্য বঙ্গীয় সমাজের গোটা পর্বতটি আমরা আঁকছি না, আমরা কেন্দ্রীভূত করছি আমাদের আলোচনা নির্বাচিত কিছু চরিত্রের দিকে, যাঁদের মধ্যে ঘনীভূত হয়েছিল রেনেসাঁসের মননশীল ও সৃজনশীল লক্ষণগুলি। এবং বলা বাহুল্য উপলক্ষণের ধূম নয়, তাঁরাই ছিলেন রেনেসাঁসের বহ্নিমান মশাল।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. "Renaissance was the first transcendent spring-tide of modern world." — J. A. Symonds, *Renaissance in Italy*, vol. I, p. 10

২. H. Haydan, *The Counter Renaissance*, U. S. A. 1973 edition

৩. J. N. Sarkar, *The History of Bengal*, vol. II, The University of Dacca, 1948, pp. 497-499

৪. Amit Sen (S. C. Sarkar), *Notes on the Bengal Renaissance*, Calcutta, 1946

৫. S. C. Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, 1979 Papyrus Edition

৬. A. C. Gupta (ed), *Studies in the Bengal Renaissance*, Jadavpur, 1958, p. XI

৭. অরবিন্দ পোদ্দার, *রেনেসাঁস ও সমাজ মানস*, ১৯৮৩, পৃ. ১

৮. S. C. Sarkar, *Ibid*, p. 69

৯. সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় রেনেসাঁসে পাশ্চাত্যবিদ্যার ভূমিকা*, মাঘ ১৩৮৬, পৃ. ৫৩-৫৪

১০. D. Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Berkeley, 1969 ; *Nineteenth Century Bengal and Fifteenth Century Europe*, Calcutta, 1963

১১. অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালীয় র‍্যানেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি*, জানুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৪৩

১২. অমলেশ ত্রিপাঠী, *তদেব*, পৃ. ১১৪

১৩. শিবনারায়ণ রায়, *'বাংলার রেনেসাঁস ও ইতিহাস তত্ত্ব', স্রোতের বিরুদ্ধে,* ১৯৮৪, পৃ. ১০৩
১৪. Sumit Sarkar, *A Critique of Colonial India,* 1985, p. 13
১৫. J. A. Symonds, *Ibid,* vol. 2
১৬. "The reawakening faith in human reason, the reawakening belief in dignity of man and the desire for beauty, the liberty, audacity and passion of the Renaissance received from Greek Studies their strong est and most vital impulse."— J. A. Symonds, *Ibid,* p. 82
১৭. ......"not because it was classical or ancient, but because it was wholly uneffected by Christian religious theme." — W. Ullman, *Mediaval Foundation of the Renaissance Humanism,* London, 1977, p. 107
১৮. J. A. Symonds, *Ibid,* vol. I, pp. 10-11
১৯. "The Middle Ages had said or had pretented to say 'No' to life ;the Renaissance, with all its heart and soul and might, said 'Yes'. W. Durant, *The Story of Civilization,* vol. V, The Renaissance, New York, 1953, p. 581
২০. ......'first cultural and social breach between the Middle ages and Modern times'. — M. A. Von, *Sociolgy of the Renaissance* (Tran) England, 1944, p. 3
২১. উদ্ধৃত শিবনারায়ণ রায়, 'রেনেসাঁস ও ইতিহাসতত্ত্ব', *স্রোতের বিরুদ্ধে,* পৃ. ৪৬
২২. F. Engels, *Dialectics of Nature,* pp. 1-3
২৩. J. Huizinga, *Man and Ideas, the problem of Renaissance,* London, 960.
২৪. (Renaissance— S. M.) 'the setting sun all Europe mistook for dawn' — V. Hugo. Quoted L. W. Spitz, *Ibid,* p. 230
২৫. "The Renaissance, it seems to me, was essentially an age of transition, containing much that was still mediaval, much that was recognizably modern and also, much that of the mixture of mediaval and modern elements, was peculiar to itself and was responsible for its contradic tion and contrasts and its amazing vitality." —W. K. Ferguson, 'The Reinterpretation of the Renaissnce' *Facets of the Renaissance,* California, 1954, p. 16
২৬. Sumit Sarkar, *Ibid,* p. 13
২৭. শিবনারায়ণ রায়, *তদেব,* পৃ. ৪৮-৪৯
২৮. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি', ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা, আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত, ৯ মার্চ, ১৯৯১; *"সমাজ সমীক্ষা"* ২৯-৩০, পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ৩৭-৫৫
২৯. 'The Mediteranian Sea served as a high way of Italy's merchants'. — L. W. Spitz, *Ibid,* p. 17

৩০. Quoted Sismondi, *History of the Italian Republic*, p. 527
৩১. F. Gilbert, *The Pope, his Banker, and Venice*, 1980
৩২. R. D. Roover, *The Rise and Decline of the Medici Bank 1397-1494*, Cambridge, 1964
৩৩. I. Origio, *The Merchant of Prats : The Life and papers of Francesco De Marco Datini*, London, 1957
৩৪. G. A. Brucker, 'The Pattern of Social Change', *The Florentine politics and Society*, Princeton, 1962
৩৫. M. M. Paston, 'The Risc of Money Economy', *"Economic History Review"*, XIV, 1944
৩৬. A. M. Von, *Ibid*, p. 15
৩৭. W. Durant, *Ibid*, p. 68
৩৮. M. Dobb, *Modern Capitalism : Its Origin and Growth*, London, 1928; *Studies in the Development of Capitalism*, London, 1948
৩৯. J. R. Hale (ed), *A Concise Encyclopaedia of Italian Renaissance*, G. B. 1981.
৪০. W. Durant, *Ibid*, p. 687
৪১. R. S. Lopez, 'Hard times and Investment in Culture', *The Renaissance: A Symposium*, New York, 1953
৪২. R. S. Lopez & H. S. Miskimin, The Economic Depression of the Renaissance, *"The Economic History"*, XIV, 1962
৪৩. *Ibid*
৪৪. "During the Renaissance many merchants were less busy, or, at least thought they could spare more time for culture." — A. Malho (ed), *Social and Economic Foundation of the Italian Renaissance*, U. S. A., 1969, p. 115
৪৫. W. K. Ferguson, 'Renaissance Economic Historiography', A. Malho (ed), *Ibid*, pp. 120-122
৪৬. R. S. Lopez, *Ibid* (Tran. S. M.)
৪৭. "I hope I have said enough to show that the Renaissance was neither an economic golden age, nor a smooth transition from mediaval well being to modern prosperity." — R. S. Lopez, *Ibid*
৪৮. P. J. Jones, 'Florentine Families and Florentine Diaries in the Fourteenth Century', *Papers of the British School at Rome*, XXIV (N. S. vol. XI)
৪৯. A. Malho, *Ibid*, Introduction

৫০. G. Villani, 'The Greatness of Florence', A. Malho (ed), *Ibid*, p. 21
৫১. F. Antal, 'Florentine Paintings and its Social Background', London, 1947
৫২. A. Malho, *Ibid*, p. 7
৫৩. A. M. Von, *Ibid*, p. 60
৫৪. P. J. Jones, *Ibid*, A. Malho (ed), *Ibid*, p. 4
৫৫. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁসের পোপ', পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর দশম বার্ষিক অধিবেশনে 'বহির্ভারত বিভাগে' উপস্থাপিত গবেষণা-নিবন্ধ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩-৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩; "*ইতিহাস অনুসন্ধান ১০*" প. ব. ইতিহাস সংসদ, ১৯৯৪, পৃ. ৬৭১-৬৭৪.
৫৬. W. K. Ferguson, 'The Church in a Changing World' "*American Historical Review*", 59, 1953, pp. 1-18
৫৭. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 172
৫৮. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 341
৫৯. W. Durant, *Ibid*, p. 161 .
৬০. W. Ullman, *Ibid*
৬১. O. P. Kristller, *Renaissance Thought: The Classic, Scholastic and Humanist Stains*, New York (1955), 1961
৬২. 'We Must not label the Renaissance as unchristian.' — J. Huizinga, *Man and Ideas, The Problem of Renaissance*, London, 1960, p. 271
৬৩. G. Vasari, *Artists of the Renaissance*, (1550), English Edition 1965, p. 240
৬৪. E. Male, *The Early Churches in Rome*, p. 29
৬৫. G. R. Potter (ed), *The New Cambridge Modern History*, vol. 1, Cambridge, 1957, p. 136
৬৬. W. Durant, *Ibid*, p. 296
৬৭. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'ইতালীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি মিথ'. পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর ৮ম বার্ষিক অধিবেশনে (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৮. ৯. ১৯৯১) 'বহির্ভারত বিভাগে' উপস্থাপিত নিবন্ধ। "*ইতিহাস অনুসন্ধান*"-*৭ম খণ্ড*, ১৯৯৩, পৃ. ৬৮৪-৭০০
৬৮. ঐ, 'দান্তের মূল্যায়ন' (মতামত), "*চতুরঙ্গ*", বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৯, জানুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ৭৬০-৭৬৫
৬৯. D. Bush, *Renaissance and English Humanism*, Canada, 1939, p. 55
৭০. —*Ibid*, p. 64
৭১. —*Ibid*, Chap-III, pp. 69-100
৭২. V. Cronin, *The Flowering of the Renaissance*, London, 1969
৭৩. S. Drake, 'Mathematics, Astronomy and Physics in the Work of Galileo', C. S. Singleton (ed), *Art, Science and History in the Renaissance*, U. S. A. 1967, pp. 305, 332

৭৪. H. Butterfield, *Origins of Modern Science*, 1949 ; L. L. Snyder, *The Making of Modern Man*, U. S. A.. 1967, p. 236
৭৫. D. Bush, *Ibid*, pp. 91-92
৭৬. L. L. Snyder, *Ibid*. p. 48
৭৭. ....."advocates of science could say that classical sciences are obsolete that the Humanists considered a party of reaction, an impediment in the way of progress." —D. Bush, *Ibid*, pp. 91-92
৭৮. D. Bush, *Ibid*, pp. 92, 94
৭৯. P. Smith, *Erasmus : A Study of his Life, Ideals and Place in History*, New York, 1923 ; L. L. Snyder, Ibid, p. 62
৮০. C. G. Nauert, Jr., 'Humanist Infiltration into the Academic World: Some Studies of Northern Universities', *"Renaissance Quarterly"*, The Renaissance Society of America, New York, vol. XLIII, Num. 4, Winter 1990
৮১. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 169
৮২. L. W. Spitz, *Ibid*, p. 169
৮৩. J. Burckhardt, *Ibid*, pp. 314-320
৮৪. M. M. Bullard, The Inward Zodiac : A Development in Ficino's Thought on Astrology, "*R. Q.*", vol. XLIII, Num. 4, Winter 1990, pp. 687-708
৮৫. J. Burckhardt, *Ibid*, Chap-VI
৮৬. R. S. Kinsman (ed), *The Darker Vision of the Renaissance*, California, 1974
৮৭. O. Niccoli, *Prophecy and People in Renaissance Italy* (Tran), L. G. Cochrane, Princeton
৮৮. L. L. Snyder, *Ibid*, p. 46
৮৯. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম', '*সংস্কৃতি*", দ্বিভাষিক গবেষণামূলক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৪, পৃ. ৭৫-৯৬
৯০. 'A philosophy of education that favoured classical studies'; .... 'an Intellectual movement, primarily literary and philological which was rooted in the love of and desire for the rebirth of classical antiquity.' — L. W. Spitz, *Ibid*, p. 139
৯১. Quoted L. W. Spitz, *Ibid*, p. 140
৯২. J. A. Symonds, *Ibid*. vol. 2, Age of Revival
৯৩. S. Dresden, *Humanism in Renaissance*, London, 1968
৯৪. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 397
৯৫. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 57
৯৬. E. Hutton, *Pietro Aretino, The Scourge of Princes*, London, 1922

৯৭. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 206

৯৮. D. Javitch, '*IL CORTEGIANO* and The Constraints of Despotism', R. H. Hassning and D. Rosand (ed), *Castiglione : The Ideal and the Real Renaissance Culture*, Yale University Press, London, 1983, p. 26

৯৯. G. C. Beck, *Raphael*, New York, 1976 ; W. Durant, *Ibid*, p. 513

১০০. W. Rospigliosy, *Ibid*, p. 102

১০১. W. Shepherd, *Life of Poggio Braciolini*, (Florence, 1825), Liverpool, 1837; L. W. Spitz, *Ibid*, p. 152

১০২. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 176

১০৩. R. E. Proctor, 'The Studia Humanities : Contemporary Scholarship and Renaissance Ideals', "*R. Q.*", vol. XLIII, Num-4, Winter 1990, p. 816

১০৪. E. Garin, *Italian Humanism* (Tran. by P. Munz) Rpt..Westport, Conn: Green Wood Press, 1975 ; Alberti Battista, *LIBRI DELLA FAMIGLA (Treatise on Family Life)*

১০৫. শিবনারায়ণ রায়, *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়*, এপ্রিল ১৯৮১

১০৬. J. Huizinga, *Ibid*, p. 284

১০৭. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'ইতালীয় রেনেসাঁসের সমাজচিত্র : সাধারণ মানুষ', ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস্, কলকাতা, আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত, ৭ই আগষ্ট ১৯৯৩ ; *"সমাজ সমীক্ষা"*, সপ্তম বর্ষ, ৪র্থ-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯৪

১০৮. "Common man is merely a part of the background against which these glittering figures move". —E. R. Chamberlin, *Everyday Life in Renaissance Times*, G. B. 1965, p. 86

১০৯. ......"the rich got richer while the poor got poorer, we must remember that it was concentrated wealth rather than widely distributed prosperiety that was responsible for the patronage for art, letters, music and all the higher forms of intellectual and aesthetic culture". —W. K. Ferguson, 'Renaissance Economic Historiography', A. Malho (ed), *Ibid*, p. 121

১১০. Gene A. Brucker, *Ibid*

১১১. J. R. Hale (ed), *A Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance*, G. B. 1981

১১২. J. Blum, *The peasantry from the Thirteenth Century to the Nineteenth Century*, Publication No. 33, Service Centre for Teachers of History, The American Historical Association, Washington, 1960, pp. 18-20

১১৩. J. R. Hale (ed), *Ibid*, Population

১১৪. L. L. Snyder, *Ibid*, p. 115

১১৫. "The land which he tilled could never belong to him, its ownership was divided and subdivided ; tenant was super imposed upon ten ant..... but it was the tiller of the land who paid taxes not the land-lord." —E. R. Chamberlin, *Ibid*, Chap-IV, p. 97

১১৬. E. R. Chamberlin, *Ibid*, p. 94

১১৭. "The closing year of the Middle Ages and the opening years of the Renaissance were marked by violent if hopeless rebellion of the lower classes, eruptions from the sullen pool which was marked by the glittering surface of the new society." —E. R. Chamberlin, *Ibid*, p. 86

১১৮. P. F. Grendler, *Schooling in Renaissance Italy : Literary and Learn ing 1300-1600*, Baltimore and London, 1989

১১৯. P. F. Grendler, *Ibid*

১২০. E. R. Chamberlin, *Ibid*, p. 95

১২১. "Whoever wishes to found a state and give it laws must start assum ing that all men are bad." —N. Machiavelli, *IL PRINCIPE* (The Prince), 1513 ; *The Portable Machiavelli* (Tran. P. Bondanella & M. Musa), N. Y. Viking Penguin, 1979

১২২. Guicciardini, *RICORDI*; Quoted L. W. Spitz, *Ibid*, p. 247

১২৩. W. Durant, *Ibid*, p. 596

১২৪. "At this period women stood on a footing of perfect equality with men". —J. Burckhardt, *Ibid*, p. 240

১২৫. P. F. Grendler, *Ibid*

১২৬. J. R. Hale (ed), *Ibid*, p. 121

১২৭. L. Martines, 'A Way of Looking at Renaissance Women in Renais sance Florence', *"Journal of Mediaval and Renaissance Studies"*, 1974

১২৮. C. Fahy, 'Three Early Renaissance Treatise on Women', *"Italian Studies"*, 1956

১২৯. "They praised women as patrons or muses and ignored their writing." —E. V. beilin, *Redeeming Eve*, Princeton University Press

১৩০. J. R. Hale (ed), *Ibid*, p. 348

১৩১. W. Durant, *Ibid*, p. 576.

১৩২. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 153

১৩৩. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 22

১৩৪. P. F. Grendler, *Ibid*
১৩৫. 'Italy was rich and fair and weak, not yet a country but only a peninsula.' —W. Durant, *Ibid*, p. 613
১৩৬. W. Durant, *Ibid*, p. 440
১৩৭. W. Durant, *Ibid*, p. 616
১৩৮. .... "Italy more enslaved than Hebrew, more oppressed than Persians, more scattered than Athenians without order." —Machiavelli, Quoted in W. Durant, *Ibid*, p. 563
১৩৯. W. Durant, *Ibid*, p. 613
১৪০. W. Durant, *Ibid*, p. 636
১৪১. "Three things I would see before I die. And yet though I were to live to a great age, I fear I shall see none of them. I desire to see a well ordered republic established in Florence; Italy free from all the barbarian invaders : and the world delivered from the tyranny of these rascally priests". —Guicciardini, RICORDI, Series-1, No. 14. (Tran. and quoted by L. W. Spitz, p. 233)
১৪২. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'কী ধরনের কসমোপলিটান সমাজ আমাদের কাম্য?' *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২, শরৎ ১৪০০
১৪৩. J. A. Symonds, *Ibid*, vol 1, Age of Despot
১৪৪. A. Ventura, 'The Triumph of the Aristocracy in Veneto', Reprinted in A. Malho (ed), *Ibid*, p. 171
১৪৫. W. Durant, *Ibid*, p. 71-75
১৪৬. L. L. Snyder, *Ibid*, p. 119
১৪৭. O. Prescott, *Ibid*, p. 37
১৪৮. Guicciardini, *Ibid*
১৪৯. R. H. Bainton, *Ibid*
১৫০. M. P. Gilmore, *Humanists and Jurists*, G. B. 1963
১৫১. L. W. Spitz, *Ibid*, p. 248
১৫২. W. Rospigliosi, *Ibid*, pp. 149-162
১৫৩. W. Durant, *Ibid*, p. 637
১৫৪. 'Drop by drop Italy was being drained of blood' —J. A. Symonds wrote in his conclusion, Chap IX, p. 373, *Ibid*, vol. 2, p. 321
১৫৫. "Like the jack ass in the fable they put on the dead lion's skin of his manner and brayed beneath it thinking they would roar". —J. A. Symonds, *Ibid*. vol. 3, Fine Arts, p. 362
১৫৬. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 369

১৫৭. A. M. Von, *Ibid*

১৫৮. F. Petrarcha, *Lives of the Illustrious Men;* M. Bishop, *Petrarch and his World,* Bloomington, 1963

১৫৯. J. H. Hale (ed), *Ibid*

১৬০. J. D. Neva, 'Reflecting Lesser Lights : The Imitation of Minor Writers in the Renaissance', *"R. Q."*, vol. XLII, Num 3, Autumn 1989, pp. 449-479; G. L. Burns, What is Tradition? *"New Literary Hisrtory"*, vol. 22, Num. 1, Winter 1991. —'I excert all my mental powers to flee contemporaries and seek out the men of the past.' —Petrarch

১৬১. G. E. Sundys, *History of Classical Scholarship*, vol. 2, Cambridge, 1908, p. 13

১৬২. Ian Thomosn, 'The Scholar as Hero in Ianus Pannonius Panegyric on Guarinus Veronenses.' *"R. Q."* vol. XLIV, Num. 2, Summer 1991

১৬৩. W. H. Woodward, *Vittorino Da Feltre and Other Humanist Educators,* Cambridge, 1918

১৬৪. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 275

১৬৫. "Greece has not perished but has migrated to Italy, Which in former days was called greater Greece." —W. Durant, *Ibid*, p. 379

১৬৬. "Happy these, our times in which, if we endavour a little more, I am confident that Roman Language will soon grow ever more verdant that the city itself, and with it all learning be restored." —L. Valla, *ELENGANTLAE LINGUE LATINAE (Elegancies of The Latin Language)*, 1440

১৬৭. J. P. Mohaffy, 'What the Greeks have done for the modern civilization?' Quoted in G. C. Sellery, *The Renaissance, its Nature and Origin,* Wisconsin, 1950, p. 128

১৬৮. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 1, Chap. 1

১৬৯. W. Ullman, *Ibid,* p. 102

১৭০. E. Garin, *Ibid*

১৭১. M. A. Von, *Ibid,* p. 43

১৭২. "Humanists believed that an education based on reading of classical literature had the power to liberate man and to form him spiritually" —O. P. Kristeller, *Ibid.* Quoted in P. Bondanella & J. Bondanella (ed), *Ibid,* p. 279

১৭৩. "This is the culminating gift of God, this is the supreme and marvellous felicity of man ...... that he can be which he wills to be. ...

but God the father endowed man, from birth with the seeds of every possibility and every life." — Pico Della Mirandolla, *ORATIO DE HOMINIS DIGNITATE (Oration on the Dignity of Man)*

১৭৪. L. Valla, *'DE FALSO CREDILA ET EMENTITA CONSTANTINI DONATIONE DECLAMATIO'* (1440) ; *The Treatise of Lorenzo Valla On Donation of Constantine,* New Haven, Conn : Yale University Press, 1922.

১৭৫. B. Castiglione, *IL LIBRO DEL CORGENIANO (The Book of the Courtier)* 1528, Tran. C. S. Singleton, Garden City, New York, 1959

১৭৬. 'The original humanities offered confidence in a self, One's own self' — R. E. Procter, 'The Studia Humanities : Contemporary Scholarship and Renaissance Ideals', *"R. Q."*, vol. XLIII, Num. 4, Winter 1990, pp. 815-817—'It you have yourself, that is enough', Petrarcha, *Familiaries"*, 8. 1. 18 ·

১৭৭. "Human existence is iron. When nothing is done with it, it rusts. It is only through constant activity that polish is secured"—Aldo Manutius told in 1490 Quoted L. W. Spitz, *Ibid*, p. 188

১৭৮. 'Man is bron in order to be useful to man.' — Alberti Battista, *LIBRI DELLA FAMIGLA (Treatise on Family life)*; P. Bondanella & J. Bondanella (ed), *The Macmillan Dictionary of Italian Literature,* London, 1979, p. 280

১৭৯. "Humanism was thus an education for life, the building of a new society and a new world". — E. Garin, *Ibid*

১৮০. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় 'ইতালীয় রেনেসাঁসের শিল্প-ভুবন পরিক্রমা : স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা', *"শারদীয় যুবমানস"*, ১৯৯৩, পৃ. ১৯৩-২০২

১৮১. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 3, p. 1
'Like today's science during the Renaissance, Art excercised alike controlling influence.' — W. Durant, *Ibid*, p. 529

১৮২. P. Murray, *The Architecture of the Italian Renaissance*, London, 1963

১৮৩. Alberti, *Ten Books of Architecture*, Translated by L. Leoni, Book-VI, Chap. 2, 1755

১৮৪. J. A. Symonds, *Ibid*, W. Durant, *Ibid*, p. 87

১৮৫. J. A. Symonds, vol. 3, *Ibid*, p. 11

১৮৬. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 88

১৮৭. Flaxman, *Lecture on Sculpture*, p. 310

১৮৮. Quoted in W. Durant, *Ibid*, p. 92

১৮৯. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 104

১৯০. W. Pater, *Ibid*, p. 58
১৯১. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 14
১৯২. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 23
১৯৩. W. Durant, *Ibid*, p. 86
১৯৪. W. Durant, *Ibid*, p. 86
১৯৫. W. Durant, *Ibid*, p. 461
১৯৬. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 139
১৯৭. I. A. Richter, *Ibid*, Chap IV, p. 193 onward
১৯৮. W. Durant, *Ibid*, p. 667
১৯৯. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 200
২০০. W. Durant, *Ibid*, p. 665
২০১. 'A return to antiquity'; "Raphael represents return to antiquity and Leonardo return to nature." — W. Durant, *Ibid*, p. 460; W. Pater, *Ibid*, p. 86
২০২. W. Durant, *Ibid*, p. 234
২০৩. G. Vasari, *Ibid*, Quoted O. Prescott, *Ibid*, p. 36
২০৪. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 201
২০৫. W. Durant, *Ibid*, p. 115
২০৬. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 62; W. Roscoe, *Life of Lorenzo de Medici called Magnificient*, London, 1799
'High born Lorenzo-laurel in whose shade.
Thy Florence rests nor fears the towering
Storm......
Nursed in the shade thy spreading branch
Supplies
Tuneless before, a tuneful swan I rise.'—Poliziono
২০৭. W. Durant, *Ibid*, p. 508; Lanciani, *The Golden Days of the Renais sancc in Rome*, Boston, 1904, p. 302
২০৮. P. Munz, *Raphael*, p. 420
২০৯. 'The Cinquecento is the Triumph of Aristocracy.' — A. Ventura, *Ibid*
২১০. 'Instead of Patriotism the Italians were inflamed with the zeals of cosmopolitan.' — J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 11
২১১. W. Durant, *Ibid*, p. 379
২১২. "The Renaissance man was always in motion and discontent, fretting at limits, longing to be an universal man". — W. Durant, *Ibid*, p. 580
২১৩. "Toward almost all nations I am what is called blank paper" — Erasmus told. — J. Huizinga, *Erasmus*, New York, 1924 ; L. W. Spitz,

Ibid, p. 294

২১৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'কী ধরনের কসমোপলিটান সমাজ আমাদের কাম্য', *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২, শরৎ ১৪০০

২১৫. M. Luther, *Address to the German Nobility*, 1517; R. H. Bainton, *Ibid*, p. 131

২১৬. A. M. Von, *Ibid*, p. 37

২১৭. "Birth decides nothing, so as to goodness or badness of a man. Modern distinction based on culture and on wealth." —J. Burckhardt, *Ibid*, pp. 217-222

২১৮. J. R. Hale (ed), *Ibid*

২১৯. W. Rospigliosi, *Ibid*, pp. 149-166

২২০. W. Rospigliosi, 'Pius-II Peasant, Humanist, Diplomat', *Ibid*

২২১. Poliziaono wrote, "Lorenzo raised me from the obscure and humble station where my birth placed me, to that degree of dignity and distinction I now enjoy, with no other recommendation than my literary ability."—J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, pp. 250-251

২২২. A. M. Von, *Ibid*, p. 15

২২৩. W. Durant, *Ibid*,. p. 92

২২৪. G. Vasari, *Artists of the Renaissance*, (Eng. Tran), 1965 *(LE VITE DE, PIN ECCELLENTI ARCHITETTI : PITTORI ET SCULTORI ITALIANI DA CIMABUE IN SINO A TEMPI NOSTRI*, 1550)

২২৫. J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy*; *English Edition*, London, 1945, *(DIE CULTUR DER RENAISSANCE IN ITALIEN*, 1860)

২২৬. E. Cassirer, Individual and Cosmos in the Philosophy of the Renais sance, 1927, *(INDIVIDUUM UND KOSMOS IN DER PHILOSOPHIE DER RENAISSANCE)*

২২৭. E. Cassirer, Kristller and Randal, *The Renaissance Philosophy of Man*, 1950; D. Koenigsberger, *Renaissance Man and Creative Think ing : A History of Concepts of Harmony*, 1400-1700, Sussex, 1979

২২৮. F. Engels, *Communist Manifesto*, First Italian Edition, Introduction, 1-2-1893

২২৯. O. Prescott, *Ibid*

২৩০. J. Burckhardt, *Ibid*, p. 86

২৩১. E. Garin, *Science and Civic Life in the Italian Renaissance*, (Tran. P. Munz), U. S. A., 1969

২৩২. D. Koeningsberger, *Ibid*, Chap 1, 'Leon Battista Alberti' ; D. Marsh,

Leon Battista Alberti, Dinner Picecs, A Translation of the Intercenales. Bringhamton, New York, 1987

২৩৩. "Where shall I put Alberti in what catalogue of learned man shall I place them?" —J. R. Hale, *Ibid*, p. 18

২৩৪. Quoted W. Durant, *Ibid*, p. 226

২৩৫. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 3, p. 235

২৩৬. Vinci Wrote in the application letter for service :

1. I have plans of bridges, very light and strong and suitable for carrying very easily ....
2. When a place is besieged, I know how to remove the water from the trenches ....
3. .... I have plans for destroying every fortress of other strong ho'd even it were founded on rock.
4. I have plans of mortars most convenient and easy to carry with which to harl small stones in the manner almost of a storm;.......
5. Also I have means of arriving at a fixed spot by caves and secret and winding passage....... to pass underneath trenches or a river.
6. Also I will make eovered cars, safe and unassailable which will enter among the enemy with their artillery,......
7. Also, If need shall arise, I can make canon, mortars and light ordnance of very useful ....
8. .....In short, to meet the variety of circumstances, I shall contrive various and endless means of attack and defence.
9. In time of peace I believe I can give perfect satisfaction, equal to that of any other, in architecture and the construction of buildings both private and public and in conducting water from one place to another.

   Also I can carry out sculpture in marble, bronze of clay, and also I can do in painting whatever can be done, as well as any other, be he who may....... And if any of the aforesaid things should seem impossible or impracticable to anyone I offer myself as most ready to make the trial of them in your park, or in whatever place may please your Excellency, to whom I command myself with all possible humility.

   —W. Durant, *Ibid*, pp. 202-203; I. A. Richter (ed), *Ibid*, pp. 294-296

২৩৭. F. Engels, *Dialectics of Nature*, pp. 1-3

তৃতীয় অধ্যায়	বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা ঃ রামমোহন

রবীন্দ্রনাথকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁর জীবনের আদর্শ-পুরুষ কে? এই ধরনের অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও এই প্রশ্নটির উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন লিখিতভাবে। তাঁর জীবনের হিরো 'রামমোহন রায়'।[১] ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দিক থেকে শুধু নয়, উত্তরটিকে আমরা গ্রহণ করতে চাই একটু ঐতিহাসিক তাৎপর্যে অন্বিত করে। উনিশ শতকের কলকাতায় যে জাগরণের পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার পুষ্পিত পরিণাম। শিকড় থেকে বৃন্তে অখণ্ড রস-চলাচলের যে কার্য-কারণ সূত্র থাকে, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে ক্রিয়াশীল ছিল সেই সাংস্কৃতিক বিকাশ-সূত্র। রামমোহনকে আদর্শ-পুরুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতি যেন পুষ্পিত পরিণামের শিকড়-প্রণাম। রামমোহনই ছিলেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা-পুরুষ।

এশিয়াটিক সোসাইটি কি রেনেসাঁসের সূচনাবিন্দু

অনেকেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস শুরু করতে চেয়েছেন উইলিয়াম জোন্সের (১৭৪৬-১৭৯৪) উদ্যোগে কলকাতায় স্থাপিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪, ১৬ই জানুয়ারি) থেকে। বিশেষ করে ডেভিড কফ *'ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড দি বেঙ্গল রেনেসাঁস'* গ্রন্থে একে একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছেন।[২] পুঁথি-সংগ্রহ ও প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র গুরুত্ব অপরিসীম হলেও বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি খুব স্পষ্ট নয়। যে-যে কারণে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'কে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাবিন্দু বলা সঙ্গত নয় বলে মনে করি, সেগুলি সূত্রাকারে এইরকম—

(ক) ১৭৮৪, ১৬ই জানুয়ারি 'এশিয়াটিক সোসাইটি' তার যাত্রা শুরু করেছিল ৩০জন কলকাতা-প্রবাসী ইওরোপীয় কৃতবিদ্য নাগরিক-সদস্য নিয়ে। ১৮২৯ সালের আগে সেখানে দেশীয় সদস্য গ্রহণ করা হয়নি।[৩] অর্থাৎ প্রথম ৪৫ বছর 'সোসাইটি' ছিল আক্ষরিক অর্থে সাহেবদের প্রতিষ্ঠান। ১৮২৯, ৪ মার্চ সেখানে সভ্যপদ পান প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস এবং রামকমল সেন। রামমোহনের বিদেশ যাত্রা পর্যন্ত (১৮৩০, ১৯ নভেম্বর) মোট ১৩ জন ভারতীয় কলকাতা 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভ্য হয়েছিলেন। এর মধ্যে রাধাকান্ত দেবও মেম্বর হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রামমোহনের নাম প্রস্তাবিত হয়নি।[৪] 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র সঙ্গে সম্পর্ক-সূত্র ছাড়াই রামমোহনের মতো উত্তুঙ্গ ব্যক্তি-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। বাংলার জাগরণের ক্ষেত্রে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সূচনাগত ভূমিকাটি তাই অস্পষ্ট।

(খ) রেনেসাঁসের আক্ষরিক লক্ষণ অনুযায়ী গ্রন্থ-সংগ্রহ ও প্রাচীন বিদ্যাচর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সন্দেহ নেই। টীকা বা অনুবাদকর্ম 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র বিদ্বজ্জনেরা করেছিলেন মূলত ইংরাজিতে। 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭, ২০ জানুয়ারি) স্থাপিত হওয়ার আগে

বাঙ্গালীর ইংরাজি-জ্ঞান ছিল অনুল্লেখ্য। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-কৃত অনুবাদ বা সটীক সম্পাদনাগুলির উদ্দিষ্ট পাঠকরা ছিলেন ইওরোপীয় ও ইওরোপের পাঠক-সমাজ। প্রথম দিকে বঙ্গীয় সমাজের সঙ্গে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র বিদ্যাচর্চার চলাচলের কোন সেতুই ছিল না।

(গ) ইতালিতে হিউম্যানিস্টরা প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যার চর্চায় নিরত হয়েছিলেন নিছক গ্রীক বা লাতিন-চর্চার জন্য নয়। ক্রান্তিকালীন একটা সময়-পর্বে তাঁরা এর দ্বারা ইতালির সাংস্কৃতিক আবহটি বদল করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন বিদ্যাচর্চার অর্ঘ্যে তাঁরা অভ্যর্থনা করেছিলেন নতুন যুগকে। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার পিছনে সেই ধরনের কোনো তাগিদ ছিল না। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নবত্ব সঞ্চার করার কোনো ক্রান্তিকারী ভূমিকা তা পালন করেনি। ডেভিড কফের রেনেসাঁস-প্রকল্প 'এশিয়াটিক সোসাইটি' থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে। রাধাকান্ত দেবদের মধ্যে তিনি দেখেছেন, সেই প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার ভারতীয় উত্তরসূরিত্ব।[৫] অর্থাৎ 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চা দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে কোনও নবত্ব সঞ্চার করতে পারল কি না—এই মৌলিক প্রসঙ্গটিই উপেক্ষিত থেকে গেছে।

(ঘ) 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপনের মূল প্রেরণা ও কার্য-কারণ সন্ধান করতে আমাদের তাকাতে হবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপীয় মনীষার গতি-প্রকৃতির দিকে। সে-সময় শিল্পসভ্যতার ক্রমবিকাশ ইওরোপকে ক্রমশ উপনিবেশবাদের দিকে ঠেলে দেয়। শিল্পসভ্যতাপ্রসূত যান্ত্রিক জীবনচর্যা তার সৃজনশীল কবি-শিল্পী ও মননশীল বুদ্ধিজীবীদের একটা সংকটে ফেলে দিয়েছিল। যান্ত্রিক জীবনচর্যার বিশুষ্কতা থেকে মুক্তি পেতে তার কবি-শিল্পীরা সেখানে গড়ে তোলেন রোমান্টিকতার আন্দোলন। যে জীবন একদা ছিল, কিন্তু এখন নেই, সেই সোনালি অতীতের মধ্যে এবং গ্লানিময় পারিপার্শ্বিক জীবনের হাত ছাড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রস-রহস্যে প্রবেশ করলেন ইওরোপের কবিকুল। আর তার বুদ্ধিজীবীরা খোঁজ করছিলেন নতুন রহস্য-দ্বীপের আশ্রয়। উপনিবেশবাদ তাদের সেই সুযোগ এনে দেয়। উপনিবেশবাদ কবলিত দেশগুলির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-সন্ধানের অ্যাডভেঞ্চার তাঁদের পেয়ে বসে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পথে, ইওরোপীয় মনীষীদের প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার নানা সাগ্রহ চেষ্টার মধ্যে ফুটে উঠেছে, সেই আশ্রয়কামী অ্যাডভেঞ্চারের লক্ষণমালা। বৌদ্ধিক আশ্রয়ান্বেষণের সঙ্গে অবশ্যই মিশেছিল বিজয়ী জাতির বৌদ্ধিক গরিমাবোধ। প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যও, তাঁরা নিজেদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সাধন করেছিলেন, যা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো নির্ভেজাল জ্ঞানসাধকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি লিখেছেন,

> "কেবল এশিয়া, আফ্রিকা বা আমেরিকার স্বর্ণ-রৌপ্য, পণ্য-দ্রব্য প্রভৃতি পার্থিব সম্পদেই ইউরোপের মনীষা তুষ্ট থাকিতে পারিল না। এই মনীষা বিশেষ করিয়া এশিয়াখণ্ডের সুসভ্য জাতিগণের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান-আহরণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল।....এইভাবে ইউরোপ এক অভিনব সভ্যতাজগতের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ লাভ করিল। Exploitation of material wealth-এর পাশে Exploitation of intellectual and spiritual wealth-এর

প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষণা একটি নূতন বিদ্যারূপে ইউরোপের মানসিক চর্চা ও চর্যার ক্ষেত্রে এইভাবে একটি বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করিল।"[৬]

এই পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪)। ইওরোপীয় মনীষার অষ্টাদশ শতকীয় গতিপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল উইলিয়াম জোন্সের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার বিস্ময়কর আগ্রহের রহস্য। সারা ইওরোপ জুড়ে প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চার যে তৃষিত আগ্রহ তখন অঙ্কুরিত হচ্ছিল, উইলিয়াম জোন্স হচ্ছেন তারই প্রতিনিধি। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪) প্রসঙ্গে প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চার সমকালীন কিছু উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার ছ'বছর আগেই ওলন্দাজ পণ্ডিতরা জাভা বা যবদ্বীপের বাটাভিয়াতে প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চার কেন্দ্র খুলে ছিলেন। ইওরোপের বিভিন্ন শহরে প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী নগরীতে 'সোসাইটিক এশিয়াটিক', ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড', ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় 'ওরিয়েন্টেল সোসাইটি', ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে 'ওরিয়েন্টেল সোসাইটি' প্রভৃতি স্থাপিত হয়।[৭] এগুলিকে বলা যেতে পারে কলকাতায় স্থাপিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র ইওরোপীয় কাউন্টার পার্ট। ঔপনিবেশিক বাণিজ্য-প্রক্রিয়ার দু'টি ঘাঁটি থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দপ্তর যেমন কলকাতা ও ব্রিটেন দু'জায়গাতেই ছিল। সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ইওরোপীয় চাহিদা পূরণের একটি রপ্তানি-কেন্দ্র বিশেষ। প্রতিষ্ঠানটির স্থাপন-ইতিহাসের মূল রহস্য যেমন নিহিত ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপীয় মনীষার গতি-প্রকৃতির মধ্যে ; তার মূল উদ্দেশ্যও ছিল মূলত ইওরোপের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করা। তাই 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ইওরোপকে যে পরিমাণে প্রাণিত ও দীক্ষিত করেছিল, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে সে ভূমিকা স্বভাবতই পালন করতে পারেনি। বঙ্গীয় জাগরণের সঙ্গে তার উদ্দেশ্য বা বিধেয়গত কোনো সম্পর্কই ছিল না। একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, বঙ্গীয় রেনেসাঁস তার কাছ থেকে কিছুই পায়নি। সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) পর্যন্ত।[৮] সে আর এক গৌণ আলোচনার বিষয়। আমাদের বক্তব্য, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাবিন্দু হিসাবে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'কে চিহ্নিত করা বা উইলিয়াম জোন্সে রেনেসাঁসের 'ফাদার ইমেজ' আরোপ করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে অনেকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আলোচনা শুরু করেছেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে সূচনাগত গুরুত্বে কি কারণে অধিষ্ঠানযোগ্য, তা নিয়ে খুব স্পষ্ট করে কোনও আলোচনা করা হয়নি। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এটি ছিল প্রশাসনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। যতদিন কোম্পানির একমাত্র কাজ ছিল মাল কেনা, হিসাব রাখা, জাহাজের মালের ফর্দ করা ; ততদিন অশিক্ষিত লোকদের দিয়ে কাজ

চলত। ইংলন্ডের পাবলিক স্কুল থেকে সামান্য বিদ্যা নিয়ে পনেরো-ষোলো বছরের বালকরা আসত 'রাইটার' হয়ে ; কোনও শিক্ষানবিশী না করে তারা গিয়ে বসত বড় বড় কাজে। লর্ড ওয়েলেসলি দেখলেন, এইসব ছোকরা এদেশে দু'তিন বছর থাকতে না থাকতে, ইওরোপের স্কুলে যা কিছু বিদ্যা আয়ত্ত করে এসেছিল, তা সবই ভুলে যেত, আর এশিয়ারও কিছু আয়ত্ত করতে পারত না। আর যারা স্বভাব-অলস ও উচ্ছৃঙ্খল, তারা জুয়া খেলে ও অন্যান্য পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়ে স্বাস্থ্য ও সম্পদ দুই-ই হারাত। এমতাবস্থায় তিনি বিলেত থেকে আগত যুবকদের সিভিলিয়ান করে তোলার জন্য, অর্থাৎ দেশীয় রীতিনীতি ও ভাষা-শিক্ষা দেবার জন্য, একটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই কলেজই 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'। সুতরাং উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এ-ধরনের প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হওয়াই সম্ভব। যদিও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'-এর কার্যারম্ভ হয়েছিল ; তথাপি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪মে-কে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঐদিন কলেজে অনুষ্ঠান করেন ওয়েলেসলি। কেননা তার ঠিক এক বছর আগে, ঐ দিনে ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে ধ্বংস করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম একদিক থেকে তারই বিজয়-স্মারক।[৯] বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা-প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা যাকে দেওয়া হবে, তার সম্পর্কে এই তথ্যটি অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়।

'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'-এর জন্ম-মৃত্যুর কাহিনী যাই হোক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগষ্ট লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট নিযুক্ত হন) তাঁর মিনিটের পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন, তা সত্যই সমীহ করার মতো। তাতে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যা নিয়মিতভাবে পঠন পাঠনের কথা বলা হয়েছিল।[১০]

মূলত লর্ড ওয়েলেসলির পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়েছিল এই কলেজ। তাঁর এই পোষকতার জন্য ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এক কবিতায়, তাঁকে এক কবি মেদিচি সদৃশ সম্মান দান করেন।[১১] পাঠ্যসূচির আপাত-বিশালতা ও কলিজিয়নসের বন্দনা-গীতি সত্ত্বেও 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' ছিল সিভিলিয়ানদের ট্রেনিং-সেন্টার ও ওয়েলেসসি ছিলেন এক বিদ্যোৎসাহী বড়লাট মাত্র। উইলিয়াম কেরীর মতো বিদ্বান মিশনারীর অধ্যক্ষতায় পণ্ডিত ও মুন্সীদের নিয়োগ করে, এখানে শিক্ষাদানের কাজ চালানো হতো। প্রয়োজনের চাপে এখানে নিযুক্ত পণ্ডিতরা কিছু বাংলা বই লিখেছিলেন, যা বাংলা গদ্যের উদ্ভবের ইতিহাসে একটা মাত্রা যোগ করেছিল। ডেভিড কফ অবশ্য এই প্রশাসনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির বিদ্যা-চর্চা ও এখানে নিযুক্ত পণ্ডিতদের অ্যাকাডেমিক ভূমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতদের তিনি রামমোহনের উপরে স্থান দিতে চান।[১২]

বাংলা গদ্যে কয়েকটি প্রাথমিক বই লেখা ছাড়া এখানকার শিক্ষককুল এমন কিছু করেননি, যা বঙ্গীয় সমাজের জাগরণের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করার যোগ্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে এমন কোনও ছাত্র উৎপন্ন হয়নি, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে যাঁর নাম কালির অক্ষরেও লেখার যোগ্য। বাংলার চলমান সমাজ ও বিদ্যাচর্চার গতিধারা পাল্টে দেওয়ার মতো, অনন্য বা বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব ফোর্ট উইলিয়ামের গদ্য-রচনাকারী পণ্ডিতদের ছিল না। সুতরাং রেনেসাঁসের সামান্য দু'একটি সূত্র এই কলেজের কর্মধারার মধ্যে

ক্রিয়াশীল থাকলেও তার গুরুত্ব এতদূর নয়, যাতে তাকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাবিন্দু বলা যায়।

আসলে কোন প্রতিষ্ঠান বা একাডেমি নয়, ব্যক্তি-মানুষের নির্ণায়ক ভূমিকাই রেনেসাঁসের সূচক।[১৩] উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য-সংস্কৃতির রপ্তানী-কেন্দ্র 'এশিয়াটিক সোসাইটি' বা সদ্য ইওরোপ থেকে আসা তরুণ সিভিলিয়ানদের দাঁতন কাঠি সরবরাহ করার জন্য স্থাপিত, 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'কে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচক বলার কোনো অর্থ হয় না।

শ্রীরামপুর মিশন

শ্রীরামপুর মিশনের সর্বাধ্যক্ষ, সুপণ্ডিত, মানব-হিতৈষী উইলিয়াম কেরীতেও এই 'ফাদার ইমেজ' আরোপ করা চলে না। ১৮০০ থেকে ১৮৩৪ অব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ৪০টি ভাষায় মোট ২ লক্ষ ১২ হাজার গ্রন্থের কপি মুদ্রিত করেছিল। তাদের মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ২৬১।[১৪] একথা মনে রেখেও বলা চলে, 'কলেজ ফর এশিয়াটিক ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ড আদার ইউথ'-এ সেবাইত শিক্ষককুল খ্রীষ্টীয় করুণা ও সেবার আদর্শ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। করুণা দিয়ে পতিতোদ্ধার হয়। পতিতোদ্ধার আর জাগরণ এক নয়। শিক্ষার আলোক-বিস্তারের ক্ষেত্রে মিশনারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, কিন্তু তাদের শিক্ষা ইওরোপের অগ্রগামী বুর্জোয়া শিক্ষার অংশ নয়। কি-ধরনের শিক্ষা তাঁরা বিস্তার করতেন, তার একটু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। Questions and Answers on the *First Scientific Copy Book* :

> "Q. Out of what was the earth created ?
> Ans. God created the earth and all things out of nothing.
> Q. How were men created ?
> Ans. God created all men of one blood.
> Q. What is more the value than the Sun, moon and stars?
> Ans. The soul of man.
> Q. Whence arise the rain and fruitful seasons ?
> Ans. God creats them."[১৫]

প্রাক্-বেকন যুগের এই খ্রীষ্টীয় শিক্ষা দিয়ে বাংলার জাগরণ হয়নি। পরবর্তীকালে পাদ্রিদের সঙ্গে রামমোহনের যে তর্কযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে প্রমাণিত হয়েছিল তাদের অপ্রগতিশীলতা ও একপেশে চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা। বস্তুতপক্ষে রামমোহন ছিলেন নবযুগের সেই কষ্টিপাথর যা দিয়ে যাচাই হয়েছিল সে-যুগের প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার ধারক-বাহকদের স্বরূপ। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রাচ্য-বিদ্যার কত পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছিল, বা 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' সিভিলিয়ানদের জন্য ক'টি বাংলা বই লিখেছিল, বা 'শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস' থেকে কত সংখ্যক বই ছাপা হয়েছিল—তা দিয়ে রেনেসাঁসের সূচনাবিন্দু নির্ণয় করা সঙ্গত নয়। এ-ব্যাপারে এমন ব্যক্তিপ্রতিভার দিকে আমাদের তাকাতে হবে, যার নির্ণায়ক ভূমিকা আমাদের সাংস্কৃতিক গড্ডল-প্রবাহে নিয়ে আসতে পেরেছিল

'চলতে চলতে নদীর বাঁক ফেরা'। আধুনিককালের বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে রামমোহনই সেই মানুষ, যিনি পুরানো বিশ্বাসের জড়তা থেকে জীবনকে উদ্ধার করার তাগিদ মর্মে-মর্মে অনুভব করে, বিদ্যা এবং জ্ঞানের কর্ষণ দিয়ে জীবন ও সমাজের সংরচনা-কর্মে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। ইতালির রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে পেত্রার্কার যে গৌরব, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে সেই গৌরব রামমোহনের প্রাপ্য।

রেনেসাঁস ঃ ব্যক্তিপ্রতিভার ভূমিকা

রেনেসাঁসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশ বিচ্ছুরণ ও কৃতিত্বের ইতিহাস। ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রে উত্তরণের সময় ইতালিতে হিউম্যানিস্ট আখ্যাত নতুন ধরনের বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যা ও মনন-চর্চার সৌজন্যে বদলে দিতে সক্ষম হন মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির গড্ডল-প্রবাহ। হিউম্যানিস্টদের নির্ণায়ক ভূমিকা ছাড়া রেনেসাঁস ছিল অকল্পনীয়।[১৬] চিন্তাশীলতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে এঁরা আঘাত ও লঙ্ঘন করেছিলেন পুরাতন পৃথিবীর অতিনিরূপিত সীমা ও রচনা করেছিলেন নতুন যুগের অভ্যর্থনাপত্র। রামমোহনকে আমরা পাই রেনেসাঁসের সেই হিউম্যানিস্টের ভূমিকায়।

রেনেসাঁসের মধ্যে উত্থিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি (ফ্যাকাল্টি) বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল, রামমোহনের মধ্যে তার পর্যাপ্ত সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিস্মৃত ও বিলুপ্ত প্রাচীনকে রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা উদ্ধার করেছিলেন আবিষ্কারকের মমতায়; আবার অগ্রগামী চিন্তা ও নীতিকে তাঁরা অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সাহস-বিস্তৃত বক্ষপটে। অন্যতর সংস্কৃতির হাতিয়ার নিয়ে তাঁরা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন ; একই সঙ্গে নবোদ্ভিন্ন জীবন ও যুগকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন। রেনেসাঁসের মানুষ 'ক্রিটিক্যাল' ও 'জেন্টল'। তাঁরা 'ক্রিটিক্যাল' অমানবিক সংস্কার ও জীর্ণ আচারের বিরুদ্ধে। বিদ্যা ও রুচির দিক থেকে তাঁরা অভিজাত, মার্জিত ও পরিশীলিত। ধর্মাচরণের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন গোঁড়ামিমুক্ত ও 'সেকুলার' ; মানবিক ও সাংস্কৃতিক ঔদার্যের দিক থেকে তাঁরা যত না স্বাদেশিক ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন 'কসমোপলিটান'। রেনেসাঁসের মানুষ গড়পড়তা ও গতানুগতিক মানুষের সীমা ও সাধ্য অতিক্রম করে অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক মানুষ হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন।[১৭] তাঁরা ছিলেন বহুদেশ-ভ্রমণকারী, বহু-ভাষাবিদ, বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী, মননশীল-চিন্তা ও সৃজনশীল-সক্রিয়তার অধিকারী।[১৮]

রামমোহন মৌল অর্থেই ছিলেন রেনেসাঁসের মানুষ। ভ্রামণিক, বহু-ভাষাবিৎ, সন্ধিৎসু, অধ্যয়নশীল, প্রাচীন শাস্ত্র-বিশারদ, চিন্তাশীল ও সৃজনমুখী এক আধুনিক ব্যক্তিত্ব তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের বাঁধা-পথে তিনি চলেননি। গড়পড়তা কোন গতানুগতিক মানুষ হিসাবে তাঁকে নেওয়া চলে না। *"টাইমস"* পত্রিকার সম্পাদক এম. ডি. অ্যাকোস্টা লিখেছেন, প্রথম দর্শনেই তাঁকে মনে হয় 'he is above mediocrity'।[১৯] নিরন্তর এক প্রশ্নময়তা ও অ-গতানুগতিক চিন্তাধারা তাঁকে বাধ্য করেছিল গৃহত্যাগে। ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও প্রচলিত মূর্তি পূজার বিরোধিতা করে এক প্রস্তাব লিখে তিনি ষোল বছর বয়সে গৃহত্যাগে বাধ্য হন। সারা জীবন ধরেই তিনি ছিলেন উইল ডুরান্ট প্রদত্ত

রেনেসাঁস-ম্যানের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।

"The 'Renaissance Man' was always in motion and discontent, fretting at limits, longing to be a 'Universal Man'—bold in conception, decisive in deed, eloquent in speech..."[২০]

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়, এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে তাঁর সন্ধিৎসু চলিষ্ণুতা ছিল নিরন্তর। রামমোহন শুধু অনন্য-মানুষ ছিলেন না, তিনি বৈশ্বিক-মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। বিদ্যায়, বৈষয়িকতায়, ধর্মচিন্তায়, সমাজ-সংস্কারে, পুস্তিকা ও গ্রন্থ-রচনায়, পত্রিকা প্রকাশনায়, সরকারী নীতি-সংস্কারে তিনি যেভাবে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন, তাতে তাঁকে বহুমুখী-প্রতিভার অধিকারীও বলা যেতে পারে। তাঁর মননশীল ও সৃজনশীল সক্রিয়তায় বাংলার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জগতে এক গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের মৌল চিন্তা-সূত্রগুলি, আমরা এদেশে প্রথম যে-ব্যক্তি-প্রতিভার মধ্যে মূর্ত হতে দেখি, তার নাম রামমোহন রায়। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে তুলনা করলে রামমোহনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রতিভার রূপটি মলিন তো নয়ই, বহুক্ষেত্রে উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হয়।

রামমোহনকে রেনেসাঁসের প্রতিভূ-চরিত্র বলা যায় কিনা—তা নিয়ে দু'রকম মত আছে। একদল বলেছেন, তাঁকে 'রেনেসাঁস-ম্যান' বলা যায় না।[২১] এঁদের যুক্তিমালা রেনেসাঁস-সম্পর্কিত ন্যূনতম ভিত্তিগত ধারণা অনুসরণ করেনি। অন্যদল, যাঁরা বলেছেন তিনি যথার্থই রেনেসাঁসের প্রতিভূ, তাঁরাও প্রকৃত রেনেসাঁসের ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এমন বলা যায় না।[২২] আমরা এখন প্রবেশ করব, রেনেসাঁসের মৌল লক্ষণগুলি রামমোহনের মননশীল সক্রিয়তায় কিভাবে ক্রিয়াশীল বিকাশ লাভ করেছিল, সেই অনুপুঙ্খ আলোচনায়।

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা দু'ধরনের রচনার মধ্যে দিয়ে ইতালির সাংস্কৃতিক পৃথিবীকে বদলে দিয়েছিলেন। প্রস্তাব বা পুস্তিকা-জাতীয় রচনা ও উদ্ধারীকৃত প্রাচীন পুঁথির সটীক সম্পাদিত অনুবাদকর্ম।

রেনেসাঁসের হাতিয়ার : প্রস্তাব ও পুস্তিকা

ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও প্রজ্ঞাদায়ী প্রচুর প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। মুখ্যত এইসব প্রস্তাবগুলির সূত্রেই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের ইতালিতে একটি বৌদ্ধিক-বিপ্লব সূচিত হয়। এইসব প্রস্তাব ছিল পরিবর্তনশীল সময়ের চিহ্নস্বরূপ। পুরানো ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় অতৃপ্তি, অসন্তোষ এবং নতুন মূল্যবোধ ও মূল্যানুগ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে এগুলির জন্ম। এইসব নিবন্ধধর্মী রচনাগুলি প্রকৃতপক্ষে হিউম্যানিস্ট অভিধেয় রেনেসাঁসের প্রাগ্রসর বুদ্ধিজীবীদের নবার্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, মূল্যবোধের ব্যক্তিগত ফসল। নিজেদের অর্জনগুলিকে তাঁরা লিপিবদ্ধ আকারে সমকালের মধ্যযুগীয় মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের বিরুদ্ধে ও নবোত্থিত আধুনিক মানুষদের প্রশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন। প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

এগুলির মধ্যে ছিল প্রভূত পরিমাণ প্রাচীন ও মূলানুগ গ্রীক ও রোমান বিদ্যার তথ্য ও তত্ত্বগত উপাদান। দ্বিতীয়ত, এগুলির মধ্যে ছিল ইহবাদী, বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। তৃতীয়ত, এগুলি ছিল অধিকাংশক্ষেত্রে বিচার ও বিতর্কপ্রবণ। চতুর্থত, এগুলি ছিল নতুন ধরনের জ্ঞানের যোগানদার।

রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক হিসাবে কথিত পেত্রার্কা *'ফেমিলিয়ারিজ্', 'লেটার্স টু দ্য এনসিয়েন্ট ডেডস্'* প্রভৃতি রচনার অতীত-চর্চার দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইতালির মুখ। জীবনবাদী ও জ্ঞানবাদী একটি বৌদ্ধিক আবহ প্রথমত তিনিই রচনা করেন।[২৩] বোক্কাচিও তাঁরই পথ ধরে অগ্রসর হন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভার্গারিও রচনা করেন *'দ্য ইনজিনুইস মরিবুস'* নামক একটি শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব। ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর ও প্রখ্যাত হিউম্যানিস্ট সালুতাতি *'অন দ্য ওয়ার্লডি অ্যান্ড রিলিজিয়ন'* নামক প্রস্তাবে ধর্মের তাত্ত্বিকদের প্রকৃত ধার্মিক হতে আহ্বান জানান। আলবের্তি *'অন দ্য ফেমিলি'* নামক একটি প্রস্তাবে পারিবারিক জীবনের নতুন ব্যাখ্যা দেন। মানেত্তি তাঁর *'অন দ্য ডিগনিটি অ্যান্ড এসেলেন্স অব ম্যান'* নামক প্রস্তাবে মানুষের কীর্তির মধ্যেই তার মহত্ত্ব ও মর্যাদাকে দেখতে চান। লরেঞ্জো ভাল্লার বিতর্কিত রচনা *'ডিক্লামেশন কনসার্নিং ফলস ডোনেশন অব কনস্টানস্টাইন'*। এ-প্রস্তাবে তিনি পোপের পার্থিব রাজত্বের ভিত্তি খসিয়ে দিয়েছিলেন। অপর একজন হিউম্যানিস্ট পিকো দেল্লা মিরানদোল্লা ১৪৮৬ সালে গ্রীক, লাতিন ও হিব্রু জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য-সন্ধানী *'কনক্লুশনস্'* নামক নয়শো সূত্রের একটি বিতর্কিত প্রস্তাব রচনা করেন। অপর একটি বিখ্যাত প্রস্তাব *'অরেশন অন দ্য ডিগনিটি অব দ্য ম্যান'*-এ পিকো মানুষের মহত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পম্পোনাজ্জি *'অন দ্য ইম্‌মরালিটি অব দ্য সোল'* নামক প্রস্তাবে বলেন 'মানুষ মরণশীল প্রাণী'। 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' নামে আখ্যাত এরাজমুস একের পর এক প্রস্তাব রচনা করে গিয়েছিলেন। তিনি লেখেন *'প্রেইজ অব ফেলি'* (১৪০৯)। এতে মানুষের মূর্খামিকে আক্রমণ করা হয়েছিল। *'কলোকুইজ'* নামক একটি রচনায় তিনি সংস্কার, অন্ধ-প্রথানুগত্য, তীর্থযাত্রা, সন্তদের অজ্ঞতাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর *'হ্যান্ডবুক অব এ ক্রিশ্চিয়ান নাইট'* নামক রচনায় ধর্মের আচার ও অনুষ্ঠানগত দিকের পরিবর্তে জোর দেন 'undogmatic ethical piety based on genial love'-এর উপর। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত *'অন দ্য ফ্রি উইল'* নামক রচনায় তিনি প্রোটেস্টান্ট মতের প্রবর্তক লুথারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণতম বিতর্কে অবতীর্ণ হন।[২৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রেনেসাঁসের আমলে 'হিউম্যানিজম' বিতর্কময় ধারালো অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের রচিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলি তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতো উত্থিত হয়েছিল পুরানো পৃথিবীর জড়ত্বকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য। হিউম্যানিস্টরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন মধ্যযুগের বিশুষ্ক মহীরুহের ভিত্তি। প্রথমদিকে প্রস্তাবগুলি ছিল পাণ্ডুলিপির আকারে, পরে মুদ্রণযন্ত্রের সহায়তায় এগুলি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা-পুরুষ রামমোহন রচিত -'বিচার', -'উত্তর', -'আবেদন', -'সংবাদ' অভিধেয় প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের রচিত প্রস্তাবগুলির মতো এগুলিও প্রায় একই রকম প্রাচীন ও মূল্যানুগ বিদ্যার তত্ত্ব ও তথ্য-

সমর্থিত। এগুলির মধ্যেও রয়েছে ইহবাদী, বাস্তবমুখী, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এগুলিও তীক্ষ্ণভাবে বিচার ও বিতর্কপ্রবণ। এই প্রস্তাবগুলিও নতুন ধরনের জ্ঞানের যোগানদার। পুরানো ও প্রচলিত ধ্যানধারণার অতৃপ্তি ও অসন্তোষ থেকে নতুন মূল্যবোধযুক্ত, মূলানুগ-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার যে আকাঙ্ক্ষা ইতালির রেনেসাঁসের প্রস্তাব-ধর্মী রচনাগুলির জাতক ; রামমোহনের রচিত প্রস্তাবগুলি মধ্যে ইতিহাসের সেই একই সূত্র ক্রিয়াশীল। এই প্রস্তাবগুলির সৌজন্যেই উনিশ শতকের কলকাতায় একটি বৌদ্ধিক-বিপ্লবের সূচনা হয়।

তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্‌ প্রথম আলো

গর্ডনকে লেখা এক চিঠিতে (লন্ডন, ১৮৩২) এক চিঠিতে রামমোহন স্বহস্তে আত্মজীবনীর একটি খসড়া সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে লিখেছেন,

> "যখন আমার বয়স প্রায় ষোলো, তখন মূর্তিপূজার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমি একটি লেখা প্রস্তুত করি। এর ফলে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আমার মতান্তর হয়। আমি গৃহত্যাগ করে দেশে-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করতে থাকি।"[২৫]

এ-রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। তাঁর প্রথম রচনা হিসাবে যেটি বিখ্যাত, সেটি ফার্সিতে লেখা (আরবি ভূমিকা সম্বলিত) *'তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন'* (আনুমানিক ১৮০৪)। পুস্তিকাটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শেষে তিনি বলেছেন,

> "সংক্ষেপে হলেও এই অধমের মতে বিশেষভাবে বিবেচ্য ও কার্যকর এই কয়েকটি কথা ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মতামত অগ্রাহ্য করে এই আশায় নিবেদন করা হল যে, স্থিরবুদ্ধি লোকেরা সংস্কারমুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর বিচার করবেন।"[২৬]

'ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন' লোকেদের বিরুদ্ধে ও 'সংস্কারমুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত' লোকেদের জাগরিত করার জন্য রচিত এই ১৫-১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি রেনেসাঁসের বার্তাবাহী। রামমোহন যখন থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতা-বাস শুরু করেন (১৮১৪), তখন থেকে অনেকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাকাল ধরতে চেয়েছেন। আমাদের মতে *'তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্‌'* নামক অসাধারণ পুস্তিকাটির রচনাকালকে (আনুমানিক ১৮০৪) এ বিষয়ে সমুচিত গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেননা এই পুস্তিকাটির মধ্যে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এর সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

রামমোহনের বিচার ও বিতর্কমূলক প্রস্তাব

রামমোহনের এই ধরনের বিচার ও বিতর্কমূলক প্রস্তাব বা পুস্তিকাগুলিকে প্রতিপক্ষ ও বিষয়ের দিক থেকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

১. ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে বা সাকারবাদের বিরুদ্ধে
২. হিন্দুদর্শনের পক্ষে বা পাদ্রিসাহেবদের বিরুদ্ধে
৩. সতীদাহ-রদের পক্ষে বা সতীদাহ সমর্থকদের বিরুদ্ধে

১. সাকারবাদের বিরুদ্ধে বিচার বা বিতর্কমূলক রচনা

ক. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬)
খ. শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮১৭)
গ. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭)
ঘ. গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)
ঙ. কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০)
চ. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০)

'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' রামমোহনের প্রথম শাস্ত্রবিচার-গ্রন্থ। জনৈক বিদ্যাবাগীশ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কয়েকটি প্রশ্ন 'আত্মীয় সভা'য় পাঠিয়েছিলেন। তারই উত্তরে ২০-২১ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি লেখা। এটি সংস্কৃতে লেখা। এতে শাস্ত্র-প্রমাণ উপস্থাপন করে রামমোহন দেখান, নিজ-নিজ ইষ্ট দেবতাতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করে অন্য সম্প্রদায়কে হেয় করা অনুচিত। *'শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচার'* ইংরাজিতে লেখা। জনৈক শঙ্কর শাস্ত্রী *"মাদ্রাজ ক্যুরিয়রে"* একটি লেখায় রামমোহনের সমালোচনা করে দেখাতে চেয়েছিলেন, মনুষ্য-জাতির উন্নতির জন্য মূর্তিপূজা আবশ্যক। তারই উত্তরে লেখা এটি।

'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' ভাষায় লেখা রামমোহনের প্রথম বিচারমূলক পুস্তিকা। প্রকাশকাল ১৮১৭, মে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিমা-পূজার সপক্ষে পাঁচ-দফা যুক্তি দেখিয়ে *'বেদান্ত চন্দ্রিকা'* লিখেছিলেন। রামমোহন তার প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ড-খণ্ড করেন। গুরুবাদ ও পুরোহিতদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তিনি লেখেন, যাবৎ শাস্ত্রকে গোপনে রেখে তাঁরা জনসাধারণকে বলেন,

> "যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র ইহাই নিশ্চয় কর তোমার বুদ্ধিকে বিবেচনাকে দূরে রাখ আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান তোমার তুষ্টির জন্যে সর্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্ধেক আমাকে দেও আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।"[২৭]

শাণিত ছুরির মতো এখানে রামমোহনের বিদ্রূপাত্মক বক্তব্য ঝলসে উঠেছে। এ-পুস্তিকার দৈর্ঘ্য ১৮ পৃষ্ঠার মতো। *'গোস্বামীর সহিত বিচার'*-এ (১৮১৮, জুন) রামমোহন লেখেন, 'জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না।' *'কবিতাকারের সহিত বিচার'*-এ (১৮২০) তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অদ্ভুত সব প্রশ্নের জবাব দেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, রামমোহন পুস্তক ছাপিয়ে ঘরে ঘরে বিতরণ করে দেশের ধর্ম নষ্ট করেছেন।[২৮] *'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার'* (১৮২০) "ইহা দেবনাগর অক্ষরে, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় এবং বাঙ্গালা অক্ষরে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এই চতুর্বিধ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল।"[২৯] জনৈক সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী শূদ্র ও স্ত্রী-লোকাদির বেদাধ্যয়নে অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তারই জবাবে এটি রচিত।

এছাড়া রামমোহন লেখেন *'চারি প্রশ্নের উত্তর'* (১৮২০), *'পথ্যপ্রদান'* (১৮২৩), *'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার'* (১৮২৬)। *'পাষণ্ডপীড়ন'* গ্রন্থে জনৈক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনকে কটু-কাটব্য করে লেখেন, 'রামমোহন অর্থ সহিত বেদমাতা গায়ত্রী ম্লেচ্ছ হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।[৩০] তদুত্তরে রামমোহন *'পথ্যপ্রদান'*-এ লেখেন '৪০ বৎসর

পূর্বেই দেশাধিপতিরা জানিয়াছেন।' শাস্ত্রবিচার প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না।....শাস্ত্রসকল সমানভাবে গ্রাহ্য করা যায় না। কারণ তার মধ্যে পৌর্ববাপর্য্য আছে, অসামঞ্জস্য আছে। শাস্ত্রসকলের মধ্যে বচনে বচনে বিরোধ দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রামাণ্যক্রম এইরকম। প্রথম শ্রুতি। দ্বিতীয় মনুস্মৃতি। বেদার্থ নির্ণয় জন্য মনুস্মৃতিই প্রধান অবলম্বন। তৃতীয় অন্যান্য স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র। চতুর্থ শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার।.... যেরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বচনসকলের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গণ্য হইবে।"[৩১]

'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' গ্রন্থে রামমোহন লেখেন, 'মদ্যপান করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না।'[৩২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মানুষ সম্পর্কে রামমোহনকে তেমন কোন অবাস্তব আদর্শবাদ পোষণ দেখি না।'[৩৩]

২. পাদ্রি-সাহেবদের বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক রচনা

ক. ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)
খ. অ্যান অ্যাপীল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক (১৮২০)
গ. সেকেন্ড অ্যাপীল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক
ঘ. ফাইনাল অ্যাপীল (১৮২৩)

বিতর্ক শুধু রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে বেধেছিল তা নয়, বিতর্ক বেধেছিল আগ্রাসী খ্রীষ্টান পাদ্রিদের সঙ্গেও। শ্রীরামপুরের একজন পাদ্রি ১৮২১ সালে ১৪ই জুলাই *"সমাচার দর্পণ"* পত্রিকায় বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করলে রামমোহন *ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ সং১* *'Brahminical Magazine, The Missionary & The Brahmin No. 1'* এই নামে একখানি দ্বিভাষিক, সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন। এর বাঁ পৃষ্ঠায় বাংলা, ডান পৃষ্ঠায় ইংরাজি অনুবাদ থাকত। তিনি এতে লেখেন, 'যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্মসংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার সহ হয় না', পাদ্রী মহাশয় হিন্দু ধর্মে সাকারবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন কিন্তু, 'আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন।'[৩৪]

বাইবেল থেকে খ্রীষ্টের উপদেশ সংকলন-মূলক একটি গ্রন্থে রামমোহন খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, অলৌকিক অংশ বর্জন করলে মার্শম্যান তাঁকে আক্রমণ করলেন। এর থেকে যে বাদানুবাদ শুরু হয়, তাতে রামমোহনকে তিনটি আবেদনমূলক পুস্তিকা বা পুস্তক রচনা করতে হয়। প্রথম পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬, দ্বিতীয় পুস্তিকা ৯৭ পৃষ্ঠা, শেষ পুস্তিকার কলেবর আরো বৃদ্ধি পায়। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা যেমন সত্য নির্ণয়ের জন্য মূল-পাঠে পৌঁছতে চাইতেন, রামমোহনও তা করেছেন। শুদ্ধ পাঠের পুনরুদ্ধার এবং প্রক্ষেপ ও অ-মূলানুগ ব্যাপারগুলিকে তিনি এতে বর্জন করেছেন। রামমোহনের শেষ পুস্তিকাটি 'ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস' ছাপতে অস্বীকার করলে রামমোহন উপায়ান্তর না দেখে 'অক্ষরাদি প্রস্তুত করাইয়া

নিজে ধর্ম্মতলায় 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' নামে একটি মুদ্রণযন্ত্রালয় স্থাপন করিলেন।' রামমোহন রায়ের জীবনীকার লিখেছেন,

> "মার্সম্যান্ সাহেব স্বমত সমর্থন জন্য ইংরেজি বাইবেল হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। রামমোহন রায় ইংরেজি অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহা স্বয়ং ইংরেজিতে অনুবাদপূর্ব্বক দেখাইলেন মার্সম্যান সাহেবের কথা তাঁহার অবলম্বিত ধর্মশাস্ত্র সঙ্গত নহে। মার্সম্যান সাহেব পরাস্ত হইলেন।"[৩৫]

'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' নামে খ্যাত এরাজমুস গ্রীক অধ্যয়ন করেছিলেন, মূলত নিউ টেস্টামেন্টের হারিয়ে যাওয়া চাবি খুঁজে পাবার জন্য। লাতিন ভাষায় সম্পাদিত তাঁর *'অ্যানোটেশনস্ অন দ্য নিউ টেস্টামেন্ট'* নামক অসাধারণ বিচার-তীক্ষ্ণ গ্রন্থে বাইবেলের মূল-পাঠে পৌঁছুনোর যে প্রয়াস আছে, রামমোহনও সেই কাজটি একই রকম প্রযত্নে করার প্রয়াস পেয়েছেন। মেরী কার্পেন্টার জানিয়েছেন,

> "He devoted some of the most important years of his life to the study of Hebrew and Greek that he may judge of the real meaning of the Christian scriptures."[৩৬]

৩. সতীদাহের সমর্থকদের বিরুদ্ধে

সতীদাহ বিষয়ে রামমোহনের রচিত প্রস্তাব তিনটি

ক. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ (১৮১৮)

খ. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ (১৮১৯)

গ. সহমরণ বিষয় (১৮২৯)

শাস্ত্র ও ধর্মাচরণের দোহাই দিয়ে নিরপরাধ বিধবাদের স্বর্গের লোভ দেখিয়ে দড়ি দিয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে বেঁধে চিতায় জীবন্ত পোড়ানো হতো। রামমোহন এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এক্ষেত্রেও তিনি হাতিয়ার করলেন পুস্তিকা বা প্রস্তাব। ২২ পৃষ্ঠার প্রথম প্রস্তাবটি বাদানুবাদের ধাঁচে সাজানো। প্রবর্তক বলছেন, 'স্বামী মরিলে স্ত্রী সকলের অগ্নিপ্রবেশ ব্যতিরেকে আর অন্য ধর্ম নাই।'[৩৭] নিবর্তক বলছেন,

> "ঐ সকল বচনেতে ঐ বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্প বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ ছুপিয়া রাখ। ঐ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারিতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা হয়।"[৩৮]

সহমরণ বিষয়ে, দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে রামমোহন সহমরণ-সমর্থক জনৈক কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের তর্কজাল ছিন্নভিন্ন করেন। প্রবর্তকের শাস্ত্রীয় দোহাই-এর জবাবে নিবর্তক

বলেছেন,

> "গীতাপুস্তক অপ্রাপ্য নহে, এবং আপনারাও তাহার অর্থ না জানেন, এমৎ নহে; তবে এই সকল শাস্ত্রকে অন্যথা করিয়া অজ্ঞলোকের তুষ্টির নিমিত্তে স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া শাস্ত্র-জ্ঞান-রহিত যে স্ত্রীলোক, তাহাদিগকে নিন্দিত পথে কেন প্রেরণ পুনঃপুনঃ করেন?"[৩৯]

এ প্রস্তাবে শাস্ত্র-জ্ঞানের সঙ্গে যুক্তির, জ্ঞানের সঙ্গে করুণাদ্রব চিত্তের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

> "প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পবীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাঁহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয় ; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন।"[৪০]

রামমোহন এদেশে স্ত্রীলোকদের অসহনীয় অবস্থা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে শেষে লিখেছেন,

> "দুঃখ এই যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী তাহার্বদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব দাহ হইতে রক্ষা পায়।"[৪০ক]

শাস্ত্র-চর্চার জন্য শাস্ত্রচর্চা নয়, শাস্ত্রজ্ঞানকে রামমোহন ব্যবহার করেছেন মানবতাবোধের রক্ষক ও প্রহরী হিসাবে।

হিউম্যানিজম ঃ 'রিভাইভ্যাল অব লার্নিং'

সাইমন্ডসের ভাষায়, 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' হচ্ছে 'রিভাইভ্যাল অব লার্নিং'।[৪১] মধ্যযুগেব সঙ্গে সম্পর্কছেদের প্রয়োজনে ইতালিতে হিউম্যানিস্টরা নেমে পড়েছিলেন, প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধারের কাজে। ক্লাসিক্যাল গ্রীক ও রোমান পুঁথির উদ্ধার, সেগুলির অনুবাদ, সটীক সম্পাদনা ও পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত আকারে সেগুলিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা ইত্যাকার কাজগুলি রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন।[৪২] এর ফলে সেখানে জ্ঞানচর্চার গতানুগতিকতা ভঙ্গ হয়। সমৃদ্ধ হয় মানুষের চিন্তা-চেতনার জগৎ। যে-জ্ঞান চলে গিয়েছিল মানুষের অগোচরে, উপেক্ষা ও অনাদরের অন্ধকার থেকে তাকে আলোয় নিয়ে আসা ও প্রাচীন বিদ্যার আলোতে মানুষের জ্ঞানের জগতকে আলোকিত করা ছিল হিউম্যানিস্টদের প্রধান কাজ। পেত্রার্কা তাঁর 'লেটারস্ টু দ্য এনসিয়েন্ট ডেড'-এ লিখলেন,

> "আজকাল মানুষ সোনারূপা আর ঐন্দ্রিয়িক আমোদ-আহ্লাদ ছাড়া কিছু বোঝে না। আহা! কী ভালোই ছিল রোমান সভ্যতার সোনালি দিনগুলি। আমি যদি লিভির যুগে জন্মাতাম, কী ভালোই না হতো!"[৪৩]

তিনি হতে চাইলেন তাঁর সময়ের সিসেরো।[৪৪] বোক্কাচিও মঠের অনাদৃত পাঠাগারে পাঠাগারে ঘুরে বেড়াতেন।[৪৫] পোজ্জিও ক্লুনির মঠ থেকে উদ্ধার করলেন সিসেরোর বক্তৃতামালা। সুইজারল্যান্ডে সেন্ট গলের এক মঠ থেকে খুঁজে বের করলেন কুইন্টিলিয়নের *'ইনস্টিটুসিও ওরেশনস্'*।[৪৬] ভিতরুভিয়াস, তাসিতাসের রচনা উদ্ধার করে সেগুলি সম্পাদিত

আকারে প্রকাশ করলেন। ফাইলেলফো অনুবাদ করলেন অ্যারিস্টটল, জেনোফোন, লাইসিয়াসের রচনা। লরেঞ্জো ভাল্লা তাঁর সম্পাদিত *'এনোটেশনস্ অন দ্য নিউ টেস্টামেন্ট'* গ্রন্থে পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের পাঠগত ভ্রান্তি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখালেন।[৪৭] ফিকিনো প্লেটোর *'ডায়লগ'* অনুবাদ করলেন, *'সিম্পোসিয়াম'*-এর ভাষ্য রচনা করলেন। অন্যদিকে পম্পোনাজি অ্যারিস্টটলের দর্শনকে নতুন অর্থে পুনর্বাসিত করলেন ইতালির বৈদ্ধিক জগতে। আলবের্তি ভিতরুভিয়াসের স্থাপত্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের অনুবাদ করে নবযুগের স্থাপত্য-কলার সামনে এনে দিলেন রোমান স্থাপত্য-চিন্তার সুদৃঢ় ভিত্তি।[৪৮] এরাজমুস ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে গ্রীকভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের বিশ্লেষণনিষ্ঠ সম্পাদনা প্রকাশ করলেন এবং শরৎকাল নাগাদ প্রকাশ করলেন তার লাতিন অনুবাদ।[৪৯] রেনেসাঁসের বিখ্যাত মুদ্রণ-ব্যবসায়ী অলডাস ম্যানুটিয়াস দু'দশকের মধ্যে ১২৬টি গ্রীক ও লাতিন পুঁথির নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।[৫০] তিনি বলেছেন,

> "What a joy to see these volumes of the ancients rescued from the book-burner and given freely to the world."[৫১]

যে বিদ্যা বন্দী ছিল সংস্কৃত ভাষার জটাজালে

আক্ষরিক অর্থে পুঁথির উদ্ধার বলতে যা বোঝায়, তা না করলেও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে, চাবি-তালার ভিতর থেকে রামমোহন প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার জটাজালে আবদ্ধ জ্ঞানকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করে ও মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করে হিউম্যানিস্টের দায়িত্বই পালন করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,

> "রামমোহন *'ব্রহ্মসূত্র', 'উপনিষদ', 'গায়ত্রী', 'আত্মনাত্মবিবেক'* প্রভৃতি গ্রন্থ দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করলেন ও ছাপালেন একের পর এক। হিন্দু সমাজে মাত্র তিন শতাংশ বা মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের বাস, এই নিতান্ত সংখ্যালঘু বর্ণ ছিল হিন্দু-ধর্মের রক্ষক ও অধ্যাত্ম-বিদ্যার পরিবেশক। হিন্দুর অধ্যাত্মসম্পদ ছিল সংস্কৃত ভাষার মধ্যে বন্দী। ব্রাহ্মণ সমাজের বাইরে যে বিরাট শূদ্র-সমাজ বিদ্যমান তারা সকল প্রকার ধর্মের উৎস সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাই ধর্ম-কর্মের জন্য ব্রাহ্মণদের উপর নির্ভরশীল। রামমোহন সেই ভাষার বাধা ভেঙে দিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যকে সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন—এই ঘটনাকে বিপ্লবই বলব।...... বর্তমান যুগে এই প্রথম, যখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বেদান্তাদি বাঙালি পড়বার সুযোগ লাভ করল, ভাষার বাঁধ ভাঙবার সঙ্গে মানুষের মুক্তির নানা পথ মুক্ত হয়ে গেল।"[৫২]

প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধারমূলক রামমোহনের অনুবাদ-গ্রন্থগুলি এই রকম :

বেদান্ত

১. বেদান্ত —১৮১৫
২. বেদান্তসার —১৮১৫

উপনিষৎ ৫টি

৩. তলবকার উপনিষৎ —১৮১৬
৪. ঈশোপনিষৎ —১৮১৬
৫. কঠোপনিষৎ —১৮১৭
৬. মাণ্ডুক্যোপনিষৎ —১৮১৭
৭. মুণ্ডকোপনিষৎ —১৮১৯

অন্যান্য অনুবাদ

৮. গায়ত্রীর অর্থ —১৮১৮
৯. আত্মানাত্মবিবেক —১৮১৯
১০. বজ্রসূচী —১৮২৭

বেদান্ত গ্রন্থ (ব্রহ্মসূত্রের ভাষাবিবরণ)

ব্রহ্মজ্ঞানের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলি শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যাসহ প্রচার করেছিলেন বহুকাল আগে। রামমোহন ঐ গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন *'বেদান্ত গ্রন্থ'*[৫৩] নামে। ৫৫৮ সূত্র সমন্বিত এ-গ্রন্থের তিনটি অংশ—ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। গ্রন্থ-অংশে সংস্কৃত সূত্রাংশ উদ্ধৃত করে তারপর বাংলা ব্যাখ্যা, তারপর আবার পরবর্তী সূত্র এবং তার বাংলা ব্যাখ্যা—এইভাবে গ্রন্থটি রচিত।

প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৭+১৬৬। এই গ্রন্থের হিন্দুস্থানি অনুবাদ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় অল্পদিনের মধ্যে। ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন—

> "সংস্কৃত ভাষারূপ অন্ধকার যবনিকা অন্তরালে ইহা লুক্কায়িত থাকায় (concealed within the dark curtain of the Sanskrit language) এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকেই এই গ্রন্থের ব্যাখায়, এমনকি এতাদৃশ পুস্তকের স্পর্শে অধিকারী করিয়া রাখায়, এই বেদান্তগ্রন্থ, যদিও ইহা নিরন্তর প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তথাপি সাধারণের নিকট অল্পই পরিচিত, এবং বাস্তবিক অতিশয় অল্পসংখ্যক হিন্দুরই আচরণ ইহার উপদেশের কথঞ্চিৎ অনুযায়ী।
>
> আমার মত সমর্থনের জন্য আজ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট অপরিচিত এই বেদান্ত গ্রন্থের তথা ইহার সারভাগের, হিন্দী ও বাংলা অনুবাদ আমার সাধ্যানুসারে করিয়া বিনামূল্যে আমার স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে যতদূর ব্যাপকভাবে বিতরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব, ততদূর বিতরণ করিয়াছি।"[৫৪]

বেদান্তসার

পূর্বপ্রকাশিত *'বেদান্ত গ্রন্থ'* ও তার অনুবাদ বিস্তৃত ও কঠিন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "পাছে সকলে বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মর্মগ্রহণ করিতে না পারে, এইজন্য তিনি সার-সঙ্কলনপূর্বক *'বেদান্তসার'* নামে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন।"[৫৫]

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এরও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২২। এতেও আছে সংস্কৃত-সূত্রের উদ্ধৃতি ও বাংলা-ভাষ্য।[৫৬]

উপনিষৎ

রামমোহন *'বেদান্ত গ্রন্থ' 'বেদান্তসার'* সংকলন করার পর উপনিষদ অনুবাদে মন দিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন,

> "এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূলবেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে (বঙ্গ-শ.মু.) ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে।"[৫৭]

তলবকার উপনিষৎ

১৮১৬ অব্দের ২৯ জুন সামবেদের অন্তর্গত '*তলবকার উপনিষদ*' প্রকাশিত হয়।[৫৮] '*তলবকার উপনিষদ*'-এর অপর নাম *'কেনোপনিষদ'*। মূল পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৭। সামবেদীয় তলবকার শাখার নবম অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব বিদ্যমান। রামমোহনের মতে, 'এ অধ্যায় বেদশিরোভাগ।' বলে নেওয়া প্রয়োজন, রামমোহন উপনিষদের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার অবলম্বনে সংক্ষেপিত ভাষা-বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

ঈশোপনিষৎ

রামমোহন *'ঈশোপনিষৎ'*-এ ভূমিকাংশে প্রশ্ন তুলেছেন প্রায়ই লোকে বলে,

> "বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইবে। কিন্তু একজনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না; যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি প্রকাশ করে।"[৫৯]

ঈশোপনিষদ-এর মূল পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০+৪+১৩।[৬০] *ঈশোপনিষদ*-এ একটি বিস্তৃত ভূমিকাংশ আছে। তা পড়লে টের পাওয়া যায়, রামমোহনের বিরুদ্ধে কুৎসা ও আক্রমণ ইতোমধ্যেই পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। ফলে অনুবাদধর্মী রচনার ভূমিকাতেও একটা জবাবী মেজাজ ও প্রতি-আক্রমণের প্রবণতা ফুটে উঠেছে। উদাহরণ—

> "কিন্তু এই পণ্ডিতের দিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কিনা বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা করিয়া থাকেন কিনা যদি এসকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন তবে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ করেন কেন।"[৬১]

কলকাতার উঠতি ধনীরা পূজা-পার্বণে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে খানাপিনার আসর বসাতেন। তারাই রামমোহনের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। রামমোহন প্রশ্ন তুললেন,

> "আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাঁহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরাসিদ্ধ হয়।"[৬২]

তীরের মত তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

শঙ্করের অনুবাদমূলক ব্রহ্মোপাসনার গ্রন্থ প্রচার করলেও রামমোহনের অভিমতে কিছু বিশেষত্ব ছিল।

> "শঙ্কর সন্ন্যাসের পক্ষে, রামমোহন রায় গার্হস্থ্যধর্মের পক্ষপাতী।......গৃহস্থও ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী, এই সত্য প্রচাব করিয়া রামমোহন রায় ভারতে নবযুগ প্রবর্তিত করিয়াছেন।"[৬৩]

রামমোহন রচিত এই *'ঈশোপনিষদ'*-এর একটি ছিন্নপত্রই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংশয়াকুল জীবনে জ্বেলে দিয়েছিল দীপবর্তিকার আলো, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে তার শ্রদ্ধান্বিত স্বীকৃতি আছে।[৬৪] রামমোহন যে, শুধু বাংলা অক্ষরে বাংলা অনুবাদসহ উপনিষদগুলি প্রকাশ করেছিলেন তা নয়, সংস্কৃত বৃত্তি বা টীকাও দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেন। এই বৃত্তি অবশ্য শিবপ্রসাদ শর্মার লেখা।[৬৫]

রামমোহন *'ঈশোপনিষদ'*-এর ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন,

> "প্রত্যেক দেবতার উপাসকরা আপনাদের উপাস্য দেবতার প্রাধান্য রক্ষার জন্য এতদূর অধ্যবসায়শীল হন যে, যখন তাঁহারা হরিদ্বার, প্রয়াগ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি প্রভৃতি তীর্থস্থানে একত্র হন, তখন তাঁহাদের সম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা লইয়া ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন পরস্পর প্রহার ও অত্যাচার পর্যন্ত হইয়া থাকে।"[৬৬]

কঠোপনিষৎ

'কঠোপনিষদ'-এর ভাষা বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ আগষ্ট। মূল গ্রন্থে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫৭।[৬৭] এর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকাতে লিখেছেন,

> "The present publication is intended to assist the European community informing their opinion respecting Hindoo theology, rather from the matter found in the doctrinal scriptures than from the Puranas, moral tales, or any other modern works, or from the superstitions, rites and habits daily encouraged and fostered by their self-interested leaders."[৬৮]

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

'*কঠোপনিষদ*' প্রকাশের তিনমাস পরে ১৮১৭ সালের অক্টোবর মাসে *'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ'* প্রকাশিত হয়। মাণ্ডুক্য অথর্ববেদীয় উপনিষদ। মাণ্ডুক্য ঋষির নামে পরিচিত। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৩+১৯।[৬৯] সুদীর্ঘ ভূমিকায় রামমোহন জবাবী ধাঁচে অনেক উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। পরম্পরাচলিত নিরর্থক গুরুবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন,

> "শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমৎ গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমৎ গুরু দুর্লভ যে শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন।"[৭০]

জ্ঞানীকে শুধু শ্রবণেব উপর নির্ভর করলে হবে না। 'কর্তব্য এই যে বেদান্তবাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন।'[৭১]

মুণ্ডুকোপনিষৎ

রামমোহনকৃত পঞ্চউপনিষদের শেষটি *'মুণ্ডুকোপনিষৎ'*। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।[৭২] এই বছরেই ইংরাজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে, অন্যান্য উপনিষদে যেমন সংস্কৃত সূত্র ও বাংলা অর্থ বা ভাষ্য একসঙ্গে জড়ানো ছিল, এখানে সেভাবে না লিখে, প্রথমে সংস্কৃত পাঠ ও পরে পৃথকভাবে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হচ্ছে।

বামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য *"তত্ত্ববোধিনী"* পত্রিকায় লেখেন—

> "বহ দিবসাবধি বঙ্গদেশে বেদের চর্চা উঠিয়া গিয়াছিল ; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বেদ বেদান্তের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, শ্লোক, সূত্র ও ভাষ্য শুনিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ হইতে রামমোহন রায় যে ভূরি ভূরি স্বমতপোষক ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসকল উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন তাহাতে ভট্টাচার্য ও গোস্বামীরা অভিভূত হইয়া পড়িলেন।"[৭৩]

গায়ত্রীর অর্থ

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশ করলেন।[৭৪] গায়ত্রী ছিল ব্রাহ্মণের জপের মন্ত্র। অব্রাহ্মণ এ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে বা শুনতে পারে না—এই ছিল লৌকিক ধারণা। এই নিষেধের কারণ গায়ত্রীর মন্ত্র বেদাংশ (ঋগ্‌বেদ ৩৬২ সূক্ত, ১০ ঋক্) এবং সেজন্য শূদ্রের পক্ষে অশ্রাব্য। রামমোহন এই বৈদিক মন্ত্র বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ ও প্রচার করলেন।

বজ্রসূচী

এই পুস্তিকাকল্প গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ। রামমোহন যে *'বজ্রসূচী'*র অনুবাদ করেছেন তাতে রয়েছে জাতিভেদের নিন্দা। রামমোহন অবলম্বিত *'বজ্রসূচী'*র রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় কে তা জানা যায় না। বি. এইচ. হগসন রামমোহনের *'বজ্রসূচী'*র অনুবাদের অন্তত দু'বছর পর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে গিয়ে উদ্ধার করেছিলেন অশ্বঘোষকৃত বৌদ্ধ *'বজ্রসূচী'*। রামমোহন মৃত্যুঞ্জয় রচিত *'বজ্রসূচী'*র পুঁথি কোথায় পেলেন তা অনির্ণীত থেকে গেছে। উপরন্তু এটিকে বলা হয়েছে 'প্রথম নির্ণয়'।[৭৫]

এক চিঠিতে রামমোহনের জাতিভেদ বিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

> "I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and subdivisions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies

and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise....It is I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort."[৭৬]

রামমোহনের ধর্মসংস্কারের মূলে যে একটি নিশ্চিত ইহবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা এই চিঠিতে পাওয়া যায়। জাতিভেদ-প্রথার মৌল কাঠামোটিকে এই অনুবাদমূলক রচনায় আক্রমণ করা হয়েছে।

উপাসনা-পদ্ধতিমূলক পুস্তিকা

প্রাচীন বিদ্যার উপর ভিত্তি করে রামমোহন কয়েকটি উপাসনা-পদ্ধতিমূলক মৌলিক প্রস্তাব বা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এই ধরনের পুস্তিকা—

প্রার্থনাপত্র	—১৮২৩
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	—১৮২৬
গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং	—১৮২৭
ব্রহ্মোপাসনা	—১৮২৮
অনুষ্ঠান	—১৮২৯

'প্রার্থনাপত্র' পৃষ্ঠা দুয়েকের ক্ষুদ্র পুস্তিকা।[৭৭] এতে স্বজাতীয়-বিজাতীয় সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশ করা হয়েছে। রামমোহনের 'আদর্শ মানুষ'-এর দুটি লক্ষণ। প্রথমত, সে হবে বিশ্বাসী। আর দ্বিতীয়ত, সে হবে অপরের কল্যাণেচ্ছু।

জগতে প্রচারিত সকল ধর্মকে রামমোহন (এই *'প্রার্থনাপত্রে'*) তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক, যারা নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক। ভারতবর্ষের দশনামা সন্ন্যাসীদের অনেকে, গুরু নানকের সম্প্রদায়, দাদুপন্থী অনেকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ইওরোপ ও আমেরিকার একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানগণ এই শ্রেণীভুক্ত। দুই, অবতারবাদী হিন্দু ও প্রাচীনগণ যাঁরা প্রতিমা নির্মাণ না করে মনে মনে তাঁর ধ্যান করেন। তিন, অবতারবাদী ও মূর্তিপূজক। হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এঁরা আছেন। তিনি আরও বলেছেন, অবতারবাদী ও মূর্তিপূজক হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের 'দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়।'[৭৮]

'ব্রহ্মসভা' স্থাপন কালে রচিত *'ব্রহ্মোপাসনা'*য় রামমোহন অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় বলেছেন,

> "মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক, এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা; দ্বিতীয়, এই যে পরস্পর সৌজন্যতে ও সাধুব্যবহারেতে কাল হরণ করা।"[৭৯]

'অনুষ্ঠান' প্রকাশিত হয় *'ব্রহ্মোপাসনা'* প্রকাশের পরের বছর।[৮০] এই *'অনুষ্ঠান'* পুস্তিকার প্রশ্ন ও উত্তর বাংলায় লিখিত। গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ধাঁচে লেখা। ১২টি প্রশ্ন ও তার উত্তরের মধ্যে ধর্মতত্ত্বের ধাঁচে গোটা রচনাটি সাজানো, সংস্কৃত প্রমাণ-সূত্রগুলি দেওয়া

হয়েছে স্বতন্ত্র একটি পর্যায়ে. পরে। 'কে উপাস্য?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে,

> "অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত অচিন্ত্যনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত যে এই জগৎ ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।"[৮১]

এই তাত্ত্বিক ধারণা ইতালীয় রেনেসাঁসের প্লেটোনিক দর্শনবিদ ফিকিনোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ফিকিনো বলেছিলেন,

> "One (God) as the absolute and uncontradicted original essence, prior to the plurality or specific individual being, God is the ultimate unity of all things. The One which embraces within itself numberless numbers, is related to the lesser creature through a great chain of being"[৮২]

এখানে বলা হয়েছে,

> "উপাসনার দেশ, কাল, দিক বলে কিছু নেই। যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করতে সমর্থ হয়।"[৮৩]

এই *'অনুষ্ঠান'* পত্রের ইংরাজি সংস্করণের নামকরণ করা হয়েছে 'Universal Religion' বিশ্বধর্ম। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'এটাই যথার্থ নামকরণ।'[৮৪]

দ্য প্রিসেপ্টস অব জেসাস

> *'The Precepts of Jesus. The Guide to peace & Happiness, Extracted from the Books of the New Testament' (1820)*—

রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের মৌল ধর্ম হচ্ছে সত্যের সন্ধানে প্রচলিত ও পরম্পরাবাহিত গ্রন্থ বা শাস্ত্রকে অভ্রান্ত জ্ঞানে গ্রহণের পরিবর্তে বিচারশীল মন নিয়ে মূলে পৌঁছনোর চেষ্টা। এবং মূলের শুদ্ধপাঠ উদ্ধার ও প্রকাশ করা। একদিক দিয়ে বেদান্ত উপনিষদাদি অনুবাদ করে তিনি যেমন ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রচলিত ও পরম্পরাবাহিত আচরণ ও বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছিলেন, অন্যদিকে *'দ্য প্রিসেপ্টস অব জেসাস'* নামক গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন প্রায় একই রকম আদর্শ-ও উদ্দেশ্য-চালিত হয়ে।[৮৫]

রামমোহন মূল বাইবেল পাঠ করার জন্য হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়, খ্রীষ্টানরা যে-ভাবে যিশুকে লোকসমক্ষে প্রায় দেবতা বা অবতার বানিয়ে প্রচার করছে তার সমর্থন মূল-গ্রন্থে নেই। নিউ টেস্টামেন্টের ছাব্বিশটি বইয়ের মধ্যে মাত্র চারটি গসপেল থেকে তিনি অনুবাদ করলেন—ম্যাথু, মার্ক, লুক ও জন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,

> 'যিশু সম্বন্ধে রামমোহন যে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করেছেন কোনো অখ্রীষ্টানকে তাঁর পূর্বে বা পরে করতে দেখি না।'[৮৬]

যিশুর উপদেশ কেন ভাল লাগল তার কারণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন,

> "This simple code of religion and morality is so admirably calculated to elevate men's ideas to high and liberal notions of God, who has equally subjected all living creatures, without distinction of caste, rank or wealth, to change, disappointment, pain and death has equally admitted to be partakers of the bountiful mercies...that I cannot but hope the best effects from its promulgation in the present form"[৮৭]

যিশুর বাণী ও সাধু পলের খ্রীষ্ট-তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করে রামমোহন চার গসপেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁর অনুবাদ।[৮৮] যাই হোক না, কেন রামমোহন রায় এদেশের খ্রীষ্টান পাদ্রিদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রধান অবলম্বনগুলি খ্রীষ্টের অলৌকিকতা ইত্যাদিতে আঘাত করলেন।

এই রচনাগুলি রামমোহনের মর্যাদাকে বিশ্বের চিন্তাশীল খ্রীষ্টানমহলে কোন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল, তা মেরী কার্পেন্টারের *'দ্য লাস্ট ডেজ ইন ইংল্যান্ড অব দ্য রাজা রামমোহন রায়'* গ্রন্থটি পড়লে টের পাওয়া যায়।[৮৯]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পেত্রার্কা

পরম্পরাবাহিত, গতানুগতিক বা চলতি মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রয়োজনে রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা মূলত প্রাচীন বা অন্যতর বিদ্যার চর্চায় নিরত হয়েছিলেন। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে ইতালির বৌদ্ধিক পৃথিবীকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কাজটি এঁদের করতে হয়েছিল। হিউম্যানিস্টদের মধ্যে কেউ গ্রীকবিদ, কেউ বা লাতিনবিদ হিসাবে সুখ্যাত হয়েছিলেন। কেউ বা উভয় বিদ্যাতেই ছিলেন সমান পারদর্শী। পিকো দেল্লা মিরানদোল্লা হিব্রু ভাষাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি *'কাবালা'* গ্রন্থের তত্ত্বগত দিকটির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

গ্রীক, লাতিন ও হিব্রু-বিদ্যার সমবায়ে ও নিবিড় চর্চায় ইতালির বৌদ্ধিক পৃথিবীর চেহারা বদলে যায়। পেত্রার্কাকে 'রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমের জনক' বলা হয় এই জন্য যে, তিনিই প্রথম ইতালির বিদ্যাচর্চার মুখ ঘুরিয়ে দেন প্রাচীন রোমান-বিদ্যার দিকে। রামমোহনকেও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জনক বলা যায় একই কারণে। তিনি বাংলার মধ্যযুগীয় গতানুগতিক চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক পৃথিবীকে বদলে দিলেন, প্রাচীন বা অন্যতর সংস্কৃতির নিবিড়-চর্চা শুরু করে। আরব্য ও পারস্য ভাষার পথ দিয়ে তিনি ঐস্লামিক সংস্কৃতির ভুবনে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *'তুহ্‌ফৎ-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্‌'*-এর ভূমিকাংশ আরবিতে লেখা ও মূল পুস্তিকাটি ফারসিতে রচিত। মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে ও একেশ্বরবাদের পক্ষে এই রচনাটিকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন, ব্রাহ্মণ্য-চালিত মূর্তিপূজার যে-সংস্কৃতি আমাদের সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র হিসাবে। অন্যতর ভাষা বা সংস্কৃতি থেকে শস্ত্র সংগ্রহ করে চলমান জড়ত্বের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম, 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এর মৌল আদর্শটিকেই চিনিয়ে দেয়।

প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার আলোকিত দিকগুলি সম্পর্কে জমে উঠেছিল অজ্ঞতার পাহাড়।

লোকে ভুলে গিয়েছিল বেদ ও উপনিষদে কি আছে, না আছে। নানারকম লৌকিক আচার-ব্যবহার, ভেদবাদ, অমানবিক-প্রথা, মূর্তি-পূজা ইত্যাদিকে পুরোহিতরা, নিজেদের স্বার্থে চালাচ্ছিলেন, বেদে আছে বলে। রামমোহন বেদ ও উপনিষদের সারাংশ অনুবাদ করে প্রকাশ করলেন মানুষের ভ্রান্তি অপনোদনেব জন্য। সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে থাকা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যে জ্ঞান গুপ্ত ছিল, তাকে উদ্ধার করলেনই বলা যায়। যে বিদ্যা ছিল 'concealed within the dark curtain of Sanskrit language',[১০] রামমোহন তার অনুবাদ ও সাব বাংলায় ও ইংরাজিতে প্রকাশ করে ভেঙে দিলেন পুরোহিতদের একচেটিয়া অন্ধকাবের আধিপত্য। এর ফলে প্রবাহিত তর্ক-বিতর্কের সূত্রে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে শুরু হল নতুন যুগ।

শুধু তাই নয়, রামমোহন গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট থেকে খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্বটিকে ভেদ করার চেষ্টা করেছেন। *'দ্য প্রিসেপ্টস অব জেসাস'* ও তার অনুবর্তী রচনা হিসাবে তিনটি আবেদনমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রাচীন খ্রীষ্ট-তত্ত্বটিকে তিনি যুগোপযোগী করে পরিবেশন করেন। এর সঙ্গে ইংরাজি-বাহিত আধুনিক ইওরোপীয় দর্শন শিক্ষাব্যবস্থা ও চিন্তাধারাকে তিনি সাগ্রহে বরণ করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত—এ-বিষয়ে তিনি যে বিখ্যাত চিঠি লিখেছিলেন তাতে দেখা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন ছাড়া এদেশের উন্নতি সম্ভব নয় বলে তিনি দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১১] অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসাই রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমের মৌল আদর্শ। পেত্রার্কা এই মধ্যযুগীয় অন্ধকার সরানোর জন্যই প্রাচীন সংস্কৃতির আলোকিত পৃথিবীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর রচনাকর্মে। রামমোহনও অন্ধকার অপনোদন করার জন্য কখনো গেছেন ঐস্লামিক সংস্কৃতির ভুবনে, কখনো প্রবেশ করেছেন প্রাচীন সংস্কৃত-বিদ্যার জগতে, কখনো ভেদ করার চেষ্টা করেছেন খ্রীষ্টতত্ত্বের মৌল আদর্শটি, কখনো তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বরণীয় করে তুলে ধরেছেন।

বাংলার রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে পরিভ্রমণ ও উপাদান সংগ্রহের দ্বারা নতুন যুগের সূচনাকারীর ভূমিকাই পালন করেছিলেন। সেজন্য রামমোহনকে বলা যায় বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পেত্রার্কা।

ভাষাবিদ

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা প্রথমত ছিলেন ভাষাবিদ। পল জোয়াচিমসেন রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'an intellectual movement, primarily literary and philological.'[১২] ভাষার চর্চায় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা কোন আলস্য করেননি। ভাষাচর্চার পথ ধরেই তাঁরা পৌঁছেছিলেন দু'টি প্রাচীন সভ্যতার মর্ম-সত্যে। রামমোহনের ভাষাচর্চা রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের মর্মসত্যকেই যেন স্পর্শ করেছিল। হিউম্যানিস্টদের ভাষাজ্ঞান মূলত গ্রীক ও লাতিন চর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

রামমোহন জানতেন অন্তত এগারোটি ভাষা—সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু, হিব্রু, লাতিন, ইংরাজি, ফরাসি, বাংলা ও হিন্দুস্থানি।[১৩] তিনি পাটনায় গিয়ে প্রথমে আরবি ও ফারসি

ভাষা শিক্ষা করেন। আববি ও ফারসি ভাষায় তিনি এতদূর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, যে সেই ভাষায় মধ্যে দিয়ে তিনি ইউক্লিড, অ্যারিস্টটল প্রভৃতিদের দর্শন ও জ্ঞানে পৌঁছতে সক্ষম হন।[৯৪] তাঁর প্রথম গ্রন্থ *'তুহ্ফৎ-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্'* ফারসিতে লেখা, ভূমিকাটি আরবিতে রচিত। পরবর্তীকালে রামমোহন ফারসিতে *"মীরাৎ-উল্-আখ্বার"* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাকিংহাম লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়কালে কথাবার্তা হয়েছিল আরবিতে।[৯৫] রামমোহনের সেক্রেটারি স্যান্ডফোর্ড আর্নট লিখেছেন ফারসি তিনি জানতেন মাতৃভাষার মতো।[৯৬] এই আরবি ও ফারসি ভাষার মধ্যে দিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন ঐশ্লামিক সংস্কৃতির প্রাচীন ভুবনে।

রামমোহন অতঃপর বেনারসে গিয়ে শিক্ষা করেন সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল প্রশ্নাতীত। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মীমাংসা, তন্ত্রশাস্ত্র প্রায় সর্বপ্রকার শাস্ত্রেই তাঁর অবাধ গতায়াত ছিল। সংস্কৃত-শাস্ত্রের বিশাল সমুদ্রের যে কোনও ভাগে তিনি সুদক্ষ সাঁতারুর মত পৌঁছতে পারতেন।

ইংরাজি তিনি শিখেছিলেন পরে। ইংরাজি ভাষার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির রাজ্যে। তাঁর প্রকাশিত পুস্তিকার অধিকাংশই তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র প্রায় সবই ইংরাজিতে। পরিমাণগত দিক থেকে তাঁর ইংরাজি রচনার সংখ্যা বাংলার চেয়ে বেশি তো কম নয়।[৯৭] এছাড়াও তিনি শিখেছিলেন গ্রীক ও হিব্রু ভাষা। বাইবেলের খ্রীষ্টতত্ত্বের সত্যাসত্য ও প্রক্ষেপ-নির্ণয় নিয়ে মার্শম্যানের সঙ্গে তাঁর যে বিতর্ক হয়েছিল, তাতে গ্রীক ও হিব্রু-বিদ্যার দৌলতে তিনি মূল ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে দেখিয়েছিলেন, ইংরাজি বাইবেলে বহু জিনিস রয়েছে বা পরে যুক্ত হয়েছে, যা মূল বাইবেলে ছিল না।[৯৮]

ফরাসি ভাষা শেখার কথাও রামমোহনের এক চিঠি থেকে জানা যায়।[৯৯]

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী 'হিন্দি ভাষার রামমোহন' নামক একটি নিবন্ধে লিখেছেন, হিন্দি গদ্য ভাষার বিকাশক্রমের দিক থেকে দেখতে গেলে রামমোহন হলেন 'তৃতীয় হিন্দি গদ্য লেখক'।[১০০] *'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্তসার'* ও *'সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীর সহিত বিচার'* এই তিনখানি গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ, রামমোহন প্রকাশ করেছিলেন।

লরেঞ্জো ভাল্লা বা ফাইলেলফো যে-অর্থে ব্যাকরণবিদ্ ছিলেন, রামমোহনকে সেই অর্থে ব্যাকরণবিদ্ বলা না গেলেও, ভুলে গেলে চলবে না, তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত ব্যাকরণের দুটি সংস্করণ : ইংরাজি ও বাংলা। ইংরাজি সংস্করণটি *'Bangla Grammar in the English Language'* নামে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আর বাংলা সংস্করণটি *'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'* নামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামমোহনের ব্যাকরণ তাঁর সচেতন ভাষাচিন্তার পরিণাম।[১০১]

ভাষাতে প্রকাশ

জে. এ. সাইমন্ডস রেনেসাঁসের চাবিকাঠি স্বরূপ 'রিভাইভ্যাল অব লার্নিং'কে চারটি পর্বে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হচ্ছে, 'এজ অব ট্রানস্লেশন'।[১০২] প্রাচীন

বা মূল ভাষার স্থিত জ্ঞানকে অনুবাদের মাধ্যমে সমকালের গোচরে আনা হিউম্যানিস্টদের একটি প্রধান কাজ। ভাষান্তরণের ক্ষেত্রে রামমোহন পালন করেছিলেন হিউম্যানিস্টসুলভ ভূমিকা। *'বেদান্ত গ্রন্থ'*-র ভূমিকায় রামমোহন পরিষ্কার লিখেছিলেন,

> "লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য-প্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকো এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্ত-শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক।"[১০৩]

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের বক্তব্যের প্রতিবাদ সংস্কৃত ভাষাতে করাতে রামমোহন সংস্কৃতে তার উত্তর দিয়েছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করার জন্য *'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'* লেখাতে রামমোহন তদুত্তরে লিখিত *'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'* নামক পুস্তিকায় লিখেছেন,

> "সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন [1] কিন্তু প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়ে গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্যের অন্যথা করা হয় [1] অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্ত চন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্ত চন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।"[১০৪]

স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন জ্ঞানকে সমকালের গোচরে এনে দেওয়ার দায়িত্ব রামমোহন সচেতনভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন লাতিন-সাহিত্যের প্রতি হিউম্যানিস্টসুলভ আকর্ষণ ও আনুগত্যের কারণে পেত্রার্কা নব্য লাতিন-সাহিত্যের জনক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ত্যাগ করতে পারেননি লাতিন ভাষায় সাহিত্য-চর্চার অমোঘ আকর্ষণ। কিন্তু রেনেসাঁস-ইতালির ভাষা-চর্চার নিবিড় ও দ্বিমুখী-প্রকল্পটি অনুধাবন করলে দেখা যায়, লাতিন ভাষার সপক্ষে একদল হিউম্যানিস্ট যেমন সোচ্চার ছিলেন, তেমনি মাতৃভাষার সপক্ষেও তাদের বক্তব্য কম জোরালো ছিল না। শেষ পর্যন্ত, লাতিন ভাষা থেকে ইতালি ভাষাতেই প্রবেশ করেছিলেন ইতালির সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক ও দার্শনিকরা।[১০৫] রামমোহন প্রথমাবধি ছিলেন ভাষায় (মাতৃভাষা) বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ অনুবাদ বা ভাবানুবাদের পক্ষে। এইভাবেই তিনি বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী না হলেও, বাংলা গদ্যকে বলশালী জ্ঞান-চর্চার বাহন করে তোলার প্রথম পথিকৃৎ।

দ্বিভাষিক-সূত্র

এখানেও একটা দিক লক্ষ করবার আছে, তাঁর অনুবাদ বা বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তিকাগুলিকে নিছক বাংলা বই বলা চলে না। এগুলি প্রকৃতপক্ষে দ্বিভাষিক সূত্রে লেখা। মূল সংস্কৃত সূত্রের উল্লেখ এবং তার সরল বাংলা-ভাষ্য রচনা। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা এইভাবেই উদ্ধারীকৃত গ্রীক বা লাতিন পুঁথিগুলির সমূল, সটীক ও সানুবাদ সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করতেন। প্রখ্যাত হিউম্যানিস্ট এরাজমুস ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সটীক গ্রীক নিউ

টেস্টামেন্ট সম্পাদনা করেন, সঙ্গে দিয়ে দেন তার পরম্পরাক্রমিক লাতিন অনুবাদ।[১০৬] প্রমাণ এবং প্রচার ; মূল এবং তার অনুবাদ দুয়ের কোন দিকই ছাড়বার উপায় ছিল না তাঁদের। শুধু অনুবাদ বা ভাষ্য দিলে লোকে ভাববে, এর সত্যতা কোথায়? মূলে এসব কি সত্যিই বলা আছে? সেজন্য মূল সূত্রগুলি প্রমাণ হিসাবে আনা দরকার। আবার শুধু মূল বা প্রমাণ প্রকাশ করে তো লাভ নেই ; গরিষ্ঠ-সংখ্যক অনধিকারীর কাছে পৌঁছে দিতে হলে অনুবাদ ও ভাষ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই কারণে রেনেসাঁসের আমলে হিউম্যানিস্টদের সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থ বা পুস্তিকাগুলি প্রায়ই হয়ে উঠত দ্বিভাষিক রচনা। *'ব্রহ্মোপাসনা'য়* রামমোহন লিখেছেন,

> "এই শ্রুতির পাঠ এবং ইহার অর্থ চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ক্রম ভাষাতে জানিবেন।"[১০৭]

ইংরাজিতেও

ভাষার প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় আলোচনা করতে হয়। তাঁর ভাষা-চর্চার সোপানটি শুধু সংস্কৃত থেকে বাংলা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ইংরাজিতেও লিখেছিলেন প্রচুর। তাঁর অধিকাংশ রচনারই ইংরাজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। রেনেসাঁস-ইতালিতে দেখা যায়, তাঁরা লাতিন-ভাষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক-ভাষার চর্চাতে অধিকতর মনোনিবেশ করেছিলেন। গ্রীক তাদের স্বদেশীয় ভাষা না হলেও রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা দেখেছিলেন, গ্রীক-ভাষার ভাণ্ডারে রয়েছে জীবনদায়ী ও জীবনবাদী মানব-সংস্কৃতির এক বিশাল-বিপুল ঐতিহ্য। সুতরাং বোক্কাচিও, গুয়ারিনো, বেসারিন, ফাইলেলফো, ব্রুনি, ফিকিনো, ভাল্লা, নিকোলি, পম্পোনাজ্জি প্রভৃতি প্রখ্যাত হিউম্যানিস্টরা গিয়ে ভিড়েছিলেন গ্রীক-ভাষার নিবিড় চর্চায়।[১০৮] রামমোহনের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না সজীব পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবাহক ইংরাজি ভাষাকে।

শিক্ষা

এইচ. আই. মরৌ তাঁর *'হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন এন্টিকুইটি'*-গ্রন্থে লিখেছেন প্রাচীনকালে রোমানরাই প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে বিদেশি একটি ভাষা বা বিদেশি বিদ্যা-চর্চার মধ্যে দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করেন এবং আধুনিক হিউম্যানিজমের পথ প্রস্তুত করেন।[১০৯] ইতালীয় রেনেসাঁসে তার পরিণততর রূপ দেখা যায়। পল, এফ, গ্রেন্ডলার তাঁর *'স্কুলিং ইন রেনেসাঁস ইটালি : লিটারেসি অ্যান্ড লার্নিং, ১৩০০-১৬০০'* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন ১৩০০ সাল নাগাদ দেখা যায় নতুন ধরনের 'সেকুলার স্কুল'।[১১০] এই স্কুলগুলির পাঠক্রম ছিল দু'রকম, 'লাতিন কারিকুলাম' ও 'ভার্নাকুলার কারিকুলাম'। 'লাতিন কারিকুলাম'-যুক্ত স্কুলগুলিতে পড়ানো হত গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যা। রেনেসাঁসের আবহ যথাযোগ্যভাবে গড়ে তোলার জন্য এই লাতিন-পাঠক্রম যুক্ত বিদ্যালয়গুলি ও সেখানে অনুসৃত পাঠক্রম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা দেশে কি-ধরনের শিক্ষানীতি চালু হওয়া উচিত

তা নিয়ে একটা জটিলতা দেখা দেয়। টোল-মাদ্রাসা-মক্তবগুলির শিক্ষাদর্শন পরিবর্তিত কালের বিচারে অকেজো হয়ে এসেছিল। অথচ নতুন শিক্ষানীতি কি হওয়া উচিত তা নিয়ে কোনো সর্বসম্মত মতে উপনীত হওয়া যাচ্ছিল না। অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, এটা ছিল 'time of controversion'....'There were two distinct objectives—(a) encouragement of learned natives and improvements of Indian literature (b) promotion of western knowldge and science.'[১১১]

'ওরিয়েন্টালিস্ট'রা চাইছিলেন এদেশের আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বজায় রাখতে বা তার শ্রীবৃদ্ধি করতে। আর 'অ্যাংলিসিস্ট'রা চাইছিলেন এদেশে প্রবর্তিত হোক পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। কিন্তু কিভাবে খরচ করা হবে, তা নিয়ে কোনো ঐকমত্য না হওয়ায় তা দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থেকে যায়। যেহেতু প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগীরা সরকারী যন্ত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই কারণে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, সংস্কৃত-কলেজ গৃহ নির্মাণ করার জন্য এ-টাকা ব্যয় করা হবে। সেই সময় রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে যে-পত্র লিখেছিলেন তাতে তাঁর শিক্ষাদর্শনের চিত্রটি পরিষ্কার ধরা পড়েছে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর বিশপ হিবারের মাধ্যমে পাঠানো সেই চিঠিতে তিনি লিখলেন,

> "যখন আমরা আশা করছিলাম জ্ঞানের প্রভাতসূর্য দেখতে পাবো....পশ্চিমের আলোকিত জাতি হিসাবে আপনারা এশিয়ায় আধুনিক ইওরোপের মানবিকী বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চার বৃক্ষ রোপণ করবেন....তখন দেখলাম সরকার বাহাদুর হিন্দুপণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালনযোগ্য সংস্কৃত স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যে সংস্কৃতের চর্চা ভারতে প্রচলিত রয়েছেই। ইওরোপে বেকনের পূর্বে যে ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু ছিল এ হচ্ছে সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান মাত্র। এই শিক্ষা ব্যাকরণের কচকচি ও অবাস্তব দর্শনের খুঁটিনাটি দিয়ে তরুণদের মন বোঝাই করে দেবে, যা শিক্ষার্থী বা সমাজের কোনও উপকারে আসবে না। শিক্ষার্থী শিখবে সেই ধরনের বিদ্যা, দু'হাজার বছর ধরে ভারতের সমস্ত প্রান্তে যা চালু রয়েছে, যা অর্থহীন ও অসাড় ; যা প্রকৃত মানুষ সৃষ্টিতে ব্যর্থ।....বৃটিশ জাতিকে যদি বেকনীয় জ্ঞান ও শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে তার পূর্বের যুগের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে ফেলে রাখা হতো, তাহলে যা হতো, ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও তাই হবে, যদি পূর্বতন সংস্কৃত-শিক্ষার মধ্যে তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়। 'In the same manner, the Sanskrit system of education would be best calculated to keep the country in darkness.' দেশীয়দের উন্নতিই যদি সরকার বাহাদুরের লক্ষ্য হয় তবে "It will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry and Anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."[১১২]

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত *'রামমোহন রায় অ্যান্ড দ্য নিউ লার্নিং'* নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'He rejected Sanskritic learning....To that learning he proposed a new learning which was essentially Western learning.'[১১৩]

মধ্যযুগীয় 'স্কলাস্টিক' শিক্ষাদর্শনকে বাতিল করে রেনেসাঁসের শিক্ষাবিদ ও হিউম্যানিস্টরা যেমন অন্যতর ভাষা-মাধ্যম ও অন্যতর সংস্কৃতির চর্চাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, রামমোহনের শিক্ষাচিন্তায় দেখা যায় প্রায় তার সমান্তরাল দৃশ্য। পাওলো ভার্গারিও তাঁর *'দ্য ইঞ্জেনুইস মরিবুস'* বা লিওনার্দো ব্রুনি তাঁর *'অন স্টাডিজ অ্যান্ড লেটার্স'*-নামক রচনায় ; ফাইলেলফো, গুয়ারিনো বা ভিত্তোরিনো তাঁদের ব্যবহারিক শিক্ষাদর্শনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি নিয়ে যে নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা-পর্বে সামান্য একটি পত্রে রামমোহন তার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেননি। এদেশের শিক্ষানীতি নিয়ে যে টানাপোড়েন এতদিন চলছিল, তা ছিল দু'দল ভিন্ন মতাবলম্বী সাহেবদের বিবাদমাত্র, রামমোহনের এই চিঠি নির্ধারণ করে দেয় সেই বিবাদের ভাগ্য। দেশীয় শিক্ষানীতি নিয়ে রামমোহনের এই চিঠিই ছিল শিক্ষা-বিষয়ে এদেশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর।

একাডেমি

জে. এ. সাইমন্ডস 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এর আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'একাডেমি'র গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।[১১৪] বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার নতুন সংস্কৃতিকে সমভাবাপন্ন বহুজনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একাডেমি-ধরনের সভা-সমিতির। আলাপ, আলোচনা, বিচার, বিতর্ক, পাঠ, বক্তৃতা ও শ্রুতির জন্য প্রাণ-সঞ্চারক জমায়েত বা বিদ্বৎ-সভা ইতালিতে বহুল পরিমাণে দেখা দিয়েছিল।[১১৫] ফিকিনো, পম্পোনাজি, বেনেদেত্তো ভার্চি, স্পেরোনে স্পেরোনি, পিকো দেল্লা মিরানদোল্লো, অলডাস ম্যানুটিয়াস, জাবারেলা প্রভৃতি বিদ্বান ও সুপণ্ডিতদের কেন্দ্র করে ইতালির বিভিন্ন শহরে এই ধরনের একাডেমি গড়ে উঠেছিল। এখানে সবরকম বয়সের মানুষ এসে ভিড় করতেন। মূলত এই সব একাডেমির সূত্র দিয়েই পণ্ডিতদের পঠন ও ভাবনা-চিন্তা ইতালির সামাজিক জীবনে সঞ্চারিত হয়েছিল। রামমোহন কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর, তাঁর কলিকাতাস্থিত বাড়িতে 'আত্মীয়-সভা' নামে একটি বিদ্বৎসভা স্থাপন করেন[১১৬] ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মানিকতলার উদ্যান-গৃহে এই মিলনসভাটি বসত। উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ছিল ইওরোপীয়দের বিদ্বৎসভা। দেশীয়দের প্রথম বিদ্বৎসভা বলতে রামমোহনের 'আত্মীয়-সভা'কেই বোঝায়। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ থেকে পৃথক ধরনের ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনাদি এখানে হতো।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আগষ্ট কমল বসুর জোড়াসাঁকোস্থিত বাড়িতে স্থাপিত হয় 'ব্রাহ্ম সমাজ'। রামমোহনের উদ্যোগে স্থাপিত এটি দ্বিতীয় সভা। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক প্রমুখ ছিলেন এই সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী। পরে চিৎপুর রোডের উপর ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ হলে, ১৮৩০ সালের ১১মাঘ এর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হয়।[১১৭] এই ধরনের আজব ধর্ম-সভা বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল। এই

ব্রাহ্মসমাজের 'ন্যাসপত্র'টি পড়লে টের পাওয়া যায়, কি ধরনের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রামমোহন একে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলা হয়েছে, সকল ধর্ম ও মতের মানুষ এখানে আসতে পারবে।[১১৮] সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় মুসলমান ও ফিরিঙ্গি বালকেরা পারসিক ও ইংরেজি ভাষাতে পরমেশ্বরের স্তবগান করত।

রামমোহন 'আত্মীয়-সভা' বা 'ব্রাহ্ম-সমাজের' মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে জমায়েত ও মিলনসভার সূচনা করেন, পরবর্তীকালে ইয়ংবেঙ্গলদের 'অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' (১৮২৯), 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮), দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৪১) বা 'বীটন সোসাইটি' (১৮৫১) প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সেই বিদ্বৎসভার ঐতিহ্য বাংলার জাগরণের অন্যতম প্রবাহক রূপে তাদের ভূমিকা বিচ্ছুরিত করেছিল।

মুদ্রণ-যন্ত্র

ফ্রান্সিস বেকন তাঁর *'নোভাম অর্গানন'*-এ বলেছেন তিনটি জিনিস দুনিয়ার চেহারা বদলে দিয়েছে—মুদ্রণ-যন্ত্র, বন্দুক এবং কম্পাস।[১১৯] পুঁথি-নকলকারী ও হিউম্যানিস্টদের স্মৃতি-শক্তির উপর নির্ভর করে রেনেসাঁসের ইতালিতে প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও প্রসারমুখী জ্ঞানের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কারের গৌরব জার্মানির হলেও ইতালিতে তার সুফলদায়ী প্রভাব দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিউম্যানিস্টদের সটীক ও সম্পাদিত পুঁথি ও প্রস্তাবগুলি নকলকারীদের ডেস্ক থেকে মুদ্রকদের কর্মশালায় স্থানান্তরিত হয়। এলিজাবেথ এল. আইজেনস্টাইন তাঁর *'দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যাজ অ্যান এজেন্ট অব চেঞ্জ'* নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন মুদ্রণযন্ত্র কী বৈপ্লবিক ভূমিকাই না পালন করেছিল।[১২০]

রামমোহন যে-মুদ্রণ যন্ত্রের অকুতোশক্তি সম্পর্কে প্রথমাবধি অবহিত ছিলেন, এবং সচেতনভাবেই তাঁর চিন্তা ও দর্শনকে প্রসারিত করার জন্য মুদ্রণ-যন্ত্রের উপর নির্ভর করেছিলেন, তার প্রমাণ শুধু তাঁর কাজ-কর্মে নয়, স্বরচিত জীবনালেখ্যমূলক একটি চিঠিতেও আছে। তিনি লিখেছেন,

> "Availing myself of the art of printing now established in India, I published various works and pamphlets against their errors in the native and foreign languages."[১২১]

প্রিন্টিং আর্টকে রামমোহন দু'ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন—১. পুস্তিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ, ২. পত্রিকা প্রকাশ। ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের বিরুদ্ধে ও সংস্কারমুক্ত ও ন্যায়বাদী লোকেদের প্রশিক্ষিত করার জন্য রামমোহন অধিকাংশ পুস্তিকা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে একের পর এক বিলি করেছিলেন। *'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার'* পুস্তিকাটি তিনি একই সঙ্গে চারটি ভাষায় (সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা, ইংরাজি) ও তিন রকম লিপিতে প্রকাশ করেছিলেন। যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই তিনরকম মুদ্রণ-লিপির সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তিনি। মিশনারীদের সঙ্গে যখন বিতর্ক বেধে উঠল তখন *'ব্রাহ্মণ-সেবধি Brahminical Magazine'* নামে দ্বিভাষিক সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন তিনি। এর

বাঁ-পৃষ্ঠায় বাংলা ও ডান-পৃষ্ঠায় ইংরাজি অনুবাদ থাকতো। মুদ্রণ-যন্ত্রের এই সুচিন্তিত ব্যবহার ইতালিতে দেখা গিয়েছিল। মার্শম্যানের সঙ্গে *'প্রিসেপ্টস্ অব জেসাস'* নিয়ে বিতর্ক যখন জমে উঠেছে, তখন 'ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস' জানিয়ে দেয় খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী পুস্তিকা ছাপা সম্ভব নয়। রামমোহন উপায়ান্তর না দেখে,

"অক্ষরাদি প্রস্তুত করাইয়া নিজে ধর্ম্মতলায় ইউনিটেরিয়ান প্রেস নামে একটি মুদ্রণযন্ত্রালয় স্থাপন করিলেন। উহার কার্য্য দেশীয় লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায়ই দেশীয় মুদ্রণযন্ত্রের সংস্থাপক।"[১২২]

চাবিতালার মধ্যে যে জ্ঞান বন্দী ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছাড়া অন্য জাতির যে বিদ্যায় অধিকার ছিল না ; শূদ্র-স্ত্রী-বিধর্মী-নিরপেক্ষভাবে সকলের জন্য তাকে উন্মোচিত ও প্রকাশিত করার জন্য রামমোহন মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্য যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

পত্র-পত্রিকা

পত্র-পত্রিকার ব্যাপার রেনেসাঁসে অজানা ছিল। মুদ্রণশিল্পের শাশ্বত দান মুদ্রিত গ্রন্থ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সাময়িক বা দৈনিক অবদান সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র। রামমোহন এদিক দিয়েও মুদ্রণ-শিল্পের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। রামমোহনের 'আত্মীয়-সভা'র এক সদস্য হরচন্দ্র রায় *"বাঙ্গাল গেজেটি"* প্রকাশ করেন।[১২৩] রামমোহন রচিত 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নির্ত্তকের সংবাদ' *"বাঙ্গাল গেজেটি"*তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বের হল *"সম্বাদ-কৌমুদী"*। এর সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। প্রত্যেক মঙ্গলবার "সম্বাদ-কৌমুদী" আট পৃষ্ঠা করে প্রকাশিত হতো। রামমোহন এতে নিয়মিত লিখতেন।[১২৪] রামমোহনের নানা সংস্কার-প্রস্তাব এতে ছাপা হওয়ায় গোঁড়া হিন্দুরা এর উপর চটে যান। এর এক সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *"সম্বাদ-কৌমুদী"* ছেড়ে *"সমাচার-চন্দ্রিকা"* নামে রক্ষণশীল একটি পত্রিকা বের করেন। রামমোহনের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় বের হল *"মীরাৎ-উল্-আখবার"* নামে একটি ফারসি ভাষার কাগজ। ছাপানো শুরু হয় ১৮২২ সালের ২২ এপ্রিল থেকে। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারী আইনের প্রতিবাদে রামমোহন কাগজ বন্ধ করে দেন ১৮২৩ সালেই। বাকিংহাম ও রামমোহনের সম্পাদনার ধরন দেখে সরকার সতর্ক হয়ে ওঠে। গভর্নর জেনারেলের চীফ সেক্রেটারি ডাবলু. বি. বেইলি ১০ অক্টোবর ১৮২২ সালে এক দীর্ঘ নোটে *'মীরাৎ-উল্-আখবার'*কে 'harmful to British interest' বলে মন্তব্য করেছিলেন।[১২৫] ১৮২৩ সালে চালু হয় 'প্রেস রেগুলেশন অ্যাক্ট'। পত্রিকা বন্ধের যন্ত্রণা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন একটি কবিতাংশ উদ্ধার করে,

> "যে সম্মান শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে অর্জন করেছ, অনুগ্রহের আশায় তা দারোয়ানের কাছে বিকিয়ে দিও না।"[১২৬]

'প্রেস রেগুলেশন অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে ৫৪টি অনুচ্ছেদ সমেত, কয়েকজনের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি ইংলন্ডে কাউন্সিলের কাছে পাঠিয়েছিলেন,[১২৭] যাব তুলনা মিলটনের *'অ্যারিওপ্যাজিটিকা'*।[১২৮]

ক্রিটিক্যাল-ম্যান

রামমোহনের মধ্যে আমরা লক্ষ করি 'রেনেসাঁস ম্যান'-এর অনেকগুলি ফ্যাকাল্টি। চলমান জড়ত্বের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা সমালোচনা-মুখর ছিলেন। কারো-কারো রচনায় সেই সমালোচনা তীক্ষ্ণতম রূপ ধারণ করে। পোপের পার্থিব রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে লরেঞ্জো ভাল্লা খ্যাত হয়েছিলেন 'ক্রিটিক্যাল ম্যান' হিসাবে।[১২৯] ইংলন্ডের বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট টমাস মোরেকে রাজতন্ত্র-বিরোধী একটি রচনার জন্য রাজা অষ্টম হেনরী মৃত্যুদণ্ড দেন।[১৩০]

রামমোহনের প্রস্তাব-বিচার-বিতর্ক-মূলক পুস্তিকাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের ক্রিটিক্যাল ফ্যাকাল্টি। এদেশের রক্ষণশীল সমাজপতি ও তাদের কায়েমী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে রামমোহন লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন—তার অজস্র পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন রচনাকর্মের মধ্যে।

জেন্টলম্যান

রেনেসাঁসের মধ্যে শুধু ভাল্লা বা সেল্লিনির মতো আক্রমণাত্মক মানুষই নন, কাস্তিলিওনে[১৩১] বা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো মার্জিত, সুরুচি-সম্পন্ন, সুভদ্র মানুষেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কাস্তিলিওনে ছিলেন বহু গুণান্বিত, নমনীয়, সজ্জন, ঝকঝকে এক সামাজিক মানুষ। অনেক ব্যক্তিগত সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, রামমোহনের আকর্ষণীয় ও নমনীয় ব্যক্তিত্বের কথা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবেলায় দেখা রামমোহনের এবং বিলেতে আর্ল অব মনস্টার ফিৎসক্লারেন্সের দেখা রামমোহনের মধ্যে একটা মৌলিক মিল আছে। ফিৎসক্লারেন্স তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'রামমোহন এক অসাধারণ ব্রাহ্মণ, 'fine person and most courtly manners'।[১৩২] আর্নট বলেছেন,

> "লেখালেখির সূত্রে তাঁর প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ইওরোপ জুড়ে। কিন্তু তাকে যে চাক্ষুষ দেখেনি ও নিজের কানে তার কথাবার্তা শোনেনি, সে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করতে পারবে না।"[১৩৩]

কথা বলার সময় ইংরাজি, আরবি, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি গ্রন্থাদি থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি দিতেন। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা কিন্তু এমন সরল ও আন্তরিকভাবে করতেন, যে তা সকলের হৃদয় জয় করত। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর সৌজন্য ও শালীনতাবোধ ছিল উচ্চমানের।[১৩৪] রামমোহন বিতর্কমূলক রচনাগুলি লিখেছিলেন আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের মধ্যে ; কিন্তু কোথাও তিনি ভব্যতা থেকে স্খলিত হননি। *ব্রাহ্মণ সেবধি'তে* অশালীন আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> "সাধারণ ভব্যতা এ-সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি ; পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।"[১৩৫]

তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে টি. বুট লিখেছেন,

> "No one in past history, or in present time ever came before my judgement clothed is such wisdom, grace and humility."[১৩৬]

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো রামমোহন শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ ও সুদর্শন, রাফায়েলের মতো পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিত। লিওনার্দোর ব্যক্তিত্বও ছিল অনুরূপ আকর্ষণীয়, ঝকঝকে ও বিদ্যাদীপ্ত। সেল্লিনি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'তার চেয়ে বেশি জানে এমন কোনো মানুষ আমার জানা নেই।'[১৩৭] রামমোহন সম্পর্কেও একথা বলা যেতে পারত।

রসিক মানুষ

রেনেসাঁসে দেখা দিয়েছিল জীবনরস-রসিক মানুষ।[১৩৮] ব্যক্তি-প্রতিভার প্রতিযোগিতা ও পরিপার্শ্ব-সচেতনতার যুগে মানুষের জিভ ও কলম বেশ শাণিত ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। আঘাতের যোগ্য ব্যাপারকে তাঁরা ব্যঙ্গের ছুরি দিয়ে আক্রমণ করতে দ্বিধা করতেন না। 'রসিকরাজ' উপাধিপ্রাপ্ত দোলসিবেনে ও ব্যঙ্গাত্মক লেখক আরেতিনো সে-আমলে প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। রামমোহন বিদ্বান এবং সংস্কার-কর্মে ব্যাপৃত এক সংগ্রামী যোদ্ধা হিসাবেই পরিচিত, কিন্তু তাঁর শাণিত ব্যক্তিত্বে কখনও কখনও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ছুরিও ঝলসে উঠত। বিপুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিশ্রমী রচনাগুলির মধ্যে তাঁর সেই রসবোধের পরিচয় একেবারে অসুলভ নয়। দু-একটি সে-রকম রচনার উদাহরণ—'*অতি আমোদজনক তর্কযুদ্ধের কথা*',[১৩৯] '*পাদরি ও শিষ্য-সম্বাদ*'।[১৪০] যুগপৎ ইংরাজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। কথোপকথনের আকারে লেখা। পাদরি ও তাঁর তিনজন চীন দেশস্থ শিষ্যের কথোপকথন। বিষয়—'ঈশ্বর ক'জন? নাস্তিক শিষ্যটি বলে, 'ঈশ্বর নাই'। তার যুক্তিমালা বেশ মজার। পাদরিকে সে বলে,

> "পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি।"[১৪১]

এই ধরনের সহজ রসিকতার পাশাপাশি রামমোহন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করতেও ওস্তাদ ছিলেন। রসিকতার ছুরি দিয়ে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের বন্ধন কাটার দৃষ্টান্ত আছে তাঁর সহমরণ বিষয়ক পুস্তিকাতেও। বিপ্রনামা নামে একজন লিখেছিলেন, 'সহমরণাদি কাম্য কর্ম। কামনা পরিত্যাগপূর্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়।' রামমোহন তদুত্তরে লেখেন, লেখকের যা শাস্ত্রজ্ঞান তাতে হয়ত 'বিপ্রনামা ভবিষ্যপুরাণোক্ত নরবলি প্রদানের প্রবৃত্তিও দিবেন, যে যদ্যপিও এ ক্রুর কর্ম্ম হয় কিন্তু কামনা ত্যাগপূর্বক করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবেক—ধন্য ২ বিপ্রনামা ধন্য অধ্যাপক।'

সেকুলার-ম্যান

নাস্তিক বা ধর্মহীন অর্থে অবশ্যই সেকুলার ছিলেন না রামমোহন। ইতালীয় রেনেসাঁসের দিকে যদি তাকাই সেই অর্থে কেই বা নাস্তিক ছিলেন সেখানে?[১৪২] 'ক্লাসিক্যাল-হিউম্যানিস্ট' হিসাবে খ্যাত পেত্রার্কা থেকে 'ক্রিশ্চিয়ান-হিউম্যানিস্ট' হিসাবে সুপরিচিত এরাজমুস প্রায় সকলেই ছিলেন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী। রেনেসাঁসের মানুষ চার্চের সমালোচনা করেছেন,

কিন্তু কেউই তাকে পরিত্যাগ করেননি। পেত্রার্কা মনে করতেন, 'True philosopher is a lover of God.'[১৪৩] এরাজমুস বলতেন,

> "All studies philosophy, rhetoric are followed for this one object, that we may know Christ and honour Him. This is the end of all learning and eloquence."[১৪৪]

রেনেসাঁসের চিত্রকলার দিকে তাকালেও দেখা যায়, ধর্মীয় বিষয় তাঁদের কাছে কম আগ্রহের বিষয় ছিল না।[১৪৫] সুতরাং রেনেসাঁস ধর্মকে বাদ দিয়ে এগিয়েছিল—এই ধারণা ঠিক নয়। সেখানে যে জিনিস হয়েছিল, তা হচ্ছে ধর্মকে সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আবহমান বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণাকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে যুগোচিত নানা প্রশ্নের জালে তাকে ছেঁকে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। পিকোর মানুষ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিস্ময় হয়েও ঐশ্বরিক সৃজন-বলয়ের বহির্গামী কিছু নয়।[১৪৬] ফিকিনোর *'দে ভিতা'*র মানুষের অবস্থান বিশাল বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রীয় বিন্দুতে।[১৪৭] নানা অপবিশ্বাস, ও ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী থেকে তাদের মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল বৃহত্তর ও নির্মুক্ত এক পৃথিবীতে। রেনেসাঁস বন্ধনছেদের এক অপরূপ মুক্তি-প্রকল্পে নতুন করে সাজিয়ে তোলা এক অধি-আত্মিক জীবনের গল্প যেন।

অস্তিত্বের প্রবল বসন্ত যেমন গাছের ভিতর থেকে অদৃশ্য দাঁত দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু পল্লবের জামা কেটে বের করে আনে নিজেকে ; প্রমাণিত করে ঋতুর পালাবদলের সত্যকে, রামমোহন তাঁর ধর্মভাবনার মধ্যে সেই সংক্রান্তি ও উন্মোচনকেই ফলিয়ে তুলেছিলেন। জাতিভেদের দ্বারা জীর্ণ, মূর্তিপূজার দ্বারা গ্রস্ত, নানান অপবিশ্বাস ও বিদ্বেষে বিকলাঙ্গ হিন্দুধর্মের বর্তমান অবস্থা যে জাতি হিসাবে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী—এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।[১৪৮] ধর্মের নামে পুরোহিত-তন্ত্রে অমানবিক নীতি-নির্দেশ যে প্রতিবাদ ও উচ্ছেদের যোগ্য-এ বক্তব্যও তিনি নিয়ে আসেন। ইসলামের মধ্যে থাকা একেশ্বরবাদ, মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ, উপনিষদের মধ্যে স্থিত অথচ বিস্মৃত ব্রহ্মবাদ, ও একত্ববাদী খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যসূত্র তিনি রচনা করার প্রয়াস পান। তাঁর এই সংশ্লেষণ-প্রয়াস ইতালীয় রেনেসাঁসের মরমীয়াবাদী দার্শনিক পিকো দেল্লা মিরানদেল্লোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের সঙ্গে প্যাগান জীবনবাদকে অনেকেই মেনেছিলেন, পিকো তার সঙ্গে *'কাবালা'*য় বর্ণিত হিব্রু-দর্শনের মেলবন্ধন ঘটান। সমস্তরকম গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠা ও ধর্মকে মানবিক কল্যাণবোধের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়াকে যদি সেকুলার জীবনদর্শন আখ্যা দেওয়া যায়, রামমোহন ছিলেন সেই সেকুলারিজমের অনন্য প্রবক্তা। শুধু বিশ্বাসের কথা নয়, তাঁর পড়াশুনা-চাকরি-আহার-সংসর্গ-গ্রন্থরচনার বিষয়-বিদ্যাচর্চা-বিতর্ক-সংস্কার আন্দোলন—সমস্ত কিছুর মধ্যে যে চরিত্রটি ফুটে আছে তাতে তাঁকে মিলনধর্মী মানবসংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে-অভিহিত করা যায়।[১৪৯] অমলেন্দু দে তাঁকে 'মাজমা-উল্-বাহরাইন' (দুই সমুদ্রের মহামিলন) এর প্রবক্তা দারা শিকোহ্র উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন।[১৫০] বঙ্গীয় রেনেসাঁস ছিল এক অর্থে কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু-সমাজের রেনেসাঁস। মুসলমান-সমাজ তার বাইরে থেকে গিয়েছিল।[১৫১] কিন্তু রামমোহন সম্পর্কে এ-অভিযোগ অচল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের যাঁরা হোতা, তাঁরা

রামমোহনের কাছ থেকে কেন চাঁদা নেওয়া যাবে না—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ্যেই অতিরিক্ত মুসলমান সংসর্গের কথা তুলেছিলেন।[১৫২] ব্রজেন্দ্রনাথ শীল থেকে দিলীপকুমার বিশ্বাস সকলেই দেখিয়েছেন, ইসলামধর্মের সাবল্য ও বিশ্বজনীনতা তাঁকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল।

> "ইসলাম ধর্মের সঙ্গে গভীর পরিচয় তাঁর চিন্তাকে তিনভাবে প্রভাবিত করেছিল। কুরান শরীফ অধ্যয়নের ফলে হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রতীকোপাসনায় তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয় ও আজীবন নিশ্ছিদ্র একেশ্বরবাদের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয়, ইসলাম ধর্মের মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ ও আপেক্ষিক সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি বহুল পরিমাণে তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও বিচারশীল মনোভাব গঠনে সহায়ক হয়। উপরন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুফী মরমিয়াবাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।"[১৫৩]

শ্রীমতী কার্পেন্টারের *'দ্য লাস্ট ডেজ ইন ইংল্যান্ড অব দ্য রাজা রামমোহন রায়'* বইটির পাঠকমাত্রই জানেন, পাদ্রি প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মের জড়াইবুড়ি অংশকে প্রত্যাখ্যান করলেও খ্রীষ্টধর্মের একত্ববাদকে তিনি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।[১৫৪]

রামমোহন নন্দকিশোর বসুকে ইংলন্ড যাত্রার প্রাক্কালে বলেছিলেন,

> "মুসলমানরা তাঁকে মুসলমান, হিন্দুরা তাঁকে বৈদান্তিক হিন্দু ও খ্রীষ্টানরা তাঁকে একত্ববাদী খ্রীষ্টান বলবে।"

নন্দকিশোর বসু এই বক্তব্যের মর্মপাঠ করেছেন এইভাবে, 'But he really belonged to no sect. His religion was universal theism.'[১৫৫] রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মসভা'র *'ন্যাসপত্রে'* এই গোঁড়ামি মুক্ত সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ধরা পড়েছে। তাতে বলা হয়েছে,—এই সমাজের উপাসনাগৃহ জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, প্রতীক, চিত্র বা প্রতিমূর্তি থাকবে না। এখানে কোনো সম্প্রদায়ের দেব-দেবী, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মগুরুর নিন্দা করা যাবে না ইত্যাদি....।[১৫৬] সমস্ত প্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উন্নত এই মানুষটি ধার্মিক হয়েও যে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার এই শুভ্র-সমুন্নত মূর্তি ইতালীয় রেনেসাঁসেও সুদুর্লভ ছিল।

কসমোপলিটান-ম্যান

সাইমন্ডস *'রেনেসাঁস ইন ইটালি'* গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, 'রেনেসাঁসের সংস্কৃতি স্বাদেশিক নয়, কসমোপলিটান।'[১৫৭] প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন বিদ্যাচর্চার সূত্রে তার হিউম্যানিস্টরা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন সমকালকে। ফিকিনো যখন 'প্লেটোনিক একাডেমি'তে চুটিয়ে প্লেটোর দর্শন চর্চা করেছেন, তখন তিনি ভাবেননি প্লেটো তাঁর স্বদেশের মানুষ ছিলেন কিনা। টিশিয়ান বা রাফায়েল যখন প্যাগান বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন, তখন খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অন্তঃশীল আনুগত্য তাঁদের ব্যাহত করেনি। 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' নামে খ্যাত এরাজমুসের জন্ম নেদারল্যান্ডে, শিক্ষা ফ্রান্সে, শিক্ষকতা ইংলন্ডে ; তাঁর ভ্রমণতীর্থ ইতালি,

বসবাস মুখ্যত ব্যাসেলে, প্রাচীন জার্মানিতে কথা বলতে ভালবাসতেন, ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রীক ও লাতিন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় সব দেশই তাঁর স্বদেশ, প্রকৃতপক্ষে 'He belonged to none'.[১৫৮] রেনেসাঁস মানুষকে নিখিল বিশ্বের মানুষ করে দিয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনকে রেনেসাঁসের নিজস্ব অর্থেই 'বৈশ্বিক-মানুষ' হিসাবে পাওয়া যায়। কম-বেশী এগারোটি ভাষায় যাঁর দখল ছিল, বলা যেতে পারে 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী! রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি',-র সীমা তিনি অতিক্রম করে গিয়েছিলেন অনায়াসে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্ম-সমাজ'-এর ন্যাসপত্রে 'রামমোহন রায়ের সর্ববিধ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বিশ্বজনীন অধ্যাত্মবোধের অতি সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে।'[১৫৯] তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, 'Brother, our religion is universal'—এই কথাটি বলতে বলতে তাঁর চোখ অশ্রু-পূর্ণ হয়ে উঠত।

রামমোহনই প্রথম ভারতীয় যিনি সমুদ্র পেরিয়ে রওনা দিয়েছিলেন ইওরোপের পথে।

> "The West had long gone to the East, with him the East began to come to the West."[১৬০]

রেনেসাঁসের দু'টি মৌলিক প্রবণতার নাম 'discovery of man' ও 'discovery of the world.'[১৬১] মোগল বাদশাহের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার কাজে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন—এটা বাইরের তথ্য ; সত্যটা ধরা পড়েছে তাঁর নিজের জবানীতে—

> "I now felt a strong wish to visit Europe, and obtain, by personal observation, a more thorough insight in its manners, customs, religion and political imstitutions."[১৬২]

দূরের বিশ্বকে জানার রেনেসাঁসোচিত অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কালাপানি পেরনোর শাস্ত্রীয় নিষেধ লঙ্ঘন করতে সাহসী করেছিল ও ইওরোপের পথে প্রথম ভারতীয় সমুদ্রযাত্রী করেছিল। সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে কিভাবে তিনি স্থাপন করেছিলেন তাঁর মানসিক সম্পর্ক, তার প্রমাণ আছে বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে—সে-সম্পর্কে তার সদা-জাগ্রত কৌতূহল ও সেই সব ঘটনাজনিত প্রতিক্রিয়ায়। ফ্রান্স, স্পেন, নেপলস, পর্তুগাল, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের তৎকালীন আন্দোলন ও ঘটনাবলীতে রামমোহন যে উদ্দীপিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাতে তাঁকে 'বৈশ্বিক মানুষ' বলতেই হয়।[১৬৩] রাষ্ট্রনৈতিক সীমা ডিঙিয়ে যাবার জন্য পাসপোর্ট লাগে। বিশ্বমানবতাবোধের যে স্তরে তিনি মানসিকভাবে উন্নীত হয়েছিলেন, তা ধরা পড়েছে পাসপোর্টের জন্য ফরাসি বিদেশ-মন্ত্রককে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,

> "....all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches."[১৬৪]

যদি সাংস্কৃতিক-সংশ্লেষণের দিকে থেকে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে, সেদিক থেকেও রামমোহন পালন করেছিলেন ইতালীয় বা ইওরোপীয় হিউম্যানিস্টদের তুলনায় প্রসারিত ভূমিকা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য উদ্ধার করছি,

> "The European Renaissance integrated or made an effort to integrate the Graceo-Roman culture with the Judaeo-Christian; Rammohun took upon himself the more complex task of weaving the entire Graceo-Roman Judaeo-Christain culture of the west into the fabric of an ancient Eastern culture. It was a great experiment in building up a new international humanity."[১৬৫]

রামমোহনের আন্তর্জাতিকতাবাদকে কেউ কেউ ব্রিটিশের দালালি[১৬৬] হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশরা যে করাল বিশ্বদর্শন হাতে করে এদেশে এসেছিলেন, রামমোহন বা রবীন্দ্রনাথের ইওরোপ-যাত্রা বা বিশ্বভ্রমণ তারই সমীভূত একটি প্রক্রিয়া নয়। দু'টি পৃথক যাত্রাবিন্দু, দু'টি পৃথক তরণী, দু'টি পৃথক লক্ষ্য। ব্রিটিশের হাতে আন্তর্জাতিকতাবাদ বন্ধনের রজ্জু, রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবাদ সেই বন্ধন থেকে মুক্তির অন্যতর অভিযাত্রা। মানব সভ্যতার যে ঐতিহাসিক বিকাশ-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইতালি, স্পর্শকাতর আত্মসংকোচের পরিবর্তে বিস্তারমুখী বিশ্ববাদী সাংস্কৃতিক উদারতাকে আশ্রয় করেছিল, ভারতেতিহাসের বিশেষ সাংস্কৃতিক ক্রান্তি-লগ্নে দাঁড়িয়ে, রামমোহন সেই একই রকম প্রসারণমুখী আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবাহক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

লিবারেটর

রামমোহনকে রেনেসাঁস অর্থে একজন 'লিবারেটর' হিসাবে গণ্য করা যায়। প্রাচীন বা মধ্যযুগের 'লিবারেটর' ও রেনেসাঁসের 'লিবারেটর'-এর মোদ্দা তফাৎ দু'টি। এক, রেনেসাঁসের লিবারেটর কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবী করেন না। মানুষ হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত, বিশ্বাস নয়, বিচার ; আনুগত্য নয়, জিজ্ঞাসাই তাঁর হাতিয়ার। চৈতন্যের সময় বাঙলায় প্রথম রেনেসাঁস হয়েছিল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা এই সত্যটা বিস্মৃত হয়ে যান। তৃতীয়ত, আরও একটা গুরুতর তফাৎ আছে—মধ্যযুগের 'লিবারেটর' 'একামেবাদ্বিতীয়ম'। তাঁর ভাবনা চিন্তা, তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে জনমানস আবর্তিত হতে থাকে। রেনেসাঁসে উদিত হয় বিভিন্ন ধরনের মননশীল ও সৃজনশীল প্রতিভা। বিভিন্ন দিক থেকে এখানে সমস্যাকে আক্রমণ করা হয়। জীবনকে বিভিন্নভাবে সংরচিত করার উদ্যম চলতে থাকে। চতুর্থত, দর্শনগত দিক থেকে একটা মৌলিক তফাৎ হচ্ছে এই যে, 'স্কলাস্টিসিজম'[১৬৭] আখ্যাত মধ্যযুগীয় দর্শন প্রাচীন বিশ্বাস ও শাস্ত্রকে যুক্তি-শোধিত করে মাত্র, কিন্তু রেনেসাঁসের 'হিউম্যানিজম'[১৬৮] প্রাচীন শাস্ত্র বা বিদ্যাকে ব্যবহার করে মানবিক কারণগুলিকে সমর্থন করার জন্য ; প্রয়োজনে সে প্রাচীন বিদ্যাকে বর্জন করে এবং নতুন জ্ঞান ও রীতি-নীতির সঙ্গে হাত মেলায়। রামমোহনের 'লিবারেশন'-প্রক্রিয়া রেনেসাঁসোচিত। পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি একই সঙ্গে গ্রহণ করেছেন কোরান ও উপনিষদের শাস্ত্রিক জ্ঞান। সতীদাহ-প্রথা নিবারণের সমর্থন যেমন খুঁজেছেন প্রাচীন শাস্ত্রে, তেমনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গ্রহণ করেছেন প্রশাসন (বেন্টিঙ্ক) ও আইনের শক্তি। প্রাচীন জ্ঞানকে অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃতের দুষ্প্রবেশ্য অন্তরাল থেকে উদ্ধার করেছেন, আবার পাশ্চাত্য-

বিদ্যাকেও সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। অজ্ঞানতা, অনধিকার, অবিচার ও অন্যায্যতার বিরুদ্ধে তিনি মানবিক জ্ঞান ও ন্যায্য অধিকারের সপক্ষে 'রেনেসাঁস লিবারেটর'-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন। *'তুহ্‌ফৎ-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্‌'*-এর সমাপ্তি অংশে রামমোহন মনুষ্য প্রজাতিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন।[১৬৯] প্রথমত প্রতারক, যারা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধর্মবিশ্বাসের নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করে। দ্বিতীয়ত যারা প্রতারিত, যারা প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান না করে অপরের অন্ধ অনুসরণ করে। তৃতীয়ত যারা প্রতারক ও প্রতারিত, যারা বিনা বিচারে অন্যের কথা মেনে নেয় এবং অপর মনুষ্যরাও যাতে বিনা বিচারে সেই কথা মানে তারই চেষ্টা করে। চতুর্থত যারা অন্যদের প্রতারণা করে না, নিজেরাও প্রতারিত হয় না। চতুর্থ শ্রেণীর মানুষেরা সৎ ও সত্যান্বেষী। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, রামমোহন কোন্‌ শ্রেণীতে পড়বেন? অবশ্যই চতুর্থ শ্রেণীতে। কিন্তু নিছক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ হলে 'লিবারেটর' হওয়া যায় না। রামমোহন আসলে পঞ্চম আর এক শ্রেণীর মানুষ, যাঁর কাজ প্রথম শ্রেণীর (প্রতারক) মানুষের হাত থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের মুক্ত করে চতুর্থ শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তাঁকে 'লিবারেটর' বলব আমরা এই জন্য। রামমোহনের জীবনব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তাঁর 'লিবারেটর' পরিচয়টি। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডাম একবার বলেছিলেন,

> "Love of freedom was perhaps the strongest passion in his soul, freedom not of action, but of thought."[১৭০]

যিনি সংস্কৃত থেকে বেদান্তের অনুবাদে প্রাণপাত করেছিলেন তিনিই শিক্ষানীতির প্রশ্নে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির পক্ষে ওকালতি করলেন। আসলে তাঁর আনুগত্য সংস্কৃত বা পাশ্চাত্য শিক্ষা কোনও কিছুর প্রতিই নয়, তাঁর আনুগত্য সেই জ্ঞানের প্রতি, যা মানুষকে দেবে মুক্তির আলো। শাস্ত্র বা আইনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিল একই রকম। রামমোহনের যেসব ব্যবহার ও আচরণকে তাঁর দ্বৈততার প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয়, আসলে এক অখণ্ড মুক্তিসূত্রে সেগুলি ভিতর থেকে গাঁথা। রামমোহনের দু'টি প্রাসঙ্গিক উক্তি আমরা উদ্ধার করছি যাতে ধরা পড়েছে রেনেসাঁস লিবারেটরের স্বচ্ছ মুক্তি-দর্শন ও প্রত্যয়। রিফর্ম বিল নিয়ে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন (এপ্রিল ২৭, ১৮৩২)—

> "The struggles are not merely the reformers and anti-reformers but between liberty and tyranny through out the world ; between justice and injustice and between right and wrong."[১৭১]

জেমস সিল্ক বাকিংহামকে অপর এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

> "স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরতন্ত্রের মিত্ররা শেষ পর্যন্ত কোথাও জয়ী হয়নি। কোথাও জয়ী হবেও না।"[১৭২] (১৮২১, ১১ এপ্রিল)

স্বাধীনতা ও মুক্তি সম্পর্কে এত বড় প্রত্যয় ইতালির হিউম্যানিস্টদেরও ছিল কিনা সন্দেহ।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. *রামমোহন-স্মরণ,* রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা সমিতি, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৮-৯ ; অটোগ্রাফের খাতায় প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—Question No. 24. Name your hero or heroine in life. Ans. Rammohun Roy

২. D. Kopf, *British orientalism and the Bengal Renaissance*, Berkeley, 1969

৩. দিলীপকুমার বিশ্বাস, *রামমোহন-সমীক্ষা,* ১৯৭৩, পৃ. ২৫৫-২৫৬

৪. *Manuscript proceeding of the Asiatic Society of Bengal*, vol. IV, p. 73

৫. D. Kopf, *Ibid*

৬. গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, *বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা-পথিক,* ২য় সং ১৯৭৭

৭. *তদেব,* পৃ. ১৩-১৪

৮. বিজিতকুমার দত্ত, *রাজেন্দ্রলাল মিত্র,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯১

৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন রায় ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ও সাহিত্য,* ১৯৬৫, পৃ. ৪৭

১০. Quoted in G. S. A. Ranking 'History of College of Fort William from its Foundation', *"Bengal : Past & Present"*, vol. VII, 1911, pp. 7-8

১১. John Collegins 'Literary Characteristics of the most distinguished members of the Asiatic Society', *"The Asiatic Annual Register"*, London, 1802, p. 113

১২. D. Kopf, *Ibid*

১৩. J. Burckhardt, *The Civilization of Renaissance in Italy* (Tran), London edition, 1945

১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৫৪

১৫. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তার পরিজন,* ১৯৭৪, পৃ. ১৪৬

১৬. J. Burckhardt, *Ibid*, Chap II, pp. 81-103 ; P. O. Kristller, *Renaissance Thought : The Classic, Scholastic and Humanist Stains,* New York, 1961

১৭. J. Burckhardt, *Ibid*, Chap. II

১৮. F. Engles, *Dialectics of Nature*, p. 3

১৯. M. Carpenter, *The Last Days in England of the Raja Rammohun Roy* (1866), 1976 edition, Edited by S. Majumdar, p. 33

২০. W. Durant, *The Story of Civilization*, vol. V, The Renaissance, New York, 1953, p. 580

২১. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, *বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন,* জুন ১৯৯০

২২. N. S. Bose, *Indian Awakening and Bengal,* 1969
২৩. J. A. Symonds, *Renaissance in Italy,* vol. 2, Gloucester, 1967
২৪. L. W. Spitz, *Renaissance and Reformation Movement,* Chicago, 1971, p. 297
২৫. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ সংস্করণ, ১৯৮৮ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৪৪৮
২৬. রামমোহন রায়, *Tuhfatul Muwahhiddin* or A Gift to Deists (Tran. by Moulavi Obaidullah El Obaide). A. Roy (ed), *Nineteenth Century Studies,* 1973, p. 1
২৭. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র., তদেব,* পৃ. ১২৪-১২৫
২৮. *তদেব,* পৃ. ২১৫
২৯. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত,* দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮১, পৃ. ৭৪
৩০. *তদেব,* পৃ. ১২০
৩১. *তদেব,* পৃ. ১২৯-১৩০
৩২. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.,* পৃ. ৩৩৩-৩৩৪
৩৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৩০৫-৩০৬
৩৪. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.,* পৃ. ২৩৪
৩৫. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ১১১
৩৬. M. Carpenter, *Ibid,* p. 35
৩৭. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র., তদেব,* পৃ. ১৬৯
৩৮. *তদেব,* পৃ. ১৭৩
৩৯. *তদেব,* পৃ. ১৯১
৪০. *তদেব,* পৃ. ২০২-২০৩
৪০ক *তদেব*
৪১. J. A. Symonds, *Ibid,* vol. 2 ; S. Dresden, *Humanism in the Renaissance* (Tran. by M. King) London, 1968
৪২. L. W. Spitz, *Ibid,* p. 139
৪৩. M. P. Gilmore, "The Renaissance Conception of the Lessons of History", W. Werkmeister (ed), *Facets of the Renaissance,* Los Angelos, 1959, p. 75
৪৪. "Christ is my God, Cicero, on the other hand, is the prince of language I use"—F. Petracha. Quoted by D. Bush, *Renaissance and English Humanism,* Canada, 1939, p. 50
৪৫. J. E. Sandys, *History of classical Scholarship,* vol. 2, Cambridge, 1908, p. 13
৪৬. W. Rospigliosi, *Writers in the Italian Renaissance,* London, 1978, pp. 167-174

৪৭. O. H. Taylor, *Thought and Expression in the Sixteenth Century*, New York, 1920, p. 36
৪৮. P. Murray, *The Architecture of the Italian Renaissance*, London, 1963
৪৯. M. M. Checksfield, *Potraits of Renaissance Life and Thought*, London, 1964.
৫০. J. R. Hale (ed), *A Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance*, G. B., 1981, 'Aldus'
৫১. L. W. Spitz, *Ibid*, p. 189
৫২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২১৯
৫৩. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.*, পৃ. ৩-৬০
৫৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২২৪-২২৫ (অনুবাদ প্র. মু.)
৫৫. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২৯-৩০
৫৬. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.*, পৃ. ৬১-৬৮
৫৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ১১৭
৫৮. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.*, পৃ. ৬৯-৭৩
৫৯. *তদেব*, পৃ. ৭৭
৬০. *তদেব*, পৃ. ৭৪-৮৪
৬১. *তদেব*, পৃ. ৭৮
৬২. *তদেব*, পৃ. ৭৭
৬৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ৪২
৬৪. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী* (১৮৯৮), সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ২০-২২
৬৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২৩৫
৬৬. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ৫০
৬৭. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.*, পৃ. ১২৬-১৪১
৬৮. *The English Works of Raja Ranmohun Roy*, Panini Office Edition, 1906, p. 45
৬৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *রামমোহন গ্রন্থাবলী*, পরিষৎ সংস্করণ, প্রথম-সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৩৭-২৫৫
৭০. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.*, পৃ. ১৪৮
৭১. *তদেব*, পৃ. ১৪২
৭২. *তদেব*, পৃ. ১৮০-১৮৮
৭৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ১৫৬
৭৪. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.*, পৃ. ১৭৬-১৭৯
৭৫. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২০২
৭৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২৯০
৭৭. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রা. র.*, পৃ. ২৬০-২৬১
৭৮. *রামমোহন গ্রন্থাবলী*, পরিষৎ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৬৮

৭৯. অজিতকুমার ঘোষ, (সম্পাদিত), *রা. র.*, পৃ. ৩৪২-৩৪৩
৮০. *তদেব*, পৃ. ৩৫৩-৩৫৭
৮১. *তদেব*, পৃ. ৩৫৩
৮২. L. W. Spitz, *Ibid*, p. 177; "*Renaissance Quarterly*" vol. XLIII, Num. 4, p. 70
৮৩. *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ সংস্করণ, পৃ. ৩৫৫
৮৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২৯৫
৮৫. *English Works*, vol. V, *Ibid*, pp. 1-54
৮৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ৩৯৫
৮৭. *English Works*, *Ibid*
৮৮. *English Works*, *Ibid*, p. 454
৮৯. M. Carpenter, *Ibid*
৯০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (উদ্ধৃত ও অনূদিত), *তদেব*, পৃ. ২২৪-২২৫
৯১. J. K. Mazumdar, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movement in India*, rpt. 1988, p. 252
৯২. L. W. Spitz, *Ibid*, p. 139
৯৩. *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ সংস্করণ, *তদেব*, পৃ. ৭৩০
৯৪. Iqbal Sing, *Rammohun Roy*, 1958
৯৫. S. D. Collect, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy* (1900) ed. by D. K. Biswas and P. C. Ganguly, 1962, p. 406
৯৬. S. D. Collect, *Ibid*
৯৭. রামমোহনের বাংলা রচনার পরিমাণ *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলী* অনুসারে ৭৮৬ পৃষ্ঠা, আর ইংরাজি রচনার পরিমাণ পাণিনি-সংস্করণ অনুযায়ী ৯৫৮ পৃষ্ঠা
৯৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২৯২
৯৯. M. Carpenter, *Ibid*, p. 78
১০০. রামমোহন-স্মরণ, *তদেব*, পৃ. ২৩৬
১০১. নির্মল দাশ, 'বৈয়াকরণ রামমোহন রায়', *রামমোহন-স্মরণ*, *তদেব*, পৃ. ৩৩১
১০২. J. A. Symonds, *Ibid*, vol 2, p. 117
১০৩. *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ সংস্করণ, *তদেব*, পৃ. ৩
১০৪. *তদেব*, পৃ. ১০৭
১০৫. B. Willey, *Tendencies in Renaissance Literary Theory*, (1921-22) Norwood, 1977
১০৬. R. H. Bainton, *Erasmus of Christendom*, N. Y., 1969
১০৭. *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ সংস্করণ, *তদেব*, পৃ. ৩৪৩
১০৮. "The reawakening faith in human reason, reawakening belief in dignity of man, the desire for beauty, the Liberty, audicity, the passion of the

Renaissance received from Greek Studies their strongest and most vital impulse".—J. A. Symonds, *Ibid*, pp. 81-82

১০৯. H. I. Marrou, *A History of Education in Antiquity* (Eng. Tran. by G. Land), 1956

১১০. P. F. Grendler, *Schooling in Renaissance Italy Literacy and Learning : 1300-1600*, London, 1989

১১১. A. Tripathi, *Vidyasagar : The Traditional Moderniser*, 1974, pp. 8-9

১১২. J. K. Majumdar, *Ibid*, Letter No. 142, pp. 250-252

১১৩. R. K. Dasgupta, 'Rammohun Roy and New Learning', B. P. Barua (ed). *Rammohun Roy and New Learning*, Cal. 1988, p. 29

১১৪. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 117

১১৫. J. A. Symonds, *Ibid*, pp. 232-238

১১৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ৮২ ; বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ২য় খণ্ড, ১৯৬৩, পৃ: ১০৫-১০৬ ; বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, ১৯৭৩, পৃ. ৬৩

১১৭. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ২য় খণ্ড, ১৯৬৩, পৃ. ১০৭

১১৮. *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ সং, *তদেব*, পৃ. ৫৩৬-৫৪৩

১১৯. F. Bacon, *Novum organum, Aphorism*, 1620, p. 129 ; E. L. Eisenstien, *The Printing Press as an Agent of Change*, Cambridge, 1979

১২০. E. L. Eisenstien, *Ibid*

১২১. *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ সং, পৃ. ৪৫০

১২২. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ১১১

১২৩. "It was the first Indian Newspaper edited, published and managed by the Indians"—M. C. Kotnala, *Raja Rammohun Roy and Indian Awakening*, July 1975, New Delhi, p. 103

১২৪. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, 'আধুনিক যুগ, সংবাদপত্র ও রামমোহন', *রামমোহন-স্মরণ*, *তদেব*, পৃ. ৩১৮-৩১৯

১২৫. A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-1835)*, Cal. 1976, p. 106 ; Bengal Public Consultation no. 7, 17 Oct. 1822

১২৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'মার্কসবাদী মূল্যায়নের নামে রামমোহনের চরিত্র-হননই কী লেখকের উদ্দেশ্য?' গ্রন্থ-সমালোচনা, *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ১০, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৮২১-৮৩৪

১২৭. *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ সং, *তদেব*, পৃ. ৫০১-৫২৮, Petitions Against Press Regulations 2(i) Memorial to Supreme Court 2(ii) Appeal to the King in Council

১২৮. S. D. Collet, *Ibid*, p. 177

১২৯. L. W. Spitz, *Ibid, The Treatise of Lorenzo Valla on Donation of Constantine,* New Heaven, 1922
১৩০. L. W. Spitz *Ibid,* pp. 293-294
১৩১. B. Castiglione, *The Book of Courtier* (Tran), C. S. Singleton, New York, 1959
১৩২. M. Carpenter, *Ibid*, p. 7
১৩৩. M. Carpenter, *Ibid*, p. 45
১৩৪. M. Carpenter, *Ibid*, p. 75
১৩৫. *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ সং, পৃ. ২৪৯
১৩৬. M. Carpenter, *Ibid,* p. 122
১৩৭. W. Durant, *Ibid,* p. 226
১৩৮. J. Burckhardt, *Ibid,* p. 103
১৩৯. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ১১১
১৪০. *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ সং, *তদেব,* পৃ. ২৬২-২৬৩
১৪১. *তদেব,* পৃ. ৩৬০
১৪২. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'দান্তের মূল্যায়ন', *"চতুরঙ্গ",* বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৯, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৭৬০-৭৬৫
১৪৩. D. Bush, *Ibid,* p. 55
১৪৪. D. Bush, *Ibid,* p. 64
১৪৫. W. Durant, *Ibid,* p. 86 ; V. Cronin, *The Flowering of the Renaissance,* London, 1969, p. 101
১৪৬. W. Pater, *The Renaissance,* Introduction by A. Symonds, New York, 1873, Chap. 2, 'Pico Della Mirandolla'
১৪৭. M. M. Bullard, 'The Inward Zodian : A Development in Ficino's Thought on Astrology', *"R. Q.",* vol. XLII, Num. 4, Winter 1990, pp. 687-708
১৪৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ২৯০
১৪৯. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন : মিলনধর্মী মানব সংস্কৃতির উদ্গাতা', *"গণশক্তি",* ২ জুন ১৯৯১
১৫০. অমলেন্দু দে, 'নবচেতনার দুই অগ্রপথিক : দারা শিকোহ ও রামমোহন রায়', *রামমোহন স্মরণ, তদেব*
১৫১. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়. 'রেনেসাঁস ও বাংলার মুসলমান সমাজ', *ইতিহাস অনুসন্ধান—৬,* প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত, ১৯৯১, পৃ. ২৪১-২৬১
১৫২. A. F. Salahuddin, *Ibid,* p. 210
১৫৩. দিলীপকুমার বিশ্বাস, *রামমোহন-সমীক্ষা,* ১৯৭৩, পৃ. ১০
১৫৪. M. Carpenter, *Ibid,* p. 35
১৫৫. S. D. Collet, *Ibid,* p. 201

১৫৬. *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ সং, পৃ. ৫৩৬-৫৪৩, 'The Trust Deed of Brahmo Samaj'
১৫৭. J. A. Symonds, *Ibid,* vol. 2, p. 11
১৫৮. L. W. Spitz, *Ibid,* p. 294
১৫৯. দিলীপকুমার বিশ্বাস, *তদেব,* পৃ. ৪১-৪২
১৬০. S. D. Collet, *Ibid,* p. 306
১৬১. J. Burckhardt, *Ibid,* Chap IV, The Discovery of the World and of Man, pp. 171-216
১৬২. *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ সং, পৃ. ৪৫০, Letter to Mr. Gordon, London, 1932
১৬৩. দীপিকা বসু, 'উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ ও যুগচেতনা', নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক,* ১৯৮৪, পৃ. ১৩৩-১৫৫
১৬৪. *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ সং, *তদেব,* পৃ. ৪৮৬ [Letter to the Minister of Foreign Affairs of France, Paris; dated-London, Dec. 28th, 183]
১৬৫. R. K. Dasgupta, *Ibid,* p. 23
১৬৬. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, *তদেব*
১৬৭. Scholasticism : "It was the achievements of Scholasticism to produce an orderly synthesis of this traditional doctrine (Scholastic Theology) and to co-relate it with separate system of truths based on reason"; 'systematiser and rationaliser of relgious dogma.' *(Everyman's Encyclopaedia)*
১৬৮. Humanism : "Primarily it is a philosophy of education that favoured classical studies but finally it became a philosophy which believed that man is measure of all thing."
১৬৯. *রামমোহন স্মরণ, তদেব,* পরিশিষ্ট অংশ
১৭০. M. C. Kotnala, *Raja Rammohun Roy and Indian Awakening,* Ist Edition, July 1975, New Delhi, p. 100
১৭১. M. Carpenter, *Ibid,* p. 79
১৭২. *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ সং, পৃ. ৪৪৫, পত্র সংখ্যা-৯ (ইং)

চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকের বিদ্যুৎ-ঝটিকা : হিন্দু কলেজ-ডিরোজিও-ইয়ং বেঙ্গল

বঙ্গীয় রেনেসাঁস-ভাষ্যকারদের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, বড় জিনিসকে ছোট করে দেখার একটি চশমা তাঁরা আমাদের চোখে পরিয়ে দিয়েছেন। ডিরোজিওর মতো দুর্লভ শিক্ষক ও মাইকেলের মতো জ্যোতির্ময় ছাত্র যে-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উদিত হয়েছিলেন, সেই হিন্দু কলেজের ভূমিকা অনেকেই প্রায় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। বলা হয়েছে, কলকাতার সমাজপতিরা তাঁদের বংশলোচনদের জন্য স্থাপন করেছিলেন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি (১৮১৭, ২০ জানুয়ারী)। উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু ছেলের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থামাত্র এর দ্বারা হয়েছিল। দেশীয় ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত, পশ্চিমী বিদ্যার মদ্যপানে উত্তেজিত এর ছাত্রগণ, অযথা কিছু হৈ চৈ করে ('intellectual jugglery') হারিয়ে গেছেন[১] ইতিহাসের অন্ধকারে। এই 'Anglophile'-রা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কোনও স্থায়ী মুদ্রণ রেখে যেতে পারেনি।[২] দেশের অধিকাংশ মানুষজন যখন অশিক্ষার অন্ধকারে, তখন হিন্দু কলেজের চিলেকোঠা দিয়ে প্রবেশ করা একচিলতে আলো দিয়ে বড়মুখ করে বলার কোন মানে হয় না।

রেনেসাঁসের স্কুল

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে হিন্দু-কলেজের সঠিক মূল্যায়নের জন্য, আমরা প্রথমে প্রবেশ করব ইতালীয় রেনেসাঁসের স্কুলগুলি সম্পর্কে ভিত্তিগত ধারণার রাজ্যে। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের প্রত্যুষ-লগ্নে ইতালিতে অনেক ব্যাপারের মত শিক্ষা-দীক্ষার অঙ্গনেও এসেছিল অনিবার্য পরিবর্তনের হাওয়া। বুর্খহার্ডট তাঁর রেনেসাঁস সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থে দেখিয়েছেন, রেনেসাঁসের ইতালিতে তখন অনেক নতুন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে।[৩] পল. এফ. গ্রেন্ডলার তাঁর *'স্কুলিং ইন রেনেসাঁস ইটালি : লিটারেসি অ্যান্ড লার্নিং ১৩০০-১৬০০'* নামক গবেষণা গ্রন্থে[৪] রেনেসাঁসকালীন ইতালির শিক্ষা-দীক্ষার অন্তরঙ্গ ও তথ্যনিষ্ঠ ছবি তুলে ধরেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৩০০ সাল নাগাদ চার্চ-চালিত বিদ্যালয়গুলি গুরুত্ব হারাতে থাকে। তার জায়গায় কমিউন, নগর-কর্তৃপক্ষ বা ধনী-অভিভাবকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিক্ষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও পরিচালনায় বহু 'সেকুলার স্কুল' আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। 'মানি ইকোনমি'র যুগে বিদ্যাও হয়ে উঠতে থাকে বিক্রয়যোগ্য পণ্য। বিত্ত ও বিদ্যার একটা 'কো-রিলেশন' তৈরী হয়।[৫] শিক্ষকরা নিজস্ব উদ্যোগে যে-সব স্কুল খুলতেন, তা ছিল বৈতনিক। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা সেইসব প্রাইভেট স্কুল চালাতেন। বিদ্যার বিনিময়ে বিত্তার্জন। এ যুগে বংশকৌলিন্যের সঙ্গে বিদ্যাকৌলিন্যের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাজেই রাজন্যক, বণিক, ধনী-অভিভাবকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরেক ধরনের প্রাইভেট স্কুল আত্মপ্রকাশ করে।

জ্ঞানী-গুণী শিক্ষকদের দিয়ে এ-ধরনের স্কুল চালাতেন তাঁরা। এসব ঘরোয়া বিদ্যালয়ে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়ার সুযোগ তেমন ছিল না।

তৃতীয় আরেক ধরনের স্কুল চলত। এদের সরকারী স্কুল নামে অভিহিত করা যায়। কমিউন, কাউন্সিল বা নগর প্রশাসন-চালিত এই সব সরকারী-স্কুল নগর ও সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থাপিত। গ্রেন্ডলার বলেছেন, বিশিষ্ট ও ধনী নাগরিকদের সন্তানরাই এখানে পড়ত। শহর-পরিচালনায় যাদের কোন ভূমিকাই স্বীকৃত ছিল না, সেই হস্তশিল্পী বা দরিদ্র মানুষের সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর কোন দায় এই নগর-প্রশাসনচালিত স্কুলগুলি গ্রহণ করেনি।[৬]

রেনেসাঁসের ইতালিতে দু'ধরনের *পাঠক্রম*-যুক্ত স্কুলের দেখা মেলে। 'লাতিন-কারিকুলাম' ও 'ভার্নাকুলার-কারিকুলাম'।[৭] 'লাতিন-কারিকুলাম' যুক্ত স্কুলে পড়ানো হত গ্রীক, লাতিন, আইন, অলঙ্কার, লজিক, ইতিহাস, ভাষণদান-বিদ্যা, কাব্য প্রভৃতি। 'হিউম্যানিজম' আখ্যাত যে নতুন শিক্ষাদর্শন ('a philosophy of education that favoured classical studies')[৮] রেনেসাঁসের সময় গুরুত্ব পেয়েছিল, তা পড়ানো হত এই 'লাতিন-কারিকুলাম' যুক্ত বিদ্যালয়ে। এখানে পড়ত খুব কম সংখ্যক ছাত্র। সমাজের ধনী, রাজন্যক, উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরাই এখানে পাঠ গ্রহণ করত। বলতে গেলে শহর ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা মানুষ হত 'লাতিন-পাঠক্রম' যুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে। 'ভার্নাকুলার কারিকুলাম' যুক্ত স্কুলে পড়ত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা। এখানে পড়ানো হত বাণিজ্য ও বৃত্তি-নির্ভর জীবিকার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এমন সব বিদ্যা। যথা বুককিপিং, অঙ্ক প্রভৃতি। দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা কোন স্কুলেই পড়ত না। প্রথমত, বেতন দিয়ে পড়ার সামর্থ্য শ্রমিক-কৃষকদের সন্তানদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, স্কুলের পাঠক্রমে (বিশেষ করে 'লাতিন-কারিকুলামে') তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ তা তাদের জন্য রচিতই হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, ধর্মমুখী হলেও পূর্বতন চার্চের স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক। শিক্ষা-ব্যবস্থার নতুন পরিস্থিতিতে অবৈতনিক ও সর্বজনীন শিক্ষাদানের ধারণাটি মুছে যেতে থাকে। রেনেসাঁসের শিক্ষাচিত্রটির সারমর্ম গ্রেন্ডলারের ভাষায় এইরকম—

> "However universal free public education in the modern meaning of the term did not exist in the Renaissance Europe."[৯]

লা কাসা জিওকোসা ঃ 'স্কুল অব প্রিন্সেস'

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ভিত্তোরিনো চালিত *'লা কাসা জিওকোসা'* বা 'আনন্দনিকেতন' নামক বিদ্যালয়টি সম্পর্কে দু'চার কথা বললে, রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।[১০] ১৮২৫ সালে মান্তুয়ার শাসক গিয়ান ফ্রাঞ্চেস্কোর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যাকে বলা যায় ধনী অভিভাবকের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত প্রাইভেট স্কুল *'লা কাসা জিওকোসা'* ছিল তাই। এটি ছিল 'লাতিন-পাঠক্রম' যুক্ত বিদ্যালয়। এখানে পড়ত পৃষ্ঠপোষকের চারপুত্র, এক কন্যা ; ফ্রাঞ্চেস্কো স্ফোজার এক কন্যা ; ইতালির বিভিন্ন রাজন্যক ও শাসকবর্গের পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-পরিজনরা। ভিত্তোরিনোর শিক্ষকতার সুনামে

আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন স্থানের রাজন্যক ও ধনী অভিভাবকরা তাদের পুত্র-কন্যাদের এখানে পড়াতে চাইতেন। ভিত্তোরিনোর ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও ত্যাগ স্বীকারের সৌজন্যে কিছু মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র এখানে পড়ার সুযোগ পেলেও, বিদ্যালয়টির মূল পরিচয় ছিল *'স্কুল অব প্রিন্সেস'*। এখানে সাকুল্যে পড়তে পেত ৭৮ জন।

জেমস ব্রুস রস ভেনিসের বিখ্যাত স্কুল *'সান মার্কো'র* শিক্ষা-দীক্ষার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে দেখা যায় বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ বারো জন ছাত্রকে চ্যান্সেলারি কোর্সে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করার জন্য নির্বাচিত করে, ভেনিসের 'গ্রেট কাউন্সিল' জন-প্রতি দশ ডুকাট করে ছাত্র-বৃত্তি বরাদ্দ করেছিল (১৪৪৩)।[১১] বাকি ছাত্রদের জন্য অর্থ বরাদ্দের কোন বন্দোবস্ত হয়েছিল, এমন জানা যায় না। কিন্তু এটা জানা যাচ্ছে, ইগনাজিও নামে এক মন্ত্রমুগ্ধকারী শিক্ষক সেখানে পাঠদান করতেন।

যে-সময় ক্রাইসোলরসের মত গ্রীকবিদ, গুয়ারিনোর মত সুপণ্ডিত, ভিত্তোরিনোর মত শিক্ষাবিদ, কাইলেলফোর মত গৃহশিক্ষক, ফিকিনোর মত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা, ইগনাজিওর মত ছাত্র-প্রিয় শিক্ষক শিক্ষার্থী ও শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত, সে-সময়কার জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার উৎকর্ষ ও গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার প্রসারগত ব্যাপ্তি নিয়ে বড় মুখ করে বলার মত কিছু ছিল না। ১৩৪০ সালে খাস ফ্লোরেন্সে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল শতকরা দশ ভাগ। ১৪৮০-তে শিক্ষার্থী বালকের সংখ্যা ত্রিশ থেকে তেত্রিশে ওঠে। ১৫৮৭-৮৮ সালে ভেনিসের শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা তেত্রিশ হয়নি।[১২] জে. ডাবলু সৌন্ডার্স ১৫২০-১৬৫০ সালের মধ্যবর্তী ইংলন্ডের শিক্ষাচিত্র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, খাস লন্ডনে শিক্ষার চিত্র ভালো হলেও বাইরে ও মফস্বলে তার অবস্থা আদৌ উজ্জ্বল ছিল না। 'It would be unsafe to assume more than of a 15 percent literacy rate.'[১৩]

শহরের বাইরে নতুন শিক্ষাদর্শন-যুক্ত রেনেসাঁস-স্কুলের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা তেরো ভাগ মাত্র। রেনেসাঁসের স্কুলে সাধারণ পরিবারের সন্তানরা যেমন আসতে পারেনি, তেমনি রেনেসাঁসের স্কুলে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত গ্রীক-লাতিন-কাব্য-ইতিহাস-ভাষণদান-বিদ্যায় চৌখস্ ছেলেরাও, কোনও ভাবেই সাধারণ মানুষের পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারেনি। কেননা নতুন শিক্ষাক্রমে তাদের তৈরীই করা হয়েছিল অন্যভাবে—নাগরিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য। রেনেসাঁসের আমলে শিক্ষার বিষয়গত ও গুণগত ক্ষেত্রে গুরুতর অগ্রগতি হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু চার্চের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নতুন করে সাজানো-সেই নবগঠিত শিক্ষা-ব্যবস্থাই, যে তার সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে দ্বিধা-বিভক্ত করে দিয়েছিল, একথাও মর্মান্তিক সত্য। চেম্বারলিন লিখেছেন,

> "The intellectual spirit of the Renaissance was itself a tragic cause of degradation of ordinary man."[১৪]

সুতরাং রেনেসাঁসের স্কুল বলতে ইউটোপীয় ধারণা পোষণ করার কোন অর্থ হয় না।

ইতালীয় রেনেসাঁসের স্কুলগুলির চরিত্র, পঠন-পাঠন, শিক্ষক ও ছাত্রদের কথা মাথায়

রাখলে, অনায়াসেই হিন্দু-কলেজকে 'রেনেসাঁসের স্কুল' হিসাবে চিহ্নিত করে চলে। ইতালীয় রেনেসাঁসে 'লাতিন কারিকুলাম'-যুক্ত স্কুলগুলি যে ভূমিকা পালন করতো, হিন্দু-কলেজের উপর বর্তেছিল সেই দায়িত্ব। রেনেসাঁসের স্কুলের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এইরকম ঃ

১. সেখানে জোর দেওয়া হতো গ্রীক ও লাতিন শিক্ষার উপর। ইতালির নিজস্ব ভাষা ও চলমান সংস্কৃতিকে এড়িয়ে রেনেসাঁসের স্কুল শিক্ষা দিত অন্যতর ভাষা ও বিদ্যা। হিন্দু-কলেজ উদ্দেশ্যত ছিল প্রতীচ্য বিদ্যার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।[১৫]

২. রেনেসাঁসের স্কুলের পাঠ্য-বিষয় ছিল 'সেকুলার'। ধর্মীয় বিষয়কে তারা এড়িয়ে চলেছিল। হিন্দু কলেজও সেই অর্থে পাঠ্যসূচির দিক থেকে সেকুলার ছিল।[১৬]

৩. রেনেসাঁসের স্কুলগুলির শিক্ষা, ছাত্র, পাঠ্য-বিষয় সব মিলিয়ে দেখলে, তার একটা 'কসমোপলিটান'-চরিত্র ছিল বলা যায়। হিন্দু কলেজ সেই অর্থে প্রথম 'কসমোপলিটান'-চরিত্রের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এদেশীয় হিন্দু-সন্তানরা এর ছাত্র হলেও শিক্ষকরা ছিলেন পাশ্চাত্য জাতিভুক্ত ঃ কেউ পর্তুগীজ, কেউ ইহুদি, কেউ বা ইংরাজ।[১৭] পড়ানো হতো হোমারের অডিসি ; ভার্জিলের ঈনিড ; গ্রীস-রোম ও ইংল্যান্ড-এর ইতিহাস ; সেক্সপীয়র, বেকন, লক, নিউটন ইত্যাদি।

পরিবর্তিত সমাজ-পরিস্থিতির যে-দাবী থেকে ইতালিতে রেনেসাঁসের স্কুলগুলি জন্ম নিয়েছিল, হিন্দু-কলেজের জন্ম-বৃত্তান্তেও রয়েছে সেই একই রকম কার্য-কারণ। মার্টিন ভন তাঁর *'সোশিওলজি অব দ্য রেনেসাঁস'* গ্রন্থে লিখেছেন, বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয়লগ্নে money ও intellect-এর co-relation দরকার হয়ে পড়েছিল।[১৮] নতুন সময়কালের উপযোগী করে ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের তৈরী করার জন্য নতুন ধরনের স্কুল, অন্যরকম শিক্ষক, ভিন্নতর পাঠক্রম। কলকাতার সমাজপতিরাও বুঝেছিলেন, শুধু কুলকৌলিন্য ও বিত্তকৌলিন্য নয়, একালে বিত্ত ও বিদ্যার মিলন ঘটাতে হবে। হিন্দু-কলেজ কলকাতার আগুয়ান 'রাজা', জমিদার-ধনিক-বণিকদের সেই ভূমিকারই ফলবান রূপ।

হিন্দু কলেজ ঃ উনিশ শতকের ঝটিকা-কেন্দ্র

'ইয়ং বেঙ্গল' নামে যে বজ্রগর্ভ ঝড়ের জন্ম দিয়েছিল হিন্দু কলেজ, ইতালিতে তার নজির নেই। ভিত্তোরিনোর প্রসিদ্ধতম বিদ্যালয় *'লা কাসা জিওকোসা'* বা 'আনন্দ-নিকেতন'-এর কথা মনে রেখেও একথা বলা চলে। ইতালির বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলি তাদের পরিপাটি পাঠক্রম, পরিব্যাপ্ত ভাষাচর্চা, নিবিড় শৃঙ্খলানুগত্যের মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চপক্ষে রুচিশীল সুদক্ষ কিছু চ্যান্সেলর বা সেক্রেটারি উৎপাদন করেছিল। তাদের স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন কিছু আধুনিক কার্ডিনাল, কিছু লাতিন ও গ্রীক-জানা রাজপুরুষ, শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী কিছু পৃষ্ঠপোষক, কিছু ক্রিটিক্যাল বা সুভদ্র নাগরিক। তাঁদের অনেকে বলতে বা লিখতে পারতেন ভালো। সেক্ষেত্রে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পরিবেশ ছিল বৈপরীত্যময়। নতুন যুগের শিক্ষার্থীদের সলতেয় আগুন দেবার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের চারদিক থেকে বড় শক্ত করে বাঁধন দেওয়া হয়েছিল। ফলে হিন্দু কলেজ নিছক রেনেসাঁসের স্কুল নয়, হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের 'ঝটিকা-কেন্দ্র'। কতগুলি বিরোধী রেখা যে এসে মিলেছিল হিন্দু কলেজের

উৎস ও বিকাশ-বিন্দুতে, তা বিশ্লেষণ করলে, খানিকটা ভেদ করা যায় 'ইয়ং বেঙ্গল' নামক বিস্ফোরণ-সম্ভব ব্যক্তিত্ব-দীপ্ত মনন ও সৃজনশীল ঝটিকাখণ্ডের জন্মরহস্য। রাধাকান্ত দেবের মত রক্ষণশীল সমাজপতিদের সক্রিয় উদ্যোগ,[১৯] রামমোহনের মত বৈশ্বিক মানুষের কাম্য শিক্ষাদর্শ,[২০] ডেভিড হেয়ারের মত শিক্ষানুরাগীর সজাগ পরিদর্শন,[২১] উইলসনের মত প্রাচ্যানুরাগী হিউম্যানিস্টের নিবিড় হস্তাবলেপ, ডিরোজিওর মত দুর্লভ শিক্ষকের তারুণ্য-ঝঙ্কৃত শিক্ষাদান, আলেকজান্ডার ডাফের মত শিক্ষানুরাগীর খ্রীষ্টীয় প্রত্যাশা,[২২] কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মাইকেলের মত সপ্রতিভ জ্যোতির্ময় ছাত্রের পাঠগ্রহণ এবং মেকলের মত পাশ্চাত্যপন্থী উপনিবেশবাদীদের চাহিদা[২৩]—সব এসে মিলেছিল হিন্দু কলেজের ছেদবিন্দুতে। এতগুলি পরস্পব-স্বতন্ত্র পরিবাহী শক্তির তার যেখানে এসে মেলে, সেখানে একটা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থেকেই যায়। হিন্দু কলেজ প্রসূত 'ইয়ং বেঙ্গল'-আন্দোলন কি সেই সম্ভাবনারই অনিবার্য ফলাফল নয়? এখানে কার প্রত্যাশা কতখানি পূরণ হয়েছিল, কষে বলা শক্ত। তবে অনেকের অঙ্কই যে উত্তরে মেলেনি, তা বোধ হয় বলা যায়। সবচেয়ে বেশি করে যাদের অঙ্ক মেলেনি, তাঁরা হলেন এই কলেজের রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠাতাবর্গ।

রেনেসাঁসের শিক্ষক

রেনেসাঁসের শিক্ষকরা চলমান মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিব সঙ্গে সম্পর্কছেদ করার প্রয়োজনে জীবনবাদী প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যার পুনরুদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[২৪] তরুণ ছাত্রদের সামনে তাঁরা খুলে দিয়েছিলেন. জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার ভিন্নতর একটি সাংস্কৃতিক দরজা। ক্রাইসোলরস. ভিত্তোবিনো, গুয়ারিনো, ফিকিনো, পম্পোনাজ্জি, ভার্গেরিও, ফাইলেলফো, ইগনাজিও প্রভৃতি বিশ্রুত শিক্ষকরা, ইতালির তৎকালীন মাতৃভাষায় প্রচলিত পাঠক্রম ও চার্চ-চালিত পঠন-পাঠনকে উপেক্ষা করে, 'হিউম্যানিজম' নামক নব্য-শিক্ষাদর্শনের দীপবর্তিকা জ্বেলে দিয়েছিলেন তখনকার ছাত্রদের সামনে।[২৫] সেখানে ক্রাইসোলরস নামে গ্রীকবিশারদ এক অসাধারণ শিক্ষককে আমরা পাচ্ছি, যাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন লিওনার্দো ব্রুনি, গুয়ারিনো, ভাল্লা, পোগ্গিও, ফাইলেলফো প্রমুখ উত্তরকালের বিখ্যাত হিউম্যানিস্টরা। এঁদের মধ্যে ব্রুনি হয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর। পোগ্গিও হয়েছিলেন পোপের সেক্রেটারি। গুয়ারিনো খ্যাত হয়েছিলেন শিক্ষক হিসাবে। ভাল্লা 'ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট'-এর অভিধা অর্জন করেছিলেন। ফাইলেলফো তো তাঁর বিদ্যার পসরা নিয়ে চষে বেড়িয়েছিলেন গোটা ইতালি। ক্রাইসোলরসের পড়ানো সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিওনার্দো ব্রুনি লিখেছেন,

> "দিনের বেলায় তাঁর কাছে যা শুনতাম, রাত্রে নিদ্রার মধ্যেও তা আমার মনকে অধিকার করে থাকত।"[২৬]

ভিত্তোরিনো দ্য ফেলতর নামে অপর এক শিক্ষকের পড়ানোর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে-বিদেশে। *'লা কাসা জিওকোসা'* বা আনন্দনিকেতন নামক তাঁর বিদ্যালয়ে রাজন্যক, ধনিক, বণিকরা তাঁদের পুত্রকন্যাদের পড়াতে চাইতেন। ফলে তাঁর বিদ্যালয় *'স্কুল অব প্রিন্স'* নামে পরিচিত হয়েছিল।[২৭] গুয়ারিনোর বিদ্যালয়ে পড়বার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা এসে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকত। কাকভোরে লণ্ঠন নিয়ে তিনি দেখতেন, তাঁর

শ্রেণীকক্ষ উপচে পড়ছে।[২৮] এক গবেষক জানিয়েছেন, তাঁর কাছে ছাত্ররা আসতো ডালমাটিয়া, ক্রিট, রোডস, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্পেন. পর্তুগাল, হাঙ্গেরি, পোলান্ড, এমনকি ব্রিটেন থেকেও।[২৯] আইনাস প্যান্নোনিয়াস নামে তাঁর এক ছাত্র (১৪৪৭-১৪৫৪ পর্যন্ত ছাত্র ছিলেন) তাঁকে নিয়ে এক হাজার একশো' ন' ছত্রের *'পেনেগ্রিক'* নামে একটি কাব্য লিখে গুয়ারিনোর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। গুয়ারিনোকে সেখানে দেওয়া হয়েছে বীরের মর্যাদা। তফাৎ এই, তরবারি বা ক্রুশ নয়, তাঁর অস্ত্র ছিল কলম ('that his weapon is not the sword or the cross, but the pen')।[৩০]

পরিবর্তিত সমাজ-পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির পালাবদলের প্রয়োজনে, ইতালির হিউম্যানিস্ট-শিক্ষকরা যেভাবে গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চায় দীক্ষিত করেছিলেন তাঁদের ছাত্রদের ; প্রায় একই রকম ভাবে 'নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু'[৩১] ডিরোজিও, প্রতীচ্য-বিদ্যার দিকে, তাঁর ছাত্রদের সময়োচিত আগ্রহকে উসকে দিয়ে আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাসে পালাবদল ঘটিয়েছিলেন।

পিটার অ্যাবেলার ও ডিরোজিও

রেনেসাঁসের ইতিহাসে হিউম্যানিস্ট শিক্ষকের ছড়াছড়ি। তা-সত্ত্বেও বলা যায়, ডিরোজিওর মতো প্রাণোন্মাদনা-সৃষ্টিকারী তরুণ শিক্ষকের সাক্ষাৎ সে-রেনেসাঁসেও সুদুর্লভ। জীবন যাঁর জন্য বরাদ্দ করেছিল, অনধিক তেইশ বছরের একটি অতি সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল এবং মাত্র পাঁচ বছরের শিক্ষক জীবনে (হিন্দু কলেজে), যিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে এক বজ্রগর্ভ ঝড়ের জন্ম দিয়েছিলেন, এমন কোন ডিরোজিওর সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়া যায় না। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের দু'জন শিক্ষকের সঙ্গে ডিরোজিওর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিয়ে কিছু কথা এখানে বলা যায়। দ্বাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পিটার অ্যাবেলার-এর সঙ্গে ডিরোজিওর একটা গভীর মিল আছে।[৩২] অ্যাবেলার তাঁর ছাত্রদের বলতেন, যুক্তির পথেই পৌছুনো যাবে সত্যের পথে। ছাত্ররা বরণ করেছিলেন তাঁর শিক্ষা। কিন্তু যুগ প্রস্তুত ছিল না তাঁকে স্বীকার করতে। সেই কারণে বারংবার তার উপর নামিয়ে আনা হয় প্রতিহিংসামূলক আঘাত। বলা হয়, তাঁর শিক্ষা 'আত্মবিরোধী নির্বুদ্ধিতা', 'জ্ঞানের ছদ্মবেশে বিশুদ্ধ বাচালতা', 'তরুণ প্রজন্মের পক্ষে তাঁর শিক্ষা ও রচনাদি ক্ষতিকর'। অবশেষে, 'সাঁ সয়নস'-এর ধর্মীয় পরিষদ তাঁর পড়ানো ও রচনাদি নিষিদ্ধ করে রোধ করে সেই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের কণ্ঠস্বর। সুবিচারের আশায় তিনি বৃদ্ধ বয়সে রোমের পথে হাঁটা দিয়েছিলেন। চার্চ ও পোপের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। পথশ্রমে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত এই মানুষটি শেষপর্যন্ত মারা যান রোমের পথে। ফলে আমাদের জানা হয় না, এই ধরনের 'ক্রিটিক্যাল ম্যান'-এর জন্য পোপের ভাণ্ডারে কতটা সুবিচার জমা ছিল।

ডিরোজিও যে শিক্ষক হিসাবে বজ্রগর্ভ ঝড়ের জনক তা সর্বজ্ঞাত। তাঁরই অভিভাবকত্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে এক ঝাঁক 'ক্রিটিক্যাল ম্যান' তখন জন্ম নিচ্ছিল হিন্দু কলেজের গর্ভগৃহে। ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর শিক্ষক—এই অভিযোগ তুলে ও একই-রকম তৎপরতায়, এখানেও হিন্দুকলেজের রক্ষণশীল ম্যানেজারবর্গ ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। ছাত্ররা

ডিরোজিওকে তাঁদের যাত্রাপথের কাণ্ডারী হিসাবে বরণ করলেও রক্ষণশীল সমাজপতিদের পক্ষে তাঁকে হজম করা সম্ভব ছিল না। অ্যাবেলার ছিলেন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী। তিনি বলতেন, অ্যারিস্টটলের মতো পাণ্ডিত্যের বিনিময়েও তিনি চার্চের প্রতি বিশ্বাস হারাতে রাজী নন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি লড়াই করেছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়িয়েই। ডিরোজিও সেদিক থেকে মুক্ত মানবতার অগ্রগামী প্রবক্তা। অ্যাবেলারের মতো বিশ্বাসের মোহ তিনি পোষণ করতেন না। তাঁর সামনে নালিশ জানাবার মতো কোন চার্চ ছিল না।

ইগনাজিও ও ডিরোজিও

ছাত্রপ্রিয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে, ভেনিসের *'সান মার্কো'*র লাতিন-শিক্ষক বাতিস্তা ইগনাজিওর কথা স্মরণে আসে।[৩৩] তীব্র প্রতিযোগিতার পথ পেরিয়ে ইগনাজিও যেদিন (১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ) *'সান মার্কো'*য় শিক্ষকতার পদে যোগ দিতে আসেন, সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে শ'য়ে শ'য়ে হাজির ছিলেন গুণমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্ররা। এমন দৃশ্য *'সান মার্কো'*র ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি। বলা হয়, ইগনাজিও যে দীর্ঘ কুড়ি বছর অপেক্ষার পর *'সান মার্কো'*র প্রবেশ-পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তার পিছনে ছিল তাঁর গুণমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্রদের সক্রিয় তৎপরতা। ডিরোজিও কখন নিঃশব্দ-চরণে প্রবেশ করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে, সে-খবর কেউ না রাখলেও মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি বদলে দেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হাল-হকিকৎ। শুধু মস্তিষ্ক নয়, তাঁর পাঠদান স্পর্শ করে তরুণ ছাত্রদের হৃদয়।[৩৪] সিলেবাস ও ডেস্ক-বেঞ্চের পাত্র উপচে ডিরোজিওর ছাত্ররা, *'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'*-এর সান্ধ্য বিতর্কসভা থেকে *'পার্থিনন', 'হেসপোরাস', 'এনকোয়ারার', 'জ্ঞানান্বেষণ'* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মধ্যে দিয়ে, ধাবমান হয়ে যান স্থির-নিবদ্ধ কায়েমী সমাজের দিকে। ডিরোজিও বলতেন, শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞান-বিদ্যার অনির্বাণ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ডিরোজিও যেদিন কলেজে যোগ দিতে আসেন, সেদিন হয়তো তাকে অভিনন্দন জানাতে কলেজের প্রবেশপথে কোন সমাবেশ দেখা যায়নি, কিন্তু ১৮৩১ সালে যখন তাঁকে কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, সেদিন বহুতর ছাত্রের দীর্ঘশ্বাস যে শুধু হিন্দু কলেজ নয়, কলকাতার বাতাস ভারী করে তুলেছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইগনাজিওর সঙ্গে ডিরোজিওর তুলনা করলে দুই রেনেসাঁসের তফাৎটাও কিছু বোঝা যায়। রেনেসাঁসের পৃথিবী ছিল কঠিন প্রতিযোগিতার পৃথিবী। কিন্তু গুণের কদর ছিল সেখানে। ইগনাজিওর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সপ্রাণ শিক্ষকতায় সন্তুষ্ট হয়ে, দশ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল তাঁকে শুধু সকালে নয়, চ্যান্সেলারি পাঠক্রমের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত সেরা দশজন ছাত্রকে প্রশিক্ষিত করার জন্য, বিকালেও বক্তৃতা করতে বলে। তাঁর বেতন ১৫০ ডুকাট থেকে বাড়িয়ে ২০০ ডুকাট করে দেয়। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অবসর গ্রহণ করার কথা। কিন্তু গুণমুগ্ধ সিনেট তাঁকে আরও বারো বছর 'এক্সটেনশন' দেয়। এর মধ্যে বাতিস্তা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পক্ষাঘাতে তাঁর মুখ বেঁকে যায়। অবশেষে ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে

সিনেট তাঁর অবসর মঞ্জুর করে। শুধু তাই নয়, সফল শিক্ষকতার পুরস্কার হিসাবে আমৃত্যু তাঁকে কর্মকালীন বেতন দেবার ব্যবস্থা করে।[৩৫]

ডিরোজিও যেন জেগে ওঠা তরুণ রেনেসাঁস

যোগ্যতমের পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে প্রতিহিংসাপরায়ণতার গল্প ফিরে-ফিরে এসেছে বঙ্গীয় রেনেসাঁসে। রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগর লাঞ্ছনার লবণাক্ত সমুদ্রে স্ফটিক-কঠিন এক-একটি উজ্জ্বল দ্বীপের মতন। এক রেনেসাঁস যখন সুযোগ্য শিক্ষক বলে ইগনাজিওকে নিয়মানুগ অবসরকালের পরেও ব্যরো বছর এক্সটেনশন বরাদ্দ করে ; অন্য রেনেসাঁস তখন অনধিক তেইশ বছর বয়সের এক প্রাণোন্মাদনা-সৃষ্টিকারী শিক্ষককে ধর্মের অজুহাতে ছাঁটাই করে চরিতার্থ করে তার মধ্যযুগীয় জিঘাংসা।[৩৬] এই প্রসঙ্গে শুদ্ধতাবাদী নেতা স্যাভোনারালার কথা মনে পড়ে। রেনেসাঁসের জোয়ারে ভেসে-যাওয়া চার্চ ও পোপের বিক্ষিপ্ত চরিত্র সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুললে, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়।[৩৭] উইল ডুরান্ট লিখেছেন,

> "Savonarala was the Middle Ages surviving into the Renaissance and the Renaissance destroyed it."[৩৮]

ডিরোজিও সম্পর্কে ঘুরিয়ে বলা যায়, 'বঙ্গভূমিতে বিরাজিত মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির মধ্যে ডিরোজিও যেন জেগে ওঠা তরুণ রেনেসাঁস, মধ্যযুগীয় জিঘাংসা তাকে পিষে ফেলে।'

ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শন

হিন্দু কলেজ যে মূলত ডিরোজিওর কল্যাণেই উনিশ শতকের ঝটিকা-কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল, সে বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও আবেগ-ঝঙ্কৃত আলোচনা করেছেন বিনয় ঘোষ।[৩৯] ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায় উইলসনকে লেখা একটি চিঠিতে। ডিরোজিও লিখেছেন,

> "এদেশের একদল তরুণের শিক্ষার দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য বহন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তাদের একদল গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদী অন্ধবিশ্বাসী তৈরী না করে সত্যিকার সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরী করব। তাই সকল বিষয়ে সর্বপ্রকারের মতামত নিয়ে অবাধে আলোচনা করতে আমি তাদের উৎসাহ দিতাম। আমার বিশ্বাস, তা না করলে কোন মানুষেরই অব্যক্ত প্রতিভা ও সুপ্ত মানসিক শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয় না। লর্ড বেকনের ভাষায় বলা যায়, 'If a man will begin with certainties, he shall end in doubts.' কিন্তু তাতেও দেখলাম যে এক সংশয় থেকে মনে আর এক নতুন সংশয়ের উদয় হয় এবং অবশেষে সংশয়াকুল চিত্তের দোলার দোলায়মানতা আর শেষ হয় না কোনোদিন। সেইজন্য আমি ছাত্রদের দার্শনিক হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, কারণ হিউম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও শাণিত যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন।

কেবল তাই করেই আমি ক্ষান্ত হইনি। ডক্টর রীড ও স্টুয়ার্টের প্রতিযুক্তি ও উত্তরও হিউম-প্রসঙ্গে তাদের পড়িয়েছি। হিউমের যুক্তির এত জোরালো প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেননি। এবং 'This is the head and front of my offending.' ধর্মবিষয়ে ছাত্রদের মজ্জাগত ধ্যান-ধারণার মূল পর্যন্ত যদি আমার এই শিক্ষার ফলে নড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য আমি কি অপরাধী? তরুণদের মনে কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করা কোনদিন আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং সেটা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার।....
সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও মতের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি নিজে এত বেশি সজাগ যে অত্যন্ত ছোটখাট বিষয়েও আমি কখনও একটি নির্দিষ্ট মত প্রকাশ করি না। অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমুদ্রে দুর্জ্ঞেয় সত্যের দ্বীপে যাত্রা করাই জ্ঞানান্বেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমার ধারণা।"[৪০]

ডিরোজিওর ছাত্রদর্শন

ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শনের পাশাপাশি ছাত্রদর্শনের কথাও উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে' ও 'ডেভিড হেয়ারের অনুরাগীদের প্রতি'—নামক দু'টি সনেটে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর ছাত্রদর্শন। তিনি লিখেছেন,

"Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds."[৪১]

কবিতাটির শেষে তিনি এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, ভবিষ্যতে যখন তাঁদের যশোমাল্য গাঁথা হবে তখন মনে হবে তাঁর বেঁচে থাকা একেবারে নিরর্থক হয়নি—'I feel I have not lived in vain.'[৪২]

'ডেভিড হেয়ারের অনুরাগীদের প্রতি' কবিতায় ডিরোজিও আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন, তাঁর নির্দেশমিশ্রিত প্রত্যাশা—

"তোমরা ধরেছ হাল, দিয়ে যাও পথের নিশানা সুনিশ্চিত,
তরুণ কাণ্ডারীদল। স্বদেশের এ তরণী বিপর্যয়ে ভরা ;
তোমাদের গৌরবের কুঁড়িগুলি সবেমাত্র মেলেছে পশরা,
নন্দনের পারিজাত হয়ে তারা কোনোদিন হবে বিকশিত।"[৪৩]....
...'guide on youngmen'...'your course is well begun'.[৪৪]

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বড় ছুটির আগে, ডিরোজিও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে বিবৃতি রচনা করেছিলেন, তা উদ্ধারের যোগ্য :

"As your knowledge increases, your moral principles will be fortified; and rectitude of conduct will ensure happiness. My advice to you is, that you go forth into the world strong in wisdom and in worth ; scatter the seeds of love among mankind, seek the peace of your fellow creatures...."[৪৫]

সমৃদ্ধ জ্ঞান ও সক্রিয়তা নিয়ে বিশ্বে নিজেদের বিকীর্ণ করার ও মানবজাতির মধ্যে ভালোবাসার বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার যে নির্দেশ, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের দিয়েছিলেন, তার কোন তুলনা ইতালীয় রেনেসাঁসেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

শিক্ষক ডিরোজিওর মৌল অবদান

রেনেসাঁসের শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর মৌলিক কৃতিত্ব, সংক্ষেপে বললে, এইরকম দাঁড়াবে—

১. বঙ্গ-সংস্কৃতির নবায়নেব জন্য **ভিন্নতর বিদ্যা ও সংস্কৃতির দিকে** ডিরোজিও তরুণ-বঙ্গের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এই আত্যন্তিক অনুরাগ বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন রক্তসঞ্চার করেছিল।

২. 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে এক ঝাঁক মননশীল 'ক্রিটিক্যাল-ম্যান' ডিরোজিওর শিক্ষকতার সুবাদে জন্ম নিয়েছিল। যাব ফলে শুরু হয়েছিল, প্রশ্নহীনভাবে সবকিছু মেনে নেওয়ার পরিবর্তে, **জিজ্ঞাসার যুগ**। সমস্ত কিছুকে তাঁরা আনতে চেয়েছিলেন, 'at the bar of reason'।[৪৬] ইয়ং বেঙ্গলদের নিন্দা-প্রশংসা তাঁদের এই শাস্ত্র-বিরোধী ক্রিটিক্যাল আচরণ ও বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই। বসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৪, ১৯ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে জুরি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে রীতি অনুসারে তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করতে বললে, তিনি বললেন, "আমি গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।" হিন্দু-শ্রোতৃগণ তাতে কানে হাত দিয়ে বলেছিলেন, "দেখ কালেজের শিক্ষার কি ফল।"[৪৭] শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, কখনো কখনো তাদের সমালোচনা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও উত্থিত হত। ১৮৪৩, ৮ ফেব্রুয়ারি এক সভায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কোম্পানির বিচার-ব্যবস্থা ও পুলিশী-ব্যবস্থাকে 'notoriously and shamelessly corrupt' বললে রিচার্ডসন উত্তেজিত হয়ে তাকে 'রাজদ্রোহী' বলে অভিহিত করেন।[৪৮]

৩. রেনেসাঁস হচ্ছে **'রিভাইভ্যাল অব লার্নিং'**। ডিরোজিওর শিক্ষকতার সৌজন্যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জ্ঞানচর্চার উচ্চ মর্যাদা। জ্ঞানের অস্থির ক্ষুধা ইয়ং বেঙ্গলদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল *'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'* থেকে *'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'*য়, *"পার্থেনন"* থেকে *"এনকোয়ারার"* বা *"জ্ঞানান্বেষণ"* পত্রিকায়, চোরাই জাহাজে আসা টম পেইনের সন্ধানে জাহাজঘাটা থেকে 'ভূ-মণ্ডলের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানোজ্জ্বল অংশ' ইওরোপ পর্যন্ত। কৃষ্টদাস পাল ইয়ং বেঙ্গলদের সম্পর্কে অভিযোগ অপনোদনকারী একটি বক্তৃতায় স্পষ্ট করে বলেছিলেন,

> "Say, who is there in India that pursues knowledge from a love of it.....'If I mistake not, all will to a man answer, "Tis Young Bengal!' 'Tis Young Bengal!"[৪৯]

৪. চক্ষুকর্ণ-ঢাকা 'পরম পাকা'দের পরিবর্তে **তরুণদের প্রতি আস্থা** স্থাপন করার এক নতুন সংস্কৃতি তিনি গড়ে তুলেছিলেন, এবং ডিরোজিও বলেছিলেন, "তরুণ যাত্রীরা তোমাদের হাতে এখন হাল, এগিয়ে চলো।"[৫০] ইয়ং বেঙ্গলরা যেন বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

৫. শ্রেণীকক্ষের নির্ধারিত পাঠক্রম থেকে তিনি ছাত্রদের পৌছে দিয়েছিলেন সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার জগতে। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল *'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'* নামক উন্মুক্ত বিতর্কসভা। *"পার্থেনন"* ও *"এনকোয়ারার"* জাতীয় আক্রমণাত্মক পত্র-পত্রিকা কলেজের ছাত্ররা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে। ডিরোজিও নিজেও ছিলেন সংবাদপত্রসেবী।[৫১]

৬. ডিরোজিও শুধু মননশীল শিক্ষক মাত্র ছিলেন না, তিনি সৃজনশীল প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। তাঁর আর এক পরিচয় তিনি কবি। ১৮২৭ সালে জুন মাসে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *'পোয়েমস'* প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ সালে বের হয় *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'*। ছাত্রদের মধ্যেও তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন একটি সৃজনশীল চারিত্র্য। ডিরোজিও-সূচিত এই সৃজনশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুষ্পিত পরিণাম লক্ষ করা যায় মাইকেলে।

৭. বঙ্গীয় রেনেসাঁসের তরুণ জাতকরা নিখিল বিশ্বসংস্কৃতির যাত্রীতে পরিণত হয়েছিলেন। জাতি, ধর্ম, ভাষা, দেশ কালের জন্ম-প্রদত্ত সীমারেখাগুলি অনায়াসে অতিক্রম করে তাঁরা হতে চেয়েছিলেন রেনেসাঁসের মুক্ত-পথিক। কৃষ্টদাস পালের ভাষায় বলতে গেলে,

> "He looks upon the human race as members of one vast family, and acknowledges the tie of brotherhood on all."[৫২]

৮. রেনেসাঁসের সংস্কৃতি আধুনিক অর্থে সেকুলার না হলেও, ধর্মের অটুট ভিত্তিভূমি থেকে তা সরে আসতে থাকে। আগে মানুষ বলতে বোঝাত একজন খ্রীষ্টানকে, রেনেসাঁসের আমলে মুক্ত-মানবতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। মানুষকে দেখা হতে থাকে ধর্মীয় পরিচয়-নির্মুক্ত রূপে। ডিরোজিওর কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর ছাত্রদের সামনে বড় করে তুলে ধরেছিলেন সেকুলার-হিউম্যানিজমের আদর্শ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তিনি ছাত্রদের নাস্তিক করে দিচ্ছেন।[৫৩] পরবর্তীকালে বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে সেকুলার হিউম্যানিজমের যে আন্দোলন উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়েছিল, তার মূলে ডিরোজিও এবং তার শিষ্য-প্রশিষ্যদের অবদান কম নয়।

৯. ইয়ং বেঙ্গলদের সম্পর্কে প্রচার ছিল এই রকম— 'He professes to do but he seldom does anything.'[৫৪] অভিযোগটি একেবারেই ঠিক নয়। তাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনেও তাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। হিন্দু কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্ররা, অনেকেই যোগ্যতার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক সুপ্রিম কোর্টে জুরি হয়েছিলেন। শিবচন্দ্র দেব চব্বিশ-পরগণা, মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি জায়গায় ডেপুটি কালেক্টরের পদ অলংকৃত করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি'র সেক্রেটারি ও কিউরেটার হয়েছিলেন। রাধানাথ শিকদার-এর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা গণনা। কিশোরীচাঁদ মিত্র *'এশিয়াটিক সোসাইটি'*র সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন। হরচন্দ্র ঘোষ 'ডিরোজিও বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল।'[৫৫] তিনি বাঁকুড়ায় মুন্সেফ-এর পদ অলংকৃত করে কর্মজীবন শুরু করেন। শেষে কলকাতার ছোট আদালতে জজের পদে

উন্নীত হয়েছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী হুগলীর জাহানাবাদ মহকুমার মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তালিকা বিস্তৃত করা নিষ্প্রয়োজন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন,

> "ডিরোজিও শিষ্যদিগকে একটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, তাহারা উৎকোচ গ্রহণ না করার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।"[৫৬]

সুতরাং 'cutting beef, breaking bottle'-জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল জীব হিসাবে তাদের চিহ্নিতকরণটা সঠিক ছিল না।[৫৭] ইতিহাসের পরিহাসে তাঁদের কর্মদক্ষতা জড়িয়ে গিয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে। নতুবা রেনেসাঁসের দৃষ্টিতে দেখলে, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন কোন নিন্দাযোগ্য অপরাধ নয়। ইতালিতেও রেনেসাঁসের 'লাতিন কারিকুলাম'-যুক্ত স্কুলগুলি সর্বোচ্চপক্ষে কিছু যোগ্য চ্যান্সেলার, সেক্রেটারি বা প্রশাসকই উৎপাদন করেছিল।[৫৮]

১০. ডিরোজিও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

> "আমার উপদেশ হচ্ছে জ্ঞানে ও সক্রিয়তায় বিশ্বে নিজেদের বিকীর্ণ কর, মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দাও ভালোবাসার বীজ।"

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা শিক্ষকতাকেই তাঁদের মুখ্য জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যেমন বিদ্যালয়-স্থাপনে উদ্যোগী হতেন, তেমনি শিক্ষকতার আদর্শ গ্রহণ করে অনেকেই জীবনাতিপাত করতেন। ডিরোজিওর শিক্ষাদান ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে আশ্চর্য উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাদের অনেকেই শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচরণ সরকার, রসিকলাল সেন, উমাচরণ মিত্র প্রমুখ। শিক্ষকতার এই ধারা বহন করেছিলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ সেন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। রামতনু লাহিড়ী সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী এক ছাত্র লিখেছিলেন, 'তিনি স্কুল গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেই বোধ হইত, এখানে একটি মহৎ কার্য সম্পাদিত হইতেছে।'[৫৯]

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনেও ডিরোজিওর ছাত্ররা যে অনুপ্রাণিত ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন সেকালের সংবাদপত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৩১, ১০ সেপ্টেম্বর *"সমাচার দর্পণ"* লিখেছিল,

> "এই সকল বিদ্যালয় হিন্দু কলেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুবমহাশয়দের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।"[৬০]

রসিককৃষ্ণ মল্লিক সিমুলিয়াতে 'হিন্দু ফ্রি স্কুল' নামে বিনা বেতনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে প্রায় ৮০ জন বালক পড়ত। *"কলকাতা মান্থলি জার্নাল"* (সেপ্টেম্বর, ১৮৩১, পৃ. ১৪-১৫) লিখেছিল,

> "The rays that have emanated from the Hindoo College and that are now diverging to other places must eventually dissipate the mists of ignorance and superstition."[৬১]

প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে 'হিন্দু বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলদের অনেকেই মফস্বল কর্মস্থলে ও গ্রামের বাড়িতে

শিক্ষার আলো জ্বালানোর চেষ্টা করেছেন, সে তথ্য পাওয়া যায়। হরচন্দ্র ঘোষ বাঁকুড়ায় মুন্সেফ হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে নিজ ব্যয়ে একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপন করেন। শিবচন্দ্র দেব নিজ জন্মস্থান কোন্নগর গ্রামে তিনটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন।[৬২] একটি ইংরাজি স্কুল (১৮৫৪), 'একটি বাঙ্গালা স্কুল' (১৮৫৮), ও একটি বালিকা বিদ্যালয় (১৮৬০)। এছাড়া নবীনমাধব দে, রাজকৃষ্ণ মিত্র, নবীনচন্দ্র মিত্র, তারকনাথ সেন, কাশীশ্বর মিত্র প্রমুখ হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়।[৬৩] কোন সন্দেহ নেই, ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষাদানের সূত্রে শিক্ষা সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রচনা করেছিলেন, তারই উত্তরসূরি হিসাবে কলেজে ছাত্ররা পরবর্তী জীবনে বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

তরুণ-বঙ্গের প্রথম কবি ঃ ডিরোজিও

ডিরোজিও শুধু 'নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু' বা সাংবাদিক নন, তিনি কবিও। তরুণ-বঙ্গের প্রথম কবি। ডিরোজিও বাংলায় লেখেননি, লিখেছেন ইংরাজিতে। কাজেই বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ঠাঁই হয়নি ; আবার জাতিতে খাঁটি ইংরাজ নন বলে ইংরাজি কাব্য-সংকলনেও তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সাহেবরা ডিরোজিওকে চিহ্নিত করেছেন জন্ম-পরিচয় দিয়ে—'ইউরেশিয়ান'[৬৪] বা 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পোয়েট'[৬৫] হিসাবে ; আর বঙ্গ-সংস্কৃতির কোনো কোনো অতিভক্ত তাঁকে গিলোটিনে চাপিয়েছেন এই অভিযোগ তুলে যে,

> "ডিরোজিও বাংলা জানতেন না, বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর কখনও পরিচয় হয়নি, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য কোনও কৌতূহল কখনও প্রকাশ করেননি।"[৬৬]

অর্থাৎ বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনাগ্রহী এই মানুষটির কাব্যচর্চা বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে ভূমিকাহীন, অবান্তর একটা ব্যাপার মাত্র। সাহেবদের কারুণ্যময় বর্গীকরণ ও অতি-বঙ্গবাদীদের বিচারের কাঠগড়া থেকে পল্লব সেনগুপ্ত প্রগতিশীলতার কবি ডিরোজিওকে প্রায় উদ্ধার করেছেন বলা যায়।[৬৭] তথাপি সমস্ত বিষয়ে অস্পষ্টতা ঘোচেনি।

প্রথমত, ইংরাজি ভাষায় কবিতা লেখার জন্য তাকে ব্রাত্য করে রাখা ঠিক হবে কিনা? দ্বিতীয়ত, ডিরোজিও সম্পর্কে শিকড়হীনতার অপবাদ কতখানি সত্যি? তৃতীয়ত, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কাব্যচর্চা কোন ভূমিকা পেতেছিল কিনা? সর্বোপরি, রেনেসাঁসের শিক্ষক হিসাবে তাঁকে যেভাবে আমরা চিহ্নিত করেছি, তাঁর কাব্য-কবিতার মধ্যেও রেনেসাঁসের সেই চারিত্র্য ছিল কিনা?

রেনেসাঁসের ইতিহাস আমাদেব বলে, জীবনবাদী অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা অমার্জনীয় অপরাধ কিছু নয়, বরং আবশ্যক শর্ত। সাংস্কৃতিক স্থবিরতা-ভঙ্গের প্রয়োজনে রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও কবিরা ইতালিতে নিমগ্ন হয়েছিলেন ভিন্নতর ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায়। রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমের সূচনাকার হিসাবে সম্মানিত পেত্রার্কা হয়ে উঠেছিলেন নব্য-লাতিন সাহিত্যের জনক। ইতালীয় রেনেসাঁসে ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে পেত্রার্কা যা করেছিলেন, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য-চর্চার সূচনা করে ডিরোজিও একই

ভূমিকা পালন করেন। পাশ্চাত্য-বিদ্যার এই নিবিড় চর্চা আখেরে যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তা মাইকেলের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ডিরোজিও না এলে কোন্ পথ দিয়ে আসতেন মাইকেল? মাইকেলের সাহিত্য যদি নবীন বঙ্গসাহিত্যের রাজদরবার হয়, ডিরোজিওর কাব্য তার প্রবেশপথ। ডিরোজিওর কাব্য-কবিতা ইংরাজিতে লেখা হলেও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তা ভূমিকাহীন কোন ব্যাপার নয়।

'এ বেঙ্গলি পোয়েট্ হু রোট্ পোয়েমস্ ইন ইংলিশ'

দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ডিরোজিওর শিকড়হীনতার অভিযোগ যাঁরা তুলেছেন, তাঁরা ডিরোজিওর কাব্য-কবিতা ভালো করে পড়েননি। তাঁর কাব্য-ভুবন পরিভ্রমণ করলে দেখা যাবে, বাংলার মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, গাছ-পালা, মানবিক আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি তিনি বেশ ভালোমতোই জানতেন। *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* কাব্যে তিনি যে-ভাবে সতীদাহের বর্ণনা দিয়েছেন, তা বস্তুনিষ্ঠ। বৈদিক মন্ত্রপাঠ থেকে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণের স্ত্রী-আচার, সবই তাঁর জানা ছিল।[৬৮] তাঁর 'ইক্লিপস' কবিতাতে আছে চন্দ্রগ্রহণের সময় দেশীয় লোকজনদের আচার-আচরণের খুঁটিনাটি বর্ণনা।[৬৯] 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'[৭০] গানে রবীন্দ্রনাথ যেমন আকাশ-বাতাস সহ দেশকে ভালোবাসার কথা বলেছিলেন, ডিরোজিওর কোন কোন কবিতাংশে আছে সেই একই রকম আবেগের পূর্বধ্বনি—

> 'O! Lovely is my native land
> With all its skies of cloudless light....'[৭১]

'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান' এই কবির দেশীয় শব্দ-ব্যবহারের একটি কৌতূহলজনক দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ইংরাজিতে কবিতা লিখলেও ডিরোজিও প্রচুর খাঁটি দেশীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে বহু বাংলা শব্দ। তাঁর 'ইক্লিপস্' কবিতাটির মধ্যে দেখা যায়, 'চন্দ্র' শব্দটি অন্তত চারবার ব্যবহৃত হয়েছে।[৭২] আবার *'দ্য এনচ্যান্ট্রেস অব দ্য কেভ'* নামক আখ্যানধর্মী কবিতায়, মুসলিম আমেজ আনার জন্য, 'মুন' বা 'চন্দ্র' ব্যবহার না করে তিনি ব্যবহার করেছেন 'মেহতাব' শব্দটি।[৭৩] এই রকম ভাবে তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে—'সূর্য'[৭৪] 'গঙ্গা' ('Gunga's water rolls')[৭৫] 'পীর',[৭৬] 'ফকির', 'সন্ন্যাসী',[৭৭] 'পবন' ('Paban stirs the silent sea'), 'কামিনী' ('The pale Cameeni'),[৭৮] 'শ্মশান',[৭৯] 'সুরমা',[৮০] 'সিতার',[৮১] 'কিন্নর' ('the Kinnur's song'),[৮২] 'দিলদার' ('My only loved Dilder'),[৮৩] 'আল্লা'[৮৪] প্রভৃতি শব্দ। 'ফ্লুট অব ইয়ং কৃষ্ণ', 'মাই রাধিকা, মাই লাভ' জাতীয় ছত্রও তাঁর কবিতায় মেলে। শব্দ ও অনুষঙ্গ ব্যবহারের এই দেশীয় ঝোঁক, ডিরোজিওকে অবশ্যই আমাদের কাছের কবি করে দেয়।

তাঁর 'সঙ অব দ্য ইন্ডিয়ান গার্ল' কবিতায় ভারতীয় মেয়েটি বিষণ্ণ সুরে গঙ্গার ধারে বসে ভালোবাসার গান গায়।[৮৫] 'দ্য নেগলেক্টেড মিনস্ট্রেল' কবিতায় হতাশ, নিঃসঙ্গ-গায়ক স্বগতোক্তির সুরে বলে—

> "নদীর পাড়ে মন্দিরের মত স্তম্ভিত বট গাছটিকে, তুমি কি স্মরণ করতে পারো—
> হে আমার ভালোবাসা! যার নীচে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ বিনিময় করেছিলাম একদিন,

যার ছায়ার আমরা খর গ্রীষ্মের সূর্যকর থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলাম, এবং ডালে-বসা-পাখিদের কল-কাকলি শুনেছিলাম—তারাও বোধ হয় ভালোবাসার কথাই বলেছিল।"...[৮৬]

ডিরোজিওর কবিতা পাঠ করে আমাদের মনে হয়, সাদা কথায় তাঁর কবিপরিচয়টি হওয়া উচিত এইরকম—'he is a Bengali poet who wrote his poems in English.'[৮৭]

শুকতারা যদি দেখা যায়

ডিরোজিওকে আমরা তরুণ-বঙ্গের প্রথম কবি হিসেবে চিহ্নিত করছি এইজন্য যে, তাঁর কাব্যের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল আধুনিক সাহিত্যের বহু লক্ষণ, যা মহাবিশ্বের 'বিগ-ব্যাঙ' থিয়োরির মতো ক্রমবিকশিত হয়েছে উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যে। কোন্ গান গাইলেন তরুণ-বঙ্গের এই আদি কবি? পুরাতন কুয়াশার জরায়ু ছিঁড়ে যে নতুন দিন সমাগত তার অভ্যর্থনা সঙ্গীত। 'We live in iron days', সময় বড় কঠিন।

> ..."morning's herald star
> Comes trembling into day : O! can the Sun be far?
>
> INDIA."
>
> —"হে ভারত। শুকতারা যদি দেখা যায়, সূর্য কি দূরে থাকতে পারে?"[৮৮]

আলোকিত অতীতের পুনর্বাসন

'টু ইন্ডিয়া—মাই নেটিভ ল্যান্ড' এবং 'দ্য হার্প অব ইন্ডিয়া'[৮৯] কবিতা দু'টিকে স্বদেশপ্রেমের কবিতা হিসাবে গ্রহণ করেছেন সকলে। কিন্তু কবিতা দু'টিকে নিছক স্বদেশপ্রেমের কবিতা হিসাবে দেখলে আধখানা দেখা হয়। আসলে, এর মধ্যে রয়েছে রেনেসাঁসের সেই আবেগ, যা নিপতিত বর্তমানের সামনে দাঁড়িয়ে স্বর্ণিল অতীতের দিকে মানসযাত্রা করে এবং স্বর্ণিল অতীতের আদর্শে বর্তমানকে নতুন করে জাগিয়ে বা সাজিয়ে তুলতে চায়।

> "My country ! in thy day of glory past
> A beauteous halo circled round thy brow
> And worshipped as a diety thou wast.
> Where is that glory, where that reverence now ?"...[৯০]

এই 'fallen country'-কে নতুন করে সাজিয়ে তোলার জন্য কবি দূর অতীতে ডুব দিতে চেয়েছেন—

> "Well—let me dive into the depths of time,
> And bring out from the ages that have rolled
> A few small fragments those wrecks sublime,"...[৯১]

একসময় যা ছিল, কিন্তু এখন নেই, সেইসব সম্পদ তিনি ফিরিয়ে আনতে চান। ইতালীয় রেনেসাঁসের মৌল-আবেগটিই যেন এখানে দীপ্যমান। রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পেত্রার্কাও বলেছিলেন, 'অলোকিত অতীতের পুনর্বাসন ছাড়া মুক্তি নেই সমকালের।'[৯২]

'দ্য হার্প অব ইন্ডিয়া' নামক কবিতাটির মধ্যেও রয়েছে রেনেসাঁসের নিখুঁত আবেগ।

"Thy music once was sweet—who hears it now?
...May be my mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike thy strain!"

'মাতৃভূমির বীণার তারে তাঁরই প্রদত্ত প্রথম ঝংকার এদেশে নবযুগের সূচনা করেছে।'[৯৩]

শৃঙ্খলমুক্তির গান

সাইমন্ডসের ভাষায় রেনেসাঁস হচ্ছে, 'মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক'।[৯৪] রেনেসাঁসের বিশ্রুত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি খাঁচা-ভরা পাখি কিনে খুলে দিতেন তার দরজা।[৯৫] পাখিরা উড়ে যেত আদিগন্ত আকাশের নীলিমায়। উদ্ভাসিত চোখে তিনি তাকিয়ে দেখতেন তাদের সেই উড়ে যাওয়ার দৃশ্য। ডিরোজিওর বিভিন্ন কবিতায় আছে শৃঙ্খল-মুক্তির গান। 'ফ্রিডম টু দ্য স্লেভ' নামক একটি কবিতায় তিনি দাসত্বমুক্ত মানুষের জয়গান গেয়েছেন।

"গোলামির পালা শেষ। কি এক বিচিত্র অনুভূতি!
মুক্তি পেয়ে সমুদ্বেল বুক ভরে গর্বের স্পন্দনে
সহসা ভাস্বর হল অন্তরের মহৎ প্রস্তুতি
নতজানু দাসত্বের ক্রান্তির ঘোষণা সেই ক্ষণে ঃ
নিজেকে চিনেছে দাস মানুষের আত্মার সম্মানে,"....[৯৬]

ক্রীতদাস থেকে সম্রাট সবার কাছেই মুক্তির অনুভব সমান। স্পেনের কারাগারে থেকে মুক্ত ফরাসি সম্রাটের কথা শুনিয়েছেন তিনি 'এনেকডোট অব ফ্রান্সিস ওয়ান' নামক কবিতায়,

"Now broken was his chain ;
What were his feelings when he cried,
'I am a king again."[৯৭]

স্বাধীনতাই যে মানুষের সর্বোত্তম অধিকার, একথা তাঁর নানা কবিতায় ব্যক্ত।

সেকুলার হিউম্যানিজমের অগ্রপতাকা

রেনেসাঁসে শুরু হয়েছিল চার্চতন্ত্রের হাত থেকে মানুষের উদ্ধার-প্রকল্প। ধর্মীয় নিগড় থেকে মুক্ত-মানুষ ক্রমশ চলে আসছিল কেন্দ্রীয় মর্যাদায়।[৯৮] আজকের ভাষায় যাকে বলে 'সেকুলার হিউম্যানিজম'। তাঁর *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* কাব্যে নিশ্চিত সতীদাহ থেকে নলিনীকে সবলে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ফকির ও দস্যু দলের সর্দার, তার একদা প্রণয়ী, এখন যে ধর্ম-পরিচয়ে মুসলমান। এক ধর্মের অত্যাচার থেকে ছিনিয়ে এনে ফকির নলিনীকে অন্য ধর্মের কলমা পরানোর পরিবর্তে বলেছে,

"No more to Mecca's hallowed shrine
Shall wafted be a prayer of mine;
No more shall dusky twilight's ear
From me a cry complaining hear;
Henceforth I turn my willing knee
From Alla, prophet, heaven, to thee!"[৯৯]

"আল্লা নয়, নবী নয়, আমি এখন নতজানু হতে চাই তোমার কাছে ; মক্কার পরিবর্তে তুমিই আমার বরণীয়া।"

দৈবীবাদের পরিবর্তে মানবিক পৌরুষকে গৌরবান্বিত করে মাইকেল লেখেন *'মেঘনাদবধ কাব্য'*। *'ব্রজাঙ্গনা'* কাব্যে তিনি সমস্ত 'religious biasness'-কে এক পাশে সরিয়ে রেখে রাধাকে বেদনাময়ী নারীত্বের দিক থেকে চিত্রিত করেন।[১০০] বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেববাদ-বিনির্মুক্ত, 'সেকুলার হিউম্যানিজমে'র শক্তিশালী ঐতিহ্য, আধুনিককালে তার সূচনা কিন্তু ডিরোজিও থেকে।

'আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ'

রেনেসাঁসের সংস্কৃতি কসমোপলিটান। জন্মপরিচয় ও দেশ-কাল মানুষকে একরকম শৃঙ্খল দেয়। রেনেসাঁস মানুষকে দেশ ও জাতিগত পরিচয়ের সেই খণ্ডিত সীমা থেকে উদ্ধার করে নিখিল বিশ্বের মানুষ হওয়ার দীক্ষা দেয়। বাংলা কাব্যের যে 'কসমোপলিটান'-চরিত্র তার সূচনা মাইকেলে। কিন্তু ডিরোজিওর কাব্য-ভুবন পরিক্রমা করলে দেখা যাবে, তার মানচিত্রে ফুটে উঠেছে গ্রীস, ইতালি, ফরাসি, পর্তুগাল, ইংলন্ড, মধ্যপ্রাচ্য, স্পার্টা, সাফো, তাসো, ফ্রান্সিস ওয়ান, রোমিও জুলিয়েট, হাফিজ, মক্কা, বৈদিক স্তোত্র, সূর্য-বন্দনা, গঙ্গা—সব মিলিয়ে পরিব্যাপ্ত এক পৃথিবী। ধ্রুপদী মানবতাবাদের কারণে অতীত গ্রীস চুম্বকের মতো ইতালির হিউম্যানিস্টদের আকর্ষণ করেছিল। ফাইলেলফো বলেছিলেন, 'ফ্লোরেন্সে নতুন করে মাথা তুলছে প্রাচীন গ্রীস।'[১০১] 'মাতৃভূমির পরে যে-দেশকে ডিরোজিও সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন—সে হল গ্রীস। এই ভালবাসা তার শৌর্য-বীর্য এবং সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য।'[১০২] 'থার্মোপলি', 'গ্রীস', 'দ্য গ্রীকস অ্যাট ম্যারাথন', 'অ্যাড্রেস টু দ্য গ্রীকস', 'সাফো' ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রীক বিষয়ক কবিতা তিনি লিখেছিলেন। 'দ্য পোয়েটস হ্যাবিটেশন' নামক কবিতায় তিনি ঈজীয় সাগরের কোনও একটি দ্বীপে উধাও হতে চেয়েছেন।[১০৩]

'ইতালি' 'তাসো' প্রভৃতি কবিতায় ডিরোজিও মাইকেলের আগেই জ্ঞাপন করেছিলেন রেনেসাঁসের মাতৃভূমির প্রতি রেনেসাঁস-পোয়েটের শ্রদ্ধা। তিনি ইতালিকে 'ল্যান্ড অব দ্য লাভার অ্যান্ড দ্য পোয়েট' হিসাবে দেখেছেন।[১০৪] কবিতাটির মধ্যে শোনা যায় মাইকেলের 'ইতালি বিখ্যাত দেশ কাব্যের কানন' কবিতার পদধ্বনি। ইম্যানুয়েল কান্ট[১০৫] ও মোপের্তুইয়ের দর্শনচিন্তা[১০৬] নিয়ে আলোচনা ও অনুবাদমূলক নিবন্ধ দিয়ে তিনি জার্মানি ও ফরাসি দেশকে ছুঁয়েছিলেন। পর্তুগীজ সুরে দু'টি গান লিখে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, নিজের জন্মপরিচয়ের প্রায় অব্যবহৃত সাংস্কৃতিক ভূগোলটির কথা।[১০৭] সেক্সপীয়রীয় বিষয় ('রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট', 'য়োরিক স্কাল') নিয়ে লেখা কবিতাগুলি ছাড়াও বেকন, লক, হিউম, মন্তেস্কু, মূর, বায়রণ, ক্যাম্পবেলের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন রচনা ও কবিতার মধ্যে।[১০৮] শুধু ইওরোপ নয়, মধ্যপ্রাচের কাব্য-কবিতা, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। তাঁর *'ওড ফ্রম দ্য পার্সিয়ান অব হাফিজ'* কবিতা হাফিজের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।[১০৯] ওমর খৈয়াম ও আরব্য-রজনীর কথা তাঁর কাব্যে ছায়া ফেলেছে।[১১০] *'দ্য এনচ্যান্ট্রেস অব দ্য কেভ'* নামক আখ্যানকাব্যে মুসলিম সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান প্রকাশ

পেয়েছে। মুসলিম আবহ ও বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি 'কাফির', 'আফ্রিৎ', 'ইজরাফিল', 'এবলিস', 'মেহতাব', 'মক্কা', 'পীর', 'ফকির', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন অকুণ্ঠিতভাবে।[১১১] কিভাবে তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে এনে দিয়েছেন আরব্য আমেজ, তা বোঝানোর জন্য দু'এক ছত্র উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

> "When the Bulbul's loved mate, the Zuleikha of flowers.
> Like the young eastern bride, blooms unseen in her bowers."[১১২]

রেনেসাঁস তার মানুষের সামনে থেকে মুছে দিয়েছিল আত্ম-পর, দেশ-বিদেশ, বর্তমান-প্রাচীনের বিভেদ। ডিরোজিও যে-স্বাচ্ছন্দ্যে দেশ-বিদেশের সাংস্কৃতিক ভুবন পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন, তা রেনেসাঁসোচিত। মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথে আমরা এই সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতা লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের মতো ডিরোজিও বলতে পারতেন, 'আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শত কোটি কর হানিছে।'

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাসঙ্গিক ব্যবহারেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা তাঁর *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* কাব্যের 'হিম টু দ্য সান' অংশটি পড়লে বোঝা যায়।[১১৩] পল্লব সেনগুপ্ত এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, 'এই কাব্যে যে সূর্যবর্ণনা এবং বন্দনা করা হয়েছে তার সঙ্গে ঋগ্বেদের সূর্যচেতনার এতটুকু পার্থক্য নেই বললেই চলে।'[১১৪] রেনেসাঁসের কবি তো অস্বীকার করতে পারেন না প্রাচীন সংস্কৃতির ওজস্বী ঐতিহ্যকে। মাইকেলকে তাই বিস্তৃত প্রবাস অতিক্রম করে প্রবেশ করতে হয়েছিল রামায়ণ-মহাভারত ভারতীয় পুরাণের গল্পে।

শিল্পের আয়ুধ

রেনেসাঁসের কবি অমানবিক পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপন করবেন ঘৃণার কঠিন তর্জনী; বিপন্ন সুন্দরের জন্য রচনা করবেন অশ্রুপাতের কবিতা। যে নবজাগ্রত মানবিক বিবেক রামমোহনকে নিয়ে যাচ্ছিল সতীদাহ-প্রথা রদ করার আইনী সংগ্রামের পথে, সেই একই বিবেক ডিরোজিওকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* নামক একটি আখ্যানকাব্য। সতীদাহকে ভারতীয় নারীর সহিষ্ণুতা ও বীরত্বের মহীয়সী দৃশ্য হিসাবে ('an act of unparalleled magnanimity and devotion') অনেকে দেখাতে চাইতেন, ডিরোজিও তার তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছেন,

> "*Sattee* is a spectacle of misery, exciting in the spectator a melancholy reflection upon the tyranny of superstition and priest-craft."[১১৫]

সতীদাহ-প্রথা রদ হলে সেই আইনী নির্দেশ শিরোটীকা হিসাবে ব্যবহার করে ডিরোজিও 'অন দ্য এবলিশন অব সতী' নামে একটি উদ্দীপিত কবিতা লিখেছিলেন।[১১৬] কিন্তু এই তথ্য যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক না হয়ে পারে না, রামমোহনের প্রচেষ্টায় সতীদাহ-প্রথা রদ হওয়ার অনেক আগেই ডিরোজিও তাঁর *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* নামক দীর্ঘ আখ্যানকাব্যটি লিখেছিলেন।[১১৭] নবজাগ্রত মানবিকতার কবি ছাড়া সতীদাহের দৃশ্য এমন বুক-পোড়ানো-দীর্ঘশ্বাসে কে বর্ণনা করতে পারতেন?

সদ্যোবিধবা তরুণী নলিনীকে নিয়ে আসা হয়েছে সতীদাহের জন্য। ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত। নিয়মমাফিক সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করানো হল নলিনীকে দিয়ে। নির্দয় শব্দে বেজে চলেছে বাজনা। হৃদয়হীন জনতা গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে চিতাস্থলটি। সমস্ত দৃষ্টি এখন হতভাগিনী নলিনীর উপর কেন্দ্রীভূত।

"And she, that lonely victim, stands the while
Like a pale flower beside the funeral pile.
The gaze of all is on her—there she stands,
Created perfect by eternal hands!
What though the rose has vanished from her cheek
Her eyes speaks more than ever tongue may speak."[১১৮]

কণ্ঠ যেখানে মূক হয়ে থাকে, সেখানে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে চোখ। আর্তের চোখের সেই ভাষা যিনি পড়তে পারেন, তিনিই দরদী শিল্পী। যে দরদী হৃদয় ও মানবিক বিবেকের জন্য বাংলা সাহিত্য শরৎচন্দ্রে আর্দ্র হয়ে আছে, ডিরোজিও তার নান্দীপাঠ করেছিলেন বহু আগে। তিনি বলেছিলেন, 'নারী অপরের খেলনামাত্র নয়'।[১১৯] শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, যাঁদের চোখের জলের হিসাব কেউ নেয় না তারাই তাঁকে পাঠিয়েছে তাদের দুঃখের কথা লিখতে।[১২০] *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* কাব্যের লেখক ডিরোজিও-ও একথা বলতে পারতেন।

প্রথম সনেট-লিখিয়ে বাঙালী কবি

প্রবাসে থাকাকালে মাইকেল পেত্রার্কা পড়ে সনেট লেখায় অনুপ্রাণিত হন এবং রচনা করেন শতাধিক চতুর্দশপদী কবিতা। বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট লেখার গৌরব মধুসূদনেরই। এই গৌরব থেকে মাইকেলকে বঞ্চিত না করেও বলা যায়, তাঁর আগেই একজন বাঙালী কবি অনেকগুলি সনেট লিখেছিলেন। সেই কবির নাম ডিরোজিও। ব্রাডলি-বার্ট সম্পাদিত ডিরোজিওর অসম্পূর্ণ কাব্য-সংকলনটিতে চোখ বুলালে দেখা যাবে, সেখানে সনেট নামাঙ্কিত কবিতা রয়েছে অন্তত তেরোটি।[১২১] 'হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে' লেখা ডিরোজিওর বিখ্যাত কবিতাটি তো রূপগত পরিচয়ে সনেটই। এগুলি কি মাইকেলের অপঠিত ছিল?

নস্টালজিক বিষণ্নতার কবি

ইতালীয় রেনেসাঁসের চিত্রকলা যাঁরা ভালো করে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, সেখানে চিত্রিত চরিত্রগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ছড়ানো ছিল একটা প্যাস্টোরাল অনুষঙ্গ। লিওনার্দোর বিখ্যাত 'মোনালিসা' ছবিটিতেও রয়েছে বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রেক্ষিত।[১২২] জর্জিনোর বহু ছবিতে দেখা যায়, তার চিত্রিত মানুষগুলি দাঁড়িয়ে আছে বহুধা-বিস্তৃত-আকাশ ও পৃথিবীর একান্ত অনুষঙ্গ নিয়ে।[১২৩] মমতা-মেদুর সেই প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ ও নস্টালজিক বিষণ্নতা মাইকেলের *চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র* মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। 'কপোতাক্ষ নদ', 'নদীতীরস্থ মন্দির', 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিন মাস'—ফেলে আসা পৃথিবীর জন্য একরকম মন-কেমন-করা উচ্চারণ। ডিরোজিওর 'সঙ অব দ্য ইন্ডিয়ান গার্ল', 'দ্য নেগলেকটেড মিনস্ট্রেল' 'ইভনিং ইন অগষ্ট'

প্রভৃতি কবিতার মধ্যে আছে সেই একই রকম নস্টালজিক বিষণ্ণতা, 'Roll on fair Ganges!—what a noble stream!'[১২৪] কপোতাক্ষ নদের জায়গায় আমরা পাচ্ছি প্রবহমান গঙ্গার মধুর কলধ্বনির কথা। 'দাঁড়াও পথিকবর। জন্ম যদি তব/বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল'......নিজের সমাধিফলকের কবিতা নিজে লিখে মাইকেল আমাদের ব্যথিত করে গিয়েছিলেন; ডিরোজিও এ'রকম একটি নয়, দু'টি কবিতা লিখেছিলেন।[১২৫] আঠারো বছর বয়সেই ডিরোজিওর বিষাদ এত ঘন যে তিনি লেখেন,

"বালিতে ঘুমাবে শুয়ে, নির্জনেতে, সর্বশেষ ঘুম;
স্বপ্ন দেখা সাঙ্গ তার; জনহীন সমুদ্রের কূলে
স্বর্গ-ঝরা অশ্রুজলে ভিজে যাবে কবর নিঝুম;
কোনোদিন তীর্থ সেরে যাত্রীদল আসবে না ভুলে
সেই পথে; পুষ্প-অর্ঘ্যে শ্রদ্ধানত হবে না তো তারা
তন্দ্রাহীন তারাদল দেবে শুধু রাতের পাহারা।"[১২৬]

রেনেসাঁসে ব্যক্ত হয়েছিল নবজাগ্রত একটি সভ্যতার যৌবনদীপ্ত প্রাণের অপরিসীম জীবনতৃষ্ণা। বরবর্ণিনীদের রূপচিত্রণে মঞ্জরিত হয়েছিল তার শিল্পীদের বাসন্তিক সৌন্দর্য-তিয়াসা। লিওনার্দোর *'মোনালিসা'*, বতিচেল্লির *'ভেনাসের জন্ম'*, জর্জিনোর *'নিদ্রিতা ভেনাস'*-এ তার নন্দন-স্বাক্ষর। বাঞ্ছিত সৌন্দর্যের কমলটিকে ঘিরে রেনেসাঁসের ঐতিহ্যবাহী রোমান্টিক কবির তৃপ্তিহীন গান। ডিরোজিও তাঁর কাব্যে-কবিতায় রচনা করেছিলেন সেই সৌন্দর্য-পিপাসার গান,

"Her eyes seemed made of the pure star-light
And her face was mild and sweet:
Her neck was white as the flower of night
And her tresses kissed her feet......
Even death had failed to conquer."[১২৭]

এমন সৌন্দর্য তার, যে মৃত্যুও তাকে ম্লান করতে পারে না।

রেনেসাঁসের শিল্পীরা সৌন্দর্য-ঝলকিত জীবনের রূপকার হলেও বিষাদ তাদের পিছু ছাড়েনি। তাই মহাশিল্পী অ্যাঞ্জেলোর পৌরুষদৃপ্ত ফ্রেস্কোর পেশীর মোচড়ে মোচড়ে ফুটে থাকে নিঃশব্দ আর্তনাদ, তরুণ খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে রেনেসাঁসের মেয়েরা।[১২৮] এরাজমুস বলেন জীবনের আরেক নাম 'slow death'। জীবনকে নিবিড় করে অনুভব করেছিলেন বলেই ডিরোজিওর কবিতাতেও মাঝে মাঝে ছড়িয়ে পড়ে সর্বরিক্ত নিঃসঙ্গতার শাশ্বত বিষাদ—

"And left my mind in dark, despairing mood
To fell, and think upon its solitude."[১২৯]

রোমান্টিক গীতিকাব্যের প্রথম অভ্যর্থনাকার

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর কবি সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছিলেন এক সময়-বিরুদ্ধ সংকল্প, 'গাহিব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'। এই ধ্রুপদী বাসনাকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করেছে তাঁরই অন্তঃস্থ রোমান্টিক কবিমানস। ডিরোজিও মহাকাব্য রচনার কোনো ভুল স্বপ্ন দেখেননি। আখ্যানকাব্যের

মধ্যেও তিনি ছিলেন রোমান্টিক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের সৌজন্যে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে (*'লিরিক্যাল ব্যালাডস'*) লিরিক কাব্যের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এদেশে ডিরোজিওই তার প্রথম অভ্যর্থনাকার। কালে এই রোমান্টিক গীতিকাব্যের ধারা বাংলা কবিতার রাজ্যে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। বিহারীলালের মতো শিথিল নয়, দেবেন্দ্রনাথের মতো তরল নয়, অক্ষয় বড়ালের মতো ধূসর নয়, হেমচন্দ্রের মতো স্থূল নয়, নবীন সেনের মতো ফেনিল নয়, অথচ মাইকেল-অতিক্রান্ত এক লিরিক্যাল উচ্চারণ ডিরোজিও তাঁর কবিতার কণ্ঠে দিয়ে গিয়েছিলেন। 'সামার-বার্ড'-এর মতো ডিরোজিওর নিঃসঙ্গ কবিপ্রাণ পরিভ্রমণ করে বেড়ায় 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'—

> "My mind that wandered once like summer bird
> From twisted brake and bush on wildest wing,
> Swift as its own desires must fall at last
> even from those sweet ideal worlds it made :
> And, like my native earth, which once a star
> Blazed through the pathless ether, must I roam,
> Darkness without, within consuming flame."[১৩০]

জীবনানন্দ লেখেন,

> "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে......
> আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন"[১৩১]

একই রকম ক্লান্তি-জড়ানো পরিভ্রমণ, একই রকম বিষাদসিক্ত অন্বেষণের কথা।

বাংলা কাব্যের অনেক নির্ণায়ক লক্ষণই ডিরোজিও গর্ভিত করে গিয়েছিলেন তাঁর কাব্যকবিতায়। তাঁর কাব্যের মধ্যে আমরা পাই নবযুগের কবি মাইকেলের পদধ্বনি, বঙ্কিম-লালিত রোমান্সের বীজ, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা। ডিরোজিওর কবিতায় অঙ্কুরিত হয়েছিল নজরুলের সেকুলার জীবনদৃষ্টি, শরৎচন্দ্রের দরদী হৃদয়, জীবনানন্দের বিষাদ। তরুণ-বঙ্গের প্রথম কবি অনধিক তেইশ বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে তাঁর 'পোয়েমস্' (১৮২৭), *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা অ্যান্ড আদার পোয়েমস্'*, 'দ্য এনচ্যান্ট্রেস অব দ্য কেভ' প্রভৃতি কাব্য-কবিতার মধ্যে নতুন গড়নের যে নন্দন-প্রদীপ প্রস্তুত করেছিলেন, মাইকেল তাতেই বঙ্গভাষার আলোক-সংযোগ করে হয়েছিলেন নবযুগের কবি। ডিরোজিও লিখেছিলেন তরুণ-বঙ্গের দিকে তাকিয়ে, মাইকেল লিখেছিলেন বৃহত্তর-বঙ্গের উদ্দেশে। ডিরোজিওর পিছনে ছিল বৃহত্তর বঙ্গ, সামনে ইয়ং বেঙ্গল; মাইকেলের পিছনে ছিল ইয়ং বেঙ্গল, সামনে বৃহত্তর বঙ্গ। সুতরাং তিনি বাংলায় লেখেননি বলে তাকে ব্রাত্য করে রাখা সমীচীন নয়। শিকড় থেকে বৃন্তে রস-চলাচলের যে অখণ্ড প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে, ডিরোজিওর সঙ্গে মাইকেলের ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেই যোগ—সেই সম্পর্ক।

'শাস্ত্র মানে না মানে মানুষের ভালো'

অনেক পথ পেরিয়ে 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার' কবি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'ধর্মমোহ' নামে একটি কবিতায় লিখলেন,

"নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর!
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না মানে মানুষের ভালো।"[১৩২]

নামোল্লেখ না করে রবীন্দ্রনাথ এখানে বুদ্ধির আলোকধৌত জীবনবাদের যে ঐতিহ্যকে বিধাতার আশীর্বাদপূত করে বরণ করেছেন, বঙ্গসংস্কৃতিতে তার সূচনাকার ছিলেন ডিরোজিও।[১৩৩]

মাতৃভাষার সমৃদ্ধি-সাধনে ইয়ং বেঙ্গলদের দান

রেনেসাঁসের ভাষাচর্চা সম্পর্কে ভিত্তিগত ধারণার অভাবে ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলদের ভূমিকা অকারণ খাটো করে দেখানো হয়েছে। মাতৃভাষার সমৃদ্ধি-সাধনে ও তার গুণগত পরিবর্তন-সাধন-প্রকল্পে ইয়ং বেঙ্গলরা পালন করেছিলেন রেনেসাঁসোচিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব। মাতৃভাষা ছাড়া অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা রেনেসাঁসের ইতিহাসে কোনও অমার্জনীয় অপরাধ নয়। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা মাতৃভাষার পরিবর্তে গ্রীক ও লাতিন ভাষার চর্চায় নিরত হয়েছিলেন। চার্চ-শাসিত মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়োজনে, তার বুদ্ধিজীবীরা তখন অধিকতর জীবনবাদী গ্রীক ও প্রাচীন রোমান সংস্কৃতির কথা তুলে আনছিলেন। রক্তস্ফীত প্যাগান জীবনবাদ ও রোমান জীবনচর্যার ঐশ্বর্য ও উত্তাপকে তাঁরা নতুন করে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন তাঁদের বিস্তারমুখী জীবনে। ভাষাচর্চা এখানে ভাষা-চর্চা মাত্র নয়, প্রাচীনতর ভাষার আশ্রয়ে নতুন জীবনবাদের পুষ্টি-সন্ধান।[১৩৪] 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এর জনক হিসাবে খ্যাত পেত্রার্কা বোক্কাচিওকে একটি চিঠিতে লিখছেন,

> "আমি ভার্জিল, হোরেস, লিভি, সিসেরো একবার নয়, সহস্রবার পড়েছি। দায়সারা গোছের পড়া নয়, আমি পড়েছি আস্তে আস্তে এবং তা দিয়ে আমি সঞ্জীবিত করেছি আমার সমগ্র মনকে। সকালে যা পড়তাম, সন্ধ্যায় সেগুলো রোমন্থন করতাম; বালকের মতো গোগ্রাসে গিলতাম এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো হজম করতাম। তাঁদের লেখাগুলি শুধু মস্তিষ্কে নয়, মজ্জাগত করে নিতাম (not only in my memory but in my very marrow)।"[১৩৫]

এই বক্তব্য থেকে আন্দাজ করা যায়, অন্যতর ভাষাচর্চায় তাদের অনুরাগের স্বরূপটি কিরকম ছিল? বিখ্যাত গ্রীকবিদ্ ক্রাইসোলরসের কাছে গ্রীক ভাষা শিক্ষা করলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট ব্রুনি, গুয়ারিনো, পোজ্জিও, ফাইলেলফো প্রমুখ। পেত্রার্কা হতে চাইলেন তাঁর সময়ের সিসেরো; ফিকিনো হয়ে উঠলেন প্লেটোবিদ ; পম্পোনাজ্জি খ্যাত হলেন অ্যারিস্টটলবিদ্ হিসাবে। ফাইলেলফো তাঁর গ্রীক ও লাতিন বিদ্যার পসরা নিয়ে ইতালির এক সিটি-স্টেট থেকে অন্য সিটি-স্টেটে সওদা করে বেড়াতে লাগলেন। ভেনিসের বিখ্যাত মুদ্রণ-ব্যবসায়ী অলডো ম্যানুটিয়াসের বাড়ি প্রায় গ্রীক-কলোনিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। লরেঞ্জো ভাল্লা লাতিন ভাষা-চর্চার সপক্ষে রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাব

'এলিগেন্সিজ্ অব দ্য লাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ্' (১৪৪৪ খ্রীঃ)। রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলিতে পড়ানো হতে থাকে গ্রীক ও লাতিন-পাঠক্রম।[১৩৬] প্রিসকোট লিখেছেন, রেনেসাঁসের বাজন্যকদেব শুধু যুদ্ধ ও রাষ্ট্রশাসন-বিদ্যার নয়, গ্রীক ও লাতিন বিদ্যাতেও পারদর্শী হতে হতো।[১৩৭] রুসেল্লি নামে এক বণিক তাঁর ডায়েরীতে সুখী মানুষের সাতটি লক্ষণ লিপিবদ্ধ কবেছেন।[১৩৮] গ্রীক ও লাতিন ভাষায় পারদর্শিতা তাঁর অন্যতম গুণ হিসাবে ধরা হয়েছে। কাস্তিলিওনে তাঁব *'কোর্টিয়ার'* গ্রন্থে আদর্শ ভদ্রলোকের যে বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন, তাতে গ্রীক ও লাতিন জানা আবশ্যক হিসাবে দেখানো হয়েছে।[১৩৯] বুর্খহার্ডট তাঁর রেনেসাঁস সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন, লাতিন ভাষার মর্যাদা ও তাব প্রতি অনুরাগ সে-সময় এমন বৃদ্ধি পায়. যে ছেলেমেয়েদের নামকরণও লাতিনে হতে থাকে।[১৪০] তখনকার বিখ্যাত বক্তাদেব বক্তৃতাগুলি গ্রীক ও লাতিন উদ্ধৃতিতে ছাওয়া থাকত। প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার, সেগুলিব সটীক সংস্করণ. অনুবাদ. মুদ্রণ প্রভৃতি মিলিয়ে রেনেসাঁসের আমলে যে বৌদ্ধিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে মাতৃভাষা ইতালিই হয়ে পড়েছিল দুয়োরাণী। রেনেসাঁসের ভাষা-চর্চা সুতরাং প্রথমত ছিল গ্রীক ও লাতিনমুখী।

কিন্তু অনুধাবন করলে দেখা যায়, গ্রীক ও লাতিন ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষা ইতালির সপক্ষেও অনুরাগতপ্ত ভাষা-চর্চার একটি ধারা সেখানে বিদ্যমান ছিল। সুপণ্ডিত ভাল্লা যেমন লাতিন ভাষার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, তেমনি আলবের্তি বাতিস্তা নামে বহুমুখী প্রতিভাধর এক শিল্পী লিখেছিলেন মাতৃভাষা ইতালির সপক্ষে একটি জোরালো প্রস্তাব—*'দেল্লা ট্রাঙ্কুইলিত্তা দেল্লা নিমো'* (১৪৪৫-১৪৫০)। সেখানে তিনি প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে লেখেন,

> "সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন ভাষায় যদি আমি লিখি, কার এমন সাধ্য আছে যে আমাকে আক্রমণ করে ও অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়?"[১৪১]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিউম্যানিস্ট ও সাহিত্যিকরা ইতালি ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকেন। সাননাজারো মাতৃভাষায় লেখেন *'অর্কেদিয়া'* (১৫০৪), এরিস্তো লেখেন *'অরল্যান্দো ফুরোসা'*, মেকিয়াভেলি ও গুইচারদিনি তাঁদের ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ লেখেন ইতালি ভাষাতেই। পেত্রার্কা ও বোক্কাচিও নব্য-লাতিন-ভাষার স্থপতি হলেও, ইতালি ভাষার প্রতি তাঁদের মমত্ব কম ছিল না। বেসিল উইলি তাঁর *'টেন্ডেন্সিজ ইন রেনেসাঁস লিটারারি থিয়োরি'* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তা উদ্ধৃতি সহযোগে দেখিয়েছেন।[১৪২] আরেতিনো ঘোষণা করেন, 'প্রত্যেক ক্ষমতাশালী লেখকের উচিত পেত্রার্কা ও বোক্কাচিওকে এড়িয়ে মাতৃভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করা।' রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বেম্বো তাঁর *'প্রোজ দেল্লা লিঙ্গুয়া ভোলগার'* (১৫২৫) নামক লেখায় গ্রহণীয় ভাষাদর্শ নিয়ে একটি আলোচনামূলক সংলাপ রচনা করেছেন। সেখানে বিতর্ক সমাপ্ত হয়েছে মাতৃভাষার অনুকূলে। কাস্তিলিওনের *'কোর্টিয়ার'* গ্রন্থেও পেত্রার্কা-বোক্কাচিওর ভাষাদর্শ ও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়, তা নিয়ে মনোরম আলোচনা আছে। সেখানে কাউন্ট চলতি ভাষার সপক্ষে। বলা বাহুল্য, কাউন্টের মধ্যে দিয়ে কাস্তিলিওনে নিজের অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। ত্রিসিনো তাঁর *'এল ক্যাসতেল্লানো'* নামক রচনায় বলেছেন, দান্তের ভাষাকেই ফিরিয়ে আনা উচিত। ইতালীয় রেনেসাঁসে ভাষাচর্চার বিবর্তন-রেখাটি খুবই স্পষ্ট। প্রথম দিকে, হিউম্যানিস্টরা গ্রীক লাতিনাদি অন্যতর ভাষা-চর্চার দিকে

পতঙ্গের মতো ধাবিত হলেও, ক্রমশ তারা ফিরে এসেছিলেন লোকচলতি মাতৃভাষার দিকে। দ্বিমুখী সেই ভাষা-প্রকল্পের মধ্যে একটা অনিবার্য অন্তঃসংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। গ্রীক ও লাতিন ভাষার উৎস থেকে সম্পদ ও সৌন্দর্য আহরণ করে অবশেষে, তাঁরা তাদের মাতৃভাষাকেই সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করে তুলেছিলেন। রেনেসাঁসের ভাষা-চর্চার এটাই সার সত্য।[১৪৩] এর ফলে বুর্খহার্ডটের উক্তি অনুসারে, ইতালীয় ভাষা ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ ও সুরচিত একটি উদ্যানে পরিণত হয়েছিল।[১৪৪] ইতালীয় রেনেসাঁসে ভাষাচর্চার এই ইতিবৃত্ত থেকে মূল দু'টি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে—

এক ঃ জীবনবাদী অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা রেনেসাঁসে কোনো অমার্জনীয় অপরাধ নয়, বরং আবশ্যক শর্ত।

দুই ঃ অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক ও নিবিড় চর্চা মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনেই শেষ পর্যন্ত উৎসর্গিত হয়।

ইয়ং বেঙ্গলরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে বহির্মুখী পতঙ্গের মত ধাবিত হয়েছিলেন, প্রতীচ্য বিদ্যার প্রতি ব্যক্ত করেছিলেন নিঃসংশয় অনুরাগ ; প্রাণপণে রপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সে-সব বিদ্যা। সেজন্য তাঁদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়ে থাকে। অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এই ধরনের অনুরাগদীপ্ত আবেগ ও আনুগত্যের জন্য ইতালীয় রেনেসাঁসের ভাষ্যকাররা কিন্তু ইতালির হিউম্যানিস্টদের অপরাধী সাব্যস্ত করেননি। বরং রেনেসাঁসের ইতিহাস আমাদের এই কথা বলে যে, এই সাংস্কৃতিক প্রবাস ব্যতীত রেনেসাঁসের আমলে নবতর সংস্কৃতির জন্মই হতো না। মধ্যযুগীয় গতানুগতিকতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ব্যতীত সম্ভব হতো না আধুনিক যুগে প্রবেশ। যে জীবন বিশুষ্ক, কিন্তু একদা সঞ্জীবিত ছিল—তার সন্ধানে ইতালির হিউম্যানিস্টরা প্রবেশ করেছিলেন গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যার প্রাচীনতর ভুবনে। সেই একই রকম তাগিদ থেকে আধুনিক যুগের বঙ্গ পথিকরা তৃষিত আগ্রহে ধাবিত হন প্রতীচ্য ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে। যে জীবন এখানে বিশুষ্ক, মৃতপ্রায়, তা অন্য কোন গোলার্ধে সজীব ও সঞ্জীবিত রয়েছে ; অতএব 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে ইয়ং বেঙ্গলদের এই মাননিক প্রস্থান রেনেসাঁসের প্রক্রিয়া-বহির্ভূত কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, বরং আবশ্যিক শর্ত।

এখন আমরা আসব দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে। পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের প্রাথমিক ঝোড়ো অনুরাগ সত্ত্বেও মাতৃভাষার পরিপুষ্টি-প্রকল্পে তাঁদের প্রত্যাবর্তন ও অবদান যে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—সেই প্রসঙ্গে। ইংরাজি থেকে মাতৃভাষার দিকে তাঁদের ক্রমপরিবর্তিত অনুরাগের সেই ইতিবৃত্ত তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সভা-সমিতি, সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও তাঁদের রচিত মননশীল ও সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি—এই তিন দিক থেকে লক্ষ করা যায়।

সভা-সমিতি

১৮২৮ সালে ডিরোজিও এবং ডিরোজিয়ানদের স্থাপিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসো-সিয়েশন'ই ছিল পাশ্চাত্যপন্থীদের প্রথম সভা। ইংরাজিই ছিল এই সভার মুখ্য এবং

বলতে গেলে একমাত্র ভাষা। এর সমান্তরালে, মাতৃভাষার সপক্ষে সংগঠিত সওয়াল শুরু হয়· ১৮৩২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, রামমোহন রায়ের সিমলা স্কুলে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি সভা 'সর্বতত্ত্বদীপিকা'য়। এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার বিশেষ অনুশীলন করা। এটি অবশ্য ইয়ং বেঙ্গলদের সভা নয়, তবে উদ্যোক্তাদের অনেকেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২ মার্চ ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত তরুণদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। এখানে কেবল ইংরাজি নয়, বাংলা ভাষাতেও প্রবন্ধ পঠিত হতে থাকে। উদয়চাঁদ আঢ্য নামে এক ব্যক্তি মাতৃভাষার সপক্ষে একটি সুরচিত প্রস্তাব করে পাঠ করে বলেন,

> "দেশের মনুষ্য সেই দেশের ভাষার কর্মদক্ষতা হইলে পরাধীন দাসত্বের কারণ চ্যুত হইয়া স্ব২ প্রধান হইতে পারেন তৎপ্রমাণ দেখুন যে এমত দেশও অদ্যাপি কতিপয় আছে যে তত্রস্থের স্বীয়২ জাতীয় ভাষায় জ্ঞান দ্বারা বৃহত২ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেছেন। রাজার ভাষা বা কোন রাজার সহিত সংসৃষ্ট রাখেন না।"[১৪৫]

উদয়চাঁদ আঢ্যের এই প্রস্তাব মনে করিয়ে দেয়, ইতালির 'ইনফিয়ামেত্তি একাডেমি'তে স্পেরোনে স্পেরোনি কর্তৃক পঠিত 'ডায়লক অন ল্যাঙ্গুয়েজ' নামক নিবন্ধটির কথা। তাতে তিনি বলেছিলেন,

> "শুধু গ্রীক-লাতিন নয়, ইতালি ভাষাতেও যে কোন সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করা যায়।"[১৪৬]

এরপর থেকে উক্ত একাডেমি ইতালিতে বক্তৃতা দেওয়া বা রচনা প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেয়। বেনেদেত্তো ভার্চ্চি ইতালি ভাষায় ওভিদ ও থিয়ক্রিটাসের অনুবাদ-কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বক্তৃতার ভাষা নিয়ে তাঁদের কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি বা পিছু হঠতে হয়নি, তা নয়। 'ফ্লোরেনটাইন একাডেমি'তে ভার্চ্চি 'নিকোমাচিয়েন এথিকস'-এর উপর জ্ঞানগর্ভ ও জনপ্রিয়বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্রথম বক্তৃতা তিনি ইতালিতেই দেন। পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে তাঁকে নিরুপায় হয়ে ফিরে আসতে হয় লাতিনে। কেননা ক্রমবর্ধমান শ্রোতার আসরে ফরাসি ও জার্মানরা ভিড় জমাতে থাকে। লাতিন-ই ছিল তখন ইওরোপের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা'। ১৮৪৪, ২৩ জুন রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'হেয়ার প্রাইজ-ফান্ড-কমিটি'। এই কমিটি ঘোষণা করে, সমাজ-মঙ্গল বিষয়ে বাংলায় রচিত একটি করে বইকে প্রতি বছর পুরস্কৃত করা হবে। ১৮৫১, ১২ আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেথুন সোসাইটি'। অনন্য-সাধারণ এই সভার সভাপতি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও সদস্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু কলেজের খ্যাতিমান ছাত্ররা। এই সোসাইটির নিয়মাবলী অনুসারে ইংরাজি, বাংলা অথবা উর্দুতে লিখিত বা মৌখিক ভাষণ দেওয়া যেত। সোসাইটির 'ট্রানসাকশন্সে' প্রকাশিত পঠিত নিবন্ধের তালিকায় দেখা যায়, মাতৃভাষার প্রতি ঝোঁক অনেক বেড়েছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংস্কৃত কাব্য', কৈলাসচন্দ্র বসু 'ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটক', প্যারীচরণ সরকার 'বাংলার শিশুপালন ও শিশু শিক্ষা', লালবিহারী দে 'বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা', 'বাংলায় মাতৃভাষা শিক্ষা', ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' প্রভৃতি প্রস্তাব এখানে পাঠ করেন।[১৪৭] এই প্রসঙ্গে সমকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র (১৮৫৩) কথা উল্লেখ করা যায়। বিনয়

ঘোষের মতে,

> "বেথুন সোসাইটির খাঁটি বাঙালী সংস্করণ বিদ্যোৎসাহিনী সভা।......ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই আলোচনা হত। কিন্তু বাংলা ভাষার আলোচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী।"[১৪৮]

এই প্রসঙ্গে দু'টি সংবাদ খুব জরুরী—

এক : "বেথুন সোসাইটি'র সব বাঙালী সভ্যই প্রায় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।"[১৪৯]

দুই : 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকেই *'মেঘনাদবধ কাব্য'*-এর রচয়িতা ও নবযুগের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল।

পত্র-পত্রিকা

সভা-সমিতির মধ্যে দিয়ে ইয়ং বেঙ্গলদের যে সুস্পষ্ট বিবর্তন লক্ষ করা যায়, তাদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার দিকে তাকালেও তা নজরে পড়ে। ১৮৩০ সালের শরতে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় তরুণ ছাত্রদের বের করা *"পার্থেনন"* ছিল বাঙালীদের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম ইংরাজি সমাচারপত্র। এরপর তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত *"হেসপেরাস"* ; ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত *"এনকোয়ারার'* ছিল ইংরাজি পত্রিকা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে অপর এক ডিরোজিয়ান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করে *"জ্ঞানান্বেষণ"*। এটি প্রথম ইংরাজিতে প্রকাশিত হলেও, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে পত্রিকাটি ইংরাজি ও বাংলা দ্বিভাষী কাগজে পরিণত হয়। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে বিখ্যাত ডিরোজিয়ান রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়, প্রগতিশীল ও দ্বিভাষিক পত্রিকা *"বেঙ্গল স্পেক্টেটর"*। এটি প্রথম থেকেই বাংলা ও ইংরাজি এই দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব পড়েছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের উপর। পত্রিকার স্তম্ভে মন্তব্য করা হয়,

> "আজ আমাদের সামনে একটি নতুন উষার উদয় হতে চলেছে। চিন্তাজগতে যে দাসত্ব এতদিন জাতীয় মনকে জড়পদার্থ করে রেখেছিল, আজ তা দূর হতে চলেছে।"
>
> (ডিসেম্বর ১, ১৮৪২)[১৫০]

১৮৫৪ সালের ১৬ই আগষ্ট প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশ করেন *"মাসিক পত্রিকা"*। এবার আর দ্বিভাষিক নয়। খাঁটি বাংলা পত্রিকা। প্রত্যেক সংখ্যার প্রথম পাতায় ছাপা থাকত,

> "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে ; যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।"[১৫১]

*"মাসিক পত্রিকা"*তেই বের হয়েছিল *'আলালের ঘরের দুলাল'*।

"পার্থেনন" বা *"এনকোয়ারার"* থেকে *"মাসিক পত্রিকা"*—ইয়ং বেঙ্গলদের প্রকাশিত সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। ইংরাজি ভাষার পত্রিকা প্রকাশ দিয়ে শুরু

হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গলদের পথ চলা। ক্রমে দ্বিভাষিক পত্রিকাপর্ব পেরিয়ে সহজবোধ্য বাংলা পত্রিকায় এসে যেন সম্পূর্ণ হল তাদের পরিক্রমা। ইংরাজি থেকে বাংলার দিকে ইয়ং বেঙ্গলদের মানস-বিবর্তনের বৃত্তান্তটি রেনেসাঁসীয় মানস-বিবর্তনেরই বৃত্তান্ত।

মননশীল ও সৃজনশীল রচনাদি

১৮৩১ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় *'পারসিকিউটেড'* নামে একটি ইংরাজি নাটক লিখে হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করেন। আঠারো বছর বয়সেই মাইকেলের কবিতা ছুটে যেত ইংলন্ডের সম্পাদকদের ঠিকানায়।[১৫২] তিনি *'দ্য ক্যাপটিভ লেডি'* বা *'ভিসিয়ন অব দ্য পাস্ট'* লিখে বাংলার মিল্টন হতে চেয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ইংরাজিতে রচনা করেছিলেন জীবনী গ্রন্থাদি। নিবন্ধ বা গ্রন্থাদি রচনায় তাঁরা প্রথমত ছিলেন ইংরাজির পক্ষপাতী। কিন্তু এইখানেই তাদের রচনা-প্রকল্পের বৃত্তান্ত শেষ নয়, শুরু মাত্র। ইতালিতে যেমন হিউম্যানিস্টরা উভমুখী একটি ভাষা-প্রকল্পে চলাচল করতেন ; গ্রীক-বিদ্যাকে লাতিন এবং প্রাচীন লাতিন-রচনা-সম্ভারকে সটীক ইতালি ভাষায় এনে দিতেন। ডিরোজিয়ানরা সেই দায়িত্ব অনেকাংশে পালন করেছিলেন। ইংরাজি ভাষায় লেখা মননশীল ও সৃজনশীল-রচনাকে বাংলায় এনে দেওয়ার কাজ ; একই বিষয়কে ইংরাজি ও বাংলায় লেখা এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমুন্নত রূপ ও ভাব অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যকে নবায়িত করা—ইয়ং বেঙ্গলরা এর সবগুলিই করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রর *'কৃষিসংগ্রহ'* (৫ম খণ্ড) অনুবাদমূলক লেখা।

> "এই সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি পাশ্চাত্যমণ্ডলীর গ্রন্থ থেকে বিবিধ অংশ সংগ্রহ করে নিজের অনূদিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সি. কে. রবিনসন কৃত অ্যারারুট নামে পলো প্রস্তুত করিবার প্রণালী, কাপ্টেন রিচমন্ডের আলুর চাষ......ইত্যাদি চাষের বর্ণনা দিয়েছেন।"[১৫৩]

এটিকে অনুবাদমূলক কাজের দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যায়।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বহু গ্রন্থ লিখেছেন দ্বিভাষিক সূত্র মেনে। যেমন *'ডায়লক অন দ্য হিন্দু ফিলজফি'* নামক দর্শন বিষয়ক গ্রন্থটির বাংলা-সংস্করণও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র *'এ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ অব ডেভিড হেয়ার'* জীবনী গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা-সংস্করণ প্রকাশ করেন। এইসব স্তর পেরিয়ে ইয়ং বেঙ্গলরা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন মাতৃভাষায় সৃজনশীল সাহিত্য-রচনাকর্মের মধ্যে। বেসিল উইলির ভাষায়, রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও সাহিত্যিকরা যেমন গ্রীক ও লাতিন-ভাষার চর্চা দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তারা 'decided the issue in favour of vernacular.'[১৫৪] ঠিক তেমনি ইয়ং বেঙ্গলরা ইংরাজি ভাষা দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক পথ-পরিক্রমা শুরু করলেও, শেষ পর্যন্ত 'they have sobered themselves down in their literary habits. *They are now the zealous advocates of Bengali.*'[১৫৫] এই বক্তব্য কৃষ্টদাস পাল নামক এক ইয়ং বেঙ্গলেরই। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১জুন পঠিত ইয়ং বেঙ্গল সম্পর্কিত একটি ডিসকোর্সে

তিনি একথা বলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের *'আলালের ঘরের দুলাল'* (১৮৫৮) কথ্য ও সহজবোধ্য বাংলায় লেখা একটি সফল সৃজনধর্মী লেখা। শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রন্থটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন *'আলালের ঘরের দুলাল'* বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিল।[১৫৬] বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন এই রকম,

> "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক......দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উন্নত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য ও সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করেন এবং তিনিই প্রথমে ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক আলালের ঘরের দুলালে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।"[১৫৭]

প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন ঃ ডিরোজিও থেকে মাইকেল

পরিশেষে মাইকেলের প্রসঙ্গ টেনে আমরা শেষ করব, ইয়ং বেঙ্গলদের মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন প্রকল্পের বৃত্তান্ত। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের যে বৃক্ষ রোপণ করে গিয়েছিলেন, ইয়ং বেঙ্গলরা ছিলেন তার শাখা-প্রশাখা স্বরূপ, মাইকেলের মাতৃভাষা-চর্চায় লক্ষ করা যায় তারই বিস্ময়কর পুষ্পিত পরিণাম। পাশ্চাত্য ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ এবং ক্রমশ তার থেকে রসদ ও প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে মাতৃভাষাকে নবজীবন দান করা—এই রেনেসাঁসীয় ভাষা-প্রকল্পের একটি নিবিড় প্রদর্শনীক্ষেত্র ও প্রমাণ হচ্ছে মাইকেলের জীবন ও সাহিত্যচর্চা। মাইকেলের জীবন ও সাহিত্য-চর্চার দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে পাশ্চাত্য-প্রবাস, দ্বিতীয় পর্বে স্ব-ভাষায় প্রত্যাবর্তন। যাঁরা প্রথম পর্বটিকে মাইকেলের ভ্রান্তি ও দ্বিতীয় পর্বটিকে তার সংশোধন হিসাবে দেখেছেন, তাঁরা রেনেসাঁসের সত্যটিকেই বোঝেননি। প্রখর নিদাঘ যে কাঙ্ক্ষিত বর্ষারই পূর্ব-ঋতু—প্রকৃতির এই অন্তঃক্রিয় সত্যটিকে যেন অস্বীকার করা। বাংলা সাহিত্যে *'মেঘনাদবধ কাব্য'* যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে মাইকেলের *ইলিয়ড, ওডিসি,* দান্তে, ভার্জিল, মিল্টন পড়া মিথ্যা হতে পারে না। তাঁর রচিত *'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'* যদি স্বীকার করে থাকি, তবে তার লাতিন শেখা ও পেত্রার্কা পড়াকে অস্বীকার করবো কোন যুক্তিতে? *'কৃষ্ণকুমারী', 'বীরাঙ্গনা', 'তিলোত্তমাসম্ভব',* অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট এ সব তো আকাশ থেকে পড়েনি। তার পিছনে ছিল নিবিড় প্রস্তুতি, সাত সমুদ্রের সিন্দবাদ-কল্প নাবিকের বিপুল বহির্যাত্রা। কিভাবে মাইকেল প্রস্তুত করেছিলেন নিজেকে—তার নিবিড় চিত্র ধরা পড়েছে মাদ্রাজ থেকে লেখা এক চিঠিতে (১৮ আগষ্ট, ১৮৪৯)।[১৫৮]

সামগ্রিকভাবে রেনেসাঁসের আলোকে ইয়ং বেঙ্গলদের ঐতিহাসিক ভূমিকা যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তা হলে দেখা যাবে ডিরোজিও থেকে যে প্রকল্প শুরু হয়েছিল, মাইকেলে তা

পূর্ণপরিণতি পেয়েছে। বিচ্ছিন্ন করে দেখলে 'ডিরোজিও বাংলা জানতেন না'[১৫৯] বলে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, বা 'মাইকেল আদৌ ডিরোজিয়ান নন'[১৬০] বলে রায় দেওয়া হয়ত সহজ, কিন্তু ইতিহাসের যথার্থ প্রেক্ষিতে ইয়ং বেঙ্গলদের আন্দোলন ও তাদের অবদানকে যদি স্থাপন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে ডিরোজিও থেকে মাইকেল একটি অখণ্ড প্রক্রিয়ার নাম। প্রবাস-পর্বে যাঁর নাম ডিরোজিও, প্রত্যাবর্তন-পর্বে তিনিই মাইকেল। স্বাদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীনতার শত অপবাদ সত্ত্বেও, ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গসংস্কৃতির ও বাংলা ভাষার নবায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা পালন করেছিলেন একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। ডিরোজিও না এলে কোন পথ দিয়ে আসতেন মাইকেল? পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল কর্ষণ ছাড়া মাইকেল কি বদলে দিতে পারতেন মাতৃভাষার রঙ ও রূপ?

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. A. Tripathi, *Vidyasagar : The Traditional Moderniser,* 1974, pp. 86-87
২. A. Poddar, *Renaissance in Bengal : Quests and Confrontations (1800-1860),* 1970
৩. J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy,* London Edition, 1945
৪. P. F. Grendler, *Schooling in Renaissance Italy : Literacy and learning, 1300-1600,* Baltimore and London, 1989
৫. A. M. Von, *Sociology of the Renaissance,* (Tran) England, 1944
৬. P. F. Grendler, 'Schooling in Western Europe', *"Renaissance Quarterly,"* vol. XLII, No. 4, Winter 1990, p. 775
৭. P. F. Grendler, *Ibid*
৮. L. W. Spitz, *The Renaissance and Reformation Movement,* U. S. A., 1971, p. 139
৯. P. F. Grendler, Same as 6
১০. W. H. Woodward, *Vittorino Da Feltre and other Humanist Educators,* Cambridge, 1918
১১. J. B. Ross. 'Venetian Schools and Teachers Fourteenth to early Sixteenth Century : A Survey and a Study of Giovanni Battista Egnazio' *"R. Q.",* vol. XXIX, No. 4, Winter 1976, pp. 521-566
১২. P. F. Grendler, Same as 6
১৩. J. W. Saunders, *A Biographical Dictionary of Renaissance Poets*

and Dramatists 1520-1650, G.B.,1983, pp. 187-188

১৪. E. R. Chamberlin, *Everyday Life in Renaissance Times*, G. B., 1965

১৫. "The Primary Object of this institution be the tution of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages ; and in the literature and science of Europe." —হিন্দু কলেজ স্থাপনের এই উদ্দেশ্য ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ মে'র সভায় হিন্দু কলেজ কমিটি কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। Amitava Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823*, Calcutta, 1968, p. 28 ; J. C. Bagal, 'The Origins of the Hindu College' in S. C. Sengupta, S.C. Sarkar and T. N. Sen (ed) *"Presidency College, Calcutta, Centenary vol."* 1955, p. 303

১৬. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *অশান্তকাল : জিজ্ঞাসু যুবক*, ১৯৮৮, পৃ. ৫৫-৫৭

১৭. হিন্দু কলেজে ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে নিযুক্ত হন প্রথম শিক্ষক জেমস আইজ্যাক দ্য আনসেলম। ইনি চন্দননগরের ফরাসি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। স্কুল চালু হবার ঠিক আগে দু'জন মনিটর নিযুক্ত হন ; একজন ইহুদি জন জোহানিস, অন্যজন পর্তুগীজ ফ্রান্সিস দ্য সু'জ। প্রখ্যাত শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত। ডি. এল. রিচার্ডসন, ডা. রস, ডা. টাইটলার ছিলেন ইংরেজ।

১৮. A. M. Von, *Ibid*

১৯. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দু কলেজ : রক্ষণশীলদের দুর্গ-দখলের লড়াই', *"গণশক্তি"*, ১৪ মার্চ, ১৯৯৩

২০. J. K. Majumdar (ed), *Raja Rammohun Roy and Progressive Movement in India*, 1988, Rpt. Letter to Lord Amharst (Dec. 11. 1823), pp. 250-252.

২১. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, ১৯৮৭, পৃ. ২৬-৩৪

২২. Rev. A. Duff, *India and Indian Missions*, Edin., 1879

২৩. মেকলে বলেছিলেন যে তাঁর শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হল এমন একটি ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণী গড়ে তোলা—"Who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons Indian in colour and blood and English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."—H. Sharp, *Selections from Education Records, Part-1, 1781-1839*, Calcutta, 1920

২৪. S. Dresden, *Humanism in the Renaissance*, G. B., 1968

২৫. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম', *"সংস্কৃতি"*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৫-৯৬

২৬. "I delivered myself over to Chrysoloras with such passions that

what I had received from him by day in hours of waking occupied my mind at night in hours of sleep."–J. A. Symonds. *Renaissance in Italy*, vol. 2. Revival of Learning, Gloucester, 1967, p. 81

২৭. W. Durant, *The Story of Civilization*, vol. V. The Renaissance, N. Y., 1953, p. 250

২৮. W. Durant, *Ibid*, pp. 262, 269

২৯. I. Thompson, 'The Scholar as Hero in Innus Pannonius Panegyric on Guarinus Veronensis.' "*R. Q.*", vol. XLIV, No.2, Summer 1991

৩০. I. Thompson. *Ibid*, p. 211

৩১. বিনয় ঘোষ, *বিদ্রোহী ডিরোজিও ঃ নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর জীবনচরিত* ১৮০৯-১৮৩১, মার্চ ১৯৬১

৩২. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'দুই বেনেসাঁসের দুই শিক্ষক ঃ পিটাব অ্যাবেলার ও ডিরোজিও' "*যুবমানস*", ডিসেম্বব ১৯৯২

৩৩. J. B. Ross, 'Venetian Schools and Teachers Fourteenth to early Sixteenth Century : A Survey and a Study of Giovanni Battista Egnazio'. "*R.Q.*", vol. XXIX, No. 4. Winter 1976, pp. 521-566

৩৪ "He felt it his duty as such to teach not only words but things, to touch not only the head but the heart"–K. C. Mitra, 'The Hindoo College and its Founder', included in P. C. Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare*, Calcutta, 1877, Appendix B. VII-XXXVII

৩৫. J. B. Ross, *Ibid*

৩৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'প্রবেশ ও প্রস্থান ঃ দুই রেনেসাঁসের দুই শিক্ষক ইগনাজিও ও ডিরোজিও', "*যুবমানস*", মার্চ ১৯৯৩

৩৭. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁসের পোপ', প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ, দশম বার্ষিক অধিবেশন, বহির্ভারত বিভাগে পঠিত নিবন্ধ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪. ১২. ১৯৯৩ ; আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ (সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান-৯*, ১৯৯৪, পৃ. ৬৭১-৬৭৫

৩৮. W. Durant, *Ibid*, p. 161

৩৯. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *তদেব*, পৃ. ৫৬-৫৭, ৭২

৪০. বিনয় ঘোষ, *তদেব*, পৃ. ৭৮-৭৯ (অনুবাদ বিনয় ঘোষ কৃত) ; সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *তদেব*, পরিশিষ্ট-২, পৃ. ১৪২-১৪৬ (মূল চিঠি)

৪১. F. B. Bradley-Birt (ed), *Poems of Henry Louis Vivian Derozio : A Forgotten Anglo-Indian Poet* with a new foreword by R. K. Dasgupta, Oxford University Press, Cal, 1980, Poetry No. 20, p. 43, 'Sonnet to the Pupils of the Hindoo College'

৪২. 'হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে', পল্লব সেনগুপ্ত, *ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও,* ১৯৭৯ (১৯৮৫ সংস্করণ), পৃ. ১২৩
৪৩. পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ১২৪
৪৪. Bradley-Birt (ed), *Ibid,* p. 120
৪৫. 'Conclusion of My Address to My Students Before the Grand Vacation in 1829', পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ১০৪
৪৬. 'Conflict within the Bengal Renaissance', S. Sarkar, *On the Bengal Renaissance,* 1979, p. 72
৪৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* বিশ্ববাণী সং ১৯৮৩, পৃ. ৯৩
৪৮. G. Chattopadhyay, *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century, Selected Documents, vol. 1,* 1965. 'Report of the Controversy between Dakhinaranjan and Richardson at the meeting of SAGK', *"Bengal Hurkaru"*, Feb.13th, 1843
৪৯. A. Roy (ed), *Nineteenth Century Studies,* 1973, p. 463
৫০. পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ১২৪
৫১. T. Edwards, *Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher and Journalist,* (1884) Cal. 1980
৫২. A. Roy (ed), *Ibid,* p. 469
৫৩. বিনয় ঘোষ, *তদেব*
৫৪. A. Roy (ed), *Ibid*
৫৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, *তদেব,* পৃ. ১০১
৫৬. রাজনারায়ণ বসু, *সেকাল আর একাল,* ৩য় সং, ১৩৮৩, পৃ. ৩১
৫৭. G. Chattopadhyay, *Ibid,* p. XXI
৫৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, *তদেব,* পৃ. ২৮৬
৫৯. যোগেশচন্দ্র বাগল, *তদেব* পৃ. ১৯৫
৬০. "সমাচার দর্পণ", ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১
৬১. G. Chattopadhyay, *Ibid,* p. XXIV
৬২. শিবনাথ শাস্ত্রী, *তদেব,* পৃ. ৯৯-১০২
৬৩. G. Chattopadhyay, *Ibid*
৬৪. T. Edwards, *Ibid,* (Eurasian); E. W. Madge, *Henry Derozio : The 'Eurasian' Poet and Reformer,* 1905
৬৫. Bradley-Birt, (ed), *Ibid,* (Anglo-Indian)
৬৬. পবিত্রকুমার ঘোষ, *বাংলার রেনেসাঁস* : স্বপ্ন মায়া না মতিভ্রম, ১৯৮১, পৃ. ৭
৬৭. পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব*
৬৮. Derozio, *The Fakeer of Jungheera,* Canto-1/19

৬৯. Bradley-Birt, *Ibid,* pp. 98-100, 'Eclipse'
৭০. 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান,* বিশ্বভারতী, চৈত্র, ১৩৮৬, পৃ. ২৪৩
৭১. Deriozio, *The Fakeer of Jungheera,* 11/3, p. 178
৭২. Bradley-Birt, *Ibid,* pp. 98-100
৭৩. Deriozio, *The Enchantress of the Cave,* Stanza/1
৭৪. Bradley-Birt, *Ibid,* p. 146
৭৫. Bradley-Birt, p. 40
৭৬. Bradley-Birt, p. 179
৭৭. Bradley-Birt, p. 183
৭৮. Bradley-Birt, p. 93
৭৯. Bradley-Birt, p. 180
৮০. Bradley-Birt, p. 72
৮১. Bradley-Birt, p. 73
৮২. Bradley-Birt, p. 143
৮৩. Bradley-Birt, p. 72
৮৪. Bradley-Birt, p. 172
৮৫. Bradley-Birt, p. 40
৮৬. Bradley-Birt, p. 85
৮৭. Bradley-Birt, *Ibid,* R. K. Dasgupta-forward, p.E
৮৮. পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* 'অন্য দ্য অ্যাবলিশন অব সতী', পৃ. ১২৬-১২৮
৮৯. *'দ্য ফকিরা অব জঙ্গীরা'* কাব্যের মুখবন্ধ হিসাবে কবিতাটি লেখা। প্রকাশকাল ১৮২৮। Bradley-Birt, *Ibid,* p. 2
৯০. 'দ্য হার্প অব ইন্ডিয়া', ১৮২৭ সালের প্রকাশিত *'পোয়েমস'* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। Bradley-Birt, *Ibid,* p. 1
৯১. Bradley-Birt, *Ibid,* p. 2
৯২. G. L. Burns, 'What is Tradition ?' *"New Literary History",* vol. 22, No 1, Winter 1991, The University of Virginia, p. 6 ; M. Bishop (Tran), *Letters From Petrarch,* Bloomington, 1966, p. 183
৯৩. Bradley-Birt, *Ibid,* p. 1
৯৪. J. A. Symonds, *Renaissance in Italy,* vol. 1
৯৫. W. Durant, *Ibid,* p. 215
৯৬. 'ক্রীতদাসের মুক্তি', পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ১৩৪
৯৭. পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ৪৪
৯৮. D. Koeningberger, *Renaissance Man and Creative Thinking : A*

History of Concepts of Harmony, 1400-1700, Sussex, 1979

৯৯. Derozio, *The Fakeer of Jungheera*, Canto-First, XXXVII, pp. 171-172

১০০. ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), *মধুসূদন রচনাবলী*, ১৯৭৭, পত্রসংখ্যা-৭৩ (ইং)

১০১. Filelfo wrote, "Greece has not perished but has migrated to Italy which in former days was called greater Greece",—W. Durant, *Ibid*, p. 379

১০২. পল্লব সেনগুপ্ত *তদেব*, পৃ. ৪৩

১০৩. "It should be an Aegean isle
Where Heaven, and Earth and Ocean smile...
On such a spot I'd make my home."
—'The Poets Habitation', Bradley-Birt, *Ibid*, p. 82

১০৪. "Oh ! How I long to look upon thy face
Land of lover and the poet ! Thou"
—'Italy', Bradley-Birt, *Ibid*, p. 46

১০৫. Derozio 'Objection to the Philosophy of Emanuel Kant', T. B. Laurence (ed), *English Poetry in India*, vol. 1, 1869

১০৬. Derozio, 'On Moral Philosophy', পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব*, পৃ. ১১০-১১৭

১০৭. পল্লব সেনগুপ্ত , *তদেব*, পৃ. ৪৪

১০৮. "তাঁকে মুর ও বাইরনের দ্বারা প্রভাবিত বলা হয়।......'দ্যরোজিয়োর মধ্যে দুটি ধারার মিলন দেখা যায় ; একদিকে বার্নস, যিনি সর্ব মানুষের সমভ্রাতৃত্বের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, আর একদিকে টমাস ক্যাম্পবেল, যিনি উৎপীড়িত ও পর-পদানত জাতির বিদ্রোহের অধিকার স্বীকার করেছেন। দর্শনে তাঁর ওপর দুটি ধারারই কমবেশি চাপ ছিল। তিনি বেকন থেকে হেঁটে লক-হিউমে পৌঁছেছেন, হিউম থেকে মন্তেস্কু পর্যন্ত এসেছেন"—সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *তদেব*, পৃ. ১২৪-১৩৪

১০৯. 'Ode from the Persian of Hafiz' ; *"Indian Magazine"*, February ; সু. মৈত্র, *তদেব*, পৃ. ১২৩

১১০. আরব্য রজনীর ছায়া—*The Fakeer of Jungheera*, Notes on 11/4/6-10 ; ওমর খৈয়ামের ছায়া—'Here's a health to thee,' "Come hither boy ! fill up my cup"–"মূল রুবাইআৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এ সাকী হল বালক, স্পষ্টতই ডিরোজিও মূলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।" পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব*, পৃ. ৪৬

১১১. *Enchantress of the Cave*, Notes A to F, T. Edwards, *Ibid*, pp. 211-215

১১২. Bradley-Birt, *Ibid*, p. 174

১১৩. Derozio, *The Fakeer of Jungheera*, 1/19

১১৪. পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ২৮-৩৩

১১৫. 'Hindu Window',—*'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* কাব্যের ১ম সর্গের ১০ম স্তবকের ১৬শ-১৭শ চরণেব টীকা হিসাবে লেখা একটি বক্তব্যের অংশ এটি। পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ১১৮

১১৬. পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ১২৫

১১৭. *'The Fakeer of Jungheera'* কাব্য প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এইভাবে, 'In the press and speedily will be published The Fakeer of Jungheera and Other Peoms by H. L. V. Derozio' "Bengal Hurkaru", 16th August, 1827

১১৮. Bradley-Birt, *Ibid*, p. 148, *The Fakeer of Jungheera,* 1/XI

১১৯. Bradley-Birt, *Ibid,* p. 149, *The Fakeer of Jungheera*

১২০. "মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুই নেই, এদের বেদনাই আমায় মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে", শরৎচন্দ্র, উদ্ধৃত অজিতকুমার ঘোষ, *শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার,* মে ১৯৮৩, পৃ. ৪৪৩

১২১. Bradley-Birt, *Ibid*

১২২. *"Monalisa"*, Andre Chastel, *Leonardo Da Vinci,* N. Y., 1961

১২৩. Luigi Colletti. *All the Paintings of Giorgione,* G. B., 1961

১২৪. Bradley-Birt, *Ibid,* p. 34

১২৫. দুটির মধ্যে প্রথমটি লিখেছিলেন ১০ জানুয়ারি, ১৮২৫ দ্বিতীয়টি মার্চ, ১৮২৭ S. S. Mukhopadhyay & A. Kumar (ed), *Unpublished Poems of H.L.V. Derozio,* 2000

১২৬. 'আমার সমাধি' ('দ্য পোয়েটস গ্রেভ' নামক কবিতাটির অনুবাদ), পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ১৩৫-১৩৬

১২৭. Bradley-birt, *Ibid,* p. 185

১২৮. *"Pieta",* Euzo Carli, *All the Paintings of Michelangelo,* Milan, 1963

১২৯. 'Sonnet', Bradley-Birt, *Ibid,* p. 127

১৩০. 'The Neglected Minstrel', Bradley-Birt, *Ibid,* p. 92

১৩১. 'বনলতা সেন'—জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), *আধুনিক বাংলা কবিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ,* মার্চ ১৯৫৬ পৃ. ৭৪-৭৫

১৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধর্মমোহ', *পরিশেষ,* রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ১৯৮২, পৃ. ৯৭৮

১৩৩. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'কবি ডিরোজিও ও বাংলা সাহিত্যে তার উত্তরাধিকার', *"গণশক্তি"* , ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৩

১৩৪. W. Ullmann, *Mediaval Foundation of the Renaissance Humanism,* London, 1977, p. 107

১৩৫. G. L. Burns, *Ibid,* Same as 92

১৩৬. P. F. Grendler, *Ibid*

১৩৭. O. Prescott, *Princes of the Renaissance,* London, 1969, p. 36

১৩৮. A. Malho (ed), *Social and Economic Foundation of the Italian Renaissance,* U. S. A., 1969, p. 201

১৩৯. B. Castiglione, *The Courtier,* (Tran) C. S. Singleton, N. Y., 1959

১৪০. J. Burckhardt, *Ibid,* p. 147

১৪১. B. Willey, *Tendencies in Renaissance Literary Theory* (1921), Norwood Edition, 1979, p. 25

১৪২. B. Willey, *Ibid,* Chap-III

১৪৩. B. Willey, *Ibid*

১৪৪. J. Burckhardt, *Ibid,* p. 230

১৪৫. G. Chattopadhyay, *Ibid,* Appendix–1, pp. 1-9

১৪৬. R. S. Samuels, 'Venedetto Varchi, the *ACADEMIA DEGLI,* and the Origins of the Italian Academic Movement', *"R. Q",* vol. XXIX. No. 4, Winter 1976, p. 610

১৪৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, *বেথুন সোসাইটি,* ১৩৬৭

১৪৮. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ,* ১৯৭৩, পৃ. ১৩১

১৪৯. বিনয় ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৯৯

১৫০. উদ্ধৃত নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত), *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক,* ১৯৮৪, পৃ. ৪৩

১৫১. উদ্ধৃত শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, *প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমকালীন বাঙলা,* ১৯৮৫

১৫২. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৭৩, পৃ. ১৮০, পত্র সংখ্যা ১৩ (ইং)

১৫৩. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৫৯

১৫৪. B. Willey, *Ibid,* p. 23

১৫৫. A. Roy (ed), *Ibid,* p. 466

১৫৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, *তদেব,* পৃ. ১০৪

১৫৭. উদ্ধৃত শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৬৬-৬৭

১৫৮. ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), *মধুসূদন রচনাবলী, তদেব,* পত্র সংখ্যা-৪২ (ইং)

১৫৯. পবিত্রকুমার ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৭

১৬০. পল্লব সেনগুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ৭১

পঞ্চম অধ্যায়

যে হিউম্যানিস্ট ইতালীয় রেনেসাঁস চোখে দেখেনি : বিদ্যাসাগর

'রেনেসাঁস-হিউম্যানিজম' বলতে আজকের দিনে যে যুক্তি-সিদ্ধ মানবমুখী-দর্শন বা সহৃদয় মানবতাবাদের কথা বুঝি, ইতালীয় রেনেসাঁসে হিউম্যানিজম বলতে ঠিক সেই জিনিস বোঝাত না। হিউম্যানিজমের মৌল অর্থ ছিল ক্লাসিক্যাল বিদ্যার চর্চা। স্পিৎজ বলেছেন, 'হিউম্যানিজম হচ্ছে একটা শিক্ষাদর্শন, যা ধ্রুপদী বিদ্যার অনুরাগী।'[১] অন্য একজনের ভাষায়, 'এটা প্রাথমিকভাবে সাহিত্য ও ব্যাকরণ-বিদ্যাভিত্তিক একটা আন্দোলন, যার মূল নিহিত আছে ধ্রুপদী বিদ্যার প্রতি ভালোবাসা ও তার পুনরুদ্ধারের আগ্রহে।'[২] এর ফলে ইতালির জ্ঞান-চর্চার জগতে শুরু হয় এক নতুন যুগ। বদলে যায় তার সাংস্কৃতিক আবহ। মধ্যযুগীয় মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে এই আন্দোলন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।[৩] জে. এ. সাইমন্ডসের ভাষায় রেনেসাঁস হচ্ছে, 'রিভাইভাল অব লার্নিং'।[৪] গ্যারিন বলেছেন, 'হিউম্যানিস্টরা শুধু প্রাচীন ভাষাবেত্তা ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন নতুন ধরনের মানুষ' ('নিউ টাইপ অব ম্যান')।[৫] পেত্রার্কা, বোক্কাচিও, ফাইলেলফো, পোগ্গিও, সালুতাতি, ব্রুনি, আলবের্তি, গুয়ারিনো, ফিকিনো, পলিজিয়ানো, পম্পোনাৎসি, ভাল্লা, পিকো, এরাজমুস প্রমুখ হিউম্যানিস্টরা প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয়লগ্নে ইতালি ও ইওরোপের নতুন পরিবর্তিত সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি বৌদ্ধিক আবহ তাঁরাই রচনা করেছিলেন, একথাও সত্য। ক্লাসিক্যাল বিদ্যার রসদ দিয়ে এঁরা গতানুগতিক চিন্তার পৃথিবীকে আঘাত করেছিলেন এবং 'নিউ টাইপ অব ম্যান' হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ে এঁরা প্রবর্তন করেছিলেন নতুন চিন্তাধারার। পেত্রার্কা ও বোক্কাচিও হয়ে উঠেছিলেন নব্য-লাতিন বা ইতালীয় সাহিত্যের রূপকার ; ভিত্তোরিনো, ভার্গারিও রচনা করেছিলেন নতুন শিক্ষাদর্শন ; ফিকিনো, পম্পোনাৎসি প্লেটো ও এরিস্টটলকে নতুন ব্যাখ্যায় হাজির করেছিলেন ; সালুতাতি ও ব্রুনি ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলার হিসাবে সূচনা করেছিলেন নব্য প্রশাসন-পদ্ধতির, ভিল্লানি থেকে গুইচারদিনি ইতিহাস-চর্চায় নতুন ধারার প্রবর্তনা করেছিলেন ; গুয়ারিনো, ফাইলেলফো, নিকলো নিকলি জ্ঞানদানবিদ্যায় এনে দিয়েছিলেন নতুন জোশ্ ; ভাল্লা ও পিকো কায়েমি বিশ্বাস ও সংস্কারগুলির মূলে আঘাত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ; আলবের্তি বলেছিলেন, 'মানুষের অভিধানে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই' ; এরাজমুস রচনা করতে চেয়েছিলেন বিশ্বসংস্কৃতির ভিত্তি।

প্রাচীন বিদ্যায় সশস্ত্র হিউম্যানিস্টরা মধ্যযুগীয় মানসিকতার দুর্গপ্রাকার ভেঙে পৃথিবীর সামনে এনে দিতে চেয়েছিলেন, জীবনের এক নতুন যুগোপযোগী রূপ। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা প্রাচীন বিদ্যাকে বিনিয়োগ করেছিলেন নতুন যুগের অভ্যর্থনা-কর্মে।

রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের মৌল তাৎপর্যটি ধরতে না পারলে কি হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডেভিড কফের বঙ্গীয় রেনেসাঁস সংক্রান্ত গ্রন্থ *'ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড দি বেঙ্গল রেনেসাঁস'*।[৬] তিনি ধরে নিয়েছেন, প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার প্রয়াসই রেনেসাঁস। সেই কারণে তাঁর রেনেসাঁস-প্রকল্প উইলিয়াম জোন্স থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে রাধাকান্ত

দেবের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন 'ধর্মসভা'য় এসে। প্রাচীন বিদ্যার লোষ্ট্র-কাষ্ঠ সংগ্রহ করলেই হবে না, তা দিয়ে যদি নতুন যুগের হর্ম্য বানানোর প্রকল্প বা পরিকল্পনা না থাকে, তবে তাকে আর যাই বলা হোক, রেনেসাঁস বলা অর্থহীন।

ধ্রুপদী বিদ্যার অধিকার ঃ সংস্কৃত অধ্যয়ন

দেখা যায়, বিদ্যাসাগর মৌল অর্থেই 'রেনেসাঁস-হিউম্যানিস্ট'। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১২ জুন থেকে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বারো বছর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সূত্রে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় এ-সমস্ত বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।[৭] ১৮২৯ সালের জুন থেকে প্রথম তিন বছর, তিনি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কাছে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পাঠ নেন। এ সময় তাঁর পাঠ্যতালিকায় ছিল *'মুগ্ধবোধ', 'অমরকোষ', 'ভট্টিকাব্য'* প্রভৃতি। তারপর ১৮৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রখ্যাত পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে পড়েন সাহিত্য-শাস্ত্র। তাঁকে পড়তে হয় *'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'কিরাত-অর্জুনীয়', 'শিশুপালবধ', 'নৈষধচরিত', 'শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্বশী', 'রত্নাবলী', 'মুদ্রারাক্ষস', 'উত্তররামচরিত', 'দশকুমারচরিত', 'কাদম্বরী'* প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, সাহিত্য-শ্রেণীর কৃতী ছাত্র হিসাবে ১৮৩৫ সালে তিনি অর্জন করেন তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি।[৮] বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মনে হয়, সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়ার সময়ই তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও পড়া শেষ করেছিলেন।[৯] জ্যোতিষ বা অঙ্ক-বিদ্যা বলতে তখন পাঠ্য ছিল লীলাবতী ও বীজগণিত। সাহিত্য-শাস্ত্রের পাঠ শেষ করে প্রবেশ করেন অলঙ্কারশ্রেণীতে। সেখানে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের কাছে এক বছর ধরে পড়েন *'সাহিত্য-দর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ', 'রসগঙ্গাধর'*। তারপর ১৮৩৬ সালের মে মাস থেকে ১৮৩৮ সালের প্রথম-ভাগ পর্যন্ত দু'বছর ঈশ্বরচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির কাছে বেদান্ত-শ্রেণীতে পড়েন। ১৮৩৮ সালে তিনি প্রবেশ করেন স্মৃতি-শ্রেণীতে। সেখানে হরনাথ তর্কভূষণ ও হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পড়েন *'মনুসংহিতা', 'মিতাক্ষরা', 'দায়ভাগ', 'দত্তকমীমাংসা', 'দত্তকচন্দ্রিকা', 'দায়তত্ত্ব', 'দায়ক্রম-সংগ্রহ', 'ব্যবহারতত্ত্ব'*। ১৮৩৯ সালে তিনি প্রবেশ করেন ন্যায়-শ্রেণীতে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্করত্নের কাছে *'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী', 'ভাষাপরিচ্ছেদ', 'ন্যায়সূত্র', 'কুসুমাঞ্জলি'* প্রভৃতি অধিগত করেন। ১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর হাতে দুটি সার্টিফিকেট। একটি সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট, আর একটি সংস্কৃত কলেজের গুণমুগ্ধ অধ্যাপকদের দেওয়া দেবনাগরী বয়ানে স্বেচ্ছা-প্রশংসাপত্র। এতে স্বাক্ষর করেছেন ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রের সাত জন অধ্যাপক। লেখা হয়েছে, 'অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে......।' সুতরাং সংস্কৃত-বিদ্যায় বিদ্যাসাগরের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল প্রশ্নাতীত। বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে বিদ্যাসাগরকে 'ক্লাসিক্যাল হিউম্যানিস্ট' বলে উল্লেখ করেছেন।[১০] রেনেসাঁসের লাতিনবিদ হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে সংস্কৃতবিদ্যায় বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য অনায়াসেই তুলনীয়।

প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার ঃ সটীক সম্পাদনা

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা ছিলেন গ্রন্থকীট ও পুঁথিপাগল মানুষ। প্রাচীন পুঁথির পুনরুদ্ধারে, সটীক সম্পাদনায়, অনুবাদে তাঁরা প্রাণপণ করে নিজেদের বিনিয়োগ করেছিলেন। গুয়ারিনো সম্পর্কে গল্প আছে, তিনি কনস্টানটিনোপল থেকে বহু গ্রীক পুঁথি নিয়ে ফিরছিলেন। পথে কিছু পুঁথি হারিয়ে গেলে দুশ্চিন্তায় ও মনোকষ্টে একরাত্রে নাকি তাঁর মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল।[১১] পোগ্গিও মঠে-মঠে ঘুরে বেড়াতেন অন্ধকার আবর্জনা থেকে মূল্যবান পুঁথি উদ্ধার করার জন্য। সেজন্য তাকে 'ডকুমেন্টথিব' বলা হতো।[১২] বোক্কাচিও মঠের সন্ন্যাসীদের দ্বারা অবহেলিত প্রাচীন পুঁথিগুলিকে জীর্ণ দশা থেকে সানন্দে উদ্ধার করতেন। পুঁথির বিনষ্ট পাতাগুলির জন্য তার চোখ জলে ভরে যেত।[১৩] সাইমন্ডস বলেছেন—

> "Days and nights they spent in carefully transcribbing............till the treasure trove become the common property of all."[১৪]

উদ্ধারীকৃত পুঁথিগুলিকে সটীক সম্পাদনা ও অনুবাদের মাধ্যমে সাধারণের গোচরে এনে দেবার মহৎ কাজটি তাঁরা করেছিলেন। সাইমন্ডস 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এর যুগকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। দ্বিতীয় যুগটিকে তিনি অভিহিত করেছেন 'এজ অব অ্যারেঞ্জমেন্টস্ অ্যান্ড ট্রানশ্লেশনস্' নামে।[১৫]

প্রাচীন পুঁথির উদ্ধারের কাজটি গুয়ারিনো, ব্রুনি, পোগ্গিও, ভাল্লা, পিজ্জিকোলি বা বোক্কাচিও যেভাবে করেছিলেন, বিদ্যাসাগর ঠিক সেরকম কিছু করেননি বটে ; তবে পুঁথির শুদ্ধতাবিচার, পুঁথির মধ্যে ডুবে থাকা, সেগুলির সযত্ন সম্পাদনা, অনুবাদ ও মুদ্রণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা যথার্থই রেনেসাঁস-হিউম্যানিস্ট সুলভ। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে কি ধরনের ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, তা আগে বলা হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতাকালে তিনি কি-ধরনের পুঁথি বা গ্রন্থকীটে পরিণত হয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখায় লিখেছেন—

> "সে-সময় তাঁহার পরিশ্রম যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়েতে বাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রে যখন যাও, দেখিবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তকরাশির মধ্যে নিমগ্ন ; ....মনোযোগ সহকারে কেবল বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন ও গভীর রূপে শাস্ত্রের বিচারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একবার একমুষ্টি অন্ন মুখে দিবার জন্য বাহিরে যাইতেন, তদ্ভিন্ন সমুদয় সময় শাস্ত্র পাঠে যাপন করিতেন। এখন অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাশীকৃত হাতে লেখা পুঁথি পড়িয়া তাঁহাকে এক একটি বচন সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।"[১৬]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "শুনিয়াছি, এই সময়ে তিনি দ্বিপ্রহরের সময়ে কেবল একবার বন্ধুবর রাজকৃষ্ণবাবুর গৃহে আহার করিতে যাইতেন। কলেজের কার্য্য শেষ করিয়া অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে পুস্তকরাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন এবং গ্রন্থকীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে-পত্রে বিচরণ করিতেন। ....শাস্ত্রালোচনায় এইরূপ

নিয়ত নিযুক্ত থাকার সময়ে একদিন রাত্রিশেষে একটা বিষয়ে শাস্ত্রার্থের সঙ্গতি নির্ণয় করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় যাইতেছিলেন, পথে সহসা প্রজ্ঞাদেবীর কৃপা হইল, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন ঐ শ্লোকের অর্থ কিরূপ হইবে। তৎক্ষণাৎ তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় সেই পরিশ্রান্ত শরীরে ও ক্লিষ্ট মনে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল। তিনি গৃহে না গিয়া সংস্কৃত কলেজে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত শ্লোকের অর্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে শাস্ত্রচর্চা করিতে করিতে রজনী শেষ হইল।"[১৭]

ভ্রমপূর্ণ, স্খলিত, বিকৃত ও বিভিন্ন পাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সংস্কৃত পুঁথিগুলি মিলিয়ে, বিচার-বিবেচনা করে বিদ্যাসাগর অন্ততঃ দশখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য সম্পাদিত সংস্করণ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। *'সর্বদর্শন সংগ্রহ'* (১৮৫৩-৫৮), *'রঘুবংশম্'* (১৮৫৩), *কিরাতার্জুনীয়ম্* (১৮৫৩), *শিশুপাল বধম্* (১৮৫৭), *বাল্মীকি রামায়ণ* (টীকাসহ) (১৮৬১, *কুমারসম্ভবম্* (১৮৬১), *কাদম্বরী* (১৮৬২), *মেঘদূতম্* (১৮৬৯), *উত্তরচরিতম্* (১৮৭০), *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* (১৮৭১), *হর্ষচরিতম্* (১৮৮৩)। এই সব গ্রন্থ সম্পাদনার কাজ কি ভাবে তিনি করতেন, তা বোঝা যায় গ্রন্থগুলির বিজ্ঞাপন অংশ পাঠ করলে। *'হর্ষচরিত'* গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশ কিছুটা উদ্ধার করছি। বিদ্যাসাগর লিখেছেন,

> "বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব, অপূর্ব এক গদ্যকাব্য হস্তগত হওয়াতে আমি কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম। ....কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলাম একমাত্র পুস্তক অবলম্বন করিয়া হর্ষচরিত মুদ্রিত করিলে, সম্যক শুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলকথা এই, এত স্থল অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন প্রতীয়মান হইতে লাগিল যে, পুস্তকান্তরের সাহায্য না পাইলে, হর্ষচরিত মুদ্রিত করা পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না।"

শেষ পর্যন্ত অশেষ চেষ্টায় উত্তর ভারত থেকে দু'খানি পুঁথি তিনি সংগ্রহ করেন। "এইরূপে তিনখানি পুস্তক হস্তগত হইলে আমি সাহস করিয়া হর্ষচরিতের মুদ্রাঙ্কন কার্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হই।"[১৮] হর্ষচরিতের পুঁথি হাতে পেয়ে বিদ্যাসাগরের নিরতিশয় আনন্দ ইতালির পুঁথি-পাগল হিউম্যানিস্টদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নষ্টপ্রায় পুঁথির অন্ধকার থেকে ওভিদ ও টাসিটাসের কিছু পুঁথি উদ্ধার করতে পেরে বোক্কাচিও একই রকম উত্তেজনা ও উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন।

'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থটির সম্পাদনার ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছেন, *'সংস্কৃত কলেজ'* ও *'এশিয়াটিক সোসাইটি'* দু'জায়গায় দু'টি মাত্র পুঁথি ছিল। পাঠান্তরের বৈপরীত্য দেখে তিনি বেনারস থেকে আরো তিনখানি পুঁথি সংগ্রহ করে আনান। তারপর খুব সতর্কতার সঙ্গে তিনি গ্রন্থটি সম্পাদনা ও মুদ্রিত করেন।[১৯] শুদ্ধ পাঠের প্রতি বিদ্যাসাগরের এই নিষ্ঠায় রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমের চারিত্র্য বর্তমান। তাঁর বিচারশক্তিও ছিল অসামান্য। সম্পাদিত *'মেঘদূত'*-এর বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

> "মেঘদূত পাঠ করিয়া আমার যেরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তদনুসারে ১১০টি শ্লোক কালিদাস প্রণীত, অবশিষ্ট ১৭টি তদীয় লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে।"[২০]

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বিদ্যাসাগরের "মেঘদূত সংস্করণ বেরোনোর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর কাশ্মীরে একখানা পুঁথি পাওয়া গেল। *'মেঘদূত'*-এর প্রবীণতম টীকাকার বল্লভদেবের টীকাখানা আছে সেই পুঁথিতে। দেখা গেল বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় মেঘদূতের যে ক'টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, বল্লভদেবের টীকায় সে সব শ্লোকের নাম গন্ধ নেই। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের বিচার নির্ভুল।"[২১]

মুদ্রণযন্ত্রের হাতিয়ার

রেনেসাঁসের যুগে বিদ্যা ও জ্ঞানের আধেয় যেমন বদলে যায়, তেমনি বদলে যায় তার আধারও। পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি থেকে তা সরে যায় মুদ্রিত গ্রন্থের আধারে। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হলে রেনেসাঁসের ইতালিতে তা দাবানলের মত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে। অলডাস ম্যানুটিয়াস নামে এক ব্যক্তির নাম মুদ্রণ-যন্ত্র ও রেনেসাঁসের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। হিউম্যানিস্টদের সযত্ন সম্পাদিত প্রাচীন গ্রীক পুঁথি ও তার লাতিন অনুবাদ তাঁর মুদ্রণালয় থেকে ছাপা হতে থাকে।[২২] 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটাটিজ্' নামে খ্যাত এরাজমুস লিখেছেন,

> "Together we attacked the work, I writing while Aldo gave my copy to press."[২৩]

উদ্ধারীকৃত ও সযত্ন সম্পাদিত প্রাচীন বিদ্যাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া ও সর্বজন-প্রাপ্য করার ব্যাপারে মুদ্রণযন্ত্র হিউম্যানিস্টদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় রেনেসাঁসে অগ্রণী পুরুষের ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজে স্থাপন করেছিলেন 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রণালয়। নিজে প্রেসের কাজ বুঝতেন ও পরিচালনা করতেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, টাইপ কেসে কোথায় কোন কোন বাঙলা অক্ষর থাকলে সুবিধা হয়, ছাপার কাজ সহজ হয়, তার জন্য একটি নিয়মও তিনি বের করেছিলেন যা 'বিদ্যাসাগর সার্ট' বলে পরিচিত।[২৪] বিদ্যাসাগর নিজের স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রে নিজের অশেষ যত্নে সংগৃহীত, সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছিলেন। এদিক থেকে বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অলডো ও এরাজমুস।

ভাষা-চর্চার দ্বিমুখী সোপান

ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও সাহিত্যিকদের ভাষা-চর্চা ছিল দ্বিস্তরিক। তাঁরা প্রথমত ঝুঁকে পড়েছিলেন গ্রীক ও লাতিন ভাষার দিকে। উদ্ধারীকৃত পুঁথির সম্পাদনা ও অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তাঁদের লাতিন-চর্চা তুঙ্গে ওঠে। রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক হিসাবে আখ্যাত পেত্রার্কা ইতালির মুখ লাতিন চর্চার দিকে ফিরিয়ে দেন। তাঁকে বলা হয় নব্য-লাতিন সাহিত্যের সূচনাকারী। হিউম্যানিস্টদের গ্রীক ও লাতিন-চর্চা প্রস্তুত করে আধুনিক ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যের পথ। ক্রমশ ইতালির লেখক ও সাহিত্যিকরা ফিরে আসেন মাতৃভাষা ইতালিতে। লাতিন-চর্চার রসদ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে ইতালীয় সাহিত্যকেই। ভাল্লা যেমন লাতিন ভাষার সমর্থনে রচনা করেন একটি জোরালো প্রস্তাব *'এলিগেনসিজ্ অব দ্য লাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ'* (১৪৪৪), তেমনি পাশাপাশি আলবের্তি *'দেল্লা ট্রাঙ্কুইলিত্তা দেল্লা নিমো'* (১৪৪৫-১৪৫০)

নামক রচনায় প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে লেখেন,

> "সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন ভাষায় (অর্থাৎ মাতৃভাষায়) যদি আমি লিখি, কার এমন ক্ষমতা আছে যে আমাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।"

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইতালীয় ভাষার দিকে হিউম্যানিস্ট ও সাহিত্যিকরা ক্রমশ সরে আসতে থাকেন। ভাষাদর্শ নিয়ে রেনেসাঁসের ইতালিতে তীব্র একটি অন্তর্নাটক অভিনীত হয়েছিল। তার প্রমাণ আছে বেম্বো রচিত *'প্রোজ দেল্লা লিঙ্গুয়া ভোলগার'* (১৫২৫) নামক রচনায়। পৃথক-পৃথক ভাষাদর্শ নিয়ে সেখানে তিনটি চরিত্র গুইলানো দ্য মেদিচি, ফেদেরিকো ফ্রেগোসো ও এরকোল স্ট্রোজি তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেখানে বক্তব্য সমাপ্ত হয়েছে মাতৃভাষার অনুকূলে।[২৫] একদিকে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ভাষার চর্চা, অন্যদিকে লোকচলতি মাতৃভাষার চর্চা—এই দুই বিপরীত ধারার মধ্যে একটা অনিবার্য অন্তঃসংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচীন ভাষার উৎস থেকে সম্পদ ও সৌন্দর্য আহরণ করে ইতালীয়রা তাঁদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করে তুলেছিলেন।[২৬] রেনেসাঁসের ভাষা-চর্চার এটাই সার সত্য। বিদ্যাসাগর নিজে সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে বৃত হয়েছিলেন। সংস্কৃত পুঁথির জগতে গ্রন্থকীটের মত বিচরণ করতেন ; সংস্কৃত গ্রন্থাদি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। সংস্কৃত চর্চায় স্বাভাবিক ভাবেই আস্থাশীল। ভাল্লা যেমন লাতিন ভাষা চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রস্তাব রচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগরও তা করেছিলেন। তাঁর *'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'* একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এই প্রস্তাবের উপসংহার অংশে রয়েছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—

> "সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহার প্রচলিত আছে, সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্বন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি করা যাইবেক না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।"[২৭]

মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার স্বার্থেই সংস্কৃত ভাষা-চর্চার আবশ্যকতা। ইতালীয় রেনেসাঁসের ভাষা-চর্চার সারসত্যটি বিদ্যাসাগর তাঁর এই প্রস্তাবে ব্যক্ত করেছেন। অনুধাবন করলে দেখা যায়, সংস্কৃত থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে সংস্কৃত বিদ্যাসাগর দু'দিক থেকেই সিঁড়ি ফেলেছিলেন। দুরূহ *'মুগ্ধবোধ'* দিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাত্রদের পাঠ শুরু করতে হত। তিনি ছাত্রদের সেই অসুবিধার কথা ভেবে সংস্কৃত ব্যাকরণের দুর্গম সমুদ্র হাতড়ে মূল ও প্রয়োজনীয় সূত্র ও উদাহরণগুলিকে সিঁড়ির মত সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁর বাংলায় লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণের গ্রন্থগুলিতে—*'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'য়* (১৮৫১) ও *'ব্যাকরণ কৌমুদী'* ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগে (১৮৫৩-৬২)। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে এগুলি লেখা। কী বৈপ্লবিক কাণ্ডটাই না তিনি এর দ্বারা করলেন। সংস্কৃত ছাত্ররা ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠ নেবে বাংলায় লেখা ব্যাকরণে। সংস্কৃত শিক্ষার হাজার-

হাজার বছরের ইতিহাসে এ জিনিস বোধ হয় প্রথম ঘটল। এখানে তিনি সিঁড়িটা ফেলেছেন মাতৃভাষা থেকে সংস্কৃতের দিকে।

'এজ অব ট্রানগ্রেশন'

আবার *'ঋজুপাঠ'* ১ম, ২য়, ৩য়-ভাগ (১৮৫১-১৮৫২), *'শকুন্তলা'* (১৮৫৪), *'সীতার বনবাস'* (১৮৬০), *'আখ্যানমঞ্জরী'* ১ম, ২য়, ৩য়-ভাগ (১৮৬৩-১৮৬৮), *'মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ'* (১৮৬০) প্রভৃতি অনুবাদ-মূলক গ্রন্থগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি সিঁড়ি ফেলেছেন সংস্কৃত থেকে বাংলার দিকে। সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনী, চরিত্র ও রস বাংলা ভাষায় এনে দেওয়া। অনুবাদ রেনেসাঁসের বৌদ্ধিক আবহকে যে-ভাবে বদলে দিয়েছিল তাতে বলা যায়, অনুবাদকর্ম রেনেসাঁসের আবশ্যক উপাদান-বিশেষ। বিদ্যাসাগরের অনুবাদকর্মগুলিকে দেখতে হবে সেই দিক থেকেই। মূল রচনা ও তাঁর অনুবাদগুলি যাঁরা মিলিয়ে দেখেছেন এবং অনুবাদ-গ্রন্থগুলির বিজ্ঞাপন-অংশে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য সম্পর্কে যাঁরা অবহিত, তাঁরা জানেন, তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবে মূলগ্রন্থের রুচিহীন, অবান্তর, পল্লবিত অংশগুলিকে বাদ দিয়ে নির্বাচিত ও প্রয়োজনীয় অংশগুলির স্বাধীন অথচ সংগতিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস সাহিত্যরূপ বাংলাতে এনে দিয়েছেন। পেত্রার্কা বলেছিলেন, হিউম্যানিস্টরা শুধু 'রিপ্রোডিউস' করেন না, তাঁরা 'রিক্রিয়েট' করেন। বিদ্যাসাগরেব মধ্যে যে নীতি, সৌন্দর্য ও রসসচেতন একটি সৃজনশীল মানুষ বাস করত, অনুবাদকর্মগুলিতে তার হাত আছে। রুচি-শুদ্ধ, সৌন্দর্য-সচেতন, সৃজনশীল সেই মানুষটি না থাকলে, এমনকি ইতালীয় রেনেসাঁসেও মিথ্যে হত সকল আয়োজন। হিউম্যানিস্টদের প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন-চর্চা শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পর্যবসিত হয়ে যেত। অস্থিবিদ্যার নিবিড় চর্চায় নিরত থাকলেই কেউ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি হন না। ইতালির মতো রেনেসাঁস-সুলভ সৃজনশীলতার অপ্রতিরোধ্য শক্তি বিদ্যাসাগরের অনুবাদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল ছিল।

অনুবাদ থেকে শিল্পে

অনুবাদ করতে-করতেই বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের 'প্রথম যথার্থ শিল্পী'।[২৮] ওজোময়, উদাত্ত, বাকস্পন্দিত, নিরুপম, অভিজাত অথচ অন্তরঙ্গ এক গদ্যের পৃথিবী তিনি নির্মাণ করে গেলেন। তৎসমে অলঙ্কৃত ও তদ্ভবে আন্তরিক—ভাষার এই যুগলবন্দী ইতালীয় রেনেসাঁসেও অপ্রস্তাবিত ছিল। আরেতিনো প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সক্ষম লেখকদের এড়িয়ে চলতে হবে পেত্রার্কা, বোক্কাচিওর ভাবাদর্শ। ভাষার এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা ইতালীয় রেনেসাঁসকে কোনো উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক সাফল্যে পৌঁছে দেয়নি। সাহিত্য নয়, চিত্রকলাই তার শ্রেষ্ঠ শিল্প। কিন্তু অনুবাদকর্মের মধ্যে দিয়ে হলেও বিদ্যাসাগর সূচনাতেই এমন সৃজনসম্ভব ভারসম শৈল্পিক গদ্যের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিলেন, যা প্রস্তুত করেছিল রবীন্দ্রনাথের পথ। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এই ভাষায়—

> "বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি তার দ্বার উদঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"[২৯]

শাস্ত্র থেকে শস্ত্র

রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা, বিদ্যাসাগরের মতে 'বিধবা-বিবাহ'। ক্লাসিক্যাল বিদ্যার চর্চাকে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও চিন্তার পৃথিবীকে আঘাত করার প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছিলেন লরেঞ্জো ভাল্লা। *'ডিক্লামেশন কনসার্নিং দ্য ফলস্ ডোনেশন অব কনস্টানটাইন'* নামক পুস্তিকায় তিনি প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানকে শস্ত্রের মত ব্যবহার করে পোপের পার্থিব রাজত্বের ভিত্তিটি খসিয়ে দিয়ে এক বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন।[৩০] প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরও লড়াই করেছিলেন মূলত প্রাচীন সংস্কৃত-বিদ্যার রসদ নিয়ে। বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহনিরোধ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার প্রভৃতি আন্দোলনের সপক্ষে তিনি সাক্ষ্য, প্রমাণ, উদ্ধৃতি-সম্বলিত যে প্রস্তাবাদি রচনা করেছিলেন, তা তাঁর সংস্কৃত-বিদ্যার ভাণ্ডার থেকে নেওয়া। *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* ১ম, ২য় (১৮৫৫) তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমাজ বিধবা-বিবাহের সমর্থনে ও বিপক্ষে স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বিধবা-বিবাহের সমর্থন সূচক শ্লোকটি বিদ্যাসাগর উদ্ধার করেছিলেন *'পরাশর-সংহিতা'* থেকে। এ শ্লোক হয়তো সেকালে বা তার আগে কারো কারো জানাও থাকতে পারে। বিদ্যাসাগরের প্রধান কৃতিত্ব, শাস্ত্র থেকে উদ্ধারের সঙ্গে-সঙ্গে সেটিকে শস্ত্রের মতো ব্যবহার করা এবং আধুনিক যুগের আইনগত অনুশাসনের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন করে দেওয়া। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে সূত্রসন্ধান ও আধুনিক সমাজের প্রয়োজনে তার যথার্থ প্রয়োগঃ এটা 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এর লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর-বিচারে বুদ্ধিজীবীদের একটা অদ্ভুত মানস-সংকট আছে। 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' সম্পর্কে ভিত্তিগত ধারণা না থাকার জন্য এই মানস-সংকটের উদ্ভব। শাস্ত্রনির্ভরতার জন্য একদল আলোচক বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের বক্তব্য, বিদ্যাসাগর ইয়ং বেঙ্গলদের মত জাতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী নন। তিনি আধুনিক হয়েও ঐতিহ্যানুগত (দ্রষ্টব্য ঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, *'বিদ্যাসাগর ঃ দ্য ট্রাডিশনাল মডার্নাইজার'*; নিমাইসাধন বসু, *'ইন্ডিয়ান এওয়েকেনিং অ্যান্ড বেঙ্গল'*; প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য'*)। অপরদিকে আরেকদল আলোচকের মতে, শাস্ত্রের হাত ধরা পিছিয়ে থাকা মনের লক্ষণ। সুতরাং বিদ্যাসাগর ইয়ং বেঙ্গলদের মত ঠিক অতটা র‍্যাডিক্যাল বা আধুনিক নন। ('দ্রষ্টব্য ঃ অরবিন্দ পোদ্দার, *'রেনেসাঁস ইন বেঙ্গল ঃ কোয়েস্টস্ অ্যান্ড কনফ্রনটেশনস্'*; বদরুদ্দীন উমর, *'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ'* অশোক সেন, *'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড হিজ এলুসিভ মাইলস্টোন'*) শাস্ত্রকে 'রিজন'-এর গৌরবে অধিষ্ঠিত করা আধুনিকতার বিচারে পেছিয়ে থাকা মনের লক্ষণ। কিন্তু 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এর মৌল লক্ষণটি খেয়াল রাখলে বিদ্যাসাগরকে ঐতিহ্যানুগত হিসাবে দেখানো, বা যথার্থ আধুনিক নন বলে কুণ্ঠা প্রকাশ করা অর্থহীন। প্রাচীন বিদ্যার রসদকে আধুনিকতার স্বার্থে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এরই লক্ষণ।[৩১] ইতালীয় রেনেসাঁসে এ জিনিস দেখা যায়।

শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষা-প্রসার

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা অনেকেই শিক্ষক। জে. এ. সাইমন্ডস আলোচনা করে দেখিয়েছেন, রেনেসাঁসের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যায় সুপণ্ডিত হিউম্যানিস্টরা অধ্যাপনার পদে বৃত হতে থাকেন।[৩২] তাঁরা রাজন্যক, ধনিক, বিত্তবান শ্রেণীর পুত্রদের গৃহ-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হতে থাকেন। শিক্ষানীতি সম্পর্কে রচিত হতে থাকে নানা প্রস্তাব। চার্চের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ধনিক, বণিক ও নাগরিকদের উদ্যোগে স্থাপিত হতে থাকে বহু বিদ্যালয়। হিউম্যানিস্টরাই চালাতেন এসব বিদ্যালয়।[৩৩] শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে বিদ্যাসাগরের কীর্তি হিউম্যানিস্টসুলভ। বাঁধা পাঠক্রম, ও বিধিবদ্ধ রীতিনীতির মধ্যে তিনি সংশোধন, সংযোজনের মাধ্যমে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন যুগোপযোগী শিক্ষা-দর্শন।[৩৪] সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ থাকাকালে ব্যালেন্টাইনের সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বিতর্ক ও পাঠক্রম সম্পর্কে তাঁর একাধিক সুচিন্তিত ও সুদীর্ঘ সংস্কার-প্রস্তাব অনুধাবন করলে আমরা রেনেসাঁসসুলভ শিক্ষাবিদের চারিত্র্যই দেখতে পাই। ব্রাহ্মণেতর ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার তাঁরই উদ্যোগে উন্মোচিত হয়েছিল। সিলেবাসের ক্ষেত্রে যে-যে জায়গায় ছাত্রদের প্রতি নির্দয়তার অবকাশ ছিল, সেগুলিকে যতদূর সম্ভব সহজ করে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য তিনি প্রস্তাব দেন, সুকঠিন *'মুগ্ধবোধ'* দিয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু করার পরিবর্তে বাংলায় লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ দিয়ে তারা পাঠ শুরু করুক। সংস্কৃত শিক্ষার হাজার-হাজার বছরের ইতিহাসে এমন অভিনব প্রস্তাব শোনা যায়নি। শুধু প্রস্তাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদের জন্য *'ব্যাকরণ কৌমুদী'* নামক গ্রন্থও রচনা করেন। দর্শন-বিভাগের পাঠ্যসূচি সংস্কার করার প্রস্তাবে তিনি ভারতীয় বেদান্ত-দর্শন সম্পর্কে বৈপ্লবিক মতামত ব্যক্ত করেন। ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনকে তিনি বলেছিলেন ভ্রান্ত, আধুনিক যুগের পক্ষে তা অচল। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক বার্কলে সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেন। ভারতীয় দর্শনের সমান্তরালে তিনি আধুনিক যুগোপযোগী পাশ্চাত্য-দর্শনকেও পাঠ্য করার প্রস্তাব দেন।

> "........youngmen thus educated will better to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of Philosophy simply from European sources."[৩৫]

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি চেয়েছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপর মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী একদল চরিত্রবান ও সামাজিক নাগরিক সেখান থেকে বের হয়ে আসবে।[৩৬] ইতালীয় রেনেসাঁসের পাঠক্রম স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল—লাতিন পাঠক্রম ও দেশীয় পাঠক্রম (ভার্নাকুলার কারিকুলাম)। এই দু'য়ের মধ্যে কোন সেতু হিউম্যানিস্টরা বেঁধে দেবার কথা চিন্তা করেননি। তাঁরা ছিলেন মুখ্যত লাতিন পাঠক্রমেরই প্রবক্তা। কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু সংস্কৃত শিক্ষার প্রবক্তা ছিলেন না।

পাঠ্যপুস্তক রচনা

শিক্ষাপ্রসারের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অবদান ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের অবদানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। প্রথমত পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে। বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ

গ্রন্থই ছাত্রপাঠ্য। ছাত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে লেখা। *'বর্ণপরিচয়'* থেকে *'ব্যাকরণ-কৌমুদী'*; *'বেতালপঞ্চবিংশতি'* থেকে *'সীতার বনবাস'*; *'জীবনচরিত'* থেকে *'আখ্যান-মঞ্জরী'*। নবযুগের ছাত্রদের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে একের পর এক পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করে গিয়েছিলেন। ইতালীয় রেনেসাঁসের কোন শিক্ষককে এককভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়নি। শুধু *'বর্ণপরিচয়'* (১ম ভাগ, ২য় ভাগ)-এর কথাই যদি ধরা যায়, এর মধ্যে দিয়ে তিনি 'Alphabet transmission'-এর ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। এটা একটা ঐতিহাসিক কাজ। রেনেসাঁস ইতালির কোনও লাতিন শিক্ষাবিদকে সে দেশের মাতৃভাষার শিশু-শিক্ষার্থীদের জন্য বর্ণপরিচয়ের মত সূচনান্তরের গ্রন্থ রচনার কথা ভাবতে হয়নি।

৮

বিদ্যালয় স্থাপন

আরেকটি দিক থেকে তিনি অতিক্রম করে গিয়েছিলেন ইতালির হিউম্যানিস্টদের। সে হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দিক। ১৮৫৩ সালে বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছর ধরে তিনি ১টি নর্মাল স্কুল সহ অন্তত ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি (৪৩) বালিকা বিদ্যালয় ও ১টি কলেজ স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া বীরসিংহ গ্রামে বয়স্ক মানুষদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় ও কার্মাটারে সাঁওতাল বালকদের জন্য একটি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রও তিনি স্থাপন করেছিলেন। বীরসিংহের আবাসিক বিদ্যালয়টি চলত বিদ্যাসাগরের অর্থে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলার সহকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক হিসাবে ঝড়ের গতিতে তিনি যে ২০টি আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় ও ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তার সবগুলিই ছিল গ্রামে। জুন-জুলাই মাসের প্রখর রৌদ্রে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে, স্থানীয় মানুষদের উদ্যোগকে সংগঠিত করে, সরকারী পরিকল্পনা ও আশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে, যেভাবে তিনি বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন, ইতালীয় রেনেসাঁসে তার কোন তুলনা নেই। উৎসাহের আতিশয্যে তিনি যে সরকারী পরিকল্পনা ও নীতির সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। হ্যালিডে সাহেবের মৌখিক আশ্বাসে তিনি স্থানীয় মানুষদের সংগঠিত করে অন্তত ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করে, পরে বুঝতে পারেন সরকার বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে অনিচ্ছুক। এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অতঃপর তিনি প্রাণপণ লড়াই ও চেষ্টা করেছিলেন। রেনেসাঁসের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভিত্তোরিনোর বিখ্যাত বিদ্যালয় 'আনন্দনিকেতন' ছিল মান্তুয়ার রাজন্যক গোঞ্জাগার পৃষ্ঠপোষিত।[৩৭] গোঞ্জাগার অর্থেই চলত এটি। এতে পড়ত উচ্চ-বৃত্তের ছাত্ররা। ছাত্রসংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৭৮ জন। আর বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন গাঁয়ে-গাঁয়ে। এদিক থেকে বিদ্যাসাগরের কীর্তি অনেক বেশি সংগ্রামপূর্ণ। সমালোচনা করে বলা হয়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বিদ্যাসাগর অচল। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরাও এব্যাপারে পৃষ্ঠপোষক-সেবিতই ছিলেন। সরকারী উদ্দেশ্য, নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে যতটুকু ছাড়পত্র ছিল, বিদ্যাসাগর সহসা তাকে ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত মেট্রোপলিটান কলেজের সাফল্যে চমৎকৃত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সার্টক্লিফ

বলেছিলেন, 'The Pundit has done wonders.'[৩৮] আরো একটা কথা উল্লেখযোগ্য, ইতালীয় রেনেসাঁসের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা বালিকা মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে বিন্দুমাত্র কিছু চিন্তা করেনি। বালিকাদের জন্য কোনও রেনেসাঁস-হিউম্যানিস্ট বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবেনি।[৩৯] বুর্জোয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক ইংরাজ সরকারও যে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিল না। তা বোঝা গেল, বিদ্যাসাগর-স্থাপিত ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয়ের অনুমোদনের প্রশ্নে। এদিক থেকেও বিদ্যাসাগর বহুদূর এগিয়ে ছিলেন। মিস মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করতে গিয়ে, উত্তরপাড়া থেকে ফেরার পথে ঘোড়ার গাড়ি উল্টে, বিদ্যাসাগরের মারাত্মক জখম হওয়ার ঘটনা সকলেরই জানা। ঘটনাটিকে প্রতীকী অর্থে নিলে দাঁড়ায় এই রকম, বুকের পাঁজর দিয়ে তিনি এদেশের শিক্ষাপ্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। ইতালীয় রেনেসাঁসে শিক্ষাদর্শনের বহু বিখ্যাত তাত্ত্বিক ছিলেন, শিক্ষাবিদ শিক্ষকও ছিলেন, কিন্তু কোন বিদ্যাসাগর ছিলেন না। দেশের মানুষের শিক্ষাপ্রসারের স্বার্থে তাঁরা কেউ গাঁয়ে-গাঁয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করে বেড়াননি ; মাতৃভাষার শিশু-শিক্ষার্থীদের জন্য বর্ণপরিচয়ও লেখেননি ; পৃষ্ঠপোষকের নীতি লঙ্ঘন করে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও যাননি ; বা মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করতে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি উল্টে প্রাণ বিপন্ন করেননি। সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষাপ্রসারের কোন প্রকল্প রচনা ইতালীয় শিক্ষাবিদ-হিউম্যানিস্টরা বাস্তবে তো করেনই নি, বিদ্যাসাগর যা করেছিলেন, তা তাঁদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।

ব্যাকরণবিদ ও 'নিউ টাইপ অব ম্যান'

ইতালীয় রেনেসাঁসে 'স্তুদিয়া হিউম্যানিতাতিস' বলতে বোঝাত পাঁচটি বিষয়ের চর্চা—'ব্যাকরণ, ভাষণদানবিদ্যা, কাব্য, ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্র (বা দর্শন)।'[৪০] ইতালির সব হিউম্যানিস্টই সমস্ত বিদ্যায় সমান পারদর্শী ছিলেন না। ব্যাকরণ ও ভাষণদান-বিদ্যায় মহাপণ্ডিত ছিলেন ভাল্লা ; কাব্য বা সাহিত্য-চর্চায় পেত্রার্কা, বোক্কাচিও বা পলিজিয়ানো ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ; ইতিহাস-চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সালুতাতি, ব্রুনি, গুইচারদিনি প্রমুখ ; নীতিশাস্ত্র বা দর্শন-চর্চায় ফিকিনো, পম্পোনাৎসি ও পিকোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাসাগরের রচনাগুলি খুঁটিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যায়, ব্যাকরণ-বিদ্যাই ছিল তাঁর প্রতিভার মূল ভিত্তি। মননশীল ব্যাকরণবিদ্যা থেকে সাহিত্যের সৃজনশীল সরসতায় তিনি পৌঁছেছিলেন। *'ব্যাকরণ কৌমুদী'* প্রভৃতি ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে তো বটেই, তাঁর সমস্ত রচনা ও কর্মধারার মধ্যে ছিল ব্যাকরণের শৃঙ্খলা। বিদ্যাসাগর মানে ব্যাকরণের বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলা ও সাহিত্যের সহৃদয়সংবাদী হৃদয়। তাঁর রচিত বর্ণপরিচয়-১ম ভাগ থেকে বিষয়-সম্পত্তি বন্টনের উইল পর্যন্ত সর্বত্র আছে নিখুঁত সূত্রচালিত বৈয়াকরণিক শৃঙ্খলাবোধ ও পরম্পরাক্রমিক স্তর-বিন্যাস। অপরদিকে *'সীতার বনবাস'* থেকে *'প্রভাবতী সম্ভাষণ'* রচনায় আছে সাহিত্যিক সুলভ পর্যাপ্ত পরিমাণ অনুভূতিবেদ্য হৃদয়ের পরিচয়। কঠিন প্রস্তর-নির্মিত-পর্বতের উপর কলনিনাদিনী জল-ঝরনার মত বিদ্যাসাগর ও করুণাসাগর হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছেন, যেমন রচনার জগতে তেমনি কর্মের জগতেও। বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুধুই শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের কর্ম নয়, বিবেককম্পিত এক

অসাধারণ হৃদয়বান মানুষেরও কাজ। এই কারণেই তিনি ব্যাকরণ-বিদ্যায় পারদর্শী যে কোন পণ্ডিত নন, বা নন যে কোন দুঃখিত চিত্ত মানুষ ; এই কারণেই বিদ্যাসাগর গ্যারিন কথিত রেনেসাঁসের 'নিউ টাইপ অব ম্যান'।

ইতিহাস-অনুরাগী

ব্যাকরণ ও সাহিত্য-চর্চা ছাড়া তিনি ইতিহাস-চর্চা করেছিলেন। ইতালীয় রেনেসাঁসে ইতিহাস-চর্চার একটা উচ্চ মর্যাদা ছিল।[৪১] ভার্গারিও তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাবে লিখেছিলেন—

"ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য যা-যা পড়াতে হবে তার মধ্যে ইতিহাসকে আমি প্রথম স্থান দিই, তার আকর্ষণ-গুণ ও প্রয়োজন-গুণের জন্য।"[৪২]

সালুতাতি বলেছিলেন, 'ইতিহাস জনসাধারণকে শিক্ষিত করে ও ব্যক্তিকে দেয় পথনির্দেশিকা।'[৪৩] সালুতাতি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের *'বাঙ্গালার ইতিহাস'* (২য় ভাগ) নামক অনুবাদমূলক কিন্তু অনেক পরিমাণে স্বাধীন রচনাটির মধ্যে সেই একই উদ্দেশ্যমূলক দর্শন ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর অঙ্গুলি-পরিমিত মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে *'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব'* প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সুকুমার সেন লিখেছেন, 'ভারতবর্ষে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই প্রথম চেষ্টা।'[৪৪] ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের জন্য যে-ধরনের বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের এই রচনাটিতে তা আছে। জনশ্রুতি, প্রচলিত ধারণা, প্রক্ষিপ্ত পাঠ, ও অযথার্থ মূল্যায়ন সম্পর্কে তিনি যে সতর্কতা, সত্যনিষ্ঠা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। এদেশীয় পণ্ডিতেরা মনে করতেন, কালিদাস নন, মাঘই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কবি। উপমায় কালিদাস অদ্বিতীয়, কিন্তু 'মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ'। বিদ্যাসাগর মাঘের শ্রেষ্ঠত্ব খারিজ করে কালিদাসকেই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান। বিদ্যাসাগরকে অনেক ট্রাডিশনাল বা পরম্পরাপন্থী ঐতিহ্যবাদী বলে উল্লেখ করেন।[৪৫] ট্রাডিশনাল হলে তিনি মাঘকেই শ্রেষ্ঠ কবি মানতেন। বিদ্যাসাগরের এই ইতিহাস রচনা রেনেসাঁস-লক্ষণের দ্বারা বিশিষ্ট ও মৌলিক।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে বিদ্যাসাগর একবার বলেছিলেন,

"একখানা বই লেখার সমস্ত আয়োজন করে রেখেছি, কিন্তু শরীরের এমন অবস্থা হয়ে পড়েছে যে, কোন-মতেই আর সে-কাজে হাত দিতে পারছি না।"

চণ্ডীচরণ আস্তে-আস্তে বললেন—

"আপনার কি লেখার সাধ এখনো মেটেনি? এমন কি বই লেখার ইচ্ছা আছে যার জন্য এত আগে থেকে আয়োজন করেছেন?"

বিদ্যাসাগর আবার একটু হেসে বললেন—

"ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার সমস্ত আয়োজন করে রেখেছি। কেবল শরীর ভালো নয় বলে আজ কাল করে বিলম্ব হয়ে পড়ছে।"[৪৬]

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন—

"ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবেন বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাচীনতম ও অধুনাতম ইতিহাস গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া,

একদিন আলমারি-বন্ধ এই সমুদয় ইতিহাস-পুস্তক দেখিতে দেখিতে অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।"[৪৭]

দর্শন—নতুন দিগদর্শন

'স্তুদিয়া হিউম্যানিতাতিস'-এর মধ্যে দর্শন-চর্চা ছিল। ইতালীয় রেনেসাঁসে ফ্লোরেন্সকে কেন্দ্র করে প্লেটোনিক দর্শন ও পাদুয়াকে কেন্দ্র করে এরিস্টটলীয় দর্শনের চর্চা কতটা তুঙ্গে উঠেছিল তা টের পাওয়া যায়, রাফায়েল অঙ্কিত *'দি স্কুল অব এথেন্স'* ছবিটি দেখলে।[৪৮] বিদ্যাসাগর দার্শনিক বা দর্শনবিদ নন, তবে তিনি যে দশ-এগারোখানি পুঁথি সযত্নে সম্পাদনা করেন, তার মধ্যে *'সর্বদর্শন সংগ্রহ'* ছিল। দর্শন বিষয়ে কোন মৌলিক গ্রন্থ রচনা না করলেও উনিশ শতকের দর্শন বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা ও মূল্যায়নের ইতিহাসে, বিদ্যাসাগর বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলে নিজেকে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সাহসী অধিবাসী করে রেখে গেছেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতাকালে দর্শনবিভাগের পাঠ্যসূচি সংস্কার করার প্রস্তাবে তিনি বলেন, ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ভ্রান্ত, যেমন ভ্রান্ত পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক বার্কলের দর্শনচিন্তা। এসব আধুনিক কালের পক্ষে অচল।[৪৯] তিনি ভারতীয় দর্শনের পাশাপাশি আধুনিক ইওরোপীয় দর্শনকেও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন।

জীবনী-আত্মজীবনী

রেনেসাঁসের আমলে জীবনী ও আত্মজীবনী লেখার দিকে ঝোঁক পড়ে।[৫০] নির্ধারিত সামাজিক জীবনের বাঁধা গৎ ছিঁড়ে ব্যক্তিমানুষের মহিমান্বিত উত্থান তাকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত মানুষের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত করে। কীর্তিমান মানুষের জীবন লেখার আকারে সাজিয়ে দেওয়া ও একান্ত ব্যক্তিগত কথাকে সর্বজনীন আত্মজীবনীতে পরিণত করার বহু প্রয়াস, ইতালীয় রেনেসাঁসে লক্ষ করা যায়। বোক্কাচিও লেখেন *'দান্তের জীবনী'*। ফিলিপ্পো ভিল্লানি *'ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত মানুষ'* নামক রচনায় বিখ্যাত সব কবি, চিকিৎসক, বিদ্বান, শিল্পী, রাজপুরুষদের নিয়ে জীবনীগ্রন্থ লেখেন। ভেসপাসিনো, ভাসারি প্রমুখ বিখ্যাত মানুষজন ও শিল্পীদের নিয়ে অনবদ্য জীবনী রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছাত্র-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করতে নেমে *'জীবনচরিত'* (১৮৪৯) ও *'চরিতাবলী'* (১৮৫৬) নামে দুটি জীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। *'জীবনচরিত'*-এর ভূমিকায় জীবনী রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> "জীবনচরিত পাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমত কোন ২ মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ ২ বহুতর দুর্বিষহ নিগ্রহ ও দরিদ্র নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এককালে সহস্র উপদেশের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।"[৫১]

জীবনের শেষ প্রান্তে *'বিদ্যাসাগরচরিত'* (১৮৯১) নামে একটি আত্মজীবনী রচনাতেও তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেল্লিনির আত্মজীবনীর মতই এটি অসমাপ্ত থেকে গেছে। এতে আছে শুধু

শিকড় ও গোড়ায় বৃত্তান্ত, বিদ্যাসাগরের জীবনকাণ্ডের গল্প আমরা তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনতে পাইনি।

পুস্তকপ্রেমী

রেনেসাঁসের সময় পুঁথি-সংগ্রহ ও পুস্তক-সংরক্ষণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। রাজন্যক, পোপ, বণিক, হিউম্যানিস্ট সকলেই সেই হিড়িকে মেতে উঠেছিলেন। সিরিয়াকো দ্য পিজ্জিকোলি নামে এক বণিক দেশ-বিদেশে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পুঁথি সংগ্রহ করে বেড়াতেন।[৫২] পোপ নিকোলাস-পঞ্চম পুঁথি কিনতে-কিনতে ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন। পোপ লিও-দশমের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল পুঁথি ও বই কেনা। ফেদেরিগো দ্য মন্তেফেলত্রো এক রাজন্যকের পছন্দ ছিল পুঁথি। তিনি মুদ্রিত পুস্তক কিনতেন না। আবার ইসাবেলা দ্য এস্তের পাঠাগারে অলডো প্রেস থেকে বই ছাপা হওয়া মাত্র সরাসরি চলে আসত। সেইরকমই ছিল তার ব্যবস্থা।[৫৩]

বিদ্যাসাগরের পুস্তক-প্রীতি ও পুস্তক-সংগ্রহ রেনেসাঁসের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁদের দু'একজনকার স্মৃতিচারণ এ-প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যায়। শশিভূষণ বসু *'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি'* নামক একটি রচনায় লিখেছেন,

> "আমি কাচে আবৃত শেলফের পুস্তকগুলির প্রতি বারবার তাকাইতে লাগিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এস বই দেখাই", এই বলিয়া এক-একটি শেলফ খুলিয়া বই দেখাইতে লাগিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য. দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিশেষ-বিশেষ বিভাগে সজ্জিত করা হইয়াছে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সমস্ত পুস্তক একই রকম বাঁধানো। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতের পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে তাহারা একরূপ বাঁধাই করিয়া আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম আরভিঙের স্কেচবুক এই সামান্য দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের মত বাঁধানো হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে, তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক। এই সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজির মধ্যে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সময় যাপন করিতেন।"[৫৪]

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী *'স্মৃতি-রেখা'* নামক একটি লেখায় বলেছেন,

> "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুরবাগানের বাটিতে যাইয়া তাঁহার লাইব্রেরী দেখিয়া আশ্চর্য হইতাম ; কত যত্নে. কত অর্থব্যয় করিয়া, কত সময় ও পরিশ্রম সাহায্যে যে সে অদ্ভুত লাইব্রেরী সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার ধারণা করা সম্ভব নহে। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, জার্মান, ফ্রেঞ্চ সকল ভাষাতেই সর্বশাস্ত্রেরই গ্রন্থ সংগ্রহ হইয়াছিল; সকল গ্রন্থই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাত ও জার্মানী হইতে বাঁধাইয়া আনিতেন। একবার এক অনুরাগী ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এত খরচ করিয়া এ সকল বই বাঁধাইয়া আনিবার প্রয়োজন কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর

করিলেন, "ভালোবাসি বলিয়া। তুমি তোমার কুরূপা স্ত্রীকে এত অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা করিয়া অর্থ নষ্ট কর কেন?"[৫৫]

রসিকতা

কাস্তিলিওনে লিখেছেন, অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষ স্বতন্ত্র, কেননা তার রসবোধ আছে। তাঁর মতে তিনরকম ভাবে একজন মানুষ তার রসিক-পরিচয় তুলে ধরতে পারে : গল্পভিত্তিক রসিকতা, তৎক্ষণাৎ সরস জবাব ও ব্যবহারিক রসিকতা। প্রাক্-রেনেসাঁস যুগে গ্রন্থগুলি ছিল গুরুগম্ভীর জ্ঞানে পরিপূর্ণ, মানুষকে করে তোলা হচ্ছিল রামগরুড়ের ছানা-গোত্রীয়, পাপ থেকে মুক্তির চিন্তায় বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত। রেনেসাঁসে দেখা দেয় জীবনরসরসিক মানুষ (L'Uomo piacevole)। রসিক মানুষরা সমাজে সমাদৃত হতে থাকেন। দোলচিবেনে নামে একজন ব্যক্তি 'রসিকরাজ' উপাধি পান।[৫৬] কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন,

> "বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগগজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহার কথাবার্তায় হাসি তামাসার কি একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল। এই রসিকতা সেকালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের মত গ্রাম্যতা দোষে দূষিত নহে ; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য ; এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য।"[৫৭]

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন,

> "ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যাসাগর বা করুণাসাগর নন, রসসাগরও বটেন। ... মজলিশী মেজাজ, ক্ষুরধার বুদ্ধি, শ্লেষ-চাতুর্য ও অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের সমবায়ে এগুলি রচিত।"[৫৮]

ছদ্মনামে রচিত বিদ্যাসাগরের অন্তত পাঁচখানি গ্রন্থে আছে তাঁর রসবোধ ও ব্যঙ্গাত্মক মেজাজের পরিচয়— *'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'বিধবা-বিবাহ ও যশোহর-হিন্দু-ধর্ম-রক্ষিণী সভা', 'রত্নপরীক্ষা'*। ইন্দ্র মিত্র লিখেছেন,

> "অগাধ-অপার শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়া অমন বই লেখা চলে না। মজলিশী মেজাজে, হালকা চালে লেখা রঙ্গরসে ভর্তি, সোনায় যেমন সোহাগা, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তেমনি এসেছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ।"

গল্পভিত্তিক রসরচনার দু একটি উদাহরণ দিই। একবার এক বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক নদীতে স্নান করতে গেছেন। বিদ্যাবাগীশ তীরে দাঁড়িয়ে। এমন সময় দেখলেন একটি কুমীর আসছে। অনায়াসেই বাংলায় সেটা বলা যেত। বিদ্যাবাগীশ তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান জাহির করার জন্য চিৎকার করে বললেন, 'গুরো, সাবধান ভব, মহীলতা আয়াতি।' গুরুর এতে সাবধান হবার দরকার ছিল না। কেননা মহীলতা মানে কেঁচো। ফলে যা হবার হল। এরকম প্রচুর গল্প তিনি তৈরি করেছেন। তাৎক্ষণিক বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেওয়াতেও তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর দরদী হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে মানুষ তাঁকে প্রতারণা করেছিলেন। সে নিয়েও তিনি রসিকতা করতেন। রসিকতার ওপার থেকে টের পাওয়া যেত তাঁর তিক্ত জীবনাভিজ্ঞতাটিকেই। রেনেসাঁসের আমলে রসিকতা অনেকক্ষেত্রে ধারালো ছুরির মত ব্যবহৃত হত। শুধু রঙ্গরস নয়, ব্যঙ্গের চাবুকেও রেনেসাঁসের আমল বিশিষ্ট। পোপ আলেকজান্ডার ষষ্ঠের দুরন্ত

স্বৈরতান্ত্রিক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কে যেন রাত্রের অন্ধকারে তাঁর নামে লাইব্রেরির দরজায় আট ছত্রের একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখে দেয়। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেজন্য অতঃপর সেখানে আটশো পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়।[৬২] এর থেকে বুঝতে পারা যায়, কী তীব্র বিষ ছিল সেই ছড়ায়। একজন খুনি তার ছুরি দিয়ে যা করত, বিখ্যাত লেখক আরেতিনো তার কলম দিয়ে তাই করতে পারতেন। সালুতাতির চিঠিও ছিল খুব তীক্ষ্ণ।[৬৩] আক্রমণাত্মক রসিকতাতেও বিদ্যাসাগর বেশ তীক্ষ্ণ ও ঝাঁঝালো ছিলেন। কারো রেয়াৎ করতেন না।[৬৪]

ধর্ম-টর্মের কথা বলেন না কেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, পরের জন্য শুধু-শুধু বেত খেতে পারবো না। বেত কেন? তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ধর, মৃত্যুর পর কেশব সেনকে আর আমাকে যমদূতেরা নিয়ে গেছে। কেশব সেন হয়তো পাপটাপ করেছে। যমদূতেরা তাঁকে পঁচিশ ঘা বেত দিয়ে আমাকে ডাকলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে—কোথায় যেতে? আমি হয়তো বললুম, কেশব সেনের সভায় যেতুম, ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে। যমরাজ বললেন, ফের ডাক কেশব সেনকে। দে আরো পঁচিশ ঘা বেত। যে জিনিস নিজে বোঝে না, তা অপরকে বোঝাতে গেছে।[৬৫] এ রসিকতা রেনেসাঁসের ফসল। কাস্তিলিওনে যে ব্যবহারিক রসিকতা ও ব্যঙ্গের কথা বলেছেন,[৬৬] তার তীক্ষ্ণ প্রমাণ, টেবিলের উপর জুতো তুলে সাহেবকে আপ্যায়ন করা। বলা বাহুল্য, ব্যবহারিক ব্যঙ্গের এই অমোঘ ও পৌরুষপূর্ণ রূপ ইতোপূর্বে আমাদের অজানিত ছিল। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'-ধরনের রসিকতা নয়, বিদ্যাসাগরের রসিকতা ও ব্যঙ্গে পাওয়া যায় রেনেসাঁসের চারিত্র্য।

একলা মানুষ

এবারে আসা যাক একলা মানুষের প্রসঙ্গে। উগ্র আত্মাভিমানের স্বরচিত-বৃত্তে বিদ্যাসাগর বসবাস করতেন একাকী। তাই কারো সঙ্গেই তাঁর বনিবনা হয়নি। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁর শেষ জীবনের ট্র্যাজিক নিঃসঙ্গতা। প্রথমদিকে তিনি শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রতিপত্তিশালী মানুষজনদের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এবিষয়ে কিছুটা যে সফল হয়েছিলেন, তার প্রমাণ প্রথম বিধবা-বিবাহ-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা।[৬৭] সে-সময়ের পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, নাটকাদির দিকে তাকালে দেখা যায়, এ নিয়ে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড চলছে।[৬৮] ক্রমে সাহায্যকারীদের মধ্যে প্রতারকেরা এসে মেলে এবং সমাজের প্রগতিশীল অংশ পেছিয়ে পড়ে। বিধবা-বিবাহ দিতে গিয়ে তাঁর ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় সত্তর হাজার টাকা। তিনি পরে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন,

> "দেশের মানুষ এত অপদার্থ জানলে আমি কোনক্রমেই বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনে নামতাম না।"

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও সহকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক হিসাবে তিনি সরকারী নীতি ও স্থানীয় মানুষের উদ্যোগের একটা গ্রন্থিবন্ধন করে দিতে চেয়েছিলেন। চারটি জেলার বিভিন্ন গ্রামে কুড়িটি আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় ও পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে স্থানীয় মানুষদের যে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ বিশেষ করে বালিকা-বিদ্যালয়গুলি। তাঁর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সমাজের প্রগতিশীল-অংশ পিছিয়ে

পড়ে, শিক্ষা-প্রসার আন্দোলনে সরকার পিছিয়ে পড়ে। এজন্য শেষপর্যন্ত তাঁকে একলা হয়ে যেতে হয়। এই অবস্থায় তাঁর পৌরুষপূর্ণ সংগ্রামকে তাঁর সীমাবদ্ধতা ও ক্ষুদ্রত্বের পরিচায়ক হিসাবে দেখানো অসঙ্গত।

আত্মাভিমানী ব্যক্তিত্ব

রেনেসাঁসের মধ্যে নতুন ধরনের আত্মসচেতন ব্যক্তিত্ব মাথা তোলে। বুর্খহার্ডটের তত্ত্ব স্বীকার করে বলা যায়, তীব্র ও আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের অভিঘাতে চঞ্চল ও সজীব একটি সময়ের নামই রেনেসাঁস।[৬৯] ভিড়ের ভিতরেও রেনেসাঁসের কৃতী পুরুষরা নিজের-নিজের মূল্যবোধ, জীবন ভাবনা ও সৃজন-প্রক্রিয়ায় থেকে গিয়েছিলেন একলা মানুষ। *'প্লেটোনিক অ্যাকাডেমি'*-র প্রখ্যাত শিক্ষক ফিকিনো বন্ধু, ছাত্র ও অনুরাগীদের উৎপাত এড়িয়ে মেদিচি নির্মিত করেরিজ্জো-ভিলায় নির্জনকক্ষে একা-একা গিয়ে বসতেন, প্লেটোর *'সিম্পোসিয়াম'*-এর সটীক লাতিন অনুবাদ, বা *'দে ভিতা'* নামক রচনাগুলি সম্পাদনা করার জন্য।[৭০] দানবিক প্রতিভার অধিকারী মাইকেল অ্যাঞ্জেলো জানতেন না, কি করে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হয়। সিস্টিন চ্যাপেলে দশ হাজার স্কোয়ার ফুট জুড়ে, শতাধিক প্যানেলে ৩৪৩টি মানব-মানবীর ফ্রেস্কো রচনার কাজটি, চার বছর অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি প্রায় একাই সম্পূর্ণ করেন। সাহায্যকারী কয়েকজন ছিলেন বটে, তাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় মধ্যপথেই তাদের খারিজ করে দেন। বাইরের জগৎ থেকে সরতে-সরতে তিনি মানসিকভাবে এমনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, যে একসময় তিনি নিদ্রাকে প্রিয়তমা সম্বোধন করে লিখেছিলেন, 'জাগরণের যন্ত্রণা থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।'[৭১] মেদিচি-স্তম্ভের ভাস্কর্য থেকে সেন্ট পিটারের স্থাপত্যে, ডেভিডের মূর্তি থেকে সিস্টিন চ্যাপেলের ফ্রেস্কোয় যিনি একসময় অতিমানবিক প্রতিভা নিয়ে গতায়াত করতেন, সেই নিরলস কর্মী-পুরুষও শেষ জীবনে তাঁর মোট জীবনের অর্ধেকের বেশি দৈর্ঘ্য কাটিয়েছেন, প্রায় কিছুই না করে ; একধরনের বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত স্নায়বিক অবসাদের মধ্যে। যেমন তীব্র ও স্পর্শকাতর ছিল তাঁর আত্মাভিমান, তেমনি তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর একাকীত্বের, নিঃসঙ্গতার বিষাদ। মাইকেল এ্যাঞ্জেলো একবার পোপ জুলিয়াস-২এর আমন্ত্রণে তাঁর প্রাসাদে গিয়ে জুলিয়াস-২এর সাক্ষাৎ না পেয়ে একটি চিঠি লিখে জানান, "তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে আমি ফিরে যাচ্ছি। এরপর তুমি যদি আমার খোঁজ কর তাহলে আমাকে পাবে elsewhere than in Rome।"[৭২] লিওনার্দোর শিক্ষাগুরু ভেরোচ্চিও মিলানের সিনেটরদের কাছ থেকে বিখ্যাত যুদ্ধব্যবসায়ী 'চেল্লোয়নি'র অশ্বারূঢ় মূর্তি নির্মাণের বরাদ্দ পান। অনেকখানি কাজ হয়ে যাবার পর তিনি শুনতে পান অশ্বটি নির্মাণ করার ভার তাঁর উপর। আরূঢ় মূর্তিটি নির্মাণের বরাদ্দ অপর কাউকে দেওয়া হবে। ভেরোচ্চিও তৎক্ষণাৎ নির্মিত অশ্বের পা ও মাথা ভেঙে দিয়ে ফ্লোরেন্সের দিকে পাড়ি দেন। নির্মিত অশ্বের ভগ্ন-দেহাংশগুলি আর কেউ ঠিক মতো জোড়া দিতে না পারায়, নিরুপায় সিনেটররা শেষ পর্যন্ত দ্বিগুণ কমিশনে ভেরোচ্চিওকেই ডেকে পাঠান।[৭৩]

বিদ্যাসাগরের আত্মাভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ প্রায় মিথে পরিণত। কিভাবে তিনি সাহেবকে অপমান করার জন্য চটি-জুতো-সুদ্ধ-পা টেবিলে তুলে বসেছিলেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা

না হওয়ায় সে আমলে ৫০০ টাকা বেতনের চাকরি এক কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, বা 'এশিয়াটিক সোসাইটি'তে সাহেবরা জুতো পরে ঢুকতে পারবে, কিন্তু দেশীয়রা পারবে না, এই বৈষম্যের দৃশ্য দেখে ভিতরে না ঢুকে ঘোড়ার গাড়িতে এসে বসেছিলেন—এ সব গল্প প্রায় সর্বজ্ঞাত। এই ব্যক্তিত্বাভিমান রেনেসাঁস-সুলভ। আত্মমর্যাদাবোধের তীব্রতা ও স্পর্শকাতরতায় তিনি রেনেসাঁসের অভিমানী নায়কদেরও ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন। রেনেসাঁসসম্যানদের ব্যক্তিত্বাভিমান ছিল আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বেরই অভিমান, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বাভিমানে এসে মিলেছিল স্বাজাত্যাভিমানের সৌরভ ও বর্ণ।

স্পিৎজ বলেছেন, রেনেসাঁসের বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা প্রায়ই বিষন্নতার দ্বারা আক্রান্ত।[৭৪] এক অন্তহীন অতৃপ্তি ও নিঃসঙ্গতা তাদের তাড়া করে ফিরেছিল।[৭৫] লিওনার্দোর মত মহাশিল্পী আত্মবিলাপ করেন এই ভাষায়, 'I have wasted my hours.'[৭৬] মিল হয়নি তাদের স্বপ্নে ও সামর্থ্যে, ব্যথায় ও বুদ্ধিতে। পৃষ্ঠপোষক, প্রতিবেশী, পরিজন, প্রিয়জনদের সঙ্গে মানব-সম্পর্কের চারুবন্ধনগুলিকেও তাঁদের অনেক সময় এড়িয়ে চলতে হয়েছিল। যেজন্য লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কেউই বিবাহিত জীবনে যাননি। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বলতেন, 'শিল্পরূপা এক বধূকে নিয়েই আমার হাড় জ্বালাতন হয়ে গেছে।'[৭৭] পরিবারের মধ্যে থেকেও অনেক রেনেসাঁস-পুরুষ সাংস্কৃতিক ভাবে নিঃসঙ্গ থেকে যেতেন। 'প্রিন্স অব রেনেসাঁস' নামে খ্যাত রাজন্যক লরেঞ্জো সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তিনি ফিকিনোর সঙ্গে দার্শনিক, পালসির সঙ্গে হিউম্যানিস্ট, বত্তিচেল্লির সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক, ফাইলেলফোর সঙ্গে গ্রীকবিদ, পলিজিয়ানোর সঙ্গে কবি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে ভাস্কর হতে পারতেন।[৭৮] অথচ তাঁর স্ত্রী ম্যাডোনা ক্লারিসা? জীবনীকার লিখেছেন, 'her literary merit was nil.'[৭৯] নিঃসঙ্গতা অতএব ছিল তাঁদের অলঙ্ঘ্য নিয়তির মত। তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন তাদের ঐতিহ্যচালিত পরিবার-পরিজন থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই চারপাশের সামাজিক পরিবেশের অনড় জাড্যের সঙ্গে তাঁদের মিল হত না। নানান দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে পীড়িত হতে-হতে এরাজমুসের মত বৈশ্বিক মানুষকেও শেষজীবন সম্পর্কে বলতে হয়, একে বেঁচে থাকা বলা উচিত নয়, বলা উচিত 'স্লো ডেথ'।[৮০] তরুণ বয়সে গড়ে তোলা জীবনস্বপ্ন ও সমাজকে নতুন ভাবাদর্শে সুসজ্জিত ও গতিশীল করার স্বপ্ন, চোখের সামনে ভেঙে যেতে দেখে, এছাড়া অন্য কিছু মনে হওয়া সম্ভব ছিল না। ইতালীয় রেনেসাঁসের রূপকাররাই নিঃসঙ্গতার বিষাদ ও ব্যর্থতার অলঙ্ঘ্য নিয়তি এড়াতে পারেননি, বিদ্যাসাগরের পক্ষে তা কী করে সম্ভব? তাঁর চারপাশের সামাজিক জীবনের জাড্য ইতালির তুলনায় কম দুরপনেয় বা কম অনড় ছিল না।

অনন্য মানুষ

'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'-এর আলোকে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও কর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মৌল অর্থেই তিনি হিউম্যানিস্ট : গতানুগতিক সংস্কৃত পণ্ডিত মাত্র নন, রেনেসাঁস যুগের 'নিউ টাইপ অব ম্যান'[৮১]—'রেনেসাঁস-ম্যান'। বুর্খহার্ডট তাঁর গ্রন্থে 'ব্যক্তিত্বের মুক্তি' বা ব্যক্তিপ্রতিভার বিশ্লেষণমূলক একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত

করে বলেছেন, রেনেসাঁসের যুগে তিন ধরনের মানুষ দেখা গিয়েছিল ঃ 'অনন্য মানুষ', 'বহুমুখী (প্রতিভাধর) মানুষ' ও 'বৈশ্বিক মানুষ'।[৮২] বিদ্যাসাগর সেই বিচারে 'অনন্য মানুষ' (highly selfconcious individual), বহু ব্যাপারেই তিনি অতিক্রম করে গিয়েছিলেন ইতালীয় হিউম্যানিস্টদের বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতা। তার কারণ ইতালীয় রেনেসাঁসের পর চারশো বছর ধরে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ঘটে গেছে ফরাসি বিপ্লব, এনলাইটেনমেন্ট, শিল্পবিপ্লব।[৮৩] বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মতাদর্শ অনেক বেশি পরিণত হয়েছে। ইতালিতে ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। পরবর্তীকালের ইওরোপে 'বুর্জোয়া লিবারালিজম' অনেক বেশি পরিমাণে সমাজমনস্ক হয়েছে।[৮৪] বিজ্ঞান-চেতনার ফলে হিউম্যানিজমেরও বিবর্তন ঘটে গেছে। বিদ্যাসাগরে নিশ্চিতভাবেই তার উত্তরাধিকার আছে। কাজেই শুধু রেনেসাঁস হিউম্যানিজম নয়, আধুনিক হিউম্যানিজমের মূল্যবোধ ও প্রবণতাগুলিও সম্যকভাবে মূর্ত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মধ্যে।

'ম্যান অব অ্যাকশন'

ইতালির হিউম্যানিস্টরা ছিলেন 'ম্যান অব লেটারস্, নট অব অ্যাকশন'।[৮৫] ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর সালুতাতির[৮৬] মতো দু'একজনের কথা বাদ দিলে বক্তৃতার মঞ্চ, পৃষ্ঠপোষকের সভা, প্রশাসনিক চেয়ার, লেখার টেবিল, পাঠাগার ও শ্রেণীকক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর হিউম্যানিস্টদের গতায়াত। বিদ্যাসাগর সেই সীমা ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সত্যিকার কাজের জগতে। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্য হন্যে হয়ে ঘোরা, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন, 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি' খোলা, পুস্তক ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন—এ সবের সুবাদে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমের ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের। ইতালীয় রেনেসাঁস বিদ্যাসাগরের মত 'ম্যান অব অ্যাকশন' দেখেনি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বাণিজ্যিক স্বনির্ভরতা

'ম্যান অব অ্যাকশন'-এর প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরের কথা একটু বলা দরকার। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা মুখ্যত পরনির্ভর ও পেট্রন-সেবিত। মানি ইকোনমির সূচনায় তাঁরা অর্থ সচেতন হয়েছিলেন বটে কিন্তু স্বনির্ভরতার পথে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। বিদ্যাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে পেত্রার্কা, ফাইলেলফো, পোজিও প্রভৃতি হিউম্যানিস্টরা নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক সৌভাগ্য ফিরিয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত রীতিমত ব্যবসায়ীতে কেউ পরিণত হননি।[৮৭] রেনেসাঁসের আমলে বিদ্বানরা ছিলেন বিদ্বান, বণিকরা ছিলেন বণিক। বিদ্যাসাগর দুইই। এবিষয়ে বিনয় ঘোষের বক্তব্য এইরকম,

> "ধনতান্ত্রিক নবজাগরণের মূলমন্ত্র হল অবাধ বাণিজ্য এবং তার প্রধান মূলধন বিত্ত ও বিদ্যা দুই। ধনতান্ত্রিক নবযুগ কেবল পণ্যবণিকের যুগ নয়, বিদ্যাবণিকেরও যুগ।

> নবযুগের বণিকের ব্যক্তিগত উদ্যম ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বিদ্যাসাগরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সুতরাং বিদ্যার মূলধন নিয়োগ করে তিনি বিদ্যাবণিক হওয়াই বাঞ্ছিত মনে করলেন। তিনি মুদ্রক, প্রকাশক ও গ্রন্থকার হলেন।"[৮৮]

বিদ্যাসাগর বইয়ের ব্যবসায়ে নামেন ১৮৪৭ সালে। ১৮৫৫ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সহকারী-বিদ্যালয়-পরিদর্শক হিসাবে তিনি পেতেন ৫০০ টাকা বেতন। আর বইয়ের ব্যবসায়ে তার আয় ছিল ৪০০০ থেকে ৫০০০ টাকা। সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁর পক্ষে ৫০০ টাকা বেতনের চাকরি যে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তার রহস্য নিহিত আছে ব্যবসা সাফল্যে। প্রচুর দান করেছেন। উপার্জনও করেছেন প্রচুর। এই ধরনের বাণিজ্যিক স্বনির্ভরতার কোন উদাহরণ ইতালির হিউম্যানিস্টদের মধ্যে মেলে না।

অহংকারের অলঙ্কার

ইতালির হিউম্যানিস্টদের তুলনায় আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়। ইতালির হিউম্যানিস্টরা ছিলেন একান্তভাবে পৃষ্ঠপোষক-সেবিত। রাজন্যক, পোপ, ধনিক, বণিকদের উপগ্রহে পরিণত হয়েছিলেন তাঁরা। তার ফলে তাঁরা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোষামুদে, নিত্য-নূতন পেট্রনের সন্ধানে ভাসমান ও পরোপজীবী চরিত্র। হিউম্যানিজমের জনক হিসাবে আখ্যাত পেত্রার্কাও এর বাইরে ছিলেন না।[৮৯] পেট্রন হাজার অপমান করলেও অধিকাংশ সময় মুখ বুজে তাঁরা তা হজম করে যেতেন। এরিস্তো তাঁর পেট্রন কার্ডিনাল ইপ্পোলিতোর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ছিলেন। বাইরে তিনি বলতেন,

> "তুমি আমাকে বছরে তিনবার পঁচিশ এস্কুডো (মুদ্রা) করে দাও বলে বারবার খোঁটা দাও ; তুমি মনে কর, আমি তোমার শৃঙ্খলবদ্ধ দাস, তোমাকে জো হুজুর করে সব সময় চলব।"[৯০]

কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, পৃষ্ঠপোষকতা হারানোর ভয়ে তিক্ত মনোভাব পেট্রনের কাছে গোপন করে বছরের পর বছর তাঁর অধীনে কাজ করে গেছেন। পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে পারতপক্ষে সংঘাতে যাননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর? মার্শাল, হ্যালিডে, গর্ডন ইয়ং প্রমুখ রাজপুরুষরা বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও পরোপজীবীতে পরিণত হননি। যখনই তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রবাহে বাধা পড়েছে, তখনই তিনি সংঘাতে যেতে ইতস্তত করেননি। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ইংরাজ রাজপুরুষদের প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্য ও অন্ধ নির্ভরতার অভিযোগ অনেকে করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক-পদের জন্য সিসিলি বিডনের কাছে বিদ্যাসাগরের লেখা একটি আবেদন-পত্রের কথা স্মর্তব্য। কর্মহীন ও আর্থিক দিক থেকে কিছুটা বিপর্যস্ত বিদ্যাসাগরকে বিডন প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ দিতে চাইলে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, যদিও তাঁর চাকুরির প্রয়োজন আত্যন্তিক তথাপি ইওরোপীয় অধ্যাপকের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হলে তাঁর পক্ষে সে চাকুরি নেওয়া সম্ভব নয়।

> "But I must say candidly that not withstanding the serious nature of the difficulties I am in, my vanity would not permit me to serve if the salary which European professors of the institutions, is not allowed to me ...."[৯১]

তোষামুদে হলেও ইতালীয় হিউম্যানিস্টদের অহংকার কিছু কম ছিল না, কিন্তু স্বার্থের প্রশ্নে তাঁরা সমঝোতা করে চলারই পক্ষপাতী ছিলেন। অহংকারের এই অলঙ্কার, এই বিদ্যাসাগরীয় স্বাধীনচিন্তা, তাঁদের কারো কণ্ঠেই শোভা পায়নি।

শিখর থেকে শিকড়

ইতালির শিল্পী ও হিউম্যানিস্টরা অনেকেই অত্যন্ত খারাপ অবস্থা ('humble station') থেকে বিদ্যা, বৈদগ্ধ্য ও শিল্পগুণের সৌজন্যে উঠে এসেছিলেন সমাজের উপরতলায়। আন্দ্রিয়া ম্যানতেগ্না প্রথম জীবনে পশু-চারণের কাজ করতেন, তিনি হয়ে উঠলেন বিখ্যাত শিল্পী। আরেতিনোর বাবা মুচির কাজ করতেন। তিনতরেত্তোর বাবা কাপড় রঙ করতেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মা ছিলেন কৃষক রমণী, বার্থোলোমিও স্কালা ছিলেন নিঃস্ব, ভিক্ষুক মাত্র।[১২] কিন্তু সম্মান, স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের রাজমহলে প্রবেশ করে এঁরা প্রায়শ-ই ভুলে গিয়েছিলেন, যে-সমাজ বা যে স্তর থেকে উঠে এসেছিলেন, সেই সমাজ বা শ্রেণীর কথা।

ইতালির বহু শিল্পী বা হিউম্যানিস্টের মত বিদ্যাসাগরও উঠে এসেছিলেন এক অর্থে সমাজের নিম্নতল থেকেই। গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের জাতক ; বাবা ঠাকুরদাস কলকাতায় ৮/১০ টাকা বেতনের চাকুরি করতেন ; থাকতেন জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে ; নিজের হাতে রান্না করে খেতে হত। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন কাটে সেখানেই অতি কষ্টে দারিদ্র্যের মধ্যে।[১৩] পরে যখন বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌলতে তিনি কলকাতার এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, তখন তিনি ভোলেননি পরিবারের কথা, গ্রামের কথা, সমাজের কথা, দেশের কথা। বিদ্যাসাগর তাঁর ৩৭ বৎসর ব্যাপী শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসের বীরত্বপূর্ণ ফিতে কেটে ছিলেন, তার নিজের গ্রাম বীরসিংহে ১৮৫৩ সালে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। বীরসিংহে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে তাঁর গ্রামস্থিত ভাই শম্ভুচন্দ্রের কাছে বিভিন্ন জনের কাছে বন্টনের জন্য প্রতি মাসে মাসোহারা যেত সে-আমলে ৫৮৩ টাকা। বাড়ীর খরচ ২১৮ টাকা; স্বসম্পর্কীয় মাসোহারা ৬৮ টাকা (এই টাকা দেওয়া হত ১৯জনকে) ; গ্রামস্থ মাসোহারা ৫৫ টাকা ; স্কুল ২২০ টাকা, ডাক্তারখানা ২২ টাকা।[১৪] কোনো ইতালীয় হিউম্যানিস্ট তাঁর পরিবার পরিজন ও গ্রামের জন্য এ-সব করেছিলেন বলে জানা যায় না।

সমাজ-হিতৈষণা

এবারে আসা যাক সমাজ-সংস্কারের প্রসঙ্গে। ইতালীয় রেনেসাঁস ব্যক্তিপ্রতিভার কর্ষণ ও বিস্ফোরণের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তাঁরা আত্মোন্নতির কথা যে পরিমাণে ভাবতেন, সমাজের উন্নতির জন্য সে তুলনায় প্রায় কোন রকম মাথা ঘামাতেন না। রেনেসাঁসের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'বুর্জোয়া লিবারালিজম'-এর যুগে আসে সমাজমনস্কতা। সমাজ হিতৈষণার নানা দর্শন তখন রচিত হয়।[১৫] বিদ্যাসাগর যেহেতু তৎপরবর্তী যুগের মানুষ। সেই কারণে তার মধ্যে আছে সমাজ-হিতৈষণার জন্য প্রাণপাত সংগ্রাম। ইতালির হিউম্যানিস্টদের তিনি এক্ষেত্রেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ইতালির হিউম্যানিস্টরা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিপ্রতিভার অধিকারী

হয়তো ছিলেন, কিন্তু তাদের কোন সামাজিক চরিত্রই ছিল না। আর বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ।

নারীমুক্তির পথিকৃৎ

রেনেসাঁসের আমলে ইতালিতে শতকরা ১৫ ভাগ পরিবারে বিধবাদের অবস্থান ছিল। তাদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য কোন হিউম্যানিস্ট কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়নি। মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ, স্বাধীনতা, পণপ্রথা সবদিক থেকেই সমস্যা ছিল। লেখাপড়ার গরিমাময় যুগেও রেনেসাঁসের মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরোয়নি। গার্হস্থ্যকর্মের জন্য যেটুকু না নইলে নয়, তার বেশি শিক্ষার অধিকার তারা পায়নি। পণপ্রথার জন্য বিয়ে একটা সমস্যা ছিল। এজন্য মেয়েদের অনেকেই বেছে নিতেন নান হবার পথ। শতকরা ১২ ভাগ মেয়ে ছিলেন নান। গণিকা ও কোর্টিজানদের সংখ্যাধিক্য বলে দেয়, সামাজিক জীবনে মেয়েদের অবস্থান খুব ভারসাম্যযুক্ত, সুস্থিতিমূলক ছিল না।[৯৬] সেজন্য কেউ কেউ পরবর্তীকালে এমন প্রশ্ন তুলেছেন, 'Did woman have any Renaissanc?'[৯৭] রেনেসাঁসের আমলে হিউম্যানিস্টরা এসব সমস্যা নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন, এমন খবর নেই। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার-মূলক আন্দোলন ও শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস অনেকটাই নারীমুক্তির পক্ষে পথিকৃৎ-মূলক।

এবারে আসা যাক 'upper stratum'[৯৮] কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের সংস্কার-প্রয়াস আবর্তিত হয়েছিল—এই অভিযোগটির প্রসঙ্গে। ইতালীয় রেনেসাঁস চরিত্রগত ভাবে ছিল নাগরিক। বলা হয় 'No city, no Renaissance'[৯৯] ইতালীয় রেনেসাঁসের পুরো কাণ্ডকারখানাটাই ছিল উচ্চবর্গীয়।[১০০] সমাজের দিকে সেই অর্থে নজর পড়েছে অনেক পরে, শিল্প বিপ্লবোত্তর 'বুর্জোয়া লিবারালিজম'-এর যুগে।[১০১] রামমোহন, ডেভিড হেয়ার বা বিদ্যাসাগরের সমাজ-হিতৈষণার ব্যাপারটি এসেছে সেই সূত্রে। কিন্তু 'বুর্জোয়া লিবারালিজম'-এ সমাজচিন্তার একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। নিম্নতলের মানুষদের বা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য বুর্জোয়া উদারনৈতিক সমাজ-হিতৈষণা কোন বৈপ্লবিক সমাজ-পরিবর্তনের তত্ত্ব আনেনি। আনেনি, তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্য। সমাজ বদলের বৈপ্লবিক আন্দোলনের উৎস বা জন্মতত্ত্ব অন্য। রেনেসাঁসের প্রথম, দ্বিতীয় কোন স্তরেই তার প্রকল্প বা প্রস্তাব ছিল না। অতিসচেতন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিভা-কর্ষণের যুগেও (ইতালীয় রেনেসাঁস) ছিল না. সমাজ-সচেতন বুর্জোয়া লিবারালিজমের যুগেও (শিল্প বিপ্লবোত্তর ইওরোপ) ছিল না। বিদ্যাসাগরে সে-সব লক্ষণ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। বস্তুতপক্ষে, সমাজমনস্কতা ও সমাজ-হিতৈষণার দিক থেকে বিদ্যাসাগর ইতালীর রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর ছিলেন।

'অক্ষয় মনুষ্যত্ব'

মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে রেনেসাঁসের অন্যতম মহৎ দান ধর্মশাসিত মধ্যযুগীয় চার্চতন্ত্রের হাত থেকে জীবনকে উদ্ধার করা।[১০২] এ কাজটা দর্শনগতভাবে করেছিলেন হিউম্যানিস্টরা।

ইংরাজিতে যাকে বলে 'সেকুলার হিউম্যানিজম', তার জন্ম হয়েছিল রেনেসাঁসের মধ্যে। সে সময় মোহমুক্ত যুক্তিবাদী মানবতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়। ঈশ্বরের জায়গায় কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত হন মানুষ। ফিকিনো বলেন, 'বিশ্বজগতের প্রাণকেন্দ্রে মানুষের স্থান।' আলবের্তি বলেন, 'মানুষ সব করতে পারে।' পিকো দাবী করেন, 'প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কারণ ইচ্ছাশক্তির জোরে সে নিজেকে অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে পরিচালনা করতে পারে।'[১০৩] রেনেসাঁসের এই মানবতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্বীকার করেও বলা যায়, আধুনিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা সেসময় খুব সমৃদ্ধ ছিল, একথা বলা যায় না। ইতালির হিউম্যানিস্টরা চার্চ বা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করেননি। ইতালির সুবিখ্যাত চিত্রকলার দিকে তাকালেও দেখা যায়, তার শিল্পীরা শত-শত খ্রীষ্টীয় অলৌকিকতা ও ধর্মবিশ্বাসের ছবি এঁকেছিলেন।[১০৪] হিউম্যানিস্টদের দিক থেকে দেখলে পেত্রার্কা থেকে এরাজমুস প্রায় সকল হিউম্যানিস্টই ছিলেন গভীর ভাবে ধর্মবিশ্বাসী। পেত্রার্কা লিখেছেন, তাঁর দু'জন ঈশ্বর : একজন সিসেরো, অন্যজন ঈশ্বর স্বয়ং।[১০৫] ১৩৪১ সালের ৮ এপ্রিল পেত্রার্কাকে রোমে রাজকবি হিসাবে রাজকীয় অভিষেক-সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই অভিষেক-কর্ম সমাপ্ত হবার পর পেত্রার্কা প্রথম যেখানে গেলেন সেটি সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকা। পেত্রার্কা লিখেছেন,

> "সেখানে গিয়ে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমি তার প্রতিমূর্তির সামনে আমার সম্মানমাল্যটি টাঙিয়ে রাখলাম।"[১০৬]

*'ইউটোপীয়া'*র রচয়িতা টমাস মোরের জীবন-যাপন প্রণালী খ্রীষ্টীয় যাজকদের মতই শুদ্ধাচারী ছিল। 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিস' নামে খ্যাত এরাজমুস এতদূর খ্রীষ্টীয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন যে মার্টিন লুথার তাঁর সম্পর্কে বলতেন, 'তাঁর কাছে শেখেনি কে?'[১০৭] তাঁর ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা ব্যক্ত হয়েছে বিশেষত তাঁর রচনাকর্মগুলির মধ্যে।[১০৮] সেদিক থেকে বিদ্যাসাগর সঠিক অর্থেই 'সেকুলার ম্যান'। তিনি বলতেন, "ধর্ম যে কী, মানুষের বর্তমান অবস্থায় তা জানার উপায় নেই, জানার কোন দরকার নেই।"

*'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক প্রস্তাব'*এ তিনি লিখেছেন,

> "হা ধর্ম! তোমার মর্ম বুঝা ভার, কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান।"[১০৯]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত 'তত্ত্ববোধিনী' নামক ধর্মসভার মুখপত্র *'তত্ত্ববোধিনী'* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। অক্ষয় দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাপার-স্যাপার দেখে, দেবেন্দ্রনাথ এক সময় বিরক্ত হয়ে তাঁদের মতো নাস্তিকদের তাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। অপরদিকে নব্য-হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ রামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে এলেও, তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছে যাননি। ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন না কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে রসিকতা করে কেশব সেনকে জড়িয়ে গল্প করে বলেছিলেন, 'পরের জন্য যমদূতের কাছে বেত খেতে পারবো না।' কাশীতে বাবা ঠাকুরদাসকে দেখতে গেলেও বিশ্বনাথ-দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। যাঁর দয়ার সীমা-পরিসীমা ছিল না, ধর্মের বা পুণ্যের লোভ দেখিয়ে, ধর্মোপজীবী কাশীর ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে টাকা চাইলে, তিনি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।[১১০] একজন সমালোচক আবার বলেছেন, ঈশ্বরপ্রীতির পরিবর্তে মনুষ্যপ্রীতির জন্যই তাঁর জীবন ট্রাজিক ও বিষাদময় হয়ে

উঠেছিল। মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলে তাঁর জীবন মধুময় হয়ে উঠতে পারত।[১১১] মোহগ্রস্ত সমালোচকের এই বক্তব্য প্রতিবাদেরও অযোগ্য। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে তাঁর জীবনবাদী কর্মমুখী দর্শনের কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা—রেনেসাঁস-সুলভ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। এ-ব্যাপারে তিনি ইতালীয় হিউম্যানিস্টদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

যুক্তিবাদী

যুক্তিবাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ইতালীয় রেনেসাঁসের বীজমন্ত্র 'রিজন' নয়, 'রিভিলেশন'।[১১২] উইল ডুরান্ট তাঁর *'হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন'* গ্রন্থগুচ্ছের পঞ্চম খণ্ডের নাম দিয়েছেন 'দ্য রেনেসাঁস'। ষষ্ঠ খণ্ডে আলোচনা করেছেন 'রিফর্মেশন' নিয়ে। সপ্তম খণ্ডের অভিধা 'এজ অব রিজন'।[১১৩] প্রকৃতপক্ষে, বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়েছে, সপ্তদশ শতাব্দীর পর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সূচিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে। ইতালীয় রেনেসাঁসে যুক্তিবাদ কখনো কেন্দ্রীয় দর্শনের মর্যাদা পায়নি।[১১৪] যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে বিশ্বাসের কাছেই ছিল তাঁদের শেষ আত্মসমর্পণ। পিকো জ্যোতিষ প্রভৃতিকে মিথ্যা ও সংস্কার বলে উড়িয়ে দিলেও তিনি বিশুদ্ধ মরমীয়াবাদী ছিলেন। ঈশ্বরকেই কারণের কারণ বলে মানতেন।[১১৫] যুক্তিবাদের সপক্ষে কোন হিউম্যানিস্টই কোন প্রস্তাব রচনা করেননি। বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র ছিল যুক্তিবাদ। ইতালীয় রেনেসাঁসে যুক্তি শাস্ত্র ও বিশ্বাসের প্রভুত্ব ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রকে যুক্তির প্রয়োজনে এনেছিলেন। বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী বুর্জোয়া দর্শনের উত্তরাধিকার। বিদ্যাসাগরীয় 'সেকুলার হিউম্যানিজম' ও 'র‍্যাশানালিটি' ইতালীয় রেনেসাঁসে সুদুর্লভ। সুতরাং এদিক থেকেও তিনি এগিয়েছিলেন বলা যায়।

ধ্রুপদী পৌরুষ

ইতালীয় রেনেসাঁসের স্পিরিটকে *'প্যাগান লায়ন'* নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১১৬] বিদ্যাসাগরের মধ্যে আমরা সেই রেনেসাঁসের স্পিরিটকে মূর্ত হতে দেখি। নবযুগের কবি মাইকেল '*মেঘনাদবধ কাব্য*'-এ রাবণের মধ্যে রূপায়িত করেছেন প্যাগান পৌরুষকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'যে অটল দম্ভ সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতে হার মানিতে চাহে না'—তাঁর রাবণ সেই চরিত্র। মাইকেল কি সেই অজেয় ক্লাসিক্যাল পৌরুষটিকে তাঁর চোখের সামনেই ধুতি-উড়ুনি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেন নি? বিদ্যাসাগরের পোশাক-আসাক, চালচলন, কথাবার্তা, লেখা, কাজকর্মের মধ্যে ছিল 'classical simplicity and massive strength'। রেনেসাঁসের স্থাপত্যকর্মগুলিকে যে ভাষায় প্রশংসা করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রায় সেই ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন 'সবল সরল অটল মাহাত্ম্য'।[১১৭] 'Simplicity and strength' ছাড়া ধ্রুপদী চরিত্রে থাকে শৃঙ্খলার অটুট বন্ধন। বিদ্যাসাগরের শেষ উইলটি খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায়, কি নিপুণ শৃঙ্খলার অটুট

বন্ধনে তিনি তাঁর দানশীল হৃদয়ের প্রাচুর্যকে সূত্রবদ্ধ করে রেখে গেছেন।[১১৮] *'বর্ণ পরিচয়'* থেকে উইল পর্যন্ত সর্বত্র রয়েছে সরল, স্পষ্ট, ধ্রুপদী শৃঙ্খলার পরিচয়। ইতালীয় রেনেসাঁসে ক্লাসিক্যাল পৌরুষ, সবল সরলতা ও নিটুট শৃঙ্খলা থাকলেও খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও নমনীয়তার দ্বারা তা অনেকখানি 'ফেমিনিন' হয়ে উঠেছিল। মেকিয়াভেলি তাঁর রাজনৈতিক প্রস্তাবে সেই কারণে কিছু ক্রুদ্ধ সূত্র সংযোজন করেছিলেন।[১১৯] তাঁর আদর্শ রাজন্যককে তিনি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন লোডোভিকো বা লরেঞ্জোর সৌন্দর্য-বিলসিত কমনীয়তা থেকে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যে শৃঙ্খলা, যে পৌরুষ ও যে নীতিবিধৌত সরলতা বর্তমান, তা ইতালীয় রেনেসাঁসে দুর্লভ।

অনন্য ও অতুলনীয় হিউম্যানিস্ট

বিদ্যাসাগর রেনেসাঁসের 'অনন্য মানুষ'। ইতালীয় 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' ও আধুনিক হিউম্যানিজমের দ্বিবিধ উপাদান তাঁর চরিত্রে এসে মিলেছে। গ্রীক সভ্যতার অটলপৌরুষ, ইতালীয় হিউম্যানিস্টের নতুন ধরনের পাণ্ডিত্যময় ব্যক্তিত্ব, বুর্জোয়া লিবারালিজমের সমাজমনস্কতা—বিদ্যাসাগরকে অনন্য করেছিল। তার সঙ্গে এসে মিশেছিল মাইকেল-ভাষিত 'বাঙালী মায়ের হৃদয়'[১২০] 'নট ওনলি বিদ্যাসাগর, বাট অলসো করুণাসাগর' ; শুধু বিদ্যাসাগর নন, করুণাসাগর। মানুষের জন্য এমন দরদভরা হৃদয় ইতালীয় রেনেসাঁসে মেলে না। তাঁর দরদী হৃদয়ের অজস্র কাহিনী মিথে পরিণত।

একদিন হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন? কার্মাটাড়ে গিয়ে ভালো থাকেন কিনা?" বিদ্যাসাগর মাথা নেড়ে বললেন, "না।"— "না কেন?"—বিদ্যাসাগর বললেন,

> "কার্মাটাড়ে এক সের চালের ভাত, আধ সের অড়হর ডাল, আধ সের আলু আর এক সের মাংস যে অনায়াসে খেতে পারে, তাকে আজকাল পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খেয়ে থাকতে হয়, তার বেশি জোটে না। আমি সেখানে গিয়ে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করব, আব আমার চারদিকে সাঁওতালরা না খেয়ে মারা যাবে দেখব, একি সইতে পারি? বিদ্যাসাগর আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।"[১২১]

মানুষের জন্য এই অপরিমিত দরদভরা হৃদয় রেনেসাঁস হিউম্যানিস্টদের ছিল না। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের সমস্ত হিতকারী হৃদয় একসঙ্গে করলেও এর সমতুল্য হবে কিনা সন্দেহ আছে। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের প্রগতিশীল ভূমিকার কথা মনে রেখেও বলা যায়, বিদ্যাসাগরের মত এমন ঋজু, কর্মিষ্ঠ, সেকুলার ও হৃদয়বান হিউম্যানিস্ট সে-দেশে জন্মালে সে রেনেসাঁসও কৃতার্থ হত। বুর্খহার্ডট রেনেসাঁসে দৃষ্ট 'অনন্য মানুষ'-এর একরকম সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ; বিদ্যাসাগর প্রায় সবদিক থেকেই ছাপিয়ে গিয়েছিলেন সেই সংজ্ঞা।[১২২] বিদ্যাসাগরের মত 'অনন্য মানুষ' ইতালীয় রেনেসাঁস শুধু চোখে নয়, স্বপ্নেও দেখেনি।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. L. W. Spitz, *The Renaissance and Reformation Movement*, Chicago, 1971, p. 139

২. '...an intellectual movement, primarily literary and philosophical whichwas rooted in the love of and desire for the rebirth of classical antiquity'. —Quoted L. W. Spitz, *Ibid*, p. 140.

৩. W. Ullman, *Mediaval Foundation of the Renaissance*, London, 1977, p. 107

৪. J. A. Symonds, *Renaissance in Italy*, vol. 2, Revival of Learning, 1967

৫. E. Garin, *Science and Civic Life in the Italian Renaissance*, (Tran.) P. Munz, U.S.A.. 1969, p. viii

৬. D. Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Berkerly, 1969

৭. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৫৮, পৃ. ১৪৮-১৮৬

৮. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর উপাধির উৎস-সন্ধানে', বিমান বসু (সম্পাদিত), *প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর*, ১৯৯১, পৃ. ২৫৬-২৫৮

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাসাগর উপাধি', "*সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*", ৯৫ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃ. ৬৮-৭২

৯. বিদ্যাসাগর জ্যোতিষ শ্রেণীতে কোন সময় পড়েছিলেন তা নিয়ে কোন সুস্পষ্ট সদুত্তর কেউ দেননি। তবে আমার বিবেচনায় সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীতে পড়ার কালে অর্থাৎ ১৮৩৪-৩৫ সালের মধ্যে তাঁর জ্যোতিষ পড়া শেষ হয়েছিল।

"The Student of Sahitya and Alankara Classes attended this class and studied Lilabati and Vijaganita." (*i.e. Jyotisha or Mathematics class—S. M.*). "The chair of Mathematics was first created on June 1826 down to 1835"—দেবকুমার বসু (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, পৃ. ৩৮৩

১০. বিনয় ঘোষ, *তদেব*, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৯

১১. W. Durant, *The Story of Civilization*, vol. V, The Renaissance, N.Y.,1953, p. 262

১২. W. Rospigliosi, *Writers in the Italian Renaissance*, London, 1978, pp. 170-172

১৩. J. E. Sundys, *History of Classical Scholarship*, vol. 2, Quoted in L.W. Spitz, *Ibid*, p. 147

১৪. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 99

১৫. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 117

১৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', *"সখা"*, অক্টোবর ১৮৮৫, পৃ. ১৫৭
১৭. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর*, ষষ্ঠ সং, পৃ. ২২৭-২২৮
১৮. বিদ্যাসাগর জাতীয় স্মারক সমিতি প্রকাশিত *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭২, পৃ. ৫২৩
১৯. *তদেব*, পৃ. ৫২৭
২০. বিদ্যাসাগর (সম্পাদিত), *মেঘদূত*, ১৮৬৯, বিজ্ঞাপন অংশ
২১. সুকুমার সেন, *বিচিত্র-নিবন্ধ*, ১৯৬১, পৃ. ২৩৩
২২. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 94
২৩. Quoted J. A. Symonds, *Ibid*, p. 278
২৪. ইন্দ্র মিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, ১৯৬৯, পৃ. ৬২৬
২৫. B. Willey, *Tendencies in Renaissance Literary Theory*, Norwood edition, 1977, Chapter-II, 'The defence of the vernacular', pp.23-26
২৬. P. Villey, *Les Sources Italiennes de Du Bellay*, p. 74, Quoted in B. Willey, *Ibid*, pp. 23-26
২৭. *বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, তদেব*, তৃতীয় খণ্ড
২৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগষ্ট ১৯৮৯, পৃ. ১৭২
২৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, *তদেব*, পৃ. ২১৭
৩০. L. W. Spitz, *Ibid*, p. 166
৩১. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের আলোকে বিদ্যাসাগর', *"গণশক্তি"*, ১৯ এপ্রিল ১৯৯২
৩২. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 90
৩৩. P. F. Grendler, *Schooling in Renaissance Italy Literacy and Learning, 1300-1600*, Baltimore and London, 1989
৩৪. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, পরিশিষ্ট অংশ, পৃ. ৭০৫-৭৫৯
৩৫. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, পৃ. ৭১৭
৩৬. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, পৃ. ৭১৯
৩৭. W. Durant, *Ibid*, p. 250
৩৮. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, পৃ. ৩৯৯
৩৯. P. F. Grendler, 'Schooling in Western Europe', *"R.Q."*, vol. XLIII, No. 4, Winter 1990, The Renaissance Society of America, New York, pp. 777-784
৪০. সিসেরো 'স্তুদিয়া হিউম্যানিতাতিস' বলতে 'লিবারল আর্টস'-এর চর্চা বুঝাতেন। বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট লিওনার্দোব্রুনি নিকলো স্ট্রোজিকে এক চিঠিতে 'লিবারল আর্টস' সম্পর্কে লিখেছেন, 'These liberal Arts embraced grammar, rhetoric, poetry, history and moral philosophy.'— L. W. Spitz, *Ibid*, p. 140
৪১. M. P. Gilmore, 'The Renaissance Conception of the Lessons of History', *Humanists and Jurists*, Cambridge, 1963, pp. 1-37; F. G.

'The Renaissance interest in History', C. S. Singleton (ed), *Arts, Science and History in the Renaissance,* Baltimore, 1967

৪২. W. H. Woodword, *Vittorino Da Feltre and other Humanist Educators,*Cambridge, 1918, pp. 102-106

৪৩. Quoted L. W. Spitz, *Ibid*, p. 164

৪৪. সুকুমার সেন, *বিচিত্র-নিবন্ধ,* ১৯৬১, পৃ. ২৩২

৪৫. A. Tripathi, *Vidyasagar : The Traditional Moderniser,* 1967

৪৬. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব,* পৃ ৬০৭-৬০৮

৪৭. বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর,* তৃতীয় সং, পৃ. ১৮০

৪৮. J. H. Beck, *Raphael.* New York, 1976

৪৯. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব,* পৃ. ৭১৭

৫০. J. R. Hale (ed), *A Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance,* G. B. 1981; J. Burckhardt. *The Civilization of the Renaissance in Italy,* London Edition, 1945, p. 205

৫১. বিদ্যাসাগর, *জীবনচরিত,* কলিকাতা, ১৮৪৯, পৃ. ১-২

৫২. J. A. Symonds, *Ibid,* vol. 2, p. 114

৫৩. W. Durant, *Ibid,* pp. 379, 393, 397. 398

৫৪. শশীভূষণ বসু, 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি', *"প্রবাসী",* শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ. ৫৪৮ ; উদ্ধৃত ইন্দ্র মিত্র, *তদেব,* পৃ. ২১-২২

৫৫. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, *স্মৃতিরেখা,* ১৩৪০, পৃ. ১৪৮-১৪৯ ; উদ্ধৃত ইন্দ্র মিত্র, *তদেব,* পৃ. ৩৮০

৫৬. P. Barolosky. *Infinite jest Wit and Humour in Italian Painting,* 1978 ; J. R. Hale (ed). *Ibid,* p. 172 ; F. M. Schweitzer, *Dictionary of the Renaissance.* British Commonwealth, 1967, p. 498

৫৭. বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন-প্রসঙ্গ,* প্রথম পর্যায় ১৩২০, পৃ. ২১৪

৫৮. উদ্ধৃত ইন্দ্র মিত্র, *তদেব,* পৃ. ৩৭২ ; প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার* ১৯৫৭, পৃ. ১

৫৯. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব,* পৃ. ৩৭১

৬০. বিদ্যাসাগর, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য সহচরস্য, *রত্নপরীক্ষা,* ১৮৮৬, বিজ্ঞাপন, পৃ. ৫

৬১. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব,* পৃ. ৪৬৫ ; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৫০৭-৫১০

৬২. W. Durant, *Ibid,* vol. V, pp. 192, 531

৬৩. L. W. Spitz, *Ibid,* p. 160

৬৪. ক্ষুদিরাম বসু, 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি', *"পঞ্চপুষ্প",* আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ. ২৯৪

৬৫. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব,* পৃ. ৬৩৪ ; শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ. ৩৮৫

৬৬. B. Castiglione, *The Courtier,* Book II ; J. R. Hale, *Ibid,* p. 172

৬৭. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, অধ্যায়-তেরো, পৃ. ৩১০
৬৮. অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, *উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার-আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক-রচনা*, ১৯৮২
৬৯. J. Bruckhardt. *Ibid*, Chapter-II, 'The Development of Individual', pp. 81-103
৭০. J. Hankins, 'The Myth of the platonic Academy of Florence', "*R.Q.*", vol. XLIV, No. 3, Autumn 1991. p. 456
৭১. W. Durant, *Ibid*, vol. V, pp. 642-644
৭২. W. Durant, *Ibid*, p. 470
৭৩. W. Durant, *Ibid*, p. 132
৭৪. "Renaissance intellectuals and artists were frequently overwhelmed by a sense of melancholy"—L. W. Spitz, *Ibid*, p. 179
৭৫. Dinner Pieces, *Leon Battista Alberti* (Tran by David March), N.Y., 1987, p. 114
৭৬. W. Durant, *Ibid*, p. 217
৭৭. "I have only too much of a wife in my art and she has given me trouble enough. As to my children they are the work that I shall leave." G. Vasari, *Artists of the Renaissance*, IV, (Tran), 1965 ; p. 218 ; W. Durant, *Ibid*, p. 500
৭৮. W. Durant, *Ibid*, p. 217
৭৯. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 22
৮০. Smith Preserved. *Erasmus : A Study of his life, Ideals and place in History*, N. Y., 1950
৮১. 'Humanists are not pure grammarians, they are new type of man'— E. Garin, *Ibid*, p. VIII
৮২. J. Bruckhardt, *Ibid*, Chapter-II, pp. 81-103
৮৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস*, ১৩৮১, পৃ. ৬
৮৪. শিবনারায়ণ রায়, 'উদারতন্ত্রের অবক্ষয়', *গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়*, ১৯৮১
৮৫. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 57
৮৬. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 150-158
৮৭. পরমেশ আচার্য, 'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর', "*অনুষ্টুপ*", একবিংশতি বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ১৭৯-১৯৫
৮৮. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, 'বিদ্যা ও বাণিজ্য'-অধ্যায়, পৃ. ১৫৯-১৬৭
৮৯. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 206
৯০. W. Rospigliosi, *Ibid*, p. 145
৯১. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, পৃ. ৩৩০
৯২. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 251

৯৩. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, দ্বিতীয় খণ্ড, 'কলিকাতা শহরে ঠাকুরদাস', 'বড়বাজারে ঈশ্বরচন্দ্র' প্রভৃতি অধ্যায়
৯৪. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, পৃ. ৫১০
৯৫. শিবনারায়ণ রায়, 'উদারতন্ত্রের অবক্ষয়', *তদেব*
৯৬. J. R. Hale (ed), *Ibid*, 'Woman', 'Courtesans and prostitutes'
৯৭. P. F. Grendler, 'Schooling in Western Europe', *"R. Q."* Ibid, p. 784 ; E. V. Beilin, *Redeeming Eve*, Princeton University Press
৯৮. "It did move on the axis of the upper stratum alone of the society, the 'bhadraloks"—Susobhan sarkar, 'Conflict Within the Bengal Renaissance', *On the Bengal Renaissance*, 1979, pp. 69-75
৯৯. J. R. Hale (ed), *Ibid*, 'City'
১০০. "Of course the Renaissance culture was an aristocratic super structure raised upon the back of labouring poor." —W. Durant, *Ibid*, pp. 569, 726 ; A. Ventura, 'The Triumph of Aristocracy in Veneto', Rpt. in A. ·Malho, *Social and Economic Foundation of Italian Renaissance*, U.S.A., 1969, p. 170 ;
"Common man is merely a part of the back-ground against which these glittering figures move"—E. R. Chamberlin, *Everyday Life in Renaissance Times*, G. B., 1965, p. 86
১০১. শিবনারায়ণ রায়, *'গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়'*, তদেব
১০২. "During the Middle Ages Man had lived enveloped in a cowl ....The Renaissance shattered and destroyed them, rendering the thickveil . which they had drawn between the mind of man" —J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 1, pp. 10-11
১০৩. "Man is at the centre of this great chain of being"—Ficino, Quoted in L. W. Spitz, *Ibid*, p. 177 ;
...... this is the supreme and marvellous felicity of man.......that he can be which he wills to be"—Pico, Quoted in J. Burckhardt, *Ibid*, pp. 334-335 ; "Man can do everything"—Alberti
১০৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'দান্তের মূল্যায়ন', *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৯, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৭৬০-৭৬৫
১০৫. Petrarch, *'Letter to Classical Authors'*, pp. 18-20, Quoted in D. Bush, *Renaissance and English Humanism*, Canada, 1939, p. 50
১০৬. W. Rospigliosi, *Ibid*, pp. 200-202
১০৭. "Our delight and our hope, who has not learned from him ?" —Letter of Luther. Quoted in R. H. Bainton, *Here I stand : A Life of Martin Luther*, U.S.A., p. 125

১০৮. D. Bush, *Renaissance and English Humanism*, University of Toronto Press, Canada, 1939, Chapter II pp. 39-68

১০৯. বিদ্যাসাগর, *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'*, ১৮৫৫

১১০. ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, পৃ. ৬৪৮

১১১. "বস্তুত ঈশ্বরলাভ ও মানব প্রীতি—একই সত্যের এপিঠ ও ওপিঠ। 'আধুনিক' যুগের মানুষ 'মানবপ্রীতি' কথাটিকে গ্রহণ করে ; 'ঈশ্বরলাভ'-কে মনে করে সেকেলে। তার ফল কী দাঁড়াতে পারে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেই প্রমাণিত। যে নিরন্তর নির্বিচার দানে শত সহস্র মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তার প্রতিদানে এসেছে নির্মম অকৃতজ্ঞতা, অকারণ শত্রুতা ও লাঞ্ছনা।"—প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য*, ১৩৭৫, 'স্বতন্ত্র পারিজাত বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৩১-১৯২

১১২. G. C. Sellery, *The Renaissance : Its Nature and Origin*, Wisconsin, 1950, p. 169

১১৩. W. Durant, *The Story of Civilization*
vol. V—The Renaissance (1953)
vol. VI—The Reformation (1955)
vol. VII—Age of Reason (1957)

১১৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'ইতালীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি মিথ', 'পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ'-এর অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৭-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১)-এ পঠিত গবেষণা নিবন্ধ ; *"ইতিহাস অনুসন্ধান"* ৭ম খণ্ডে প্রকাশিত (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ), ১৯৯৩, পৃ. ৬৮৪-৭০০

১১৫. "Philosophy seeks truth, theology discovers it, religion hath it"—Pico. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, p. 242

১১৬. V. Cronin, *The Flowering of the Renaissance*, London, 1969

১১৭. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগষ্ট ১৯৮৯, পৃ. ১৮৫

১১৮. সন্তোষকুমার অধিকারী, *বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষদিনগুলি*, ১৯৮৫ ; ইন্দ্র মিত্র, *তদেব*, পরিশিষ্ট অংশ

১১৯. Machiaveli, *The Prince*, P. Bondanella & M. Musa (ed), *The Portable Machiavelli* (Tran), Penguin, 1979

১২০. "Wisdom of an ancient sage, energy of an European, heart of a Bengali mother"—M. S. Dutta

১২১. শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, *'প্রয়াস'* (নব সংস্করণ), ১৯১০, পৃ. ৪৫-৪৬

১২২. J. Burckhardt, *Ibid*, chap. II, 'The Development of individual', pp. 81-103

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাইকেল ঃ "জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে"

রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালি ও তার সূচনাপুরুষ পেত্রার্কাকে বন্দনা করে মাইকেল শুরু করেছেন তার *'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'*

"ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহু বিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সে দেশে জনম পূর্বে করিলা গ্রহণ
....
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি; বাকদেবীর বরে।"

প্রখ্যাত রেনেসাঁস-ঐতিহাসিক বুর্খহার্ডট (J. Burckhardt) দান্তের '*ডিভাইন কমেডি*' সম্পর্কে বলেছেন, '......it is the beginning of all modern poetry.'[১] সেই দান্তের ছয়শত জন্মবার্ষিকী উৎসবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে মাইকেল 'কবিগুরু দান্তে' নামক একটি সনেট ইতালির সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েলকে প্রেরণ করেন ১৮৬৫ সালের ৫ মে। তার উত্তরে রাজসচিব মাইকেলকে লেখেন, '......Italian genius finds an echo on the shores of the Ganges' 'আপনার কবিতা গ্রন্থির ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে'।[২] এই গ্রন্থি বস্তুতপক্ষে এক রেনেসাঁসের সঙ্গে আরেক রেনেসাঁসের। ডিরোজিওর পর মাইকেলই বোধ হয় প্রথম বাঙালী কবি যিনি ইওরোপীয় রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ও তার কবিদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক পেতেছিলেন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি এখন মূল ভাষায় (ইতালি) তাসো পড়ছি, আহা, কী সুমিষ্ট রচনা।'[৩]

ইতালীয় রেনেসাঁসের উদ্দীপনী উৎসে

শুধু ইতালীয় ভাষা বা তার সাহিত্যকর্মের সঙ্গে মাইকেল পরিচিত ছিলেন তা নয়, ইতালীয় রেনেসাঁসের উদ্দীপনী উৎসেও তিনি পৌঁছেছিলেন। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উজ্জীবনী উপাদান ছিল ইংরাজি-বাহিত পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি। রেনেসাঁস ও রেনেসাঁসোত্তর আধুনিকতার নানা ধারায় সমৃদ্ধ ছিল সেই সংস্কৃতি। কিন্তু অবহিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন রেনেসাঁসের মূল চাবিকাঠি ছিল 'রিভাইভ্যাল অব ক্লাসিক্যাল লার্নিং'।[৪] ইতালীয় রেনেসাঁসের উদ্দীপনী উৎস ছিল প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন-বিদ্যার চর্চা। মাইকেল ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের উৎস অতিক্রম করে ইতালীয় রেনেসাঁসের জীবনস্বরূপ প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের প্রাথমিক উৎসেও পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশপস্ কলেজে পড়ার সময় তিনি গ্রীক ও লাতিন পড়েছিলেন। মাদ্রাজ প্রবাসকালে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে গ্রীক ও লাতিন তাঁর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লাতিন ভাষায় রচিত কাব্য সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ইওরোপ থেকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'তুমি কল্পনা করতে পারবে না লাতিন কাব্যগুলি কী সুন্দর।'[৫]

'ঈনিড' রচয়িতা ভার্জিলের সাঙ্গীতিক সহজ ও পেলব ভাষাগুণে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। হোরেসের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি তাঁর ইংরাজি-বাংলা বহু রচনায় পাওয়া যায়। ওভিদের পত্রকাব্যের আদর্শে তিনি লেখেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'বীরাঙ্গনা কাব্য'।

গ্রীকভাষার মহাকবি হোমারকে তিনি কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন, তা ব্যক্ত হয়েছে '*হেক্‌টর বধ*' নামক অনুবাদধর্মী রচনার ভূমিকায়,

> "সময়াতিপাতার্থে উরূপাখণ্ডের ভগবান কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ঈলিয়াস নামক কাব্য সদা সর্বদা পাঠ করিতাম।......মহাকাব্য রচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস রচয়িতা কবি যে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন।"[৬]

'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রসঙ্গে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ঈডা পর্বতে জুপিটারের সঙ্গে জুনোর সাক্ষাৎ দৃশ্যটি অনুকরণ করেছি।'[৭] গ্রীক পুরাণের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর '*পদ্মাবতী*' নাটক 'Greek story of the golden apple Indianised.' বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

> "গ্রীক পুরাণের সৌন্দর্য্য আমাদের ভাষায় রূপায়িত করার অভিলাষ আমি পোষণ করি। শুধু গ্রীক গল্প ধার করা নয় আমি চাই গ্রীকরা যেমন করে লেখে তেমন করে লিখতে।"[৮]

নিজের কোন কোন রচনাকে তিনি 'প্রি-ফোর্থ গ্রীক' বলেও উল্লেখ করেছিলেন।

'সংস্কৃত দেবভাষা মানবমণ্ডলে'

ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষদের আদর্শে গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের খনিতে তাঁর সরাসরি যাতায়াত ছিল। রেনেসাঁসের স্বরূপলক্ষণ অনুসারে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হলেও, সৎ ভারতীয় কবি হিসাবে মাইকেলের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল ঐতিহ্যকে। রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,

> "হিন্দুত্ব সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই বটে তবে আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মহান পৌরাণিক কাহিনীগুলি ভালবাসি, এগুলি কবিত্বের আকরস্বরূপ।"[৯]

মাদ্রাজে প্রবাসকালে তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন। ইংরাজি ভাষার কবি হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করে তিনি যখন মাতৃভাষায় ফিরে এলেন, তখন ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্রই হয়ে উঠল তাঁর প্রধান আশ্রয়। *'শর্মিষ্ঠা', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য'* প্রভৃতি প্রতিটি রচনার বিষয়বস্তু ও চরিত্র তিনি সংস্কৃত থেকেই অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করেছেন। কালিদাস মাইকেলের বন্দনায় 'কবীন্দ্র',[১০] বাল্মীকি 'কবিকুল-পতি'।[১১] '*মেঘনাদবধ কাব্য*'-এর চতুর্থ সর্গে তিনি বাল্মীকির প্রতি নিবেদন করেছেন অনুসারীর শ্রদ্ধা,

> "নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
> বাল্মীকি। হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
> তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
> দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"[১২]

সংস্কৃত ভাষার শক্তি ও সামর্থ্যকে আশ্রয় করেই বাংলা ভাষায় নবজীবন সঞ্চার সম্ভব, একথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। বাংলা ভাষায় ব্লাঙ্ক-ভার্সের অনুরূপ অমিত্রছন্দ লেখা সম্ভব কিনা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাতে সংশয় প্রকাশ করলে মাইকেল বলেন, 'ভুলে গেলে চলবে না বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা।'[১৩] 'সংস্কৃত' নামক একটি সনেটে মাইকেল সংস্কৃত ভাষাকে যে ভাষায় বন্দনা করেছেন তাতে রেনেসাঁসের মর্মসত্যটিই (রিভাইভ্যাল অব ক্লাসিক্যাল লার্নিং) যেন ব্যক্ত হয়েছে ঃ

"সংস্কৃত দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে

কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরী
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব-আদিত্যের রূপে। পূর্বরূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্বরূপে, পুনঃ পূর্বরসে।"[১৪]

'সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে'

গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃতের মত তিনটি ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক উৎসে তাঁর যেমন যাতায়াত ছিল তেমনি ইংরাজি ছাড়াও বেশ কয়েকটি ইওরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। ইতালি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যের মিল্টন, সেক্সপীয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, ক্যাম্পবেল, টেনিসন প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তিনি মনে করতেন,

'Nothing can be better than Milton'......
'Milton is divine'.[১৫]

ব্লাঙ্ক-ভার্সের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা মিল্টন বাংলাতে ব্লাঙ্ক-ভার্সের অনুকরণে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' রচনা করে তিনি বাংলা কবিতাকে পয়ারের বেড়ি থেকে মুক্তি দেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে এ-সম্পর্কে লিখেছেন,

"ব্লাঙ্ক-ভার্স বাংলা ছন্দকে নবজীবন দান করবে এবং কালে আমাদের কবিরা আধুনিক ইওরোপীয় কবিদের সমতুল্য কাব্য রচনা করবে', 'like the modern Europeans we too shall equal, if not surpass."[১৬]

প্রখ্যাত শিক্ষক ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছ থেকে যিনি নিয়েছিলেন সেক্সপীয়রের পাঠ, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত '*রত্নাবলী*' নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে টের পেলেন বাংলা নাটকের দারিদ্র্য। অসন্তোষ আর অতৃপ্তির সিঁড়ি ভেঙে '*রত্নাবলী*'র অনুবাদ থেকে '*শর্মিষ্ঠা*', '*শর্মিষ্ঠা*' থেকে '*পদ্মাবতী*' এবং '*পদ্মাবতী*' থেকে '*কৃষ্ণকুমারী*'তে অতি দ্রুত পৌঁছেছিলেন তিনি। '*কৃষ্ণকুমারী*' বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। মাইকেলের সামনে ইওরোপীয় নাট্যকাররাই যে আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন, তা জানা যায় ১৮৬০ সালের ১৫ মে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটা চিঠি থেকে, 'যদি বেঁচে থাকি ইওরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আদর্শে আমি আরো নাটক লিখব।'[১৭]

বঙ্গভাষার নবজীবনের স্বার্থে মাইকেল কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে ছিলেন, তার নিবিড় চিত্র ধরা পড়েছে, মাদ্রাজ থেকে লেখা একটি চিঠিতে।[১৮] (১৮ আগষ্ট, ১৮৪৯) তিনি লিখেছেন তাঁর ভাষাচর্চার রুটিন এইরকম : ৬টা-৮টা হিব্রু, ১২টা-২টা গ্রীক, ২টা-৫টা তেলেগু এবং সংস্কৃত, ৫টা-৭টা ইংরাজি। চিঠিতে তামিল ভাষা চর্চার কথাও আছে। চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন, "আমার মাতৃভাষাকে ('father's tongue') সমৃদ্ধ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কি আমি নিজেকে প্রস্তুত করছি না।" ভাষাচর্চার এই আত্যন্তিক আগ্রহ ইওরোপ প্রবাসকালেও বর্তমান ছিল। ১৮৬৪ সালের ১১ জুলাই এক চিঠিতে[১৯] তিনি লিখছেন,

> "ফরাসি ও ইতালি ভাষা আমি রপ্ত করে নিয়েছি। জার্মানও শীঘ্র শিখে নেব। লাতিন, ফরাসি ও ইতালির পর স্প্যানিস ও পর্তুগিজ ভাষা শিখে নেওয়া এমন কিছু শক্ত হবে না।"

এর মাত্র তিন মাস পর ৩০ অক্টোবর, ১৮৬৪ তারিখে ভার্সাই থেকে অন্য এক চিঠিতে[২০] লিখেছেন,

> "জার্মান ভাষার নিরুদ্ধ দরজা আমি খুলে ফেলেছি। দারুণ লাগছে। আমি এখন গ্যেটে, শীলার, বেবর পড়ছি। ...... এটা একটা চমৎকার, সামান্য কঠিন হলেও, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভাষা।"

পরবর্তীকালে হোমারের '*ঈলিয়াস*' কাব্যের অনুসরণে পরুষ-গদ্যে মাইকেল লেখেন '*হেক্টর বধ*'। তার ভাষা সম্পর্কে একটি আলোচনায় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মন্তব্য করেন, 'হেক্টরবধের গদ্য অনেকটা জার্মান ছাঁচে ঢালা।'[২১] ইওরোপ প্রবাসকালে যেসব ভাষার চর্চা তিনি করেছিলেন, তার মধ্যে ইতালি ভাষা-শিক্ষা বিশেষ কাজে আসে। ১৮৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা একটি চিঠিতে[২২] তিনি জানিয়েছেন, 'আমি এখন পেত্রার্কা পড়ছি এবং তাঁর মত সনেট বাংলায় লেখার চেষ্টা করছি।' '*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*' নামে শতাধিক সনেট তাঁর সেই চেষ্টারই সোনালি ফসল। বিভিন্ন ভাষাচর্চা ও সাহিত্যপাঠের প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। '*মেঘনাদবধ কাব্যে*' রামের তুলনায় রাবণকে বড় করে দেখানোর প্রেরণা তিনি তামিলভাষার কবি কম্বণ বা দ্রাবিড়জাতির রামায়ণ-চেতনা থেকে পেয়ে থাকতে পারেন। মাদ্রাজে থাকা কালে তিনি যে তামিল ও তেলেগু ভাষার চর্চা করেছিলেন তাঁর পত্রে তার উল্লেখ আছে।

'পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে'

বুর্খহার্ডট লিখেছেন, রেনেসাঁসের ইতালি গ্রীক ও আরবদের মত ভাষাচর্চাকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। কেননা ভাষাই হচ্ছে শিক্ষিত জাতির গৃহস্বরূপ।[২৩] গ্রীক ও ল্যাতিন ভাষায় পারদর্শিতার সূত্রেই ইতালির বুদ্ধিজীবীরা 'হিউম্যানিস্ট' নামে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। গ্রীক পুঁথির লাতিন-অনুবাদ ও সংস্করণের মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছিল রেনেসাঁসের বিদ্যা আহরণের ইতিহাস। দান্তে ভার্জিলের হাত ধরে '*ডিভাইন কমেডি*'র পথ-পরিক্রমা করেছেন। পেত্রার্কা

হতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ের সিসেরো। ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রথম পর্বে লাতিন ভাষা হয়ে উঠেছিল 'লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কা' (Lingua Franca)। ধীরে ধীরে তার সাহিত্যিকরা লাতিন থেকে মাতৃভাষা ইতালিতে ফিরে এসেছিলেন। লাতিন ভাষার চর্চা বৃথা যায়নি। লাতিন চর্চার সূত্রেই পেত্রার্কা নব্যসাহিত্যধারার জনক হয়ে ওঠেন। 'Albion's shore'-এর সোনালি স্বপ্ন হাতছানি দিত মাইকেলকে। ১৮ বছর বয়সেই তাঁর কবিতা লন্ডনের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের ঠিকানায় ছুটে যেত। তিনি হতে চেয়েছিলেন ইংরাজি ভাষার বড় মাপের কবিদের একজন। তাঁর ইংরাজি কাব্য *'ক্যাপটিভ লেডি'* ব্যর্থ হল তাঁর প্রত্যাশা ও সৌভাগ্যপূরণে। আলেকজান্ডার পোপের সূত্র মেনে যিনি পরিজনদের ছেড়ে নিঃশব্দে রওনা দিয়েছিলেন মাদ্রাজের পথে,[২৪] তিনি একদিন ফিরে এলেন কলকাতায়। এই প্রত্যাবর্তন এক অর্থে হয়ে উঠল মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তন। দায়িত্ব পেয়েছিলেন একটি বাংলা নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করার। মূলের দারিদ্র্যে বিরক্ত হয়ে তিনি নিজেই লিখে ফেললেন একটি বাংলা নাটক *'শর্মিষ্ঠা'*। সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলেন প্রভূত সমাদর। মাইকেল লিখলেন, "আমি যে সহসা এতটা সাফল্য লাভ করব এ আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। 'শর্মিষ্ঠা' আমাকে বাংলার সেরা লেখকদের সারিতে বসিয়ে দিয়েছে।"[২৫]

> "নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
> অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি ......"[২৬]
>
> 'ভাই সত্য বলিতেছি', আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর। কেবল প্রতিভাশালী লোকেদের হাতে ইহা মার্জ্জিত হওয়া চাই মাত্র। ...... ইহাকে মহাভাষা অথবা মহাভাষার উপকরণগুলি এই ভাষায় বিদ্যমান, একথা বলা যাইতে পারে। এই ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিতে আমার ইচ্ছা হয়।"[২৭]

ইংরাজি থেকে মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তনের এই মাইকেলী বৃত্তান্তটি রেনেসাঁসের ভাষা-প্রকল্পেরই একটি রূপক-বৃত্তান্ত। কেউ কেউ মাইকেলকে 'ইংল্যান্ড প্রেমের শহীদ'[২৮] হিসাবে চিহ্নিত করলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, প্রাচীন ও আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল কর্ষণের সৌজন্যেই তিনি বদলে দিতে সক্ষম হন মাতৃভাষার রঙ ও রূপ। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের যে বৃক্ষ রোপণ করে গিয়েছিলেন, ইয়ং বেঙ্গলরা ছিলেন তার শাখা-প্রশাখা স্বরূপ, মাইকেলের মাতৃভাষা চর্চায় তারই পুষ্পিত পরিণাম লক্ষ করা যায়।

রেনেসাঁসের মানুষ

রেনেসাঁসের মানুষ হিসাব করে বাঁচতে শেখেনি। সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের মধ্যেও সে অভিজাত; সঞ্চয়ের বিনিময়েও সে যাপন করে সৌন্দর্য-বিলসিত জীবন ; উপার্জন ও উপব্যয়ের এক আশ্চর্য গরমিলের নাম রেনেসাঁস। 'প্রিন্স অব রেনেসাঁস' নামে খ্যাত লরেঞ্জো দ্য মেদিচি শিল্পী ও হিউম্যানিস্ট পরিবৃত ভিলাতে বসে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন গোটা ইওরোপ-জুড়ে ছড়ানো তাঁদের পারিবারিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসার কথা। পোপ লিও-১০ম স্থাপত্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে এত ঋণ করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর ইতালির

ব্যাঙ্কগুলি সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। ইতালীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস ক্রমশ-নিঃস্ব এক আভিজাত্যের জৌলুষের ইতিহাস। মাইকেলের ব্যক্তিজীবনেও আমরা সেই জিনিসই লক্ষ করি। রেনেসাঁসের এক কবি আরেতিনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন ডিউকের মত; কার-পরিহিত রাফায়েলের পোশাকের বাহার দেখে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো একবার ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'তোমাকে দেখে শিল্পী বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে নবাব।'[২৯] এই নবাবী মেজাজ মাইকেলেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কর্পদকশূন্য অবস্থাতেও তিনি প্রবাস থেকে ফিরে এসে ওঠেন ব্যয়বহুল স্পেনসেস হোটেলে। "তিনি কখনো কখনো স্পষ্টই বলিতেন চল্লিশ হাজার টাকা বৎসরে না হইলে ভদ্রলোকের কিরূপে চলিতে পারে।"[৩০] খরচের প্রসঙ্গ তুললে, বলতেন, 'আমার সঙ্গে যাহা থাকে তাহা প্রায় বাসি হয় না।'[৩১] ছোট্ট একটি পরিবারের মালিক টিসিয়ান সমুদ্রতীরবর্তী যে বাড়িটিতে থাকতেন তার বিশালত্ব ও সাজসজ্জা ছিল চমকপ্রদ। ৬নং লাউডন স্ট্রিটের সুরম্য যে অট্টালিকায় মাইকেল এক সময় থাকতেন, তা সজ্জিত ছিল ইওরোপীয় ফ্যাসানে বা ফরাসি আদলে। তার সংলগ্ন উদ্যান, আসবাবপত্র, গালিচা, পর্দার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য দেখে আগন্তুকরা বিস্মিত হতেন। তার পুস্তকাধারে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ক্লাসিক কাব্য-সাহিত্য ঠাসা থাকত, আর সেই পাঠাগারের শোভা বর্ধন করত হোমার, দান্তে, ভার্জিল, তাসো, মিল্টন সেক্সপীয়রের ধাতু বা প্রস্তর-নির্মিত বহুমূল্য অর্ধ-মূর্তিসমূহ।[৩২] বাড়ি ভাড়া দিতে না পারার জন্য প্রবাসে যাঁকে প্রায় ফরাসি জেলে যেতে হচ্ছিল তিনি গৌরদাস বসাককে ইওরোপের অভিজাত জীবনযাত্রার সপ্রশংস বর্ণনা দিয়ে একটি চিঠিতে[৩৩] লিখেছেন—

> "কোনো সন্দেহ নেই এটাই পৃথিবীর সর্বোত্তম অংশ। কয়েক ফ্রাঙ্ক খরচ করলে এখানে যে মধ্যাহ্ন ভোজন মেলে তা বর্ধমানের মহারাজারও স্বপ্নের বিষয় ...... নৃত্য-গীত-সৌন্দর্যের এমন আয়োজন। .....'This is the অমরাবতী' of our ancestral creed."

বেহিসেবী এই মানুষটির শেষ দিনগুলি কেটেছিল দারিদ্র্য ও রোগ-জর্জরিত অবস্থায়। জনৈক মনিরুদ্দীন মুন্সী রোগশয্যায় শায়িত মাইকেলকে দেখতে এসেছেন কিছু ফল ও পুষ্প নিয়ে। মাইকেল অতি কষ্টে বললেন, 'তোমার কাছে কিছু আছে কি?'[৩৪] প্রখ্যাত হিউম্যানিস্ট ফাইলেলফোর বর্ণময় বেহিসেবী জীবনের শেষদৃশ্যটি প্রায় একই রকম রিক্ততা দিয়ে আঁকা। মাইকেল হচ্ছেন রেনেসাঁসের সেই মানুষ যিনি জীবনের পলতের দু'দিকে আগুন দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেন।

'রাজেন্দ্র সঙ্গমে'

ইতালীয় রেনেসাঁস পৃষ্ঠপোষক-সেবিত। পেট্রনদের দেওয়া কমিশন ও নির্দেশ অনুযায়ী তার শিল্পী ও বিদ্বানদের শিল্প ও বিদ্যাচর্চা। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকদের জন্য যে 'প্রাণসঞ্চারক ভাবুক সঙ্গ'-এর কথা বলেছিলেন, রেনেসাঁসের পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন তদতিরিক্ত কিছু। রাজন্যক লরেঞ্জোর পৃষ্ঠপোষকতায় মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কিভাবে বিবর্ধিত হয়েছিলেন, বা রাফায়েল কিভাবে পোপ লিও-১০ম প্রদত্ত প্রভূত সম্মানমূল্য ও যথেচ্ছ স্বাধীনতার মধ্যে

কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে বাহুল্য। টিশিয়ান রাজা পঞ্চম চার্লসের পোর্ট্রেট আঁকছেন। তুলিটি ছিটকে পড়ল হাত থেকে। রাজা নীচু হয়ে তুলিটি কুড়িয়ে তুলে দিলেন শিল্পীর হাতে।[৩৫] প্রভূত সম্মান-মূল্যের সঙ্গে এই প্রাণসঞ্চারক অন্তরঙ্গতা রেনেসাঁসের বিদ্যা ও শিল্পচর্চাকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল। এ-জাতীয় কোন পৃষ্ঠপোষকতা বঙ্গীয় রেনেসাঁসে সম্ভব ছিল না। ভাঙা-চোরা রাজা আর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফাঁদে আটকে পড়া বুর্জোয়ারা তার শিল্পী-সাহিত্যিকদের আর কতদূর পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারতেন? মাইকেল কবি হিসাবে প্রাণসঞ্চারক ভাবুকের সঙ্গ ও উত্তাপ যে নিরন্তর খুঁজেছেন তার হদিশ আছে গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিপত্রগুলিতে। ১৮ বছর বয়সে মাইকেল এক সম্পাদককে লেখেন 'সম্মান আপাতত আমার অভীষ্ট নয়, আমি চাই শুধুমাত্র উৎসাহ'—

> "Fame, Sir is not my object at present ......
> all that I require is encouragement."[৩৬]

বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের আগমন, আত্মপ্রকাশ ও সাফল্য-সঙ্কোচনের ইতিহাসটি অদ্ভুভাবে রেনেসাঁস-সুলভ পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে জড়িত। মাদ্রাজ থেকে কলকাতা ফিরে বন্ধুবর গৌরদাস বসাকের সৌজন্যে বেলগাছিয়ার রাজরঙ্গশালার হর্তাকর্তাদের কাছ থেকে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত '*রত্নাবলী*'র ইংরাজি অনুবাদ-কর্মের বরাদ্দ পেয়েছিলেন। এ-জন্য তাঁকে সম্মানমূল্য দেওয়া হয়েছিল পাঁচশত টাকার একটি চেক।[৩৭] অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বুঝলেন বাংলা নাটকের দুরবস্থা। গুণগ্রাহী রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি লিখলেন প্রথম বাংলা নাটক '*শর্মিষ্ঠা*'। লিখে উভয়ের কাছে অভূতপূর্ব সমাদর পেলেন। এ নাটক উৎসর্গ করেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে। মঙ্গলাচরণে লেখেন, "মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের কি পর্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।"[৩৮] উৎসাহিত মাইকেল এরপর লেখেন '*পদ্মাবতী*', ও '*কৃষ্ণকুমারী*' নাটক। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধে ও প্রেরণায় এর মধ্যে লেখেন দু'টি অনবদ্য প্রহসন '*একেই কি বলে সভ্যতা*' ও '*বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*'। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক এই প্রহসন দু'টির অভিনয় নিয়ে ঝামেলা হয়। মাইকেল এতে ক্ষুণ্ণ হয়ে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন, "প্রহসনগুলির ব্যাপারে তোমরা আমার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছ।"[৩৯] এর মধ্যে 'ইন্দো-মুসলমান' বিষয় নিয়ে নাটক লেখার একটি খসড়া (রিজিয়া) তিনি পেশ করেছিলেন।[৪০] কিন্তু মুসলমানী বিষয়ের প্রতি নাট্য-কর্তৃপক্ষের অনীহার কারণে অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে নাটক আর তাঁর লেখা হয়নি। '*কৃষ্ণকুমারী*'র অভিনয় নিয়ে অবহেলা করা হলে তিনি বাংলা লেখাই ছেড়ে দেবেন বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এক চিঠিতে,[৪১] "I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese." পেট্রনের অবহেলায় ক্ষুব্ধ হয়ে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো একবার লিও-১০মকে অনুরূপ ভাষায় লিখেছিলেন, 'আজ আমি তোমার সাক্ষাৎ না পেয়ে ফিরে যাচ্ছি। এরপর তুমি যদি কখনো আমাকে চাও 'you must look for me elsewhere than at Rome'[৪২] ইতিমধ্যে মাইকেলের অন্যতম পেট্রন ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যু হয়। '*কৃষ্ণকুমারী*'র ভূমিকায়

তিনি লিখেছেন, "এই কাব্য বিষয়ে উক্ত রাজা আমাকে যে কতদূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না যে আর এ পথের পথিক হই।"[৪৩] অতঃপর সত্যই মাইকেল নাটক লেখার ব্যাপারে নিজেকে গুটিয়ে নেন।

'*তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*' মাইকেলের প্রথম বাংলা কাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই কাব্যে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দ মূলত পৃষ্ঠপোষক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাংলায় ব্লাঙ্ক-ভার্সের অনুরূপ ছন্দ লেখা সম্ভব কিনা তা নিয়ে চ্যালেঞ্জের ফল। বিতর্কের সময় অঙ্গীকারের সুরে যতীন্দ্রমোহন বলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোন বাংলা কাব্য লিখলে তা প্রকাশের ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। হিতৈষীর সেই সহৃদয় আশ্বাসে উদ্দীপিত হয়ে মধুসূদন লেখেন '*তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*'। এ কাব্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত। তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি তার পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক গ্রহণের ছায়াচিত্র রিনেক কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।[৪৪] মাইকেলের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি যতীন্দ্রমোহন পরম সমাদরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সূচনা স্মারক হিসাবে তাঁর রাজ-পাঠাগারে রক্ষা করেছিলেন।[৪৫] কবি ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকের এই মর্যাদাদায়ী সম্পর্ক রেনেসাঁসের পৃষ্ঠপোষকের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

'*মেঘনাদবধ কাব্য*'-এর প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করেন রাজা দিগম্বর মিত্র। এ কাব্য তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল। '*ব্রজাঙ্গনা কাব্য*' প্রকাশিত হয় কাব্যটির পাণ্ডুলিপি পাঠে মুগ্ধ জনৈক বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায়।[৪৬] '*বীরাঙ্গনা কাব্য*' মাইকেল উৎসর্গ করেন 'বঙ্গকুলচূড়' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। অদ্বিতীয় শুভানুধ্যায়ী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলের সম্পর্ক ইতালীয় রেনেসাঁসে মহাকবি দান্তে ও রেনেসাঁসের সূচনা-চিত্রী জোত্তোর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। জোত্তো দান্তের প্রথম প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, দান্তে প্রতিবন্ধুকৃত্য করেছিলেন '*ডিভাইন কমেডি*'তে (পরিশুদ্ধি পর্বত, একাদশ সর্গ) জোত্তোর চিত্রীপ্রতিভার সপ্রশংস উল্লেখ করে। বিদ্যাসাগর মাইকেলের একটি চাকরির আবেদনপত্রে সুপারিশমূলক মন্তব্যে নোট দেন, 'একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাঠাইলাম, দেখিও যেন বাতাসে উড়িয়া না যায়।'[৪৭] মাইকেল বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন একাধিক সনেটে—

> "বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
> করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
> দীন যে, দীনের বন্ধু। উজ্জ্বল জগতে
> হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।"[৪৮]

'আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ ......'

রেনেসাঁসের সংস্কৃতি স্বাদেশিক নয়, 'কসমোপলিটান'।[৪৯] তার হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা নির্দিষ্ট ভূগোল ও সময়ের গণ্ডী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাকারবিভক্ত ইতালির এক নগররাষ্ট্র থেকে আরেক নগররাষ্ট্রে তাঁরা তাঁদের বিদ্যা ও শিল্পগত যোগ্যতার মূলধন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কোন নির্দিষ্ট নগর বা স্থানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য আত্যন্তিক ছিল

না। ভ্রামণিক হিউম্যানিস্ট ফাইলেলফো এই ভাবেই জয় করে নিয়েছিলেন গোটা ইতালির হৃদয়। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি জন্মগ্রহণ করেন টাসকান প্রদেশে, শিক্ষানবিশী করেন ফ্লোরেন্সে, তারপর কর্মব্যপদেশে বিভিন্ন সময় তিনি মিলান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোমাগনা, পুনরায় মিলান, রোম ঘুরে শেষে অ্যামবসে গিয়ে সমাপ্ত করেন তাঁর জীবন-পরিক্রমা।[৫০] প্রাচীন-বিদ্যার প্রতি নিবিড় ও মমতাময় আগ্রহের কারণে তাঁরা মানসিক ভাবে ডিঙিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন সমকালকেও। ইতিহাস বা ঐতিহ্য চেতনার এই বেধ ও ভৌগোলিক পরিভ্রমণের ব্যাপ্তি তাঁদের চরিত্রে এক ধরনের সর্বজনীনতা এনে দিয়েছিল।

মাইকেলের সাংস্কৃতিক চরিত্র রেনেসাঁস অর্থেই ছিল কসমোপলিটান। বিভিন্ন ভাষা-চর্চা ও অধ্যয়নের পথ ধরে তিনি বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষার সীমা অতিক্রম করে গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, ইংরাজি, ইতালি, ফরাসি, জার্মান, ফার্সি, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় রচিত সাহিত্যের বিশাল-বিস্তৃত জগতে পরিভ্রমণে-সক্ষম ছিলেন। উইল ডুরান্ট লিখেছেন 'Renaissance man always in motion and discontent, fretting at limits, longing to be an 'Universal man.'[৫১] হিন্দু কলেজ থেকে বিশপস্ কলেজ ; এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্ম; কলকাতা থেকে মাদ্রাজ ; ভারত থেকে ভার্সাই ; রেবেকা থেকে আঁরিয়েত্তা ; ইংরাজি থেকে বাংলা; নাটক থেকে কাব্য; প্রহসন থেকে পত্রকাব্য; মহাকাব্য থেকে চতুর্দশপদী—এক নিরন্তর অতৃপ্তি ও ভ্রমণপরায়ণতা মাইকেলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। তাঁর রচনার বিজাতীয় আবহ সম্পর্কে সম্ভাব্য সংশয়ের জবাব গৌরদাস বসাককে লেখা একটি চিঠিতে[৫২] লিখেছেন—

> "যদি ভাষা শুদ্ধ, ভাবাবেগ হৃদয়গ্রাহী, বৃত্তান্ত আকর্ষণীয় এবং চরিত্রগুলি খাঁটি হয় তবে তার বিজাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন অর্থ হয় না। তুমি কি মূরের কাব্য অপছন্দ কর তার প্রাচ্যত্বের জন্য ; বায়রনের কাব্য তার এশীয় আবহের জন্য ; অথবা কার্লাইলের গদ্য তার জার্মানত্বের জন্য?"

বাংলা কাব্যের অঙ্গনে তিনি ধ্রুপদী মহাকাব্যের কবি ব্যাস, বাল্মীকি, হোমারের সঙ্গে মিলিয়েছিলেন ভার্জিল, মিল্টন, তাসো ও কালিদাসকে। মিল্টনের ব্লাঙ্ক-ভার্সের অনুরূপ অমিত্রাক্ষর ছন্দ; পেত্রার্কার সনেটের অনুরূপ 'চতুর্দশপদী-কবিতাবলী' ; ওভিদের পত্রকাব্যের অনুরূপ *'বীরাঙ্গনা কাব্য'* ; বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে *'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'*—বিচিত্রের এক অপরূপ সমারোহ। মাইকেল বাংলা সাহিত্যকে যেন বিশ্বসাহিত্যের পুষ্পোদ্যানে পরিণত করতে চেয়েছেন।

> "গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
> তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
> বিবিধ ভূষণে ভাষা ;....."[৫৩]

'Leave aside all religious biasness'

আধুনিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম ইতালীয় রেনেসাঁসে না থাকলেও তার রাজন্যক, পোপ, হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীদের কাণ্ডকারখানায় এটা স্পষ্ট যে, পার্থিব ও

মানবিক ব্যাপারগুলিকেই তাঁরা বেশি মূল্য দিতে শুরু করেছিলেন। ধর্মীয় প্রসঙ্গ থেকে তাঁদের চিত্রকলা মুক্ত হয়েছিল এমন নয়, তবে ধীরে ধীরে তার মধ্যে প্যাগান-জীবনবাদ প্রবিষ্ট হয়। মেরী ও ভার্জিনের রাজত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে ভেনাস ও ম্যাডোনারা। ভার্জিনের ছবিতে আফ্রোদিতি ও সেবাস্তিয়ানের ছবিতে অ্যাপোলো ছায়া ফেলতে থাকে।[৫৪] ভার্জিনের ছবি থেকে নগ্ন 'স্লিপিং-ভেনাস'-এর ছবিতে চলে যেতে টিসিয়ানের কোন অসুবিধা হত না। শিক্ষাবিদ ভিত্তোরিনো, শিল্পী সেপ্রিনি, সাহিত্যিক আরেতিনো বা রাজন্যক লরেঞ্জো এঁরা ঈশ্বর বা পরকাল নিয়ে তেমন চিন্তিত ছিলেন বলে মনে হয় না। মাইকেল হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁকে কোন ধর্মবিশ্বাসী বা গোঁড়া মানুষ হিসাবে গণ্য করা যায় না। বিশ্বাসের পরিবর্তে ঐহিক লাভালাভের দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ। গির্জার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই যে তিনি সারাজীবন রাখেননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল অন্তিমকালে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোন মতে হবে তা নিয়ে হুলস্থুল পড়ে যায়। শুভানুধ্যায়ী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়ে বিশপের অনুমতি আনতে যেতে চাইলে মাইকেল বলেন—

> "আমি মনুষ্যনির্মিত গির্জার সংশ্রব গ্রাহ্য করি না...... পৃথিবী তলে শ্যামশষ্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া থাকে।"[৫৫]

ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ারের সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে তাঁকে চিনতে ভুল হয় না। গৌরদাস বসাককে এক চিঠিতে[৫৬] (১৮৪৯, ২২ জানুয়ারি) মাইকেল লিখেছিলেন—"I am free as the air, as independent as the winds."

বস্তুতপক্ষে ধর্মীয় গোঁড়ামির কোন শৃঙ্খলই বাঁধতে পারেনি তাঁর মনের এই স্বাধীনতাকে। তাই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করতে তাঁকে কোন মানস সংকটে পড়তে হয়নি। মাদ্রাজ থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দু পুরাণ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান দেখে বন্ধুবর ভূদেব (মুখোপাধ্যায়) বিস্মিত হয়ে যাবে। বন্ধু রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে[৫৭] লেখেন, হিন্দুধর্ম নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামালেও,

"I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry." প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু চরিত্র ও প্লট নির্বাচন করেছেন। সর্বপ্রকার ধর্মীয় আচ্ছন্নতা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত তাঁর সাহিত্যজগৎ। কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস রামায়ণের কাহিনীকে ভক্তিরসে সিক্ত করে দিয়েছিলেন, মাইকেল সে-জায়গায় দৈবীবাদের বিরুদ্ধে মানবিক পৌরুষকে মহিমান্বিত করে লিখেছেন '*মেঘনাদবধ কাব্য*'। '*ব্রজাঙ্গনা*'য় তিনি গ্রহণ করেছেন বৈষ্ণব বিষয় কিন্তু ধর্মীয় আসক্তি বা বিদ্বেষ থেকে মুক্ত এক শৈল্পিক দৃষ্টি দিয়ে রচনা করেছেন 'Poor lady' রাধার নারীত্বের বেদনা-বিহ্বল রূপ। রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে[৫৮] এ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন, 'যখন কাব্যপাঠ করতে যাবে তখন Leave aside all religious biasness.'

'ইন্দো-মুসলমান' বিষয় নিয়ে একটি নাটক রচনার খসড়া পরিকল্পনা (রিজিয়া) তিনি পেশ করেছিলেন বেলগাছিয়া রঙ্গশালা-কর্তৃপক্ষের কাছে। একটি চিঠিতে[৫৯] তিনি লিখেছেন—"জাতিগত ভাবে মুসলমানদের মধ্যে যে তীব্রতা আছে, তাতে ভাবাবেগ প্রস্ফুটনের অসামান্য

সুযোগ পাওয়া যাবে। বিশেষ করে তাদের মহিলাচরিত্রে অনেক বেশি গৌরবদীপ্ত ঐকান্তিকতা বর্তমান।" কিন্তু মুসলমানী বিষয়ের প্রতি রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকদের অনীহার কারণে সে নাটক তাঁর লেখা হয়নি। মহরমের শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করে খিদিরপুর থেকে মাইকেল এক চিঠিতে[৬০] লিখেছেন হোসেন ও তার ভাইয়ের ট্রাজিক মৃত্যু নিয়ে মুসলমানদের একটি সত্যিকার জাতীয়-কাব্য লেখা সম্ভব। *'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'* নামক প্রহসনে ধর্মধ্বজী ভক্তপ্রসাদকে শায়েস্তা করতে হানিফ ও বাচস্পতির যৌথ-ভূমিকাটি তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা শুধু তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মনের পরিচায়ক নয়, ধর্মের অন্তরালে কায়েম হয়ে থাকা সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী ও মুক্তমনা মানুষের সবল প্রতিবাদ-চিত্র হিসাবেও স্মরণীয়।

'আজি এ প্রভাতে রবির কর'

রেনেসাঁসের যুগ ব্যক্তিত্বের মুক্তি ও ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশের যুগ। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রেব প্রাথমিক উদয়লগ্নে বিত্ত, বিদ্যা ও শিল্পগুণের অবাধ কর্ষণ শুরু হয়েছিল। ফলে বহু অনন্য, বহুমুখী এবং বৈশ্বিক প্রতিভার বিকাশ রেনেসাঁসের কালে দেখা যায়। জন্মগত পরিচয়ের বাঁধা সীমা ও সামাজিক শ্রেণী পরিচয়ের স্থাবর অবস্থান ভেদ করে হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা এ-সময় ভঙ্গিল পর্বতের মত শীর্ষচূড় ও অহংলেহী হয়ে ওঠেন। বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট ও কবি পলিজিয়ানো লিখেছেন, নিম্নবৃত্তের এক অখ্যাত-অজ্ঞাত পরিবার থেকে তিনি মর্যাদা ও খ্যাতির চূড়ায় চলে এসেছিলেন।[৬১] হস্তশিল্পের সীমানা ডিঙিয়ে এসময় উঠে আসেন ব্রুণেলেস্কি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো বিশ্ববরেণ্য শিল্পীরা। ব্যক্তিপ্রতিভার অনুরূপ বিস্ফোরণ আমরা লক্ষ্য করি মাইকেলের মধ্যে। 'যশোরে সাগরদাঁড়ী, কবতক্ষ-তীরে'র এক জাতক পরিবর্তিত যুগপরিবেশের আনুকূল্যে এক অনন্য ও বিদ্যুৎ-ঝলকিত-প্রতিভারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। হিউম্যানিস্ট পিকো দেল্লা মিরানদোল্লো বলেছিলেন, 'ইচ্ছা শক্তির জোরে মানুষ সব পারে।'[৬২] বহুমুখী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা আলবের্তি দেখিয়েছিলেন, একটি মানুষ কী না করতে পারে। মিলানের ডিউকের কাছে চাকরির আবেদনপত্রে অন্তত দশরকম যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যে চিঠিটি দিয়েছিলেন তা পড়ে সত্যি হতবাক হয়ে যেতে হয়।[৬৩] মাইকেলের জীবনবৃত্তান্তে, লিখিত চিঠিপত্রে বিদ্যাচর্চায় ও সাহিত্যকর্মে আছে সেই রেনেসাঁস-সুলভ ব্যক্তিত্বের প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস; যোগ্যতার সেই অসামান্য কর্ষণ ও প্রতিভার সেই বিস্ময়কর বিস্ফোরণ। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন,

"I shall come out like a tremendous comet and no mistake."[৬৪]

মাদ্রাজ থেকে লেখা একটি চিঠি[৬৫] ও ইওরোপ থেকে লেখা অপরাপর চিঠি[৬৬] থেকে জানা যায় বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় কী নিবিড়ভাবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন তিনি। প্রাচীন-আধুনিক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলিয়ে অন্তত এগারোটি ভাষায় তাঁর অবাধ গতায়াত ছিল। 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' নামে খ্যাত এরাজমুস বা ভাষাবিদ হিসাবে প্রখ্যাত লরেঞ্জো ভাল্লার চেয়ে মাইকেল কিছু কম জানতেন না।

অনুবাদের পথ ধরে ১৮৫৮ সালে তিনি *'শর্মিষ্ঠা'* নাটক লিখে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন। ১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে তিনখানি নাটক, দু'খানি প্রহসন, একখানি মহাকাব্য, একখানি করে আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য লিখে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটিয়ে দেন। যে-রকম অনায়াস দক্ষতায় তিনি পৌরাণিক প্রসঙ্গ থেকে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে ; লঘু হাস্যরসের প্রহসন থেকে *'কৃষ্ণকুমারী'*র মত বিষাদ-গম্ভীর ট্র্যাজেডিতে; *'তিলোত্তমাসম্ভব'* থেকে *'মেঘনাদবধ'* মহাকাব্যে ; করুণরসাত্মক গীতিকাব্য থেকে ওজস্বী পত্রকাব্যে বিচরণ করেছেন ; পয়ারের বেড়ি খুলে প্রায় চ্যালেঞ্জ রেখে ব্লাঙ্ক-ভার্সের অনুসরণে রচনা করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ; ইতালীয় সনেটের অনুসরণে লিখেছেন *'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'*—তা ইতালীয় রেনেসাঁসের বিশ্ববিশ্রুত বহুমুখী প্রতিভার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। *'জুলিয়াস স্তম্ভ'*-এর ভাস্কর্য থেকে *'সেন্টপিটারের স্থাপত্য'*-এ ; *'ডেভিড'*-এর তারুণ্যময় মূর্তি থেকে *''সিস্টিন চ্যাপেল'*-এর ফ্রেস্কো'য় অবাধে চলে যেতে পারতেন অ্যাঞ্জেলো। খ্রীষ্টীয় অলৌকিকতার ছবি *'ট্রান্সফিগারেশন'* থেকে *'নগ্ন ভেনাস'*-এর ছবিতে চলে যেতে টিশিয়ানের তুলি কখনো কাঁপত না।

মাইকেলের ব্যক্তিজীবন ও কাব্যিক প্রতিভায় যেমন একটা পৌরুষ ও অনায়াসসম্ভব যোগ্যতার প্রদর্শন আছে, তেমনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যেও আছে ব্যক্তিত্বের অত্যাশ্চর্য স্ফুরণ। *'মেঘনাদবধ কাব্য'*-এর রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা আমাদের সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব। *'বীরাঙ্গনা'*য় বিচিত্র-স্বভাবা নারী চরিত্রগুলির আত্মোন্মোচনও বিস্ময়কর।

> "পর্বত গৃহ ছাড়ি
> বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
> কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"[৬৭]

মুক্তির অসহ্য আকাঙক্ষায় বহির্মুখী এই চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বে আছে রেনেসাঁসের মর্মসত্য। অ্যাঞ্জেলোর *'ডেভিড'*, লিওনার্দোর *'মোনালিসা'*, বতিচেল্লির *'ভেনাস'*, ভেরোচিওর *'চেল্লোয়নি'*; দোনোতেল্লোর *'গাত্তামেলাতা'*, রাফায়েলের *'ম্যাডোনা'*, টিশিয়ানের *'চার্লস পঞ্চম'*[৬৮] যে মুক্তিস্নাত আনন্দলোকের বাসিন্দা মাইকেলের রেনেসাঁসে তার আহ্বান ও আকাঙক্ষা মাত্র আছে। আকাঙক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তির ; সম্ভাবনার সঙ্গে সম্মিলনের; স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অপেক্ষিত সন্ধি এখানে সম্পন্ন হয়নি। তাই কৃষ্ণকুমারীর চারপাশে মানবিক ষড়যন্ত্রের বলয় নিয়তির মত ঘনীভূত হতে থাকে ; পদ্মাবতী ক্রীড়নক হয়ে থেকে যায় দৈবী প্রতিযোগিতার অদৃশ্য পৃথিবীতে ; 'ফেভারিট' ইন্দ্রজিতের জন্য অশ্রুপাতের নিয়তি কবি এড়াতে পারেন না ; বুক পোড়ানো দীর্ঘশ্বাসে শেষ করতে হয় রাবণের পৌরুষপূর্ণ লড়াই; 'পুওর লেডি' রাধা ও জনমদুঃখিনী সীতা চুম্বকের মত টানতে থাকে মধুকবিকে। *'বীরাঙ্গনা'*র উর্বশী, ভানুমতী, দ্রৌপদী, তারা, দময়ন্তী, রুক্মিণী, সূর্পনখা অশ্রুচিহ্নিত-পত্রে নিজেদের আকাঙক্ষা ও প্রার্থনা 'নয়নকাজলে' বা বক্ষদীর্ণ শোণিতে লিপিবদ্ধ করেন মাত্র; প্রার্থনা মঞ্জুরের কোনো মিলনাত্তক গল্পে কবি তাঁদের পাঠাতে পারেন না। কেন এমন হয়? সে প্রশ্নের উত্তর বহু পূর্বে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমাজবাস্তবতা'[৬৯] নামক একটি প্রবন্ধে দিয়ে গেছেন। ধনবাদী সভ্যতার আগমনে যে

সমাজ-বিপ্লবের সূচনা এ দেশে হয়েছিল, যেহেতু তা অসমাপ্ত থেকে গেছে, তাই মুক্তির বাণী-মূর্তিগুলিও তেমন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে পারেনি।

'গাহিব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'

এঙ্গেলসের ভাষায় 'মধ্যযুগের শেষ কবি ও আধুনিক যুগের প্রথম কবি'[৭০] দান্তে '*ডিভাইন কমেডি*' নামক মহাকাব্য লিখে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও আধুনিকতার অতৃপ্ত আত্মার এক আশ্চর্য জলবিভাজিকা রচনা করেছিলেন। '*ঈনিড*' রচয়িতা প্রাচীন এক মহাকবি ভার্জিলের হাত ধরে নরক, পরিশুদ্ধি পর্বত পেরিয়ে দান্তে সেখানে চলেছেন স্বর্গের পথে তার প্রেয়সী বিয়াত্রিচের সন্ধানে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগের পুরাণ ও শিল্প-সাহিত্যের জগৎ থেকে নানা চরিত্র ও কাহিনী সেখানে উঠে আসে। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মহার্ঘ্য মূল্যবোধ ও মানবিক অভিজ্ঞতাগুলিকে নবোদ্ভিন্ন জীবন চেতনার আলোকে ধুয়ে মুছে দান্তে তাঁর মহাকাব্যের বিভিন্ন তাকে সাজিয়ে রাখেন। বিষয় আর প্রসঙ্গ-বৈগুণ্যে তাই কমেডিয়ার এক অংশ ভয়ানক, বীভৎস, জটিল ; অন্য অংশ শান্ত, সুন্দর, পবিত্র।[৭১] ইতালীয় রেনেসাঁসের পক্ষে এই মহাকাব্য বুর্খহার্ডটের ভাষায় সংযোজিত করেছিল 'a decisive weight.'[৭২] প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারমূলক রেনেসাঁস-প্রকল্পে ছদ্ম-ক্লাসিক্যাল যুগের যে সম্ভাবনা উপ্ত হয়েছিল, তারই পথ ধরে দান্তে এসেছিলেন নতুন ধরনের মহাকাব্য হাতে (লিটারারি এপিক)। পেত্রার্কা অতঃপর রচনা করেন '*আফ্রিকা*' নামে এক মহাকাব্য। পিউনিক যুদ্ধ নিয়ে লাতিন ভাষায় লেখা এই কাব্য। এরিস্তো লেখেন '*অরল্যান্ডো ফুরোসো*', বোয়ার্দো লেখেন '*অরল্যান্ডো ইনামোরাতো*' (অসমাপ্ত)। প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ নিয়ে তাসো লেখেন তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য '*জেরুজালেম দ্য লিবারেত্তা*' (১৫৭৫)। ইতালীয় রেনেসাঁসের মধ্যে সূচিত এই মহাকাব্য রচনার ধারা ইওরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। আমরা পাই পর্তুগালের কবি ক্যামোসের '*লুসিদাস*' (১৫৭২), ইংলন্ডের কবি স্পেনসারের '*ফেয়ারী কুইন*' এবং স্বনামখ্যাত জন মিল্টনের '*প্যারাডাইস লস্ট*'।[৭৩] মাইকেলের '*মেঘনাদবধ কাব্য*' রচনার আবেগ ও প্রয়াসকে দেখতে হবে এই রেনেসাঁস-প্রকল্পের প্রেক্ষিতে। দান্তে যেমন প্রাচীন রোমান কবি ভার্জিলের হাত ধরে প্রশ্নশীল নতুন চেতনায় আরক্ত '*ডিভাইন কমেডি*' রচনা করেছিলেন, মাইকেল তা করেছিলেন বাল্মীকির হাত ধরে নতুন যুগের মহাকাব্য '*মেঘনাদবধ কাব্য*' রচনার মাধ্যমে। হোমার এবং ভার্জিল, দান্তে এবং তাসো, স্পেনসার এবং মিল্টন এঁদের সকলের উত্তরাধিকার স্বীকার করে মাইকেল বাল্মীকির রাম-কাহিনীকে যে নতুন চারিত্র্য দান করেছিলেন, তাতে রয়েছে রেনেসাঁসেরই নিশ্চিত ও অব্যর্থ অন্তর্বেগ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়ে কেন তিনি মহাকাব্যের মতো অ-যুগোচিত একটি ভ্রান্ত সাহিত্যরূপের রূপকার হতে গেলেন—এ প্রশ্ন আমাদের সাহিত্য সমালোচকরা অনেকেই তুলেছেন প্রায় তিরস্কারের ভাষায়। কিন্তু এছাড়া মাইকেলের উপায় ছিল না। রেনেসাঁসের চোরা-স্রোত তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মহাকাব্যের অকূল সমুদ্রে। '*মেঘনাদবধ*' তাঁর ভ্রান্তি বা ব্যর্থতার নজির নয়; তিনি যে রেনেসাঁসেরই কবি-প্রতিনিধি তার প্রমাণ এই মহাকাব্য। আধুনিক যুগের সূচনাকারী

হলেও রেনেসাঁসে 'নিও-ক্লাসিক্যাল' কাব্যের একরকম প্রবল অভ্যুদয় লক্ষ করা গিয়েছিল। সেদিক থেকে মাইকেল হচ্ছেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের দান্তে বা মিল্টন। মাইকেল যে দান্তের ছয়শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে একটি সনেট লিখে ইতালিতে প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর অনুসরণে লিখেছিলেন '*মেঘনাদবধ কাব্য*'এর অষ্টম সর্গ, বা হতে চেয়েছিলেন বাংলার মিল্টন ও তার অনুসরণে '*মেঘনাদবধ*' কাব্যে'র ছন্দ ও ভাষাকে করেছিলেন উদাত্ত ও নিনাদিত—এ সব কোনো বিক্ষিপ্ত বা যান্ত্রিক সাদৃশ্য নয়, রেনেসাঁসের অন্তর্গূঢ় প্রেরণা ও স্বাজাত্যবোধই ক্রিয়াশীল ছিল এই অনুসরণ-অনুরণনের মর্মমূলে। দেশ-কালের অলঙ্ঘ্য ভিন্নতা সত্ত্বেও রেনেসাঁসের রক্তসূত্রে বাঁধা দান্তে, মিল্টন ও মাইকেলের কাব্যিক পরিচয়। মহাকাব্যের যে সমুদ্র-শঙ্খ নিনাদিত হয়েছিল ইতালীয় রেনেসাঁসের দান্তের হাতে, সেই একই মহাকাব্যিক পাঞ্চজন্য ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মাইকেলের '*মেঘনাদবধ কাব্যে*'। ইতালিতে দান্তে যা করেছিলেন, ইংরাজিতে মিল্টন; বাংলাতে তা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ধ্রুপদী মহাকাহিনীর ধনুকে যুগসচেতন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের ছিলা টানটান করে বাঁধা এবং তা থেকে নিক্ষিপ্ত শরে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের সাহিত্যিক প্রতীতিকে।

অসম্পূর্ণতার কবি

যে কাব্য লেখা হয়েছে তাই দিয়েই কবির বিচার, যে কাব্য লেখা হয়নি তা নিয়ে আলোচনার কোন আলঙ্কারিক রীতি চালু নেই। '*কৃষ্ণকুমারী*' '*মেঘনাদবধ কাব্য*', '*বীরাঙ্গনা কাব্য*', '*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*' প্রভৃতির স্রষ্টা হিসাবে অতিপ্রসিদ্ধি সত্ত্বেও কবির আকাঙ্ক্ষা এবং অতৃপ্তি; প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা; প্রতিশ্রুতি এবং ব্যাহত সম্পাদনের নিভৃত ইতিহাস অনুধাবন করে আমাদের মনে হয়েছে, কবি হিসাবে তাঁর যা দেবার ছিল, পাঠক হিসাবে আমাদের তা পাওয়া হয়নি।

প্রস্তুতির এক ব্যাপক ভিত্তি নিয়ে মাইকেল মাদ্রাজ থেকে কলকাতা, ইংরাজি থেকে মাতৃভাষায় ফিরে এসেছিলেন। '*শর্মিষ্ঠা*' লিখে তাঁর যে অতৃপ্তি ছিল, '*পদ্মাবতী*' লিখেও তা ঘোচেনি। ১৮৬০ সালের ১৫ মে রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন 'যদি বেঁচে থাকি ইওরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আদর্শে আরো নাটক ('other dramas') লিখব।' এরপর '*কৃষ্ণকুমারী*' লিখেই মাইকেল নাটক লেখা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। কেননা তাঁর পেট্রন ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যুতে বেলগাছিয়া রঙ্গশালা বন্ধ হয়ে যায়। 'আদার ড্রামাস' আর তার লেখা হয় না। এর মধ্যে '*একেই কি বলে সভ্যতা*' ও '*বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*' নামে লেখা প্রহসন দু'টির অভিনয় নিয়ে খুব ঝামেলা হয়। এমন নিখাদ বাস্তবতা হজম করার ক্ষমতা কলকাতার নাট্য-পৃষ্টপোষকদের হয়নি। ব্যথিত মাইকেল লেখেন, 'প্রহসনগুলির ব্যাপারে তোমরা আমার ডানা ভেঙে দিয়েছ।' সুতরাং প্রহসনও আর তিনি লেখেননি। 'ইন্দো-মুসলমান' বিষয় নিয়ে একটি নাটক লেখার খসড়া থিয়েটার কর্তৃপক্ষের অনীহায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সুতরাং একথা কখনই বলা যায় না মাইকেলের নাট্য-সম্ভাবনার সমস্ত কক্ষ উদঘাটিত হয়েছে।

এরপর আসা যাক কাব্য রচনার প্রসঙ্গে। *'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'* তাঁর প্রথম কাব্য প্রয়াস। বহু জায়গায় কাঁচা থেকে গেছে বলে পরিমার্জন ও সংশোধনের একটি অসমাপ্ত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' তাঁর অসম্পূর্ণ কাব্য। ২১টি পত্র লেখার পরিকল্পনা ছিল; লেখা হয়েছে মাত্র ১১টি পত্র।[৭৪] বাকি কয়েকটির খসড়া মাত্র করেছিলেন, সম্পূর্ণ হয়নি।

'ব্রজাঙ্গনা' নামে যে কাব্য পাই তা পরিকল্পিত সমগ্রের অংশমাত্র। কাব্যের শেষে আছে 'ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম প্রথম সর্গঃ।' পরবর্তী সর্গ অলিখিত থেকে গেছে।

'মেঘনাদবধ' কবির সুবিখ্যাত কাব্য। অসম্পূর্ণ নয়, কিন্তু কবির মহাকাব্যিক অভিপ্রায়ের ইতিহাসে *'মেঘনাদবধ'* একটি সোপান মাত্র। ১৮৬০ সালের ২৪ এপ্রিল ৬নং লোয়ার চিৎপুর থেকে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে[৭৫] মাইকেল লিখছেন,

> "তুমি একটি জাতীয় মহাকাব্য রচনার বিষয় নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছ, ভাল কথা। কিন্তু আমি মনে করি না এ বিষয়ে যথেষ্ট যোগ্যতা আমি অর্জন করতে পেরেছি। সুতরাং কয়েকটা বছর অপেক্ষা কর। ইতোমধ্যে আমার প্রিয় ইন্দ্রজিতের নিধন নিয়ে আমি একটি কাব্য রচনা করছি। ভয় পাবার কিছু নেই ; বীররসাত্মক কাব্য লিখে পাঠকদের বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলব না। আমাকে কয়েকটি ক্ষুদে মহাকাব্য (epiclings) রচনা করে হাত মক্স করতে দাও এবং এইভাবে প্রকৃত মহাকাব্য রচনার যোগ্যতায় আমি পৌঁছুব।" ('Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist.')

সকলেই জানেন সেই মহাকাব্য 'pucca fist' কোনদিন লেখা হয়নি।

১৮৬২ সালে কবি ব্যারিস্টারি পড়তে বিদেশ গিয়ে দারিদ্র্য-তিক্ত জীবনাভিজ্ঞতার মধ্যেও পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল একটি অংশে বসবাসের সৌভাগ্যকে কাজে লাগালেন ভালোভাবেই। লাতিনের সঙ্গে ইতালি, ফরাসি ও জার্মান ভাষাটা রপ্ত করে নিলেন। ১৮৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি এক চিঠিতে[৭৬] লিখছেন,

> "ইওরোপ আমাকে পাল্টে দিয়েছে।.........আমি এখন এমন একজন যথার্থ স্কলারে পরিণত হয়েছি, যে অন্তত ছ'টা ইওরোপীয় ভাষায় এবং বেশ কয়েকটা এশীয় ভাষায় বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বিনিময় করতে সক্ষম।"

প্রবাসে থাকাকালে ইতালি কবি পেত্রার্কার সনেটের অনুসরণে রচনা করেন *'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'*। সনেট রচনার এই সাফল্য স্বীকার করেও বলা-চলে ইওরোপ-প্রবাসের দুর্লভ অভিজ্ঞতা ও অর্জন বিশেষ কাজে আসেনি। কেননা ১৮৬৭ সালে ইওরোপ থেকে ফিরে তিনি আর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু লেখেননি। অর্জন অনুপাতে রচনা খুবই নগণ্য।

সত্যি বলতে কি, সমাপ্ত রচনার চেয়ে দীর্ঘতর তাঁর অসমাপ্ত রচনার তালিকা। আঁচড় দিয়েছেন কিন্তু আকার দেননি, এমন অবস্থায় থেকে গেছে তাঁর বহু ইংরেজি-বাংলা রচনার খসড়া। শুরু করেছেন কিন্তু শেষ করেননি, এমন নাটক ও কাব্যের তালিকা এই রকম ঃ[৭৭] *'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'সিংহলবিজয় মহাকাব্য', 'পাণ্ডববিজয় কাব্য', 'সুভদ্রাহরণ*

কাব্য', 'দ্রৌপদীস্বয়ম্বর কাব্য,' 'মৎস্যগন্ধা কাব্য,' 'বিষ না ধনুর্গুণ নাটক', 'নীতিমূলক কবিতাবলী', 'রিজিয়া নাট্যকাব্য' 'বিবিধ কবিতাবলী'।

১৮৬০ সালের ১৫মে রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে[৭৮] তিনি লিখেছিলেন,

> "সাহিত্যিক প্রস্ফুরণের জন্য কি বিশাল ক্ষেত্রই না দেশ আমাদের উপহার দিচ্ছে। ওঃ ঈশ্বর। আমার যদি সময় থাকত—কাব্য, নাটক, সমালোচনা, রোমান্স। আমি হতাম সেই মানুষ, যে রেখে যেত তার অবিনশ্বর কীর্তি—সমস্ত গ্রীক ও সমস্ত রোমান খ্যাতির উর্ধ্বে।"

এত সাধ ও স্বপ্ন ; এত অর্জন ও প্রস্তুতি ; এতরকম আরম্ভ ও প্রকল্পনা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ থেকে গেল তাঁর অধিকাংশ রচনা ; অব্যবহৃত থেকে গেল তাঁর বিপুল অর্জন; হয়ত অনারব্ধ থেকে গেল মাইকেল নামক এক মহাকবির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিই। অসম্পূর্ণতার এই নিয়তি কখন ঋতু থেকে কোরকে, পরিবেশ থেকে প্রতিভায় প্রবেশ করে, তা নজর করা দুরূহ হয়ে পড়ে। সূচনা ও সম্পাদনের মধ্যে জারী করা ফরমান শুধু মাইকেল কেন ইতালীয় রেনেসাঁসের বিশ্রুত শিল্পীও অগ্রাহ্য করতে পারেন না। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সমাপ্ত চিত্রের তুলনায় দীর্ঘতর থেকে যায় অসমাপ্ত চিত্রের তালিকা। তাঁর করা স্কেচ বা ড্রাফটের সংখ্যা সতের হাজার ; ছবির সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্য। ভিঞ্চি নামক অদ্ভুত মানুষটি ডায়েরি, নোট মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও সেই অর্থে কোন বই লিখে যেতে পারেননি।[৭৯] মাইকেলের কাব্যভুবন যেন অকস্মাৎ-প্রস্থিত এক মহাশিল্পীর কর্মশালা, যা অকৃত, অর্ধকৃত মূর্তিতে পরিকীর্ণ।

'কি ফল লভিনু হায়'

বিস্মৃত হওয়া যায় না মাইকেলের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির কথা। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।' প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যালেন্সশীটে ব্যর্থতা ও বিলাপের এমন বৃহৎ অঙ্ক দেখে রেনেসাঁসের জমা-খাতা থেকে আমরা সরিয়ে ফেলি মাইকেলকে। এবং মাইকেলের সঙ্গে সমীকৃত করে বঙ্গীয় রেনেসাঁসকেও খরচের খাতায় লিখে ফেলতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমরা যদি ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বজয়ী স্বপ্নের বিশ্রুত সেনাপতিদের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, তাঁদের অনেকেই এড়াতে পারেননি শিল্পিত আত্মবিলাপের অলঙ্ঘ্য পরিণাম।

আলবের্তিকে বলা হয়েছে বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠা। তিনি পারতেন না এমন কাজ কমই ছিল। রেনেসাঁস যদি ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণ-প্রকল্পের একটি নাম হয়, তবে আলবের্তি নিঃসন্দেহে সেই প্রকল্পের অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত-পুরুষ। সেই সর্বসক্ষম মানুষটিও আত্মসমীক্ষা করেছেন এই ভাষায়,

> "Thus I laboured all my life to produce erudite cones of wrapping paper."[৮০]

ইউজেনিও গ্যারিন আলবের্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাই বলেছেন, "The pessimist is the real Alberti."[৮১]

'ফ্ললেস্ট ম্যান অব দি রেনেসাঁস'[৮২] নামে আখ্যায়িত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকেও তাড়া করে ফিরেছিল এক অন্তহীন অতৃপ্তি। ড্রাফট আর স্কেচের নেপথ্য বিপুলতায় ছড়িয়ে আছে তাঁর সেই তৃপ্তিহীন শিল্পী-আত্মার পরিচয়। জেনে রাখা ভালো, '*মোনালিসা*' বা '*ভার্জিন অব দি রক*'-এর মহাশিল্পীও বিলাপ করেছেন এই ভাষায়, 'I have wasted my hours.'[৮৩] শিল্পী সেল্লিনি বা হিউম্যানিস্ট ফাইলেলফোর পলায়নপর ভাসমান জীবনের নির্গলিতার্থ অন্যরকম কিছু নয়। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর বিশ্ববিশ্রুত ফ্রেস্কোয় চিত্রিত চরিত্রগুলির পেশীর মোচড়ে যে নিঃশব্দ আর্তনাদ ফুটে আছে তা কি কেবলই ছবির আর্তনাদ, শিল্পীর নয়? জীবনের প্রতি সর্বগ্রাসী অনুরাগ ও আসক্তির গভীরতা শুধু হাসি আর আনন্দ দিয়ে মাপা যায়, তা'তো নয়; অশ্রু আর আর্তনাদ সেই প্রসক্তির আরো বড় কষ্টিপাথর। বিলাপ আর ব্যর্থতা দিয়ে মেপে নেওয়া যায় শিল্পীর জীবন-স্বপ্নের বেধ-ব্যাপ্তি ও সমুচ্চতা। রেনেসাঁস মানুষের সামনে এনে দিয়েছিল নির্মাণসম্ভব জীবনের এক বহুধা-বিস্তৃত-প্রকল্প। আলবের্তি, লিওনার্দো বা অ্যাঞ্জেলো তাঁদের অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক প্রতিভাকে আশ্চর্য রকম প্রসারিত করেও পৌঁছুতে পারেননি সেই সমগ্রতায়। একজীবনে তা পারা সম্ভবও নয়। তাই আত্মবিলাপ, তাই আর্তি। মাইকেলের আত্মবিলাপ ফেল করা ছাত্রের আত্মবিলাপ নয়। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের হারানো প্রাপ্তির খুঁটিনাটি অঙ্কে তার সদুত্তর খোঁজা নিরর্থক।[৮৪] যে গোল্ড-মেডেল রেনেসাঁস কাউকে দেয়নি, মাইকেলের আত্মবিলাপ সেই গোল্ড-মেডেলের জন্য। এ বিলাপ আলবের্তি, লিওনার্দোর সমগোত্রীয়।

'সুন্দর হে সুন্দর'

প্রাচীন বিদ্যার পুনরুজ্জীবন ও সৌন্দর্য-চর্চার জন্যই ইতালীয় রেনেসাঁস বিশ্ববিখ্যাত। তার হিউম্যানিস্টরা গিয়েছিলেন জ্ঞান-চর্চার পথে আর শিল্পীরা সৌন্দর্য-চর্চার পথে। তার ভাস্কর, স্থপতি ও চিত্রীরা ছেনি-হাতুড়ি, রঙ-তুলি দিয়ে সৌন্দর্যময় এক জীবনের রূপকার হতে চেয়েছিলেন। শত-শত ম্যাডোনা, ভেনাস, মিউস আর বরবর্ণিনীদের পোট্রেটে রেনেসাঁসের চিত্রজগৎ পরিপূর্ণ। শারীরিক সৌন্দর্যের এমন শুচিস্নাত নান্দনিক উৎসব এর আগে দেখা যায় নি। খ্রীষ্টীয় পবিত্রতার সঙ্গে প্যাগান জীবনবাদের দৃশ্য ও অদৃশ্য বিনিময় দিয়ে সাজানো রেনেসাঁসের সৃজনপুরী। মাইকেল চিত্রী নন, কবি; রূপদক্ষ নন, নাট্যকার; কিন্তু সৌন্দর্যের মহিমময় বর্ণনায় তাঁর আকর্ষণ ও দক্ষতা রেনেসাঁসোচিত। হোমার ও মিল্টনের ভক্ত এই কবির কল্পনায় বীরত্বব্যঞ্জক (Heroic) মহাকাব্যের রুদ্রটান থাকলেও তাঁর চিঠিপত্রগুলি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায়, তাঁর প্রিয় কবি সংস্কৃত ভাষার 'কবীন্দ্র' কালিদাস, লাতিন ভাষার ভার্জিল ও ইতালীয় ভাষার তাসো। তাঁর মতে হোমার শুধু 'যুদ্ধ বিগ্রহের কবি'; মিল্টন 'উদ্দীপক কিন্তু হৃদয়স্পর্শী নন'। তিনি মনে করতেন,

> "He who is 'beautiful', 'tender' and 'pathetic' with a dash of 'sublimity' is sure to float down the stream of time in triumph."[৮৫]

মধুর, পেলব, সাঙ্গীতিক, এবং করুণরসাত্মক কাব্যই চিত্তদ্রাবী ও কালজয়ী। মাইকেলের কাব্যে ও নাটকে তাই বীরের জয়ধ্বনি ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে বিপন্ন সুন্দরের জন্য

অশ্রুপাত। '*মেঘনাদবধ কাব্য*'-এর প্রারম্ভিক ঘোষণা 'গাহিব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' হলেও বন্ধুকে পত্রে[৮৬] এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন, "ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই বন্ধু, I do not trouble my readers with vira rasa." ইন্দ্রের অশনি সব যুদ্ধ জয় করতে পারে না, তখন ডাক পড়ে শিল্পীর। 'Beautiful illusions' দিয়ে অনেক সময় বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতারা মন্থর করে দেন ভয়ঙ্করের গতি; ভেঙে ফেলেন বিরোধের দুর্গ-প্রাকার। সুন্দ-উপসুন্দের বিপজ্জনক সৌভ্রাত্রে ফাটল ধরানোর জন্য দেবতাদের কাছ থেকে বরাদ্দ পেয়ে রাজশিল্পী নির্মাণ করেন তিলোত্তমাকে।[৮৭] তিলোত্তমার পদ্মনির্মিত চরণে পরানো হয় বিদ্যুৎ-রেখার আলতা; মৃণাল নির্মিত বাহু আর মেরুশৃঙ্গাকার কুচযুগে দেওয়া হয় ছায়াপথের মেখলা। শশাঙ্কের বদন, মেঘের কবরী, রামধনুর সিঁথি, শুকতারার আঁখি, বিম্বফলের অধর, গজমুক্তার দন্তশ্রেণী নিয়ে তিলোত্তমা 'আধপেটা খাই শালুক কোঁড়া'র সাহিত্যে এসে দাঁড়ায়। প্রাকৃতিক উপমান দিয়ে রমণীর দেহাঙ্গ নির্মাণের এই অ-লোকায়ত নিদর্শন আমাদের সংস্কৃত কাব্যে প্রচলিত ছিল, মাইকেল তাকেই পুনর্বাসিত করেছেন '*তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে*'। কেমন করে একটি কাল্পনিক প্রাণীকে স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ করে আঁকতে হবে, সে-সম্পর্কে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর নোট বইতে একটি চিত্তাকর্ষক নোট রেখে গেছেনঃ "ধরা যাক আঁকতে হবে ড্রাগন। তার মাথাটা আঁকো প্রহরারত হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের মত, তাতে দাও মার্জারের চোখ, কান দুটো নাও সজারুর, নাক গ্রে হাউন্ড কুকুরের, ভুরু দিও সিংহের, বৃদ্ধ মোরগের মত দু'টি রগ, আর ঘাড়টা জলের কাছিমের মত।"[৮৮]

গ্রীক পুরাণ থেকে নেওয়া কথিকার ভারতীয় রূপান্তর '*পদ্মাবতী*'। কে বেশি সুন্দরী তাই নিয়ে তার মৌলিক নাট্য-দ্বন্দ্বের সূচনা। '*কৃষ্ণকুমারী*' নাটকেরও মূল সমস্যা অসামান্যা সুন্দরী কৃষ্ণকুমারীকে নিয়ে।

রেনেসাঁসের চিত্রকলা আর কাব্যকৃতির পারস্পেকটিভে ছড়ানো আছে একটি প্যাস্টোরাল অনুষঙ্গ। জোত্তো, বতিচেল্লি, লিওনার্দো, জর্জিনো, টিশিয়ান প্রমুখ শিল্পীদের বহু বিখ্যাত ছবিতে আছে রাখালিয়া পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ-মেদুর প্রেক্ষিত।[৮৯] ভিঞ্চির '*মোনালিসা*' শুধু তার রহস্যময় হাসির জন্যই বিখ্যাত তা নয়, তার পশ্চাৎপটে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর যে বেধ রয়েছে, তাও কম বিস্ময়কর বা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেই অর্থে কোন রাখালিয়া ভুবন বঙ্গীয় রেনেসাঁসে নেই। তথাপি যমুনাতট, গোবর্ধনগিরি, ময়ূরী, সারিকা, কৃষ্ণচূড়া, নিকুঞ্জবন পরিবেষ্টিত '*ব্রজাঙ্গনা*'র গীতি-গুচ্ছে এবং কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিন মাস, বটবৃক্ষ, ঈশ্বরী পাটনী, কপোতাক্ষ নদ, বিজয়া দশমী, শ্যামাপক্ষী, শ্রীমন্তের টোপর-পরিবৃত '*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*'র মধ্যে কি সেই ছেড়ে আসা পৃথিবীর জন্য একটা মন-কেমন-করা টান টের পাওয়া যায় না, যা রাখালিয়া আবহের সমান্তরাল?

'*মেঘনাদবধ*' সশস্ত্র লড়াইয়ের কাব্য। এ লড়াই দৈবীবাদের সঙ্গে পুরুষকারের, পুরাতনী বিশ্বাসের সঙ্গে নতুন মানবিক সংস্কৃতির। এই দ্বান্দ্বিক প্রকল্পে দু'টি কানন আছে ঃ তার একটিতে সীতার অধিষ্ঠান, অন্যটিতে প্রমীলার। একজনকার রূপ শান্ত-স্নিগ্ধ-পবিত্র, অন্যজনকার আগ্নেয়-দীপ্ত-জান্তিবু। রেনেসাঁসের এক নারী খ্রীষ্টীয় পবিত্রতার বস্ত্র বা বিষণ্ণতা দিয়ে আপাদমস্তক ঘেরা : আরেক নারীর উপচীয়মান যৌবন বাঁধা থাকে আবরণহীন গোলাপী

ত্বকে। সীতা মেরী বা ভার্জিন নয়, প্রমীলাও নয় ম্যাডোনা বা ভেনাস। বিষণ্ণ খ্রীষ্টীয় পবিত্রতার পাশাপাশি নিরাবরণ প্যাগান লাবণ্যকে ইতালীয় রেনেসাঁস যেভাবে চিত্রিত করেছিল, ভারতীয় নারীত্বের শাশ্বত স্বরূপটিকে সীতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জয়িষ্ণু জীবনবাদকে প্রমীলা চরিত্রে চিত্রিত করে মাইকেল যেন অনেকটা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অভিঘাতিক সত্যটিকে শুচিস্নাত ও সৌন্দর্য-ঝলকিত করে এঁকেছেন।

'জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ'

রেনেসাঁসের কবি, শিল্পী, হিউম্যানিস্টরা মনে মনে খুঁজে ফিরেছিলেন এক সব-পেয়েছির-দেশ। পেত্রার্কা '*লেটারস টু দি এনসিয়েন্ট ডেড*'-এ লিখেছেন, তিনি যদি লিভির যুগে জন্ম নিতেন কী ভালোই না হত।[১০] রাফায়েলের স্বপ্নপুরী ছিল রোম, কাস্তিলিওনের উরবিনোর রাজসভা। ইতালির অজ্ঞাত কুলশীল বিদ্বান ও হস্তশিল্পীরা উঠে আসতে চেয়েছিলেন সম্পদ ও সম্ভোগ, সৌন্দর্য ও সম্মান-খচিত শাসককুলের টেবিলে বা ভিলায়। রেনেসাঁসের মধ্যে একটা দূরের হাতছানি ছিল। প্রত্যন্ত ইওরোপ তাকিয়েছিল ফ্লোরেন্সের দিকে, ফ্লোরেন্স তাকিয়েছিল এথেন্সের দিকে। স্থপতিরা তাকিয়েছিলেন আলবের্তির দিকে, আলবের্তি তাকিয়েছিলেন ভিতরুভিয়াসের দিকে; দর্শনের ছাত্ররা তাকিয়েছিলেন ফিকিনোর দিকে, ফিকিনো তাকিয়েছিলেন প্লেটোর দিকে। নেদারল্যান্ডের এক জাতক এরাজমুস প্রাসাদনগরী রোমের সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন ; টমাস মোরে রচনা করেছিলেন কল্পভুবনের কথিকা '*ইউটোপীয়া*' ; কলম্বাস বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত নামক এক সোনালি দ্বীপের সন্ধানে ; গুয়ারিনো গিয়ে ভিড়েছিলেন দূরান্তরের গ্রীক অধ্যাপকের ডেরায় ;[১১] গ্রীক-বিদ্যার প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করতে ফাইলেলফো বিয়ে করেছিলেন এক গ্রীক-কন্যাকেই। সাগরদাঁড়ি থেকে উঠে আসা ১৮ বছরের এক কালেজীয় যুবক প্রতীচ্য পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন,

> "I sigh for Albion's stand
> As if she were my native land."[১২]

এমন অকাট্য প্রমাণ হাতে পেয়ে উপনিবেশবাদের অলঙ্ঘ্য মানস-দাসত্বের সঙ্গে সমীকৃত করে আমরা শেষ করি আমাদের একমাত্রিক মাইকেল-বিচার। কিন্তু তিনি তো স্বপ্ন দেখেছিলেন গ্রীকরা যেমন করে লেখে তেমন করে লিখবেন ঃ ভার্জিলের মত সাঙ্গীতিক ও কমনীয়; তাসোর মত মধুর ও চিত্তদ্রাবী; কালিদাসের মত সুন্দর ও স্বাভাবিক; মিল্টনের মত উদাত্ত ও নিনাদিত ; জার্মানদের মত তেজোদৃপ্ত; সেক্সপীয়রের মত ক্রিয়াশীল; পেত্রার্কার মত চতুর্দশপদী এক তিলোত্তমা-সাহিত্য-ভুবন রচনা করবেন। সব সাধ তাঁর মেটেনি। ব্যবধান থেকে গিয়েছিল প্রস্তুতি ও প্রকল্পনা, সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে। স্বপ্নের এমন নিখিল কাণ্ডারীকে ইতালীয় রেনেসাঁসই কি পারত পূর্ণ ও তৃপ্ত কোন সব-পেয়েছির-দেশে পৌঁছে দিতে?

১৮৬৫ সালে খাস ইওরোপে বসে সেই বিলেত-প্রেমিক মাইকেলই যখন '*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*' শেষ করেন এই প্রার্থনা দিয়ে,

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বরে
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ-ভারত রতনে।"[১৩]

তখন বাস্তবিকই সম্পূর্ণ হয় রেনেসাঁসের দ্বিমুখী প্রকল্প। প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তনের এই ভ্রামণিক বৃত্তান্তটি শুধু মাইকেলের নয়, রেনেসাঁসেরই একান্ত নিজস্ব গল্প। যিনি এক সময় হতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ের সিসেরো, সেই পেত্রার্কাই কি নব্য-ইতালীয় সাহিত্যের সূচনাপুরুষ তথা ইতালীয় 'রেনেসাঁসের কলম্বাস' হিসাবে সম্মানিত হননি? বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অভ্রান্ত পথিক মাইকেলের গল্প তার থেকে খুব অন্যরকম কিছু নয়।

'দাঁড়াও পথিক বর'

বিশ্রুত শিল্পী রাফায়েলের সমাধি স্তম্ভে লেখা আছে, 'He who is here is Raphael.'[১৪] একটি মাত্র ছত্র। একটি ছত্রই যথেষ্ট। কিন্তু মাইকেলকে সম্পূর্ণ করে দিয়ে যেতে হয়েছিল অন্বেষণ ও প্রত্যাবর্তনের বৃত্তটি। অপমানদক্ষ জাতির সামনে তাঁর স্বলিখিত সমাধিলিপিটি একটি শিকড়-চিহ্নিত নিখুঁত আইডেনটিটি কার্ডের মত। বঙ্গ-সংস্কৃতির জহুরীমন্য পথিকদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, জন্মভূমির কসম—

"দাঁড়াও, পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"[১৫]

এই পরিচয়পত্রে রয়েছে শিকড়ের চিরন্তন কথামালা ; মৃত্যুর সঙ্গে জন্মের, পরিণামের সঙ্গে উৎসের এক অপূর্ব সমাধি বন্ধন। একি ইংল্যান্ড-প্রেমের পরিতাপ? না, সেকথা যাঁরা বলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অমোঘ, প্রস্তর-কঠিন ভর্ৎসনা?

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy*, London, 1945, p. 188
২. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি*, ২য় সং, ১৩৬১, পৃ. ২৯৭
৩. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, ১৯৭৭, মধুসূদনের পত্রসংখ্যা-৬৪ (ইং)
৪. J. A. Symonds, *Renaissance in Italy*, vol. 2

৫. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *পূর্ববৎ,* পত্রসংখ্যা-৯৮ (ইং)
৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, *মধুসূদন গ্রন্থাবলী,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৬১, '*হেকটরবধ কাব্য*-এর ভূমিকা
৭. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *পূর্ববৎ,* পৃ. চৌত্রিশ
৮. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *পূর্ববৎ,* পত্রসংখ্যা-৬০ (ইং)
৯. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *পূর্ববৎ,* পত্রসংখ্যা-৫৭ (ইং)
১০. 'কালিদাস', "*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*" ৯ সংখ্যক সনেট, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী,* হরফ সংস্করণ, ১৯৭৩
১১. 'বাল্মীকি', *ঐ,* ৯৪ সংখ্যক সনেট, ঐ
১২. *মেঘনাদবধ কাব্য,* চতুর্থ সর্গ, ঐ, পৃ. ২৫৮
১৩. 'That the Bengali ıs born of the Sanskrıt than which a more copious and elaborate language does not exist.'—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্মৃতিকথা; উদ্ধৃত ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী,* পূর্ববৎ, পৃ. আঠাশ
১৪. 'সংস্কৃত', "*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*", ৮৭ সংখ্যক সনেট, অজিতকুমাব ঘোষ সম্পাদিত *মধুসূদন রচনাবলী,* পূর্ববৎ, পৃ. ৩৮৪
১৫. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *পূর্ববৎ,* পত্রসংখ্যা-৬৫ (ইং)
১৬. ঐ, পত্রসংখ্যা-৭৭ (ইং)
১৭. অজিতকুমাব ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী,* পূর্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৫৮ (ইং)
১৮. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *পূর্ববৎ,* পত্রসংখ্যা-৪২ (ইং)
১৯. ঐ, পত্রসংখ্যা-৯৮ (ইং)
২০. ঐ, পত্রসংখ্যা-১০৫ (ইং)
২১. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি,* পূর্ববৎ, পৃ. ৩৭২
২২. ঐ, পত্রসংখ্যা-১১২ (ইং)
২৩. J. Burckhardt, *Ibid,* p. 228
২৪. 'To follow poetry (saıd A. Pope) one must leave father and mother'—এই বক্তব্যটি ২৫ নভেম্বব ১৮৪২ তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছেন মাইকেল; দ্রষ্টব্য : ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত *মধুসূদন রচনাবলী,* পূর্ববৎ, পত্রসংখ্যা-১৮(ইং)
২৫. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী,* পূর্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৫১ (ইং)
২৬. 'কবি-মাতৃভাষা', গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলী, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী,* পৃ. ৩৯৯
২৭. উদ্ধৃত নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি* ; গৌরদাস বসাককে লেখা পত্র, দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত '*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*'র ভূমিকা, বাংলা অনুবাদ দীননাথ সান্যাল কৃত
২৮. "ইংল্যান্ড প্রেমের শহীদ হয়ে মধুসূদন আমাদের রেনেসাঁসের উদভ্রান্তির প্রবলতম সাক্ষ্য স্থাপন করে গেছেন নিজ জীবনে।" 'বাংলার রেনেসাঁস ও মধুসূদন : একটি মূল্যায়ন', অরবিন্দ পোদ্দার, '*রেনেসাঁস ও সমাজমানস*', ১৯৮৩, পৃ. ৩৮
২৯. W. Durant, *The Story of Civilization,* vol. V, The Renaissance, N. Y., 1953, p. 503
৩০. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি,* পূর্ববৎ, পৃ. ৩৩২

৩১. ঐ, পৃ. ৩৪৪
৩২. ঐ, পৃ. ৩৬২-৬৩
৩৩. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পত্রসংখ্যা-১০৪ (ইং)
৩৪. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি*, পূর্ব্ববৎ, পৃ ৪১১
৩৫. W. Durant, *Ibid*
৩৬. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ব্ববৎ, পত্রসংখ্যা-১২ (ইং)
৩৭. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি*, পূর্ব্ববৎ, পৃ. ৮৯, পাদটীকা
৩৮. *মধুসূদন গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পূর্ব্ববৎ, '*শর্মিষ্ঠা*'র ভূমিকা
৩৯. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ব্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৮৫ (ইং)
৪০. ঐ, পত্রসংখ্যা-৮৩ (ইং)
৪১ ঐ, পত্রসংখ্যা-৮৫ (ইং)
৪২. W. Durant, *Ibid*, p. 470
৪৩. *মধুসূদন গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্কবণ, পূর্ব্ববৎ, '*কৃষ্ণকুমারী*'র ভূমিকাংশ
৪৪. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি*, পূর্ব্ববৎ, পৃ. ১১৩
৪৫. যতীন্দ্রমোহন ঠাকুব লিখেছেন, "I know not how to thank you adequately for the very present of the manuscript তিলোত্তমা in the poet's hand writing ! I will preserve it with the greatest care in my library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature."
—যোগীন্দ্রনাথ বসু, '*মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*', ৪র্থ সং, পৃ. ২৬৭-৬৮
৪৬. নগেন্দ্রনাথ সোম, '*মধুস্মৃতি*', পূর্ব্ববৎ, পৃ. ১৯৫; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর '*জীবনস্মৃতি*' (পৃ. ৬৭-৬৮) গ্রন্থে লিখেছেন তাঁর পরিচিত জনৈক বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠে মুগ্ধ হয়ে মাইকেলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে 'নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন'
৪৭. অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ব্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৫০ (ইং)
৪৮. 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', "*চতুর্দশপদী কবিতাবলী* "র ৮৬ সংখ্যক সনেট ; অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পৃ. ৩৮৪
৪৯. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. 2, 1967, p. 11
৫০. I. A. Richter (ed), *Selection from the Note Books of Leonardo Da Vinci*, The World Classic, G. B., 1952, Chap VII, 'Leonardo's way through life', pp. 285-375
৫১. W. Durant, *Ibid*, p. 580
৫২. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ব্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৪৯ (ইং)
৫৩. '*মেঘনাদবধ কাব্য*', চতুর্থ সর্গ, অজিতকুমার ঘোষ, সম্পাদিত *মধুসূদন রচনাবলী*
৫৪. W. Durant, *Ibid*, p. 86
৫৫. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি*, পূর্ব্ববৎ, পৃ. ৪২৪
৫৬. উদ্ধৃত নগেন্দ্রনাথ সোম, *ঐ*, পৃ. ৫৩
৫৭. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ব্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৫৭ (ইং)
৫৮. ঐ, পত্রসংখ্যা-৭৩ (ইং)
৫৯. ঐ, পত্রসংখ্যা-৮৩ (ইং)

৬০. ঐ, পত্রসংখ্যা-৭৩ (ইং), বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা। "We have just over the noise of the Mohurrum. I tell you that if a great poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificient Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it ? People will grumble and say that the heart of the poet in Meghnad is with the Rakhasas. And that is the real truth..."

৬১. J. A. Symonds, *Ibid*, p. 251

৬২. W. Durant, *Ibid*, p. 86

৬৩. নিজের অন্তত দশ রকম যোগ্যতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লিওনার্দো গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিশেষে লিখেছেন — "And if any of the aforesaid things should seem impossible or impracticable to anyone I offer myself as most to ready make the trial of them in your park,or in whatever place please your Excellency, to whom I command myself with all possible humility." I. A. Richter (ed), *Ibid*, pp. 294-296

৬৪. অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৮৪ (ইং)

৬৫. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৪২ (ইং)

৬৬. *ঐ*, পত্রসংখ্যা-৯৮ (ইং)

৬৭. '*মেঘনাদবধ কাব্য*', তৃতীয় সর্গ, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত *মধুসূদন রচনাবলী*

৬৮. '*ডেভিড*' (মাইকেল অ্যাঞ্জেলো), Euzo Carli, *All the Paintings of Michel angelo*, Milan, 1963

'*মোনালিসা*' (লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি), Andre Chastel, *Leonardo da Vinci*, New York, 1961

'*ভেনাসের জন্ম*' (বত্তিচেল্লি), Lionello Venturi, *Botticelli*, Britain

'*চেমোনি*' (ভেরোচিও), J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance*, London, 1945

'*ম্যাডোনা*' (রাফায়েল), James H. Beck, *Raphael*, New York, 1976

'*চার্লস-পঞ্চম*' (টিশিয়ান), F. Valconover, *All the Paintings of Tition, London*, 1965

৬৯. "যে ফিউডালবাদের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে মধুসূদন হানিয়াছিল প্রথম সবল আঘাত, আজিও তাহাকে শেষ আঘাত হানা হয় নাই। যে বুর্জোয়া বিপ্লবের তিনি ছিলেন প্রথম কবি আজিও তাহা অসমাপ্ত।" 'মেঘনাদবধকাব্যে সমাজ বাস্তবতা', নীরেন্দ্রনাথ রায়, '*সাহিত্য বীক্ষা*', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৬০

৭০. ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্, *কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো*, প্রথম ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকা,১.২.১৮৯৩

৭১. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, '*দান্তের মূল্যায়ন*', "*চতুরঙ্গ*" (আবদুর রউফ সম্পাদিত), জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৭৬০-৭৬৫

৭২. J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (Tran), London, 1945, p. 188

৭৩. F. M. Schweitzer & H. E. Wedock (ed), *Dictionary of the Re-*

naissance, 1967, 'Renaissance Epic Poetry', p. 497

৭৪. "It is my intention to finish this poem (*Virangana Kavya*–S.M.) in XXI Books. But I must print the XI already finished"—ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, ঊনচল্লিশ
৭৫. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৫৬ (ইং)
৭৬. ঐ, পত্রসংখ্যা-১১২ (ইং)
৭৭. ঐ, পৃ. আটচল্লিশ
৭৮. ঐ, পত্রসংখ্যা-৫৭
৭৯. W. Durant, *Ibid*, p. 217
৮০. D. Marsh, *Leon Battista Alberti, Dinner Pieces. A Translation of the Intercenales* (Mediaval & Renaissance Texts and Studies vol. 45, the Renaissance Society of America, Renaissance Texts Series, vol. 9, Bringhamton, New York, 1987, p. 114
৮১. Quoted in "*R. Q.*", vol. XLII, No. 2, Summer 1989 ; The Renaissance Society of America, Inc, 1161, Amsterdam Ave, New York, p. 301
৮২. W. Durant, *Ibid*, p. 227
৮৩. W. Durant, *Ibid*, p. 217
৮৪. "১৮৬১ সালে 'আত্মবিলাপ' লেখার কারণ মাইকেলের ঐকান্তিক হতাশা এবং আন্তরিক অপরাধবোধ, এমনটি পাপবোধ।" গোলাম মুরশিদ, 'আশার ছলনে ভুলি' "*দেশ*" পত্রিকা, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯১, ৫৯ বর্ষ ৭ সংখ্যা
৮৫. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, পত্রসংখ্যা-৬৯
৮৬. ৭১নং উল্লেখিত পত্রসংখ্যা
৮৭. '*তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*', তৃতীয় সর্গ ; অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, পৃ. ২২৫
৮৮. I. A. Richter, *Ibid*, 'How to make an imaginary animal natural', p. 167
৮৯. A. Marlindale (intro), *The Complete Paintings of Giotto*, Italy, 1966 ; L. Colletti, *All the Paintings of Giorgione*, London, 1961
৯০. M. Bishop, *Petrarch and his world*, Bloomington, 1963
৯১. I. Thompson, 'The Scholar as Hero in Innus Pannonius Panegyric on Guarinus Veronensis', "*R. Q.*", vol. XLIV, No. 2, Summer, 1991, *Ibid*
৯২. অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, ইংরাজি রচনাবলী, Collected Poems (No. 8 Poetry), পৃ. ৫
৯৩. 'সমাপ্তে', "*চতুর্দশপদী কবিতাবলী*", অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, ১০২ সংখ্যক সনেট, পৃ. ৩৮৮
৯৪. W. Durant, *Ibid*, p. 515
৯৫. 'সমাধি-লিপি', গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলী, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্ববৎ, পৃ. ৪০০

সপ্তম অধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র ঃ রেনেসাঁসে পা মাথা রিফরমেশনে

রেনেসাঁসের তুলি ও বঙ্কিমের লেখনী

ইসাবেলা দ্য এস্‌তে টিশিয়ান-অঙ্কিত তাঁর কমবয়সের একটি প্রতিকৃতি দেখে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'ঐ বয়সে আমি কখনই এত সুন্দরী ছিলাম না।'[১] *'মোনালিসা'* ছবিটি দেখে ফ্রাঞ্চেস্কা দ্য জিওকন্দোর তৃতীয় পত্নী ম্যাডোনা এলিসাবেত্তাও বলতে পারতেন আমার হাসির দুরধিগম্য রহস্য বস্তুতপক্ষে লিওনার্দোরই দান। রেনেসাঁসের শিল্পীরা নারীসৌন্দর্যের বিশ্ববিমোহী উৎসব রচনা করে গেছেন তাদের রঙ ও তুলি দিয়ে। জোত্তো, বতিচেল্লি, রাফায়েল, লিওনার্দো, করেরিজ্জো, বেলিনি, জর্জিনো, টিশিয়ান প্রমুখ রেনেসাঁস-চিত্রকরদের তুলিতে শত-শত ভার্জিন, ভেনাস, মিউস, ম্যাডোনা বিচ্ছুরিত করেছে তাদের সৌন্দর্যের গরিমা। দান্তে তাঁর 'ভিতা নুভা'তে বিয়াত্রিচে-বন্দনায় যাব সূচনা করেছিলেন, সেই ঐতিহ্য ধরে রেনেসাঁসের চিত্রকরবা নারী-সৌন্দর্যকেই যেন অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়ের গৌরব দান করেছিলেন। নবজাগ্রত একটি সভ্যতার তারুণ্য ও প্রাণশক্তি শুধু তার মননচর্চা বা সক্রিয়তায় নয়, তার সৌন্দর্য-চর্চাতেও বিচ্ছুরিত হয়। রেনেসাঁসে সেই সৌন্দর্য-চেতনার লাবণ্যপ্রভা মঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল বরবর্ণিনীদের রূপচিত্রণে। এতদ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল রেনেসাঁসের যৌবনদীপ্ত প্রাণের অপরিসীম জীবন-তৃষ্ণার ঐশ্বর্য।

ভাষা-শিল্পী বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসগুলিতে নারীর রূপচিত্রণে রেনেসাঁসের সৌন্দর্য-চেতনাকেই যেন রূপময় করে তুলেছিলেন। ইতালির চিত্রকররা যা করেছিলেন তাদের রঙ তুলি দিয়ে, বঙ্কিম তা করেছেন তাঁর অনুপম লেখনী দিয়ে। উপন্যাসে থাকে মানব-মানবীর হৃৎ-চিত্র। রূপের বাহ্য ভুবন অতিক্রম করে ঔপন্যাসিককে প্রবেশ করতে হয় অন্তঃস্থ অনুভূতির প্রায়ান্ধকার ভুবনে। বঙ্কিম অবশ্যই তা করেছেন। কিন্তু তিনি উপেক্ষা করেননি তার পাত্র-পাত্রীর দৈহিক-সৌন্দর্যের কনক-ভৃঙ্গারটিকে। বঙ্কিমের উপন্যাসের দু'টি অবশ্য লক্ষণীয় দিক আছে। পুরুষ নয়, নারীকেই তিনি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিষয়ের মর্যাদা। দ্বিতীয়ত, তাঁর নারীরা শুধু হৃদয়বতী নয়, রূপবতীও। রূপই তাঁদের চরিত্রের দর্পণ। লিওনার্দো বলতেন, 'শিল্পীকে মানুষটির গভীরে প্রবেশ করতে হবে।'

> ......"faces and gestures must reveal frames of mind. The human body was an outward and visible expression of the soul. It was shaped by its spirit."[২]

'আপন ঘরের বাহির হতে'

বঙ্কিমের বরবর্ণিনীদের বৈচিত্র্য-ঝলকিত নন্দনভুবনে যাওয়ার আগে আমরা জেনে নেব, তিনি তাঁর উপন্যাস-মধ্যে নারী চরিত্রগুলির সামর্থ্যের সীমা কতদূর প্রসারিত করে

নিয়েছিলেন। কী না করতে পারে বঙ্কিমের নায়িকারা! তাদের কেউ হতে পারে ডাকাতের রানী (দেবী চৌধুরানী); কেউ বা নিতে পারে জমিদারের উইল চুরি করার দুঃসাহসিক দায়িত্ব (রোহিনী); গাছে উঠতে পারে অনায়াসে (শ্রী) ; সাহেবকে বোকা বানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে পারে অনায়াসে (শান্তি); অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়তে পারে (দরিয়া); সাঁতার কাটতে পারে অসাধারণ দক্ষতায় (শৈবলিনী); যুদ্ধে নিতে পারে রণরঙ্গিণীর ভূমিকা (শ্রী, চঞ্চলকুমারী) পরিভ্রমণ করতে পারে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত (মতিবিবি); অকম্পিত হৃদয়ে বিচরণ করতে পারে শত্রুপক্ষের অন্দরমহলে (নির্মলকুমারী)। বাঙালী জীবনে রমণীর স্থান কি পরিমাণ সঙ্কুচিত ছিল, তা সকলের জানা আছে। সুবিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির এক-গৃহবধুর স্মৃতিকথার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিলেই বোঝা যাবে. নারীচরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমের কৃতিত্বের পরিমাণটি। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১) তাঁর '*স্মৃতি-কথা*'য় লিখেছেন তাঁর স্বামীর এক বন্ধু মনোমোহন ঘোষ তাঁকে দেখতে চাইলে সে-ব্যবস্থা কিভাবে করা হয়েছিল—

> "ওঁর এক বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে তিনি আমাকে দেখেন—কিন্তু আমার ত বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষেরও বাড়িতে ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই ওঁরা দুজনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমান তালে পা ফেলে বাড়ির ভিতরে এলেন। তারপরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দু'জনে মশারির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলুম ; আমি ঘোমটা দিয়ে বিছানার একপাশে, আর তিনি ভোম্বল দাসের মত আর এক পাশে। লজ্জায় কারো মুখে কথা নেই। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।"[৩]

নদীর উপর জমে থাকা তুষার ঋতু-পরিবর্তনের কারণে গলতে শুরু করলে যেমন হঠাৎ গতি পেয়ে যায়, বঙ্কিমের নারীরা যেন তেমনি গতিময়ী ও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী হয়ে উঠেছে। তাঁরা দেবীত্বে-মাদকতায়-মেধাবীত্বে-নিবেদনে-নম্রতায়-প্রাখর্যে-পবিত্রতায়-সারল্যে-প্রসাধনে-কৌটিল্যে-বিদ্রোহে অনন্যা। তাঁদের কেউ বক্রগীব, কেউ সহাস্য, কেউ কাতর, কেউ সাশ্রু, কেউ প্রফুল্ল, কেউ স্থির, কেউ কোমল, কেউ তীব্র। আপন ঘরের বাহির হতে তাঁরা কোষমুক্ত তরবারির মত এসে দাঁড়িয়েছেন উনিশ শতকের সৃজন-প্রাঙ্গণে।

সকলেই সুন্দরী কিন্তু স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিতা

কেমন রূপ তাঁদের ?—এখন আসব সেই প্রসঙ্গে। রেনেসাঁসে ব্যক্তিত্বের অনন্যতা স্বীকৃত। সামাজিক পরিচয়ের বাঁধা গৎ ছিঁড়ে মানুষ এখানে বিচ্ছুরিত করতে থাকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য। রেনেসাঁসের চিত্রকলাতেও দেখা যায় সেই স্বাতন্ত্র্যের ছাপ। *'লাস্ট সাপার'* ছবিটি অনেকেই এঁকেছেন। এঁকেছেন লিওনার্দো, অ্যাঞ্জেলো উভয়েই। কিন্তু কত তফাৎ পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় ও যীশুর মুখাভিব্যক্তিতে। সেখানকার চিত্রীরা শত-শত ভার্জিন ও ম্যাডোনার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু এক ছবির সঙ্গে অন্য ছবি মেলে না। প্রতিটি মুখই স্বতন্ত্র। বঙ্কিমের রমণীরা সকলেই সুন্দরী, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিতা। একজনের সঙ্গে আরেকজনের গাত্রবর্ণ, পোশাক, প্রকৃতি, মুখাবয়ব কিছুই মেলে না। বঙ্কিমে কোনো দু'টি নারী এক নয়। তিলোত্তমা

বসন্ত-মল্লিকার ন্যায় ; বিমলা অপরাহ্ণের স্থলপদ্মের ন্যায় ; আয়েষা রবিকরফুল্লজলনলিনীর ন্যায় ; সূর্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্যা-তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ; হীরা পদ্মপলাশলোচনা ; কুন্দ শিশিরধৌত পদ্মবৎ ; রজনীর হাস্য দুঃখময় ; লবঙ্গলতার হাসি পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গতুল্য ; শ্রী সদ্য প্রস্ফুটিত প্রাতপুষ্পের ন্যায় ; দেবীচৌধুরানী যেন জ্যোৎস্নাময়ী ভরানদী।

প্রকৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ পাঠ

যে চাবিকাঠি দিয়ে ইতালীয় রেনেসাঁসের চিত্রকলা তার উৎসব-প্রাঙ্গণের দরজা খুলেছিল; মধ্য-যুগ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল তার সৃজন-ভুবনকে, তার নাম প্রকৃতিপরায়ণতা। জোত্তোকে বলা হয় রেনেসাঁস চিত্রকলার সূচনা-পুরুষ। তিনি গুরুমুখী ঐতিহ্যের গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে এসে বসেছিলেন প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। শিল্পকে অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ নিতে হবে প্রকৃতি থেকে—লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এই দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।[৪] এই দর্শনের সূত্রেই জন্ম নিয়েছিল বত্তিচেল্লির *'ভেনাস'*, ভিঞ্চির *'ভার্জিন অব দ্য রক'*, বেলিনির *'ফিস্ট অব গড'*, জর্জিনোর *'টেম্পেস্ট'*। বঙ্কিমের বরবর্ণিনীদের বর্ণনাংশগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রকৃতির প্রতি তাঁর নির্ভরতা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির শিল্পদর্শনমাফিক। প্রকৃতিবাদই বঙ্কিমের সৌন্দর্য-চেতনার প্রধান চাবিকাঠি।

পারস্পেকটিভ ও ল্যান্ডস্কেপ

ইতালীয় রেনেসাঁসে চিত্রের জগৎ শুধু রঙ আর রেখার জগৎ নয়। পরিপ্রেক্ষিত (perspective) রচনার দ্বারা তাঁরা উপজীব্য ব্যক্তি বা বিষয়ের সীমবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। প্রকৃতির বিশাল-বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে উপজীব্য চরিত্রদের স্থাপন করে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, মানুষ এখানে বহুধা-বিস্তৃত প্রাকৃতিক পৃথিবীর জীবন-শৃঙ্খলের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বরূপ। লিওনার্দোর *'ভার্জিন অব দ্য রক'* বা জর্জিনোর *'দ্য জিপসি এন্ড দ্য সোলজার'* ছবি দেখলে বোঝা যায় পরিপ্রেক্ষিত একটি ছবিকে কতখানি বেধ (deapth) ও বিশালতা দান করতে পারে। লিওনার্দোর *'মোনালিসা'* তার রহস্যময় হাসির জন্য বিখ্যাত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পশ্চাৎবর্তী ল্যান্ডস্কেপটিও ছবিটিকে মহত্তর করেছে। ল্যান্ডস্কেপ দু-ধরনেরঃ 'আর্কিটেকচারাল' ও 'ন্যাচারাল'। টিশিয়ান 'আর্কিটেকচারাল' ল্যান্ডস্কেপের পক্ষপাতী। অন্যদিকে ভিঞ্চি, জর্জিনো, করেরিজ্জো এনেছেন 'ন্যাচারাল ল্যান্ডস্কেপ'। মনুষ্যসৃষ্ট-প্রাসাদ, দুর্গ-শোভিত নগর, অলঙ্কৃত কক্ষ ; অন্যদিকে অরণ্য-পর্বত-নদী-শোভিত প্রকৃতির বিশাল পটভূমি ঃ ইতালীয় রেনেসাঁসে রচিত হয়েছিল এতদুভয়ের এক অন্তর্লীন সন্ধি। তাঁদের চিত্রকলার দ্বিবিধ পরিপ্রেক্ষিতে আছে তারই অনিবার্য ব্যঞ্জনা। বঙ্কিম তাঁর অঙ্কিত সৌন্দর্যময়ীদের স্থাপন করেছেন বিভিন্ন ধরনের পরিপ্রেক্ষিতেঃ নির্জন অরণ্যে, চঞ্চল নদীস্রোতে, গোধূলিম্লান পুষ্করিণী সোপানে, গর্জনশীল সমুদ্রতটে, প্রায়ান্ধকার অলিন্দে, বিক্ষুব্ধ সমরক্ষেত্রে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বা অলঙ্কৃত বিলাসকক্ষে। বঙ্কিমের প্রেক্ষিত-রচনা অনেকটা ভেনেসীয় শিল্পী বেলিনি বা জর্জিনোর মত। ডুরান্ট বলেছেন, ভেনিসের চিত্রকররা রঙের ব্যবহার যদি পূর্বদেশ থেকে নাও পেতেন তাতে ক্ষতি ছিল না, কেননা 'they could get

it from the Venetian sky observing its variety of light and mist and the splender of sun sets touching campaniles and palaces or mirrored in the sky'[৫] সময়গত প্রেক্ষিতের দিক থেকে দেখতে গেলে বঙ্কিমের বিশেষ পছন্দ চন্দ্রালোকিত রাত্রি এবং সূর্যাস্তকালীন সন্ধ্যা। শৈবলিনী কপালকুণ্ডলা, দলনী বেগম, রোহিণী এঁদের সঙ্গে বিশেষভাবে আমাদের দেখা হয় সূর্যাস্তকালে। শৈবলিনী ভীমা পুষ্করিণীতে বৈকালিক জলক্রীড়ায় রত। তার সময় ও দৃশ্যগত প্রেক্ষিতটি এইরকম—

> "পুষ্করিণীর শ্যামজলে স্বর্ণরৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।"[৬]

বঙ্কিমের বরবর্ণিনীরা

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস *'দুর্গেশনন্দিনী'*তে আছে তিন নারী। তিলোত্তমা, বিমলা ও আয়েষা। বঙ্কিম তাঁদের সৌন্দর্যের কম্পারেটিভ স্টাডি উপহার দিয়েছেন—

> "কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তীমল্লিকার ন্যায় ; নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীয় রূপ অপরাহ্ণের স্থলপদ্মের ন্যায় ; নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধু-পরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায় ; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত ; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক ; কোমল, অথচ প্রোজ্জ্বল ; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না......যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা।"[৭]

বঙ্কিম আয়েষার অবয়ব পাঠকের ধ্যানপ্রাপ্য করার জন্য লিখেছেন—

> "যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তুলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ; না চম্পক, না রক্ত, না শ্বেতপদ্মকোরক অথচ তিনই মিশ্রিত, এমত বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ;......যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি স্পর্শ করিতাম না। আয়েষার সৌন্দর্য্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ। সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ। কি প্রকারে লিখিব?"[৮]

'সন্ধ্যালোকে না দেখিলে'

ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্রের একাংশ যেখানে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে দ্রবীভূত সুবর্ণের মত, সেই পটভূমির নির্জনতায় বিপন্ন নবকুমার দেখলেন কপালকুণ্ডলাকে—

> "অপূর্ব মূর্ত্তি। সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্ত্তি। কেশভার-অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন ; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃতচন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাললোচনে কটাক্ষ অতিস্থির, অতিস্নিগ্ধ,

অতিগম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময় ; সে কটাক্ষ এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য ; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুর জাল ; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।"[৯]

পরিপ্রেক্ষিত থেকে এখানে চিত্রিত চরিত্রটিকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না।

'ভাষায় কি শব্দ ছিল না?'

মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের দীর্ঘ প্রতীক্ষান্ত সাক্ষাৎ-দৃশ্যটিকে বঙ্কিম স্থাপন করেছেন প্রকৃতির বিশাল প্রাসাদ মধ্যে—

"সেই নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা বাপীতীরে, দুইজনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে সেই নিবিড় বন। ঘনবিন্যস্ত লতাস্রগবিশোভী বিশাল বিটপীসকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; সম্মুখে নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক আকাশে, বৃক্ষশিরে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজলে সর্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা, ধৈর্যময়ী। সেই ধৈর্যময়ী প্রকৃতির প্রাসাদমধ্যে মৃণালিনী হেমচন্দ্র মুখে মুখে দাঁড়াইলেন। ভাষায় কি শব্দ ছিল না? ......যদি মনে বলিবার কথা ছিল, ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না?"[১০]

'সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল'

মনোরমা বঙ্কিমী কল্পনার অপূর্ব সৃষ্টি।

"তাঁহার রূপরাশি অতুলচক্ষুতে ধরে না।......একে বর্ণ সোনার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গ শিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে......দ্বিরদ-রদ যদি কুসুম কোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত।......আর ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা উর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপী জলার্দ্র, অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন ও ভঙ্গীও সুকুমার ; নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যঃপ্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোকে পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন।"

'ভেনাসের জন্ম' খ্যাত বত্তিচেল্লি বা 'কীটস উইথ ব্রাস' নামে অভিহিত রাফায়েলের মত

বিশ্ববন্দিত শিল্পীর পক্ষে এ পর্যন্ত ছবিটি আঁকা হয়ত অসম্ভব হতো না। কিন্তু,

"দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য-সাগরের এক অপূর্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি, মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমের সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর যে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত প্রগল্‌ভ বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। সবলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল।"[১১]

ভাবান্তরের এই অপূর্ব রহস্য-মুহূর্তটিকে কে আঁকতে পারতেন?

'এ পৃথিবীর সে চোখ নয়'

'শিশিরধৌত পদ্মবৎ' কুন্দের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন,

"চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার একবকম দেখিলাম না ; আমার বোধ হয় যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয় ; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভালো করিয়া দেখে না ; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে।......বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত-মাংসের যেন গঠন নয় ; ......"[১২]

স্বর্গীয় এই সরলতা ও সৌন্দর্যের ছবি রেনেসাঁসের চিত্রীরা বহু এঁকেছেন।

'প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী শোভা' সন্ন্যাসিনী শ্রীর শোভা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন—

"সদ্যপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহানি নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়—সর্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য......তারপর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটুমাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময়।"[১৩]

সৌন্দর্যের এই শুদ্ধশ্রী রেনেসাঁসের ক্যাথলিক চিত্রমালায় অসুলভ নয়, তবে অবশ্যই শ্রীর মতো সহাস্য বা অমাতৃক নয়, তারা আপাদকণ্ঠ আবৃত, অপরিস্ফুটিত দুঃখের ছায়াতেও জ্যোতির্ময়ী।

'গৃহ সরোবরে পদ্ম ফুটিয়াছে'

জর্জিনোর আঁকা *'স্লিপিং ভেনাস'* পাপ-পুণ্যের অতীত। বঙ্কিম *'চন্দ্রশেখর'* উপন্যাসে নিদ্রিতা শৈবলিনীর দু'টি চিত্র এঁকেছেন একটির দ্রষ্টা প্রতাপ, অন্যটির চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর দৃষ্ট নিদ্রিতা শৈবলিনীর চিত্রে ডিটেলসের কাজ ও অভিঘাত দু'ই আছে। চন্দ্রশেখর শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ। অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল বিংশতি বর্ষীয়া স্ত্রী নিদ্রিতা শৈবলিনীর প্রতি।

"তাঁহার গৃহ সরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে।...... দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে।—যেন কুসুমরাশির উপরে কে

কুসুমবাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বুল রাগারক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার জোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল।"[১৪]

সুন্দর মানেই যেখানে সর্বনাশ

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে এসে বঙ্কিম বড় গোলে পড়লেন। সে গোল বারুণী পুষ্করিণীকে নিয়ে।

"পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ-নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল-লাল, কালো, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়িগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ, সেও সেই বাগানের ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।"[১৫]

এ কি দর্পণ, না চিত্রপট? পট তো চিত্রশূন্য রাখা যায় না? গোল বোধ হয় তাই নিয়ে। চিত্রপট বড় তরল ও স্থির।

"রোহিণীর কলসী ভারী, চালচলনও ভারী।......পিতলের কলসী কক্ষে ; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে।......হেলিয়া দুলিয়া পালভরা জাহাজের মত ঠমকে ঠমকে চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল।"[১৬]

বারুণী তো পুষ্করিণী মাত্র নয়, নীল জলের দর্পণ। 'রোহিণী সোপানে অবতীর্ণ হইয়া কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।' দর্পণে 'ভাস্করকীর্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া'। কিন্তু বারুণী পুষ্করিণী তো শুধু ছায়া ফেলার দর্পণ নয়, চিত্রপটও। দর্পণ বাঁচিয়ে রোহিণীকে প্রবেশ করতে হবে সেই ফ্রেমে। গোবিন্দলাল বেড়াতে এসে দেখলেন জলে একটি কলসী ভাসছে। কার কলসী?

"জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতলে আলো করিয়াছে।"[১৭]

এই আত্মঘাত থেকে বিধবা রোহিণীকে তৎক্ষণাৎ তুলে আনলেন গোবিন্দলাল। সুন্দর মানেই যেখানে সর্বনাশ যেখানে রোহিনী বাঁচে কিরূপে? *'কৃষ্ণকান্তের উইল'* এক অর্থে বিধবা-বিবাহেরই পাঠান্তর। এবং এ পাঠ জীবনবাদী রেনেসাঁসের দ্বারা সমর্থিত।

'এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে'

রঙমহলে দলনীবেগম রজতদীপের আলোয় কিংখাবের বালিশে মাথা রেখে 'গুলেস্তাঁ' পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ালেন। তাহার অঙ্গসঞ্চালনমাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল।[১৮] অনেক অনেক দিন পর অমরনাথ তাঁর পূর্ব-প্রণয়িনী বর্তমানে পরস্ত্রী লবঙ্গলতাকে দেখলেন।

> "সে হাসি তেমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছিল।"[১৯]

রূপনগরের অন্তঃপুরে এক তসবিরওয়ালী গিয়েছিল ছবি বিক্রি করতে।

> "এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল......বুড়ি তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে।"[২০]

'কে দেখাবি গো আমায় রূপ দেখা'

দৃষ্টির প্রদীপে সুন্দরের আবতি। যার দৃষ্টি নেই, তার দৃশ্যও নেই। সে চিনবে কেমন করে তার দয়িতকে? শচীন্দ্র চিবুক ধরে অন্ধ পুষ্পনারীর মুখ ফিরিয়ে দিলে রজনী অনুভব করে—

> "সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যুথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশেপাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতরে ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল।...... আ মরি মরি—সে নবনীত—সুকুমার—পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ-স্পর্শ। যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে?"[২১]

বধু রূপের আকুতি মেটে না। অন্তর বিদীর্ণ করা হাহাকারে সে বলে, 'এক মুহূর্ত্ত জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না?' লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিভিন্ন শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মহত্ত্ব অনুযায়ী পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনের স্থান প্রথম, শ্রবণ দ্বিতীয়। আঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শের স্থান এদের পরে।[২২] অন্ধের কাছে প্রথম কি? সেই প্রশ্নেরই সূক্ষ্ম শৈল্পিক-মীমাংসা *'রজনী'*তে। 'আ মরি মরি—সে নবনীত-সুকুমার-পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ'—স্পর্শ, আঘ্রাণ, শ্রুতির মিলিত মিশ্রিত ঐকতান দিয়ে দৃষ্টির ক্ষুধা মেটানো। ক্ষুধা কি মেটে? ইতালীয় রেনেসাঁসে দৃশ্যের উৎসব। কে জানে সেখানে কোনো অন্ধ রজনী গুমরে গুমরে কেঁদেছিল কিনা 'কে দেখাবি গো—আমায় রূপ দেখা'। নিশ্চল যার চোখের তারা, তার রূপ কেমন? বঙ্কিম লিখেছেন—

> "রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর, গঠন, বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত ; মুখকান্তি গম্ভীর ; গতি, অঙ্গভঙ্গীসকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক ; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরের সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্য্যপটু, শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।"[২৩]

রেনেসাঁসের নন্দনভুবনে প্রতিবন্ধী রমণী এই পুনর্বাসন উল্লেখের যোগ্য। *'মোনালিসা'*র জগদ্বিখ্যাত হাসি রহস্যময়, দুঃখময় কি?

দৃষ্টি ও শ্রুতির যুগল সম্মিলন

*‘দেবী চৌধুরানী’*র দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এক রূপবতী রমণীর বীণাবাদনের একটি সুদুর্লভ দৃশ্য আছে। যেমন তার পারস্পেকটিভ তেমনি তার কনটেন্ট। সমান্তরাল ও পরস্পরস্পর্ধিত। ভরা বর্ষা। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি। নদীর উপর বজরা। সেই বজরার ছাদে রমণী বীণাবাদনে নিযুক্তা, জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী—

> “ইহার অবয়ব সর্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনি কূলে কূলে পুরিয়াছে।......জল অস্থির কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্বিকার।......ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। ......জ্যোৎস্না পুলকিত স্থির নদীজলের মত সেই শুভ্র বসন ; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্তী বনচ্ছায়া ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে।......ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে ; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে......ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিনী বাজিল—কেদার হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ, কুসুমের মালার মত নদী-কল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল।”[২৪]

দৃষ্টি ও শ্রুতির এই যুগল-সম্মিলন ইতালীয় চিত্রকরের পক্ষেও শ্লাঘনীয় হতে পারত। ভেনিসের স্বনামখ্যাত চিত্রী জর্জিনোর *‘কনসার্ট’* ছবিটিকে বলা হয় তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় ছবি (‘most Georgionesqe’) । ছবিটি দেখে বোঝা যায় না, সঙ্গীত এখনি শেষ হল, না, আরম্ভই হয়নি। বঙ্কিমে সেই রহস্যগর্ভ ব্যঞ্জনা নেই ; কিন্তু যা আছে, তা কম কিছু নয়। বহু-বিবাহের লাঞ্ছনা ও প্রত্যাখ্যান থেকে উদ্ধার করে শব্দ-শিল্পী বঙ্কিম প্রফুল্লকে যে-স্তরে উত্তরিত করেছেন, তা রেনেসাঁসের রুচিসূক্ষ্ম শিল্প-চেতনারই সাক্ষ্যবাহী।

ইতালীয় রেনেসাঁসে চিত্রার্পিত সুন্দরীদের মডেল সুদুর্লভ ছিল না। বাস্তবের রমণীরাই উঠে এসেছিলেন চিত্রের ভুবনে। আন্দ্রিয়া ম্যানতেগ্নার আঁকা *‘পারনাসাস’* ছবিতে নৃত্য ও সঙ্গীতরতা মিউজদের একজন স্বয়ং ইসাবেলা দ্য এস্তে। বঙ্গীয় বাস্তবতায় কোনো ইসাবেলা বা বিয়াত্রিচে ছিলেন না। সেই কারণে শিল্পী হিসাবে তাঁর কাজ ছিল অনেক বেশি দুরূহ। সাফল্য বিচারের সময় এসব কথা মনে রাখা দরকার।

শেষ পর্যন্ত জয় আভিজাত্যের

এ. ভেনচুরা তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, ‘রেনেসাঁসে শেষপর্যন্ত জয় হয়েছিল আভিজাত্যের’।[২৫] মার্টিন ভণ তাঁর *‘সোশিওলজি অব দ্য রেনেসাঁস’* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন,

উৎপাদনশীল সক্রিয়তা থেকে বুর্জোয়ারা ক্রমশ আভিজাত্যপূর্ণ উপভোগীবাদী জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।[২৬] লোপেজ তাঁর *'হার্ডটাইম অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট'* নামক গবেষণামূলক নিবন্ধেও তা দেখিয়েছেন।[২৭] ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত মেদিচি পরিবারের কোসিমো, লরেঞ্জো ; মিলানের ডিউক লোডোভিকো ; পোপ জুলিয়াস-২য়, আলোকজান্ডার-ষষ্ঠ, লিও-১০ম ; শিল্পী রাফায়েল, টিশিয়ান ; হিউম্যানিস্ট সালুতাতি, পোল্লিও ; সাহিত্যিক পেত্রার্কা, আরেতিনো ; রেনেসাঁস মহিলা ইসাবেলা, বিয়াত্রিচে—এঁরা আভিজাত্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যে রাজন্যক ও ধনিক-বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রেনেসাঁসের জগৎ অভিজাত ও নান্দনিক হয়ে উঠেছিল।[২৮] রেনেসাঁসের জগৎ ছিল রাজন্যক, জমিদার, ধনিক, বণিক, পোপ, কার্ডিনাল, হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীদের জগৎ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী রাজা, রাজন্যক, জমিদার, ভূস্বামী, যুবরাজ, সেনাপতি, রাজনন্দিনী, সম্রাট-দুহিতা এদের জগতেই মূলত ঘোরাফেরা করেছে। কি ঐতিহাসিক-উপন্যাস, কি সামাজিক-উপন্যাস আভিজাত্যের আয়োজনে কোথাও কোন খামতি নেই।

গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান

*'কৃষ্ণকান্তের উইল'*এর নায়ক—

> "গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান ভ্রমণ একটি প্রধান সুখ।......বারুণীকূলে উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তর বেদিকা ছিল, বেদিকা মধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তর—খোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি—স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে,—তাহার চারিপার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভালোবাসিতেন।"[২৯]

বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল

'বিষবৃক্ষ'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে আছে নগেন্দ্রের তিনমহল বাড়ির বিস্তৃত ও পরিপাটী বর্ণনা। 'তাহার বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎ পুরী'। তিন মহল সদরের পর তিন মহল অন্দর। তিন মহল অন্দর মহলের পর পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান পরে, নীল মেঘখণ্ড তুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটির তিন মহল ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কির পথ। তার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই পথ দিয়ে অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়। বাড়ির বাইরে আস্তাবল, হাতিশালা, কুকুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান।[৩০]

সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ

'বিষবৃক্ষ'-এ চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে আছে সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহের ডিটেলস্ বর্ণনা।

> "সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর ;.....ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত ; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমসকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। একপাশে বহুমূল্য দারুনির্মিত হস্তিদন্তখচিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর এক পাশে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্টাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল।"[৩১]

চিত্রগুলির বিস্তৃত বর্ণনা বঙ্কিম দিয়েছেন। একটি চিত্র *'কুমারসম্ভব'* থেকে নীত, আরেক চিত্রে রাম জানকীকে নিয়ে লঙ্কা থেকে ফিরে আসছেন, আরেক চিত্রে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে রথে তুলেছেন, অন্য একটি চিত্রে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখবার জন্য চরণ থেকে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর তুলছেন, অন্য এক চিত্রে অভিমন্যুকে যুদ্ধে যেতে বাধা দিচ্ছেন উত্তরা, আরেক চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত। ইসাবেলা দ্য এসতে বা বিয়াত্রিচে প্রমুখ রেনেসাঁস-মহিলাদের শয়নকক্ষ এইরকমই অলঙ্কৃত ও চিত্র-শোভিত ছিল।

'বন্দী ব্রজেশ্বর যাহা দেখিল'

দুখিনীর গল্প বঙ্কিম-সাহিত্যে একেবারে নেই তা নয়। গল্প দারিদ্র্যের মধ্যে শুরু হলেও শেষ করেছেন বিষয় সম্পত্তি, স্বীকৃতি ও সৌভাগ্যের মধ্যে। রাধারানী পীড়িতা মায়ের জন্য বনফুলের মালা বিক্রি করতে গিয়েছিল রথের মেলায়, গল্পের শেষে দেখা যায় রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তার বিবাহ। রজনী সূচনায় অন্ধ পুষ্পরানী মাত্র। পরিণামে ডাক্তার পাত্র শচীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ তো বটেই, বঙ্কিম তাঁকে বিশাল বিষয় সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক অনাথিনীর কন্যা প্রফুল্ল সূচনায় নিঃস্ব ও স্বামী প্রত্যাখ্যাতা হলেও কুড়ি ঘড়া মোহরের মালিক হয়ে যায় অনায়াসে এবং ভবানী পাঠকের হাতে দেখতে দেখতে সে দস্যু-সর্দারনী হয়ে পড়ে। বন্দী ব্রজেশ্বর বজরায় তার কামরার মধ্যে প্রবেশ করে—

> "যাহা দেখিল ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইল। কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারুচিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্তজনে দশভূজাপ্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ ; মহিষাসুরের যুদ্ধ; দশ অবতার ; অষ্টনায়িকা ; সপ্ত মাতৃকা ; দশমহাবিদ্যা ; কৈলাস ; বৃন্দাবন; লঙ্কা; ইন্দ্রালয় ; নবনারী-কুঞ্জর ; বস্ত্রহরণ সকলই চিত্রিত। সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ-মখমলের কামদার বিছানা, তিনদিকে সেইরূপ বালিশ, সোনার আতরদান, তারই গোলাব-পাশ, সোনার বাটা, সোনার পুষ্পপাত্র—তাহাতে রাশীকৃত সুগন্ধি ফুল, সোনার আলবোলা ; পোরজরের সটকা-সোলার মুখনলে মতির থোপ দুলিতেছে—তাহাতে মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দুই পাশে দুই রূপার ঝাড়, তাঁহাতে

বহু সংখ্যক সুগন্ধি দীপ রূপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে ; উপরের ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ সোনার শিকলে লট্‌কান আছে। চারিকোণে চারিটি রূপার পুতুল, চারিটি বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে। মসনদের উপর একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাহার মুখের উপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে।......কানের গহনা কাপড়ের ভিতর হইতে জ্বলিতেছে।"[৩২]

'*কপালকুণ্ডলা*'য় আছে এক অরণ্যকন্যার গল্প, পথিমধ্যে আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ ঘটল মতিবিবির সঙ্গে। তিনি নিরাভরণা কপালকুণ্ডলাকে নিজের সুবর্ণমুক্তাদি শোভিত অলঙ্কার, কুন্তল, কবরী, কপাল, নয়নপার্শ্ব, কর্ণ, কণ্ঠ, হৃদয়, বাহুযুগ থেকে খুলে সাজিয়ে দিলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত একটি গল্পের পৃথিবীতে লুৎফ-উন্নিসা তার ভালোবাসার পাত্রের জন্য রাজসিক একটি আসর সাজিয়ে বসে।[৩৩]

'ললাটে অদৃশ্য রাজতিলক'

রবীন্দ্রনাথ '*জীবনস্মৃতি*'তে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।'[৩৪] বস্তুতপক্ষে বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল রাজসিক বা অভিজাতিক। ইতিহাসমিশ্রিত বা রোমান্সধর্মী উপন্যাসে বঙ্কিম যেন বেশি স্বচ্ছন্দ। ঐশ্বর্য ও বিলাসপূর্ণ দৃশ্যের বর্ণনায় তাঁর জুড়ি নেই। '*রাজসিংহ*' উপন্যাসে রূপনগরের অন্তঃপুর বর্ণনায় (প্রথম খণ্ড। চিত্রে চরণ), দিল্লী মহানগরীর বর্ণনায় (দ্বিতীয় খণ্ড। ঐশ্বর্য নরক), বাদশাহের যুদ্ধযাত্রা বর্ণনায় (সপ্তম খণ্ড। বাদশাহ বহ্নিচক্রে), রঙমহলে জেবউন্নিসার বিলাসগৃহ বর্ণনায় (দ্বিতীয় খণ্ড। ঐশ্বর্য নরক) যে ডিটেলসের কাজ ও সৌন্দর্যের আয়োজন আছে, তার তুলনা রেনেসাঁসে মেলে। ফেরারার রাজকন্যার উদ্দেশ্যে বুসেন্তোর (Bucentour) নৌপথে উৎসব-যাত্রা করলে, গোটা নদীপথ স্বপ্নের দেশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফুলে, মালায়, সুবেশধারী যুবক-যুবতীদের ভিড়ে ও সুসজ্জিত নৌকার প্রাচুর্যে মাইলতক নদীর জল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন।[৩৫] লরেঞ্জোর ভিলা, কোসিমোর ভোজনালয়, বিয়াত্রিচের আসনকক্ষের অলঙ্কৃত ঐশ্বর্য ছিল এই রকমই চোখ-ধাঁধানো ও নান্দনিক।[৩৬]

বঙ্কিম ত্রিমুখী ভূমিকায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রিমুখী ভূমিকা পালন করেন। উপন্যাসাদি রচনায় তিনি পালন করেছেন রেনেসাঁস-আর্টিস্টের ভূমিকা; প্রাচীন বিদ্যা ও জ্ঞানের পুনরুদ্ধারে তিনি ব্রতী হয়েছেন রেনেসাঁস হিউম্যানিস্টের যোগ্যতা নিয়ে ; আবার সমাজ ও স্বধর্মমূলক রচনাগুলিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে রিফরমিস্টের। শিল্পীসুলভ নান্দনিক সৃজনশীলতা ; হিউম্যানিস্টসুলভ প্রাচীন বিদ্যানুসন্ধিৎসা ও রিফরমিস্টসুলভ পরিশুদ্ধ নীতিচেতনা এই তিনের অদ্ভুত সমন্বয় আমরা তাঁর মধ্যে লক্ষ করি।

রেনেসাঁস হিউম্যানিস্টদের কাম্য ছিল প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। তাঁরা মনে করতেন, দীন ও পতিত বর্তমানের স্বাস্থ্য ফেরাতে অতীতের শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুদূর অতীতে যে জ্ঞানের চর্চা একসময় হয়েছিল, দীর্ঘদিনের অ-চর্চার ফলে তা থেকে স্খলিত হয়েছে মানবসভ্যতা। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আধুনিকতার প্রয়োজনে

তাঁরা প্রবেশ করেছিলেন অতীতের শাস্ত্রশালায়। প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুদ্ধার ছাড়া ভবিষ্যতের দিকে এগোনো যাবে না, এইরকমই ছিল তাঁদের দর্শন।[৩৭]

কিন্তু প্রাচীন-বিদ্যা নামে যা প্রচলিত আছে তার নির্বিচার পুনরুজ্জীবন তাঁদের কাম্য ছিল না। তাঁরা মনে করতেন প্রাচীন-জ্ঞান আবৃত হয় পরবর্তী নানা প্রক্ষেপে, অনৈসর্গিক মিথ্যায়; পল্লবিত হয় নানা খেলো উপাখ্যানে। মূলের মর্মগ্রহণে অক্ষম পণ্ডিতমন্যের টীকা-ভাষ্য মূলের পাঠ ও বক্তব্য বিকৃত করে দেয়। স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদীরা প্রাচীনজ্ঞানের বিকৃত ও একপেশে ব্যাখ্যা দিয়ে ফয়দা তুলতে থাকে। সুতরাং প্রাচীন-জ্ঞানকে উদ্ধার করতে হবে যতদূর সম্ভব শুদ্ধ ও মৌল পাঠে। এর জন্য হিউম্যানিস্টরা প্রবেশ করেছেন ব্যাপক অধ্যয়নের রাজ্যে। তুলনামূলক-আলোচনা ও আভ্যন্তর-প্রমাণের সাহায্যে তাঁরা পৌঁছুতে চেয়েছেন শুদ্ধ-পাঠে। এজন্য বিজ্ঞান-সম্মত বিচার ও বিশ্লেষণ-বুদ্ধিকে তাঁরা প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের অনুরক্তি প্রায়শই ছিল বিচারশীল।

প্রাচীন-বিদ্যার পুনরুজ্জীবন

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আত্যন্তিক অনুরক্তি হিউম্যানিস্ট-সুলভ। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে এক অসাধারণ গৌরববোধ তাঁর যে কোনো রচনার মধ্যে বিদ্যমান। *'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা' 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম'* এই গ্রন্থগুলিতে তিনি যেন প্রবেশ করেছেন প্রাচীন সংস্কৃতির রাজ্যে। কিন্তু কিছুই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। সতর্ক ও বিচারশীল মন দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন মূল গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ ও বক্তব্য পুনরুদ্ধার করার কাজে। মূল গ্রন্থগুলি পড়েছেন নিবিড় নিষ্ঠা নিয়ে। পড়েছেন সমকালিক ও সমধর্মী রচনাগুলি। অনুধাবন করেছেন মূল বিষয়ের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস-সম্মত ধারা। আভ্যন্তর, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক বিচার-ধারা প্রয়োগ করে মূল ও প্রক্ষেপের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। দেশী ও বিদেশী টীকা-ভাষ্যগুলির বিকৃতি ও একপেশেমি নির্ধারণ করেছেন। বিস্মৃতি, মনোরঞ্জন, অতিরঞ্জন, অনৈসর্গিকতা, উদ্দেশ্যমূলকতা এবং দেশী-বিদেশী ভুল-ভাষ্যের পাহাড়-প্রমাণ জঞ্জাল ভেদ করে বঙ্কিম যেভাবে শুদ্ধ ও মৌলপাঠে পৌঁছুতে চেয়েছেন, তার তুলনা রেনেসাঁস হিউম্যানিজমেই পাওয়া যায়। *'কৃষ্ণচরিত্র'*কে বলা যায় হিউম্যানিস্ট বঙ্কিমের মনস্বিতার পরাকাষ্ঠা। মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা বিচার করতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন,

> "মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না।......আদিম মহাভারতে চতুর্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে।"[৩৮] (প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত)

পুরাণের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ

পুরাণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, পুরাণ প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অতিরঞ্জন। তিনি লিখেছেন, সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের জন্য—

"নিয়ম করিয়াছি যে, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিব ; আর যাহা নৈসর্গিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।"[৩৯]

(প্রথম খণ্ড, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ, ইতিহাসাদির পৌর্ব্বাপর্য্য)

জয়দ্রথবধে আছে অর্জুনবধের জন্য জয়দ্রথ বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। কৃষ্ণ সে অস্ত্রের আঘাত স্বীকার করলেন স্বীয় বক্ষে। তার বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তীমালা হয়ে শোভা পেতে থাকল। বঙ্কিম বলেছেন,

"এই অস্ত্র একটা অনৈসর্গিক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না এবং অনৈসর্গিকের উপর কোনো সত্যও সংস্থাপিত হয় না। অতএব এ গল্পটা আমাদের পরিত্যাজ্য।"[৪০]

(ষষ্ঠ খণ্ড, কুরুক্ষেত্র, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, জয়দ্রথবধ)

এইভাবে তিনি পরিত্যাগ করেছেন অনৈসর্গিক, অসঙ্গত, প্রক্ষিপ্ত ও পল্লবিত নানা উপাখ্যান। তিনি লিখেছেন,

"কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভালো করিয়া বা কোন প্রকার বুজরুকি ভেল্‌কির দ্বারা ধর্মপ্রচার বা আপনার দেবত্ব স্থাপন করেন নাই।"[৪১]

(চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ)

ক্ষুরধার বিচার-বুদ্ধি ও তথ্য-প্রমাণ দিয়ে তিনি বাল্যলীলা থেকে বৃন্দাবনলীলা, বৃন্দাবন লীলা থেকে দ্বারকালীলা, দ্বারকালীলা থেকে কুরুক্ষেত্রের কাহিনীগুলি বিচার করে প্রক্ষিপ্ত ও পল্লবিত কাহিনীগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন—

"এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই।"[৪২]

(দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, ব্রজগোপী ভাগবত, বস্ত্রহরণ)

কৃষ্ণের ষোল হাজার গোপিনীর গল্প তাঁর বিচারে 'আষাঢ়ে গল্প', 'রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না।'[৪৩] অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানগুলি নাকচ করতে গিয়ে তিনি উপাখ্যান রচনাকারীকে 'গর্দ্দভ' বলতেও কুণ্ঠিত হননি।

"যে বিষ্ণু বেদে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি গোঁপ কাঁচাচুল পাকাচুল প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়।"[৪৪]

(চতুর্থ খণ্ড, ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ)

ভাষ্যকারদের হাত হইতে উদ্ধার

'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম'-এ বঙ্কিম বলেছেন,

"সাধারণ হিন্দু যদি জানিত যে, বেদে কি আছে, তাহা হইলে কখন আজিকার হিন্দু ধর্ম এমন কুসংস্কারাপন্ন এবং অবনত হইত না ; মনসা মাকালের পূজায় পৌঁছিত না। জ্ঞান চাবিতালায় ভিতর বন্ধ থাকাই উন্নতিপ্রাপ্ত সমাজের অবনতির

> কারণ।......তাই, ভারতবর্ষ অনন্তজ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান।"[৪৫] (বেদের ঈশ্বরবাদ)

'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিম বারবার বলছেন, 'ভাষ্যকারদের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার করা আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য।'[৪৬] অচর্চা, অজ্ঞানতা, ও বিকৃতিমূলক জঞ্জাল সাফাই করে প্রাচীন সত্যকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ বঙ্কিম নিষ্ঠা সহকারে করেছেন। জঞ্জাল শুধুমাত্র এদেশীয় পণ্ডিতরাই স্তূপীকৃত করেছেন তা নয় ; বিদেশী পণ্ডিতদের অসম্পূর্ণ, একপেশে ও বিকৃতি টীকাভাষ্যও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সে-বিষয়েও বঙ্কিম যথেষ্ট সচেতনতা ও স্পর্শকাতরতার পরিচয় দিয়েছেন। এদেশীয় রক্ষণশীল সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সংস্কৃত-চর্চা বিষয়ে তাঁর মনোভাব *'কমলাকান্তের দপ্তর'*-এ কৌতুক মিশ্রিত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে—

> "বিদ্যার বাজারে গেলাম।......এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটাকাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া নামাবলি গায়ে ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব ষত্ব ণত্ব—ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত্ব, নইলে ন-ত্ব।"......আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠি হাতে দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতি অস্ত্রে ছেদন করিয়া সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল?" সাহেবরা বলিলেন, "ইহাকে বলে 'Asiatic Researches'।"[৪৭]
>
> (*কমলাকান্তের দপ্তর,* দশম সংখ্যা, বড়বাজার)

ইওরোপীয়দের সমালোচন-পাঠ......মহাপাতক

'ইওরোপীয়রা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপে বুঝেন'—এবিষয়ে অনুসন্ধান করে 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে বঙ্কিম তাঁর অভিমত জানিয়েছেন,

> "সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই হইতে পারে না।"[৪৮]

বিশেষ করে *'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'* নামক গ্রন্থে বঙ্কিম Dr. Hang, Dr. Muir, Thompson, Lassen, MaxMueller, Weber, Bently, H. H. Wilson প্রমুখ ভারতবিদ্যার বিদেশী-পণ্ডিতদের মতামত ও ভাষ্যগুলি বিচার করে তাদের ক্ষতিকর অসঙ্গতি ও ত্রুটিগুলি দেখিয়েছেন। তিনি জোড়হাত করে পাঠকদের বলেছেন বিলিতি পণ্ডিতদের কাছে গীতার মর্মার্থ বুঝতে যেন না যান। প্রাচীন-জ্ঞানের শুদ্ধ-রূপটি বঙ্কিম উদ্ধার করতে চেয়েছেন ও যে-কোন বিকৃত-ভাষ্যের হাত থেকে পাখির মায়ের মতো মমতায় আগলে রাখতে চেয়েছেন। যেহেতু তা ধর্মীয় বিষয়াশ্রয়ী, সেই কারণে তাকে রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের লক্ষণযুক্ত বলা যাবে কিনা—এই প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রাচীন-বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও পর্যালোচনা-প্রকল্পে ইতালির

হিউম্যানিস্টরা বাইবেল বা ধর্মকে বাদ দেননি।

> "The Humanitist included the Bible and biblical languages in their programme of the revival of antiquity."[৪৯]

বোক্কাচিও রচিত *'জেনোলজি অব দ্য গড'* নামক বিখ্যাত রচনাটিতে আছে দেবতাদের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন ধরনের আলোচনা। এরাজমুস *'মেথড অব দ্য ট্রু থিওলজি'* নামক রচনায় সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের একটি পরিচ্ছন্ন বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এরাজমুসের সম্পাদনাকর্ম ও রচিত প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "The major portion of his literary labours was devoted, not to the classicb but to the New Testament and the Fathers."[৫০]

সুতরাং কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, গীতা বা দেবতত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে হিউম্যানিস্টের খেতাব কেড়ে নেওয়া যায় না।

আদর্শ মনুষ্য অথবা মানুষের আদর্শ

ক্লাসিক্যাল যুগ বীর-পূজক। রেনেসাঁসের চোখে মানুষ অনন্ত সম্ভাবনাময়। রেনেসাঁসের গল্প সমস্ত সম্ভাবনার দলগুলি খুলে দেওয়া এক পূর্ণবিকশিত মানুষের স্বপ্ন নিয়ে। বঙ্কিম সেই মানুষটির খোঁজে প্রবেশ করেছেন মহাভারতের দৈব-দুর্গে। সমস্ত নৈসর্গিকতা ও দেবত্বের অতিমহিমা খুলে তাকে দান করেছেন পার্থিব পূর্ণতা। *'কৃষ্ণ-চরিত্র'*-এ বঙ্কিম লিখছেন—

> "কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচনা করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কিনা তাহা আমি কিছুই বলিতেছি না।......আমরা তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি।"[৫১]

(চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণের মানবিকতা)

মহাকাব্য তল্লাশ করে, দেবত্ব খারিজ করে মানুষের এই মহা-মডেল স্থাপন করে বঙ্কিম তাঁর কাজ শেষ করেন নি।

মানুষ কিভাবে পরিশীলিত, সংস্কৃতিমান ও পূর্ণ-মানুষে পরিণত হবে তার একটি খুঁটিনাটি পরিকল্পনা পেশ করেছেন *'ধর্ম্মতত্ত্ব'* গ্রন্থটিতে।

> "গুরু—মানুষের ধর্ম্ম কি?
> শিষ্য—এক কথায় কি বলিব?
> গুরু—মনুষ্যত্ব বল না কেন?"[৫২]

(তৃতীয় অধ্যায়, ধর্ম্ম কি?)

মানববৃত্তি চারটি—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী। সকল বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্তিই মনুষ্যত্ব। অনুশীলনেই মানববৃত্তির উৎকর্ষণ। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে অলডো মানুটিয়াস লেখেন,

> "মানুষ হচ্ছে লোহার তরবারি। তরবারি যেমন অব্যবহৃত রাখলে তাতে মরচে পড়ে যায়, মানুষও তাই। সক্রিয়তা ও ক্রমাগত ব্যবহারে মানুষের ধার অব্যাহত থাকে।"[৫৩]

*'দেবীচৌধুরাণী'*তে ভবানী পাঠক বলেছেন,

> "জগীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি; এখন পাঁচ সাত বছর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে।"[৫৪]
>
> (প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে কী কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে প্রফুল্ল শাণিত ইস্পাতে পরিণত হয়েছিল তার বিবরণ আছে *'দেবী চৌধুরাণী'*র পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।

'সকলই জানিতে হইবে'

গ্রীক-সভ্যতা আমাদের দিয়েছিল শারীরিকী-বৃত্তির উৎকৃষ্ট মানুষ। গ্রীক ভাস্কর্যে আছে সেই শারীরিক মানুষের সৌন্দর্যময় রূপ। এলিজাবেথীয় ইংরেজ-সভ্যতা আমাদের দিয়েছে কার্যকারিণী বৃত্তির শ্রেষ্ঠ মানুষ। সেক্সপীয়রের নাটকে আছে সেই সক্রিয় মানুষের সংগ্রামতীক্ষ্ণ রূপ। ইতালীয় রেনেসাঁসে ঘটেছিল জ্ঞানার্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তির মানবিক স্ফুরণ। হিউম্যানিস্টদের জ্ঞানচর্চা ও শিল্পীদের সৌন্দর্যচর্চায় ব্যক্তিপ্রতিভার অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটেছিল সে-সময়। বঙ্কিম তাঁর মানবদর্শনে সব বৃত্তিগুলিকেই মেলাতে চেয়েছেন। বোক্কাচিও ব্যাখ্যাত হিউম্যানিজমে আমরা পাই এই সত্য—'লার্নিং মেকস এ ম্যান হিউম্যান'। জ্ঞান ছাড়া একটি মানুষ সদর্থে মানুষের সংজ্ঞাভুক্ত হয় না। *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*-এ শিষ্য বলছেন—

> "জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যতপ্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে।" (পঞ্চদশ অধ্যায়, ভক্তি, ভগবদগীতা-জ্ঞান)

গুরু বলেছেন—

> "জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকলেব সম্যক স্ফূর্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না।"

পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চারও এখানে সাদর আমন্ত্রণ।

> গুরু—ভূতকে জানিবে কোন শাস্ত্রে?
>
> শিষ্য—বহির্বিজ্ঞানে।
>
> গুরু—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry–গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্ত্যদিগকে গুরু করিবে। তারপর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?
>
> শিষ্য—বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।
>
> গুরু—অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই— Biology, Sociology এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্‌ঞা করিবে।
>
> শিষ্য—তারপর ঈশ্বর জানিব কিসে?
>
> গুরু—হিন্দু শাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।"[৫৫]
>
> (পঞ্চদশ অধ্যায়, ভক্তি, ভগবদগীতা-জ্ঞান)

জ্ঞানের কোনো সীমানা-নির্ধারিত ভূগোল নেই। এরাজমুস বলেছিলেন, যেখানে উত্তম পাঠাগার আছে সেখানেই তাঁর স্বদেশ।[৫৬] জ্ঞান-চর্চার জন্য গুয়ারিনো গিয়ে ভিড়েছিলেন গ্রীক গুরুর

ডেরায়।[৫৭] পোগ্গিও প্রাচীন পুঁথির সন্ধানে সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্সের জীর্ণ পরিত্যক্ত পুঁথিশালাগুলিতে ঘুরে বেড়াতেন।[৫৮] ফিকিনো প্লেটো, পম্পোনাজ্জি এরিস্টটল, পেত্রার্কা সিসেরো এবং পিকো হিব্রু-ভাষায় রচিত কাবালা চর্চায় সময় অতিবাহিত করতেন। মূলত প্রাচ্যবাদী হলেও বঙ্কিম পাশ্চাত্য-জ্ঞানের চর্চাকে স্বাগত জানিয়েছেন হিউম্যানিস্টের উদারতায়।

'বুদ্ধি মার্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ'

কাস্তিলিওনে তাঁর বিখ্যাত *'দি কোর্টিয়ার'* গ্রন্থে পরিশীলিত 'রেনেসাঁস-জেন্টলম্যান'-এর আদর্শ ছবি এঁকেছেন।[৫৯] গ্রীক ও লাতিন চর্চায়, শারীরিক সক্ষমতায়, সঙ্গীত ও চিত্রের সমঝদারিতে, প্লেটোনিক ভালোবাসায়, সহনশীল ব্যবহারে, পরিচ্ছন্ন বাচন-শৈলীতে বিদগ্ধ ও রুচিশীল যে মানুষের সন্ধান আমরা সেখানে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তার খোঁজ আছে—

অমরনাথের 'বুদ্ধি মার্জ্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী'। 'দেখিতে সুপুরুষ', 'বেশ-ভূষায় পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর ; কণ্ঠ অতি সুমধুর'। তাঁর কথায় কথায়—

> "সেক্সপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা অসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত—লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্তের ত্রৈকালিক উন্নতি-সম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হক্সলীর কথা আসিল। হক্সলী হইতে ওয়েন ও ডারুইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল।......অমরনাথ অপূর্ব পাণ্ডিত্যস্রোতঃ আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।"[৬০]

এই অধ্যয়ন-খচিত পরিশীলিত মানুষটি যে রেনেসাঁসেরই মানুষ তাতে সন্দেহ নেই।

'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন করিবে'

শুধু জ্ঞানার্জনী-বৃত্তি মানুষকে এই পরিশীলিত চারুত্ব দান করতে পারে না। ইতালীয় রেনেসাঁসে চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তির অভূতপূর্ব স্ফুরণ হয়েছিল। বঙ্কিমের *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*-এ ব্যক্ত হয়েছে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির প্রয়োজনীয়তার কথা।

> "গুরু—জগতের সকল ধর্ম্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তির অনুশীলন বিশেষভাবে উপদিষ্ট হয় নাই।
>
> শিষ্য—অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন বিহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জন করিবে, সেইরূপ আপনার ব্যাখ্যা অনুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং

কাব্যের অনুশীলন করিবে?

গুরু—হ্যাঁ। নহিলে মনুষ্যের ধর্ম্মহানি হইবে।"[৬১]

'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' নামক প্রবন্ধে তিনি সৌন্দর্যতৃষ্ণার যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তা রেনেসাঁস-সুলভ।

> "সৌন্দর্যতৃষ্ণা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয় এবং পরিপোষনীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কেননা, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্মল, পাপসংস্পর্শশূন্য ; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ......সৌন্দর্য্যজনিত সুখ চিরনূতন এবং চিরপ্রীতিকর।......কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা।......সৌন্দর্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে।"[৬২]

'আস্ত মানুষ পাইব কোথা'

মধ্যযুগে চার্চ শিল্প-সাহিত্যকে প্রত্যাখান করতে চেযেছিল। সাহিত্যকে দেখা হত সৌন্দর্যের মোড়কে পাপের পরিবেশন হিসাবে। টের্টুলিয়ান বলেছিলেন, 'কবিতা ও সঙ্গীতের মাধুর্য শয়তানের টোপ।'[৬৩] জীবন সম্পর্কে চার্চ-শাসিত মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই রকম—

> "Beauty is a snare, pleasure a sin, world a feeling show, men are fallen."[৬৪]

এই কূপমণ্ডুক নেতিবাদ থেকে রেনেসাঁস মানুষকে উদ্ধার করেছিল। সাইমন্ডসের ভাষায়, রেনেসাঁস মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছিল, ইতিবাচক জীবনবাদের বাসন্তিক জোয়ার। চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্যের অভূতপূর্ব পৃষ্ঠপোষকতা করে রেনেসাঁস মানুষ ও জীবনের সংজ্ঞা বদলে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের *'ধর্ম্মতত্ত্ব'* আধ্যাত্মিক মানব-দর্শনের জনয়িতা মাত্র নয়। তাঁর কাম্য আস্ত মানুষ। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর বৈগুণ্যে—

> "সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদগ্ধপ্রাণ, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ। সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন।"[৬৫]
>
> (নবম অধ্যায়, জ্ঞানার্জনীবৃত্তি)

রেনেসাঁসের মানুষরা ছিলেন বিদ্যার নানা শাখায় পারদর্শী, বহুমুখী মানুষ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি একাধারে শিল্পী, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী ছিলেন।[৬৬] এঙ্গেলস রেনেসাঁস-যুগের নায়কদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

> "তখনকার দিনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে এমন লোক কমই ছিলেন......যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করেননি।......তদানীন্তন নায়করা তখনও শ্রমবিভাগের আয়ত্তাধীন হননি, যার সীমাবদ্ধকারী ফলাফল তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।"[৬৭]

বঙ্কিম যে পুরো বা আস্ত মানুষের স্বপ্ন দেখেছেন সে মানুষের দেখা মেলে রেনেসাঁসেই।

'ইতিহাস সত্যের আলোক শিখা'

সিসেরো বলেছিলেন, 'ইতিহাস হচ্ছে সময়ের সাক্ষী, সত্যের আলোক শিখা'। এই সত্যকে শিরোধার্য করে ইতালির হিউম্যানিস্টরা নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস-চর্চা করে গেছেন। সালুতাতি ইতিহাস-চর্চার উপকারিতা সম্পর্কে লেখেন, 'ইতিহাস শাসককে সতর্ক করে, জনগণকে শিক্ষা দেয় ও ব্যক্তিকে চালনা করে।'[৬৮] সালুতাতি থেকে মেকিয়াভেলি, ব্রুনি থেকে গুইচারদিনি অনেকেই ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। জি. ভিল্লানি তাঁর *'দ্য গ্রেটনেস অব ফ্লোরেন্স'* নামক রচনায় ফ্লোরেন্সের খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরেন। পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফ্লেভিও বিয়ন্ডো *'ইটালি ইলাসট্রেটেড'* গ্রন্থে প্রাচীন ও সমকালীন ইতালির পুরাকীর্তির বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তুলে ধরেন। *'হিস্ট্রি অব ফ্লোরেন্স'*-রচয়িতা চ্যান্সেলার ও হিউম্যানিস্ট লিওনার্দো ব্রুনি যখন মারা যান, তখন তাকে সমাধিস্থ করার সময় তার মাথায় দেওয়া হয় লরেল পাতার মুকুট আর তার বুকের উপর সাজিয়ে দেওয়া হয় তাঁর রচিত ইতিহাসগ্রন্থ। তিনি সমকালকে অন্ধকারময় রূপে দেখিয়ে তার থেকে বের হয়ে আসার পথ খুঁজতে চেয়েছেন। রেনেসাঁসের ইতিহাসকাররা স্বদেশ সম্পর্কে অপরিসীম হতাশা ও সমুচ্চ গৌরববোধ দু'য়েরই স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের ইতিহাসগ্রন্থে। 'মডার্ন হিস্ট্রিওগ্রাফির' জনক হিসাবে খ্যাত গুইচারদিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, মৃত্যুর আগে তিনি ফ্লোরেন্সে তিনটি জিনিস দেখে যেতে চান—

> "সেখানে সুশৃঙ্খল রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অত্যাচারী সকল বহিরাক্রমণকারীদের হাত থেকে শহর মুক্ত হয়েছে, এবং পাষণ্ড যাজকদের নিপীড়ন থেকে সেখানকার মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।"[৬৯]

মেকিয়াভেলির *'হিস্ট্রি অব ফ্লোরেন্সে'* আছে রাষ্ট্রনীতিবেত্তা ও জাতি-সংগঠকের অভিপ্রায়। ইতালিকে তিনি গৌরবময় ও শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই'

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা বা ইতিহাস-চর্চা সবিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। *"বঙ্গ দর্শন"*-এর প্রথম সংখ্যাতেই তিনি লেখেন 'ভারতকলঙ্ক' নামক একটি প্রবন্ধ (বৈশাখ ১২৯৭)। বঙ্কিমের লেখা ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী দুটি মানস প্রতিক্রিয়ার ফসল—কলঙ্ক-চেতনা ও গৌরব-চেতনা।[৭০] হিন্দু জাতির বিশেষভাবে বাঙালী হিন্দুর কলঙ্ক নির্ধারণ ও ক্ষালন করে তার গৌরবময় কীর্তির ইতিবৃত্ত তিনি পারতপক্ষে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। বলতে গেলে বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনা কিছুটা গুইচারদিনি-পোষিত হতাশা ও কলঙ্ক চেতনার দ্বারা ব্যথিত ও মেকিয়াভেলি পোষিত সাংগঠনিক অভিপ্রায়ের দ্বারা উজ্জীবিত।

রেনেসাঁসের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি সামগ্রিকভাবে ইতালির তুলনায় নিজস্ব জন্মস্থানের (মুখ্যত ফ্লোরেন্স) দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিষয়ের দিক থেকে বঙ্কিমের রচনারও দু'টি ভাগ, ভারতপ্রীতিমূলক ও বঙ্গপ্রীতিমূলক।

ভারতপ্রীতিমূলক

'ভারত-কলঙ্ক' (*"বঙ্গদর্শন"*, বৈশাখ ১২৯৭)
'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা'
'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি'
'আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প'

বঙ্গপ্রীতিমূলক

'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ১ম' (*"বঙ্গদর্শন"*, ১২৮০)
'বাঙ্গালার ইতিহাস ২য়' (*ঐ*, ১২৮২)
'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে 'কয়েকটি কথা' (*ঐ*, অগ্রহায়ণ ১২৮৭)
'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' ১ম প্রস্তাব থেকে ৭ম প্রস্তাব (*"বঙ্গদর্শন"*, পৌষ ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮)
'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' (*"বঙ্গদর্শন"*, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯)
'বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রচার' (শ্রাবণ ১২৯১)
'জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত'

বঙ্কিম আক্ষেপ করেছেন—

"সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান তাহারও ইতিহাস লিখিত হয় কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।" ('বাঙ্গালার ইতিহাস')

"ইতিহাস বিহীন জাতির দুঃখ অপরিসীম।......সেই হতভাগ্য জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।" ('বাঙ্গালার ইতিহাস')

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।"

বিদেশী ও বিজাতীয় ঐতিহাসিকরা হিন্দুদের সম্পর্কে অসত্য ইতিহাস লিখে গেছে। 'Effiminate Hindoos' এই কলঙ্ক অপসারিত করে তিনি লিখেছেন—

"ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্বের যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান হইতেছে—ততই দেখা যাইতেছে যে সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতশাস্ত্রে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ব্যবস্থাশাস্ত্রে, ঐশ্বর্যে, বাহুবলে—একদিন ভারতভূমি, ভূমণ্ডলে রাজ্ঞীস্বরূপা ছিলেন।" ('জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত')

রেনেসাঁস যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থপতি ১৪০৩ সালে গিয়েছিলেন রোম দেখতে। তিনি রোমের মন্দির, স্নানাগার, স্মারক-স্তম্ভ, নাট্যশালার ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত হলেন। স্থাপত্যকর্মে সেই প্রাচীন রোমান স্থাপত্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা থেকেই স্থাপত্যশিল্পে রেনেসাঁসের শুরু। সিসেরো পাঠ করে পেত্রার্কা এতদূর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, তিনি হতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ের সিসেরো। জে. পি. মোহাফ্ফ তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'রেনেসাঁসের সাহিত্য 'four fifths of it Latinistic'।[৭১] প্রাচীন রোমসভ্যতা ও লাতিন সাহিত্য সম্পর্কে বিস্ময়জনক শ্রদ্ধাবোধ রেনেসাঁসে দৃষ্ট হয়। বঙ্কিমেও তা বিদ্যমান ছিল।

'তখন হিন্দুকে মনে পড়িল'

'সীতারাম' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুরাগ, বিস্ময় ও শ্রদ্ধাবোধ। ললিতগিরির শিখরদেশে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি বলেছেন—

> "এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশে অট্টালিকা স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহবিশিষ্ট প্রস্তর, ইস্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। ......চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তিসকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেম গর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—
>
> তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিতহরণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
>
> এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"[৭২]

ইতিহাস অনুসন্ধান ও ইতিহাস বিনির্মাণ

'সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল'—এই অলঙ্কঞ্জিত কলঙ্ক এবং পালরাজাদের আমলে বাঙালীর কীর্তি 'আসিয়াখণ্ডে এথিনীয় তুল্য'—এই গৌরবভাষণ তাঁর ইতিহাস চর্চার দুটি মূল বিন্দুকে স্পর্শ করে আছে। বলা হয়, গ্রীসে যেমন এথেন্স, ইতালীয় রেনেসাঁসে তেমনি ফ্লোরেন্স। বঙ্কিম বাঙালীর কীর্ত্তিকে গ্রীসের এথেন্সবাসীর কীর্তির সঙ্গে উপমিত করেছেন। তিনি মনে করেন গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর শোভিত বাংলা, নৈষধচরিত-গীতগোবিন্দ সৃষ্টির মানসভূমি, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের মনীষা-সমৃদ্ধ গৌরবময় বঙ্গভূমির ঐতিহ্য উদঘাটন প্রয়োজন। 'আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে?'

'বাঙালীর উৎপত্তি' বঙ্কিমের একটি অসাধারণ নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বমূলক রচনা। রচনাটির মধ্যে যে অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণী শক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা বিয়ন্ডো ও গুইচার্য়দিনির ইতিহাসচর্চার স্মারক। ফ্লোরেন্সের কৃতী চ্যান্সেলার হিসাবে সালুতাতি, অন্য একজন চ্যান্সেলার লিওনার্দো ব্রুনি, পোপের সেক্রেটারি পোগ্গিও এবং মেকিয়াভেলি তাঁদের ফ্লোরেন্সের ইতিহাস রচনায় যে জাতি-সংগঠনের আশা ও প্রকল্প রচনা করে গেছেন, বঙ্কিমে তা আরো সুতীব্রভাবে

বিদ্যমান ছিল। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' ২য় প্রস্তাবে তিনি বলছেন,

> "এখন সে-সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে পৃথিবী মধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।"

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ('একটি গীত', 'আমার দুর্গোৎসব') তিনি বেদনাবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে দেখেছেন ইতিহাসের ধ্যানসঞ্জাত মূর্তি, দেশমাতৃকার গৌরবময় রূপ। ইতিহাস অনুসন্ধান ও ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ (reconstruct) করার আগ্রহ থেকে বঙ্কিম শুধু প্রবন্ধাদিই লিখেছেন তা নয়, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের মধ্যেও এই আগ্রহ ও চেতনা মূলসূত্র হিসাবে কাজ করে গেছে।

রসিক মানুষ

জীবনবিমুখ মধ্যযুগে রচিত গ্রন্থগুলি শুষ্ক পাণ্ডিত্যে ভরা। জীবনদায়ী রেনেসাঁসে দেখা দেয় মজাদার মানুষ।[৭৩] চার্চের অতন্দ্র প্রহরা ও পতনের অনুশোচনা থেকে মুক্ত হয় তার মনন। তার চোখ তীক্ষ্ণ ও জিহ্বা প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গ ও শালীনতাপূর্ণ নির্মল রসিকতা দুয়েরই বেশ বাড়বাড়ন্ত দেখা যায় এসময়। 'Sharp eyes and bad tongues'[৭৪]-এর চর্চায় আরেতিনোর কোন জুড়ি ছিল না। বলা হয়, সেল্লিনি ছুরি দিয়ে যা করতেন, আরেতিনো কলম দিয়েই তা করতে পারতেন। আরেক ধরনের রসিকতার চর্চাও রেনেসাঁসে দেখা যায়। ভিনসেন্ট ক্রোনিন সেই নির্মল রসিকতার চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, 'Jest must bite like a sheep but not like a dog.'[৭৫] কাস্তিলিওনে তাঁর *'কোর্টিয়ার'* গ্রন্থে রসবোধসম্পন্ন কিন্তু রুচিবান মানুষের কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু পণ্ডিত ও শিল্পী নন, হাস্যরস সৃষ্টিতেও তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কাস্তিলিওনে যে রুচিবান মানুষের কথা বলেছেন, বঙ্কিমে ছিল সেই রুচিবোধ। রবীন্দ্রনাথ *'জীবনস্মৃতি'* গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ-দৃশ্যের একটি অনবদ্য চিত্র উপহার দিয়েছেন,

> "একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতা একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।"[৭৬]

এমন রুচিবোধসম্পন্ন মানুষের হাস্যরস যে কবিওয়ালা ও খেউড়-তর্জাকারীদের ভাঁড়ামি-পূর্ণ স্থূল হাস্যরস থেকে আলাদা হবে তা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিম তাঁর ঘটনা-কণ্টকিত গুরুগম্ভীর, ঐতিহাসিক, রোমান্সধর্মী ও সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে মধ্যে অবকাশমত মজাদার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, যাতে পাঠক একটু দম ফেলবার সময় পায়। সুভদ্রার সারথ্য চিত্র দেখে সূর্যমুখীর গাড়ি হাঁকাবার সখ হয়েছিল। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র নির্জন উদ্যান মধ্যে তার ব্যবস্থা করে দিলেন—

> "সূর্য্যমুখী বল্‌গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত

নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া টিপিটিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একেবারে গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন।"[৭৭]

*'মৃণালিনী'*র পরিশিষ্ট দৃশ্যে গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়ের সুখী দাম্পত্য-জীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন,

> "কথিত আছে যে বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যেদিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই দুঃখিত ছিলেন, এমন নহে। বরং একদিন দৈবকারণবশত গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে ভুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ণবদনে গিরিজায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "গিরি আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ নাকি?"[৭৮]

বাংলা সাহিত্যের দোলসিবেনে

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টিব পরাকাষ্ঠা *'কমলাকান্তের দপ্তর'*। এমন উৎকৃষ্ট হিউমারধর্মী হাস্যরস পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের পক্ষে শ্লাঘনীয় হতে পারে। রেনেসাঁস-ইতালিতে দোলসিবেনে নামে একজন মানুষ 'রসিকরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। কমলাকান্ত শর্মা বাংলা সাহিত্যের দোলসিবেনে। একই সঙ্গে এমন বুদ্ধিতীক্ষ্ণ বাচনিক উইটধর্মী হাস্যরস এবং অনুভূতি ও দার্শনিকতাসমৃদ্ধ হিউমার দোলসিবেনের আয়ত্তে ছিল কিনা সন্দেহ। বিশ্বসংসার তার চোখে একটি বৃহৎ বাজার। তার ভাষায়—'সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।' তিনি লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যের বাজারে গিয়ে,

> "বিক্রয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী......বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাই সকল ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে।"

কমলাকান্তের চোখে, 'মনুষ্যসকল ফল বিশেষ,'[৭৯] তাঁর বিচারে বড় মানুষেরা 'মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁঠাল।' 'কতকগুলি খাসা খাজা কাঁঠাল, কতকগুলির বড় আঠা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়ি সার, গোরুর খাদ্য।' সিবিল সার্বিসের সাহেবরা 'আম্রফল', স্ত্রীলোক 'কদলী বা সংসারের নারিকেল।' সম্প্রতি দেশহিতৈষী নামে এক জাতের লোক দেখা দিয়েছেন এঁরা 'শিমূল ফুল', দেখতে শুনতে বড় শোভা। কিন্তু অন্তর্লঘু ফল। আমাদের দেশের লেখকরা তেঁতুল। 'নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন।' আর 'দেশী হাকিমরা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান।'[৮০] বিচারশালার সত্যনির্ণয়ের পুরো পদ্ধতিটিকেই কমলাকান্ত হাস্যকর করে দেয়। বিরক্ত হাকিম তাঁকে জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কয়েদ দিলে কমলাকান্ত বলে 'দুই মাস হয় না?' কারণ—'সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়।—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।'[৮১] ঔপনিবেশিক কাঠামোর সংরক্ষিত সমস্ত বিচার-ব্যবস্থাটাই যেন কমলাকান্তের বক্তব্যের ছুরিতে হাস্যকরভাবে 'কালাফালা' হয়ে যায়।

সংশ্লেষণ

গোটা ইতালীয় রেনেসাঁস জুড়ে চলেছিল সিন্থিসিস রচনার কাজ। শুষ্ক খ্রীষ্টীয় নীতিতত্ত্বের চাপে জীবন যখন মরুময়, তখন প্যাগান জীবনদর্শনের রক্তস্ফীত অভিঘাতকে রেনেসাঁসের ইতালি আমন্ত্রণ জানায়। প্রিন্স, পোপ, ধনিক-বণিকদের জীবনচর্যায় ; হিউম্যানিস্টদের রচিত বিভিন্ন প্রস্তাবে-পরিকল্পনায় ; স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়—প্যাগান জীবনদর্শনের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় পবিত্রতাবাদের এক নিগূঢ় মৈত্রীসংগ্রাম ও সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়া চলেছিল। রেনেসাঁসের শিল্পীরা খ্রীষ্টীয় অলৌকিকতার ছবি যেমন এঁকেছেন, তেমনি এঁকেছেন প্যাগান জীবনবাদের ছবিও। *'ঘোষণা', 'জন্ম', 'স্তব', 'দর্শন', 'উপহার', 'রূপান্তর', 'শেষ-ভোজ', 'ক্রুশারোহণ', 'সমাধিকরণ', 'পুনরুত্থান'* প্রভৃতি ছবির পাশাপাশি *'দানে', 'লেডা ও রাজহাঁস', 'ব্যাকাস ও আরিয়াডেন', 'গ্যালেতা', 'হারকিউলিস', 'ইওরোপা'*-র ছবিও আঁকা হতে থাকে। ক্রমশ ভার্জিনের ছবিতে আফ্রোদিতি, সেবাস্তিয়ানের ছবিতে অ্যাপোলো ছায়া ফেলতে থাকে।[৮২] ভার্জিন ও ভেনাস রেনেসাঁসের ইজেলে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। ভিনসেন্ট ক্রোনিন তাঁর *'ফ্লাওয়ারিং অব দ্য রেনেসাঁস'* গ্রন্থে অবশ্য বলেছেন, প্যাগান লায়ন ও ক্রিশ্চিয়ান মেষ একত্রে মিলতে পারে কি না?[৮৩] পেত্রার্কা রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন ক্লাসিক্যাল-বিদ্যার চর্চা দিয়ে, টমাস মোরে ও এরাজমুসে এসে দেখা যায় হিউম্যানিজমের আন্দোলন খ্রীষ্টীয় তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত। জে. এ. সাইমন্ডস বলেছেন, ইতালীয় জীবন ও শিল্প-সাধনায় এই সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি যখন পরিণতি পেল তখনই তার বিকাশের ইতিহাসে এল পূর্ণচ্ছেদের পালা। ইতালীয় রেনেসাঁসে, জ্ঞান ও সৌন্দর্যচর্চা অতঃপর পৌনঃপুনিকতায় পর্যবসিত হয়।[৮৪]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের দ্বন্দ্ব বা মৈত্রী-সংগ্রাম প্রাচ্যবাদ বনাম প্রতীচ্যবাদ। সুশোভন সরকার *'অন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস'* গ্রন্থে বলেছেন, সংঘাত আছে, কিন্তু কোন সিন্থিসিস বা সংশ্লেষণ আমরা পাই না।[৮৫] একদল ঝুঁকে আছেন প্রতীচ্যবাদের দিকে, অন্যদল প্রাচ্যবাদীদের দলে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, বঙ্কিম অবশ্যই প্রাচ্যবাদীদের দলে। যেভাবে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় অস্তিত্ব মানেন এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান, তা তাঁর প্রাচ্যবাদীতারই স্মারক। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী পাশ্চাত্যকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বললে ভুল হবে। কেননা বিজ্ঞান-রহস্যমূলক রচনাগুলির মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে মর্যাদাদায়ী আগ্রহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।[৮৬] পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেছেন। *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*-এ তিনি লিখেছেন,

> "যেদিন ইওরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে।"[৮৭]

প্যাগান জীবনবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের যে সামঞ্জস্য রচনার প্রয়াস ইতালীয় রেনেসাঁসে চলেছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচ্য-ধর্মতত্ত্বের বঙ্কিম-কথিত সমন্বয়ের স্বপ্নে রয়েছে সেই একই সংশ্লেষণী আকাঙ্ক্ষা। বঙ্কিমে শেষপর্যন্ত ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব পোষিত জীবনদর্শনের মহত্ত্বই অতিকথিত হয়েছে। কিন্তু ভাস্না, টমাস মোরে ও এরাজমুসের প্রস্তাব ও প্রকল্পনাগুলিতেও কি খ্রীষ্টীয় নীতিবাদের বিশ্লেষণ-শোধিত জয় ঘোষিত হয়নি?

রিফরমেশনের আলোকে বঙ্কিম

ইওরোপে রেনেসাঁসের পর এসেছিল রিফরমেশন। জে. এ. সাইমন্ডস তাঁর *'রেনেসাঁস ইন ইতালি'* গ্রন্থে লিখেছেন—মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক রেনেসাঁস, দ্বিতীয় অঙ্ক রিফরমেশন, এবং তৃতীয় অঙ্ক বিপ্লব।[৮৮] বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয়লগ্নে রেনেসাঁস এনেছিল সামন্ততান্ত্রিক জীবনশৃঙ্খল থেকে মুক্তির ছাড়পত্র। প্রাচুর্যময় জীবনসম্ভোগের সেই নান্দনিক মহোৎসবে উচ্চচূড় সভ্যতা যখন টলে পড়ার মুখে, তখন রিফরমেশন তাকে সংহত, সংযত ও শৃঙ্খলা-চালিত করার নীতিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ন্যাসপত্র রচনা করে। রেনেসাঁস যে বিচারতীক্ষ্ণ মুক্ত-মানবদর্শন রচনা করেছিল, বুর্জোয়াতন্ত্রের বিকাশশীলতার গ্রন্থিমোচন করেছিল, রিফরমেশন তাকে বাতিল করেনি। কিন্তু এক অর্থে উভয় আন্দোলনই ছিল মৌলবাদী। রেনেসাঁস যেখানে জীবনকে দিতে চেয়েছিল ক্লাসিক্যাল জীবনবাদের সৌন্দর্য ও সম্ভোগময় ভিত্তি, রিফরমেশন সেখানে ফিরিয়ে আনে খ্রীষ্টীয় নীতিতত্ত্বের মৌল সরলতা। রেনেসাঁস চলেছিল জ্ঞান ও সৌন্দর্যের পথে, রিফরমেশন জোর দেয় নীতি, সংযম ও পবিত্রতার উপর। রেনেসাঁস নিয়ে এসেছিল জ্ঞানপীড়িত অস্থিরতা ও নীতিবোধহীন নিষ্ক্রিয় উপভোগবাদ। ডগলাস বুশ চমৎকার বলেছেন,

> "A Renaissance humanist would say that we had got out of the frying pan into the fire."[৮৯]

উইল ডুরান্ট 'রেনেসাঁস-ম্যান'-এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন,

> "The combination of intellectual enfranchisement and moral release produced the 'Man of Renaissance.'"[৯০]

আরেতিনো তখন তাঁর কলমকে ব্যবহার করেছেন ধারালো ছুরির মত ; শিল্পী সেল্লিনি প্রয়োজন মত হাতে তুলে নিচ্ছেন কখনো তুলি, কখনো ছুরি ; ফাইলেলফো অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও যাপন করছেন নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন; লরেঞ্জো তাঁর করেরিজ্জো ভিলাতে বসে ভুলে যাচ্ছেন গোটা ইওরোপ জুড়ে ছড়ানো তাদের পারিবারিক ব্যাঙ্কিং-ব্যবসার সংকটের কথা ; লোডোভিকোর সভাকক্ষে তখন নৃত্য ও গীতের উৎসব, "as if poverty were not stalking the city walls, as if France not planning to invade Italy, as if Naples were not plotting the ruin of Milan."[৯১] চিরকুমার রাফায়েল পোপের জ্ঞাতসারেই রোমের সুন্দরীদের একের পর এক গ্রহণ করেছেন তার ম্যাডোনার মডেল ও সাময়িক-সঙ্গিনী হিসাবে।[৯২] রোডরিগো নামক ব্যক্তিটি (আলেকজান্ডার-ষষ্ঠ) দুই-তৃতীয়াংশ কার্ডিনালের ভোট উৎকোচের সাহায্য নিজের স্বপক্ষে এনে বসে যাচ্ছেন পোপের চেয়ারে। আত্মহননরত নগ্ন লুক্রেশিয়ার ছবি দেখে পোপ লিও-১০ম হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছেন— এই অবস্থায় লুথারকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় খাস পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে। প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করে তিনি অন্যরকম ন্যাসপত্র রচনা করেন।

ডাবল্যু. জে. বৌসমা তাঁর একটি নিবন্ধে বলেছেন, 'Reformation was the theological fulfilment of the Renaissance.'[৯৩] এ হল একরকম বক্তব্য। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে রেনেসাঁস তার নান্দনিক মহোৎসবে প্রত্যাখ্যাত সাধারণ মানুষকে 'বিউটিফুল ইলিউশন্‌স' দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল, রিফরমেশন সেখানে বিশ্বাসের

কলমা পরিয়ে তাদের বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ থেকে সরিয়ে আনার নিগূঢ় প্রস্তাব রচনা করে। রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের নৈকট্য ও পারম্পর্য তাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সঙ্গত কারণেই বহু তাত্ত্বিক রেনেসাঁসের সম্প্রসারিত প্রকল্পে রিফরমেশনকে একটি পরিপূরক-পর্ব হিসাবে দেখতে চেয়েছেন।

রেনেসাঁস হিউম্যানিজম ও রিফরমেশন

রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের আন্দোলনও ভিতরে ভিতরে রিফরমেশনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। পেত্রার্কা ক্লাসিক্যাল বিদ্যার চর্চা দিয়ে রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের ফিতে কাটলেও, 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিস' নামে খ্যাত এরাজমুস খ্রীষ্টীয় চেতনার উজ্জীবনে অতিনিবদ্ধ করেন তাঁর জ্ঞানচর্চা। সালুতাতি, লরেঞ্জো ভাল্লা, পোল্লিও, পিকো দেল্লা মিরানদোল্লো—এঁরা গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। পোপের বিরুদ্ধে ভাল্লার অ্যাকাডেমিক লড়াইতে লুথারেরই আগাম পদধ্বনি শোনা যায়। এরাজমুসের অনুসন্ধান, টীকা-ভাষ্যসহ সম্পাদনা ও প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই ধর্মগ্রন্থকেন্দ্রিক। বলা হয়েছে, 'Erasmus closes to luther, he was so Christian.'[১৪] রিফরমেশন প্রবক্তা মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট এরাজমুস সম্পর্কে এক চিঠিতে বলেন—

"Our delight and our hope! Who has not learned from him?"[১৫]

প্রকৃতপক্ষে এরাজমুস এসে দাঁড়িয়েছিলেন রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের মধ্য-ভূমিতে।

অন্যদিকে লুথার সম্পর্কিত একটি মনোজ্ঞ আলোচনায়[১৬] স্পিৎজ দেখিয়েছেন, হিউম্যানিজমের তূণ কাঁধে ফেলেই তিনি এগিয়ে যান রিফরমেশনের পথে। তাঁর মধ্যে হিউম্যানিজমের বৈশিষ্ট্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সপ্তমস্তক-বিশিষ্ট লুথারের যে বিখ্যাত রূপকধর্মী ছবিটি দেখা যায় তার মধ্যে একটি মস্তিষ্ক হিউম্যানিজমের।

১. প্রাচীন ক্লাসিক্যাল বিদ্যায় তাঁর দখল ও প্রয়োজনে সেই বিদ্যার অনায়াস ও অনর্গল ব্যবহার ;
২. হিউম্যানিস্ট-সুলভ বিচার ও বিশ্লেষণের মেথড অবলম্বন ;
৩. হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতা।

—এই তিনদিক থেকে দেখলে লুথারকে রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের সন্নিকট মানুষ হিসাবে চেনা যায়। *'হেড ওয়াটার্স অব দ্য রিফরমেশন'* নামক একটি বিশ্লেষণাত্মক লেখায় স্পিৎজ দেখিয়েছেন, লুথার *'ট্রাইশ্রেনডেন'* নামক একটি লেখায় সিসেরো থেকে ৫৯ বার ; ভার্জিল থেকে ৫০ বার, এরিস্টটল থেকে ৬১ বার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হোমার, ওভিদ, প্লিনি, লিভি, প্লেটো, হোরেস, প্লুতার্ক, কুইন্টিলিয়ন প্রভৃতি থেকে অজস্র ক্লাসিক্যাল উল্লেখে ছাওয়া আছে তাঁর রচনাগুলি। লুথার যুবকদের শুধু ধার্মিক ও শুদ্ধচেতা করতে চেয়েছিলেন তা নয়, তিনি বলেছিলেন, তাঁরা শিল্প ও জ্ঞানের চর্চা করবে ; লাতিন গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁদের দখল থাকা দরকার। এরাজমুসের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী ও সংগ্রামের ইতিহাসও বেশ কৌতূহলপ্রদ। বৌসমা বলেছেন—"Luther recongnised that the full realization of human freedom depended paradoxocally on complete acceptance of sovereignity of god."[১৭] উত্তরকালের সাহিত্যে এই দুই আন্দোলনের সমান্তরাল

অস্তিত্ব দুর্লক্ষ্য নয়। বিশেষ করে মিল্টনের কাব্যে রেনেসাঁস ও রিফরমেশন যেন হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিম প্রতিভার প্রকৃতি নির্ণয়ে এই দুই আন্দোলনের পরস্পরসাপেক্ষ পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখা দরকার।

'ধর্মের উন্নতিতে মন দাও'

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি বিচারশুদ্ধ-অনুরাগ, গৌরব-চেতনাদীপ্ত ইতিহাসচর্চা, রাজসিক আভিজাত্য ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা, পরিশীলিত ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিকল্পনা ও দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংশ্লেষণ রচনাঃ এ সবই রেনেসাঁস-সুলভ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বঙ্কিম বহুক্ষেত্রে অতিক্রম করে গেছেন রেনেসাঁস-হিউম্যানিস্ট ও রেনেসাঁস-শিল্পীর সাংস্কৃতিক সীমান্তরেখা। রিফরমিস্টের শাস্ত্রানুগত্য, ঈশ্বরানুরক্তি, শুদ্ধতাবাদ, নীতিচেতনা, জাতি-গৌরব, পরধর্ম-বিদ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণগুলি তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন বিদ্যার প্রতি আগ্রহ হিউম্যানিস্ট-সুলভ হলেও অনুধাবন করলে দেখা যাবে, বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বঙ্কিম ধর্মানুরক্তির পরিচয় দিয়েছেন বেশি। প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর তফাৎ আছে। *'কৃষ্ণচরিত্র', 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা', 'ধর্মতত্ত্ব'* প্রভৃতি অধ্যাত্মধর্মী বিষয়ের দিকে তাঁর আগ্রহ সমধিক। এখানে তাঁকে রিফরমিস্ট বলে চেনা যায়। তিনি বারংবার বলেছেন,

"হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জম্মিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।"

(সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়, *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*)[৯৮]

"ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার করা আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্যকার্য্য।"

(ষড়বিংশতিতম অধ্যায়, *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*)[৯৯]

দ্বিতীয়ত, হিউম্যানিস্টের মতো তিনি মানুষকে কেন্দ্রীয়-চরিত্রের মর্যাদা দিলেও তাঁর মনুষ্যত্বের আদর্শ রিফরমেশনের মানবাদর্শের সঙ্গে মানানসই। শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী, এই 'সকল বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তিই মনুষ্যত্ব'—এই পর্যন্ত বলে তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*-এ বলেছেন,

> "যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি ......ঈশ্বরের ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব।"

'পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি' কিভাবে আমাদের চরিত্রে পড়বে, তার বিধান তিনি নির্দেশ করেছেন *'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা'*য়। গীতায় যে 'সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করা'র কথা আছে, বঙ্কিমের মতে 'ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ।'[১০০] তিনি বলেছেন,

"মনুষ্যের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। একজন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সৎশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে।" (একাদশ অধ্যায়, ঈশ্বরে ভক্তি, *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*)[১০১]

'কৃষ্ণচরিত্র'-এ সমাজ-সংস্করণের প্রসঙ্গ ওঠে। বঙ্কিম বলেন আদর্শ-মনুষ্য কৃষ্ণ সমাজ সংস্থাপক বা 'Social Reformer' হবার প্রয়াস পাননি।

"দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন (moral and political regeneration), ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে

সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোনমতেই ঘটিবে না।......ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্ম্মের উন্নতিতে মন দাও।"
(*'কৃষ্ণচরিত্র',* চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ—খাণ্ডব দাহ)[১০২]

এ হচ্ছে রেনেসাঁসোত্তর জার্মান রিফরমিস্টের কণ্ঠস্বর। রিফরমেশন নীতিশুদ্ধ সংযমের দ্বারা ঈশ্বরানুগত আধ্যাত্মিক চরিত্রগঠনের উপর জোর দিয়েছিল। চিত্তশুদ্ধির সংকল্প রেনেসাঁসের নয়, রিফরমেশনের। রিফরমেশনের এই শুদ্ধিবাদ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর বহু উপন্যাসে। ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও পরিশীলিত সৌন্দর্য-বিলাসের রেনেসাঁসোচিত খাস-কামরা থেকে দেবী চৌধুরানী অনুশীলনধর্মের গার্হস্থ্য-প্রচারকর্মী হয়ে হরবল্লভের পুকুরঘাটে বাসন মাজতে চলে যায়। বঙ্কিম একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে শেষ করেন উপন্যাস।

"এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র ; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"[১০৩]

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চতুর্থ খণ্ডে বঙ্কিম পাপীয়সী শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের যে বিধি ও ব্যবস্থা-নির্ধারণ করে দেন তা দান্তের ইনফার্নোর মতই পীড়ন-তাড়নময়। শৈবলিনী মহাকায় পুরুষকে বললেন, "আমার কি হবে। আমার উদ্ধারের উপায় নাই?"......গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।" তিনি বলেন, এক বস্ত্রে শ্বশুরালয়ে গিয়ে গ্রামের বাইরে পর্ণ কুটিরে থাকতে হবে। "ভূতলে শয়ন করিবে।" "ফলমূল পত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না।" "জটাধারণ করিবে।" "একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।"[১০৪]

'ঈশ্বর কৃপায় না হইতে পারে এমন কি আছে'

রেনেসাঁসের আমলে বহু অ্যান্টি-রেনেসাঁস ব্যাপার ছিল। রিফরমেশনের আমলে যা নতুন করে তাত্ত্বিক বা নৈতিক সমর্থন পায়। বঙ্কিমেও এ জিনিস দেখা যায়। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রিত হয় জ্যোতিষবচন, দৈববাণী, অলৌকিক আকস্মিকতা, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী বা সর্বজ্ঞ গুরুদেবের অঙ্গুলি-হেলনে। শত চিকিৎসাতেও যার কিছু হয়নি সেই অন্ধ রজনী এক সন্ন্যাসীর দৈব চিকিৎসায় ফিরে পায় তার চোখ। ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করতে থাকে। শচীন্দ্র বলেন,

'আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে?'

মাধবাচার্য্যের সাজানো ছকে এগিয়ে যায় মৃণালিনীর ইতিহাসাশ্রয়ী কল্প-কাহিনী (*'মৃণালিনী'*) সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর আকস্মিক আবির্ভাব পাল্টে দেয় পতনশীল সীতারামের ঘটনামুখ (*'সীতারাম'*) । লৌকিক কাহিনীর গ্রন্থনকেন্দ্রে দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে বিরাজ করে অতিলৌকিক একটি নিয়ন্ত্রণ বিন্দু বা বিশ্বস্ত 'রিলিজিয়াস জাসটিস্'। তাই সতী-সাধ্বী

ভ্রমরের মৃত্যুর পূর্বে পায়ের ধুলো দিতে রোহিণীকে স্বহস্তে হত্যা করে গোবিন্দলালকে তার কাছে ফিরে আসতেই হয় (*'কৃষ্ণকান্তের উইল'*)। কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না (*'বিষবৃক্ষ'*)। বিশ্বাস ও দৈবনিষ্ঠ রিফরমেশনের অন্তর্লীন শক্তি বঙ্কিমের উপন্যাস মধ্যে কাজ করে গেছে।

রিফরমেশন ও সংকীর্ণ জাতিবাদ

এরাজমুস রিফরমেশনের দিকে যতই এগিয়ে আসুন, শেষ পর্যন্ত তিনি হিউম্যানিস্টই ছিলেন। রেনেসাঁসের সংস্কৃতি 'কসমোপলিটান', সংকীর্ণ জাতিবাদের দ্বারা তা আক্রান্ত নয়। যথার্থ অর্থেই এরাজমুস ছিলেন 'বৈশ্বিক মানুষ।'[১০৫] অন্যদিকে লুথার ছিলেন 'জার্মান হারকিউলিস।' তিনি প্রথমাবধি রোমের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। বলেছিলেন, জার্মানিকে ইতালি শোষণ করছে। জার্মানিকে রোম মনে করে তার 'প্রাইভেট কাউ'। সেন্ট পিটার গীর্জা নির্মাণের ব্যয়বহুল পরিকল্পনায় জার্মানির মানুষদের কোন স্বার্থ নেই। সুতরাং এক কপর্দক তারা দেবে না তাতে। *'অ্যাড্রেস টু দ্য জার্মান নোবলিটি'* (১৫১৭) নামক একটি প্রস্তাবে তিনি জার্মান জাতীয়তাবাদের স্বর উচ্চগ্রাম করে দেন। হুটেন, সিকিঞ্জেন প্রভৃতি উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদীরা লুথারকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের নির্দেশে শতাধিক নাইট রোম-বিদ্বেষী লুথারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। জার্মান জাতীয়তাবাদী হুটেন রচিত প্রস্তাব *'দ্য রোমান ট্রিনিটি'* পড়লে টের পাওয়া যায়, কী তীব্র ছিল তাদের রোম বিদ্বেষ।

> "Three ills I pray for Rome : Pestilence, Femine and War. This be my Trinity."[১০৬]

কাজেই লুথারের রিফরমেশনকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় দর্শন মনে করলে ভুল করা হবে। ভিতরে ভিতরে জার্মান জাতিত্ববাদ রচনা করেছিল তার ভিত। তাঁর *'আড্রেস টু দ্য জার্মান নোবলিটি'* পড়লে দেখা যায় ধর্ম ও দেশ-প্রীতিকে তিনি একাকার করেছেন।

বঙ্কিমেও একই জিনিস দেখা যায়। তাঁর মধ্যে জাতিত্ববোধ প্রবল। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার গৌরব তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন হিন্দু-জাতীয়তাবাদ। *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*-এ ব্যক্ত করেছেন তাঁর ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান।

> "অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম।"(পঞ্চম অধ্যায়,অনুশীলন)[১০৭]
> "গীতা থাকিতে লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরানে ধর্ম্ম খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য বোধ হয়।" (ষোড়শ অধ্যায়, ভক্তি)[১০৮]

আবার তিনি মনে করেন 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশ প্রীতি।'[১০৯] 'স্বদেশ রক্ষা ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম।'[১১০] স্বধর্ম ও স্বদেশকে তিনি একাকার করে ফেলেন। তাঁর স্বদেশ হয়ে ওঠে হিন্দুর স্বদেশ। জাতিত্ববাদ উগ্র হলে অনিবার্যভাবে আসে পরজাতি বা পরধর্মবিদ্বেষ। 'ভারত কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমের হিন্দুত্ববাদ, বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুত্ববাদ প্রবল। তাঁর *'আনন্দমঠ'*-এ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার যে প্রকল্পনা আছে, তাতে ইংরাজ-বিরোধিতাকে সচেতনভাবে পাশ কাটিয়ে মুসলিম-বিদ্বেষ পোষণ করা হয়েছে। স্বদেশ প্রীতির নামে এই সংকীর্ণতা ও পরধর্ম-বিদ্বেষ 'রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমে'

ছিল না। 'প্রিন্স অব হিউম্যানিস্ট' এরাজমুস স্বপ্ন দেখতেন 'ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিজম' গোটা ইওরোপকে ঐক্যবদ্ধ করবে। সংকীর্ণ জাতিবাদ ও ভৌগোলিক স্বদেশবাদ তাঁকে জীর্ণ করেনি।

জাতিত্ববাদী সংকীর্ণতার জন্ম হয়েছিল রিফরমেশনের মধ্যে। রিফরমেশনের প্রবক্তা লুথারের জার্মানিক জাতিত্ববাদ শুধু রোমের বিরুদ্ধেই সোচ্চার ছিল তা নয়, ১৫৪৩ সালে তাঁর রচিত *'এগেইনস্ট দ্য জিউস'* পড়লে দেখা যায়, ইহুদিদের বিরুদ্ধে তিনি কম বিদ্বিষ্ট ছিলেন না। প্রস্তাবটিতে কান পাতলে হিটলারের বুটের আওয়াজ শোনা যায়। হঠাৎ একটি গুজব রটে যায়, একজন ইহুদিকে নিয়োগ করা হয়েছে লুথারকে হত্যা করার জন্য। যদিও সে গুজবের সত্যতা কখনো প্রমাণিত হয়নি। তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি রচনা করেন কুৎসিত একটি ইহুদী-বিদ্বেষী প্রস্তাব—

> "সমস্ত ইহুদিকে প্যালেস্টাইন চলে যেতে হবে। অন্যথা সুদের কারবার, বাণিজ্যাদি সহ সমস্ত ধরনের জীবিকা ছেড়ে তাদের ফিরে যেতে হবে কৃষিকার্যে। তাদের যা কিছু বই-পত্র সব পুড়িয়ে ফেলা হবে। এমনকি কেড়ে নেওয়া হবে বাইবেল।"[১১১]

বঙ্কিমের *'আনন্দমঠ'*-এ একটি চরিত্র এই ভাবে চিৎকার করে বলে, 'মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার', 'মসজিদ ভাঙ্গিয়া মন্দির গড়িব'[১১২] ইত্যাদি। মুসলমানের গ্রামে আগুন দেওয়া ও লুট করা সন্তানদলের দেশাত্মবোধক কীর্তির মধ্যেই পড়ে। (তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) অথচ ইংরাজদের সম্পর্কে *'আনন্দমঠ'*-এর মহাপুরুষ উচ্চারণ করে আপোসমূলক বক্তব্য,

> "শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই।"[১১৩]

'ইউটোপীয়া'র কল্প-সমাজ

ইংলন্ডের বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট টমাস মোরে (১৪৭৮-১৫৩৫) তাঁর বিখ্যাত রচনা *'ইউটোপীয়া'*তে একটি আদর্শ কল্প-সমাজের প্রকল্পনা রচনা করেন। তাঁর সেই কল্পরাজ্যে যাবতীয় নাগরিক প্রয়োজনীয়তা ও পরিচ্ছন্নতার আয়োজন থাকবে। সেখানে রাজত্ব করবে যুক্তি এবং সমানাধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। দারিদ্র্য ও শোষণ উভয় সমস্যার বিরুদ্ধে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা সেখানে থাকবে। ধর্মাচরণ হবে গোঁড়ামিমুক্ত। কেউ একে ব্যাখ্যা করেছেন, 'bourgeoise criticism of society' হিসাবে, কেউ বা বলেছেন, 'precious expression of socialism', কেউ বা একে ধর্মবিশ্বাসী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'idealization of the medieval values of a closed society' বলে উল্লেখ করেছেন।[১১৪] বঙ্কিম তাঁর *'সাম্য', 'বিড়াল'* প্রভৃতি রচনায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন। তিনিও বলেছেন সমানাধিকারের কথা, শাসক ও শোষকদের শোষণ ও অবিচারের কথা, ধনবৈষম্যের কথা। বলেছেন, 'সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি', কিন্তু সমস্যার মূল জায়গাগুলি সচেতন ভাবে এড়িয়ে গেছেন তিনি। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' কৃষকদের সমস্যার মূল কারণ স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি তার অপনোদন চাননি। জমিদার-নায়েব-গোমস্তা কৃষকদের উপর অত্যাচার করে

একথা তিনি বলেন, কিন্তু জানাতে ভোলেন না, 'আমরা জমিদারের দ্বেষক নহি'; উপনিবেশবাদের কথা বলেন, আবার একথাও বলেন, 'তাহাতে ইংলন্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ-সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।'[১১৫] 'বর্ণগত-বৈষম্যের সঙ্গে অধিকারগত-বৈষম্য নাই' বলে মতপ্রকাশ করেন। এবং বিখ্যাত 'সাম্য' প্রবন্ধের উপসংহারে জানান, 'আমরা সাম্য নীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে সকল মনুষ্যে সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না।'[১১৬] শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থ-ক্ষুন্নকারী কোন মৌলিক প্রস্তাব *'ইউটোপীয়া'*তে ছিল না, বঙ্কিমেও নেই। একে 'bourgeoise criticism of Society' বলাই সঙ্গত। যদিও 'socialism'-এর ছায়া এখানে একেবারে অদৃশ্য নয়। *'আনন্দমঠ'*-এ তিনি সন্ন্যাসী-শাসিত, জমিদার-পোষিত যে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রকল্পনা রচনা করেছেন তাকে 'idealization of the medieval values of a closed society' বলে অভিহিত করা যায়।

রিফরমেশন ও কৃষকহিত

'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক একটি প্রবন্ধে বঙ্কিম বঙ্গদেশীয় কৃষকদের সুখ-দুঃখ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন।

> "আজিকালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে......কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে......বল দেখি চসমা-নাকে বাবু। ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?"[১১৭]

রচনাটি লুথার রচিত প্রস্তাব *'দ্য টুয়েলভ্‌ আর্টিকলস্‌'* এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রিফরমেশন রেনেসাঁসে প্রত্যাখ্যাত কৃষকদের বিশ্বাসের কলমা পড়িয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি অনুগত রাখার চেষ্টা করে। রিফরমেশন আন্দোলন যখন চলছিল তখন কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে জার্মানি। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, ক্ষমতাভোগী শাসকশ্রেণী বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা লুথারকে মধ্যস্থ মানে। লুথার কৃষকদের বন্ধু সেজে *'দ্য টুয়েলভ্‌ আর্টিকেলস্‌'*-এ যেসব প্রস্তাব দেন, তাকে আপাতবিচারে কৃষকহিতৈষী বলে মনে হলেও, বিশ্লেষণাত্মক বিচারে তাকে সম্পূর্ণ কৃষক বিরোধী বলা হয়েছে—

> "The whole programme was conservative in line with old feudal economy. There was notably no attack on Government."[১১৮]

একই জিনিস লক্ষ করা যায় বঙ্কিমের কৃষক সম্পর্কিত রচনাটিতে। পাবনা প্রজা বিদ্রোহের সমকালে বঙ্কিম বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তখন পাবনার মত মুর্শিদাবাদ জেলাও ছিল রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত। এবং বহরমপুরেই ছিল রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের সদর দপ্তর।[১১৯] কেউ কেউ মনে করেন, 'এই কারণেই পাবনার জায়মান এক কৃষক বিদ্রোহের পূর্বগামী পদধ্বনিই যেন বঙ্কিমচন্দ্রের কানে পৌঁছেছিল এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তারই ছায়াপাত।'[১২০] এ প্রবন্ধে বঙ্কিম স্পষ্টই বলেছেন,

> "আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি।"

"আমরা সমাজ বিপ্লবের অনুমোদক নহি।"

"যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী।"

"ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় হউক। তাঁহারা নিরুপায় কৃষকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।"[১২১]

প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণের সময় তিনি একথা লেখেন,

"কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেকস্থলে দেখা যায় প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্বল।"[১২২]

বঙ্কিমের *'বঙ্গদেশের কৃষক'* ও লুথারের *'দ্য টুয়েলভ্ আর্টিকলস্'* উৎস, উদ্দেশ্য ও চরিত্রগতভাবে প্রায় এক।

জার্মানির অবস্থা ছিল অগ্নিগর্ভ। পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। লুথারের শান্তি-প্রস্তাব ব্যর্থ হয়। কৃষকরা মারমুখী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তখন লুথার রচনা করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের একটি প্রস্তাব *'এগেইনস্ট দ্য মার্ডারস্ অ্যান্ড থিবিং হোর্ডস্ অব পেজেন্টস্'* (১৫২৫)। এতে বলা হয়,

"যে যেখানে পারো বিদ্রোহী কৃষকদের প্রকাশ্যে বা গোপনে আক্রমণ বা নিধন করো, কেননা বিদ্রোহের চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না......এটা করতে হবে দেশের স্বার্থে।"[১২৩]

ধর্মনেতা লুথারের সায় পেয়ে শাসকশ্রেণী প্রায় আট হাজার কৃষকের রক্তে ভিজিয়ে দেয় জার্মানির রাজপথ।[১২৪] পাবনার প্রজাবিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে বঙ্কিম খুব 'বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত' হয়েছিলেন।[১২৫] পরিস্থিতি জার্মানির মত অতটা অগ্নিগর্ভ ছিল না। গোলমালটা দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে ছিল বলে ইংরেজ গভর্নমেন্ট উভয়দিক রক্ষা পায় এরকম একটা সমাধান করতে সমর্থ হয়। যদি পরিস্থিতি জার্মানির মত হত এবং বঙ্কিমকে সেই সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহের মুখে নীতি-নির্ণায়কের ভূমিকা নিতে হত তবে রিফরমিস্ট বঙ্কিম কি করতেন তা অনুমানের বিষয়।

মাথা রিফরমেশনে

রেনেসাঁসের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এরাজমুস-পোষিত বৈশ্বিক মানবতার আদর্শ থেকে রিফরমেশন সুলভ স্বধর্ম-গৌরবস্ফীত স্বাজাত্যবোধ ও পরধর্ম-বিদ্বেষের মধ্যে পতিত হয়েছিলেন। সমাজ-সংস্থাপন ও কৃষক-সমস্যার প্রশ্নেও তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল রিফরমেশনের প্রবক্তা লুথারের মতই। তাই আমাদের মতে, প্রতিভাগৌরবে বঙ্কিম মহৎ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর পা ছিল রেনেসাঁসে, মাথা রিফরমেশনে।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. W. Durant, *The Story of Civilization*, vol. V, The Renaissance, N. Y., 1953, p. 309

২. I. A. Richter (ed), *Selections from the Note Books of Leonardo Da Vinci,* G. B. 1953, p. 175

৩. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, *'স্মৃতিকথা', "এক্ষণ"*, ১৩৯৭ শারদীয়া, পৃ. ১৪-১৫

৪. I. A. Richter (ed), *Ibid,* pp. 226-227

৫. W. Durant, *Ibid,* p. 297

৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'চন্দ্রশেখর',* প্রথম খণ্ড-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ভীমা পুষ্করিণী, *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ,* উপন্যাস খণ্ড, সম্পাদনা গোপাল হালদার, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃ. ৩৫২

৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'দুর্গেশনন্দিনী',* দ্বিতীয় খণ্ড-প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আয়েষা, *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, তদেব,* পৃ. ৪০-৪১

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'কপালকুণ্ডলা',* প্রথম খণ্ড-পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্রতটে, *তদেব,* পৃ. ৯২

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'মৃণালিনী',* তৃতীয় খণ্ড-দশম পরিচ্ছেদ ঃ এতদিনের পর, *তদেব,* পৃ. ১৮৫

১১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'মৃণালিনী',* দ্বিতীয় খণ্ড-অষ্টম পবিচ্ছেদ ঃ মোহিনী, *তদেব,* পৃ. ১৬৫-১৬৬

১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'বিষবৃক্ষ',* পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ অনেক প্রকারের কথা, *তদেব,* পৃ. ২১৪

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'সীতারাম',* তৃতীয় খণ্ড-অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ *তদেব,* পৃ. ৮৭৯

১৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'চন্দ্রশেখর',* প্রথম খণ্ড-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ভীমাপুষ্করিণী, *তদেব,* পৃ. ৩৫৪

১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'কৃষ্ণকান্তের উইল',* প্রথম খণ্ড-সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ *তদেব,* পৃ. ৪৯৭

১৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ঐ,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ৪৯৬

১৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ঐ,* প্রথম খণ্ড-পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ৫১২

১৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'চন্দ্রশেখর',* প্রথম খণ্ড-প্রথম পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ৩৫০

১৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'রজনী',* চতুর্থ খণ্ড-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ৪৭৩

২০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'রাজসিংহ',* প্রথম খণ্ড-প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ তসবিরওয়ালী, *তদেব,* পৃ. ৫৫৫-৫৫৬

২১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'রজনী',* প্রথম খণ্ড-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ৪৪২

২২. I. A. Richter (ed), *Ibid,* p. 196

২৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'রজনী',* তৃতীয় খণ্ড-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ৪৬১

২৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'দেবীচৌধুরাণী',* দ্বিতীয় খণ্ড-তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ৭৭২

২৫. A. Ventura, 'The Triumph of the Aristocracy in Veneto', A. Malho (ed), *Social Economic Foundation of the Italian Renaissance,* U. S. A., 1969, p. 170

২৬. M. A. Von, *Sociology of the Renaissance,* (Tran), England, 1944

২৭. R. S. Lopez, 'Hard times and insvestment in Culture', A Malho (ed), *Social Economic Foundation of the Italian Renaissance, Ibid,* p. 115

২৮. W. Durant, *Ibid*

২৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'কৃষ্ণকান্তের উইল',* প্রথম খণ্ড-পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ৫১১-৫১২

৩০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'বিষবৃক্ষ',* সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ পদ্মপলাশ লোচনে! তুমি কে?, *তদেব,* পৃ. ২১৭

৩১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'বিষবৃক্ষ',* চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ, স্তিমিত প্রদীপে, *তদেব,* পৃ. ২৮০-২৮৩

৩২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *'দেবীচৌধুরাণী',* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ১১৯

৩৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'কপালকুণ্ডলা',* তৃতীয় খণ্ড-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *তদেব,* পৃ. ১১৯

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'জীবনস্মৃতি',* রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প. ব. সরকার, ১৯৮৯, পৃ. ৮৩

৩৫. J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (2nd ed), 1945, p. 258

৩৬. J. A. Symonds, *Renaissance in Italy,* vol. 2, Revival of Learing, 1967

৩৭. L. W. Spitz, *The Renaissance and Reformation Movement,* Chicago, 1971

৩৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'কৃষ্ণচরিত্র',* বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, vol. I, Part-II (প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ), সম্পাদনা গোলাপ হালদার, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮১-৫৮২

৩৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, পৃ. ৬০৭

৪০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, পৃ. ৭৪৫

৪১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, পৃ. ৪৫৭

৪২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, পৃ. ৬৩০

৪৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, পৃ. ৬৬৯

৪৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, পৃ. ৬৭৫

৪৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম', *তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, পৃ. ১১১৩

৪৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্ম্মতত্ত্ব', তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, পৃ. ৯০৭

৪৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'কমলাকান্তের দপ্তর',* বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ, নবম মুদ্রণ, ১৩৯২, পৃ. ৭৬-৭৮

৪৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "দ্রৌপদী", *'বিবিধপ্রবন্ধ', তদেব,* সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ১৯৭

৪৯. R. H. Bainton, *Here I stand–A Life of Martin Luther,* U. S. A., 1950, p. 124

৫০. R. H. Bainton, *Ibid,* p. 124

৫১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'কৃষ্ণচরিত্র', তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৬৮৭

৫২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্ম্মতত্ত্ব', তদেব,* প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৮০৫

৫৩. L. W. Spitz, *Ibid*, p. 188
৫৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'দেবীচৌধুরাণী'*, তদেব, উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৭৫৯
৫৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্ম্মতত্ত্ব', তদেব*, প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৮৫৯-৮৬০
৫৬. D. Erasmus, *Epistles*, II, pp. 163, 327
৫৭. I. Thompson, 'The Scholor as Hero in Innus Pannonius : Paneggric on Guarinus Veronesis', *"Renaissance Quarterly"*, vol. XLIV, No.2
৫৮. W. Rospigliosi, *Writers in the Italian Renaissance*, London, 1978, pp. 167-178
৫৯. B. Castiglione, *The Courtier* (Tran), C. S. Singleton, N. Y., 1959
৬০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'রজনী'*, উপন্যাস খণ্ড,-সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৪৬৩
৬১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*, প্রবন্ধ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৬৬৬-৬৬৭
৬২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প", *'বিবিধ প্রবন্ধ'*, প্রবন্ধ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ১৯২-১৯৩
৬৩. B. Willey. *Tendencies in Renaissance Literary Theory*, Norwood, 1977, p. 8
৬৪. J. A. Symonds, *Ibid*, vol. I, pp. 10-11
৬৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*, প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৮৩৩
৬৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'সত্যজিৎ রায় এবং রেনেসাঁ' (উৎপল দত্তের সঙ্গে বিতর্ক), চিঠিপত্র, *"গণশক্তি"*, ৯ জুন ১৯৯২
৬৭. F. Engels, *Dialecties of Nature*, pp. 1-3
৬৮. M. P. Gilmore, *Humanists and Jurists*, G. B. 1963, p. 19 ; Herbert Weisinger, 'Ideas of History During the Renaissance', *"Journal of the History of Ideas"*, VI (1945), pp. 415-435 ; F. Gilbert. 'The Renais-sance interest in History' *Art, Science and History*, C. S. Singleton edited, Baltimore, 1967, pp. 373-387
৬৯. Guicciardini, *Ricordi*, Series 1, No. 14; Quoted in L. W. Spitz, *Ibid*, p. 233
৭০. প্রণব বসাক, *ভারতপথ ও দুই পথিকৃৎ*, ১৯১৯, পৃ. ১০৩-১২৮
৭১. J. P. Mohaffy, 'What have the Greeks done for the modern civilization', Quoted in G. C. sellery, *The Renaissance : Its Nature and Origin*, Wisconsin, 1950, p. 128
৭২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'সীতারাম'*, উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৮৪১
৭৩. J. Burckhardt, *Ibid*, p. 101
৭৪. J. Burckhardt, *Ibid*
৭৫. V. Cronin, *The Flowering of the Renaissance*, London, p. 101
৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'জীবনস্মৃতি'*, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প. বঙ্গ. সরকার, ১৯৮৯, পৃ. ৮৩
৭৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'বিষবৃক্ষ'*, উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ২৮১-২৮২
৭৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'মৃণালিনী'*, *তদেব*, পৃ. ২০৬

৭৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বড়বাজার', *'কমলাকান্তের দপ্তর',* প্রবন্ধ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৭৫-৭৯
৮০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মনুষ্যফল', *'কমলাকান্তের দপ্তর',* প্রবন্ধ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৫১-৫৪
৮১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী', *'কমলাকান্তের দপ্তর'*, প্রবন্ধ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ১০১-১০৮
৮২. W. Durant, *Ibid,* vol. V, p. 86
৮৩. "The Christian faith still came first with these early humanities and in the most famous library of the day, the Bible was bound in gold brocade, classical writers in silver"—V. Cronin, *Ibid*
৮৪. J. A. Symonds, *Ibid,* vol. 3
৮৫. S. Sarkar, *On the Bengal Renaissance,* 1978, p. 74
৮৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ', বঙ্কিম রচনাবলী, প্রবন্ধ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পূর্ববৎ, পৃ. ১২৯-১৫৮
৮৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্মতত্ত্ব',* বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পূর্ববৎ, পৃ. ৮৬৩
৮৮. J. A. Symonds, *Ibid,* vol. I, p. 7
৮৯. D. Bush, *Renaisssance and English Humanism,* Canada, 1939, p. 94
৯০. W. Durant, *Ibid,* vol. 1, p. 580
৯১. W. Durant, *Ibid,* p. 187
৯২. W. Durant, *Ibid,* p. 578
৯৩. H. A. Oberman (ed), *Luther and the Dawn of the Modern Era,* Netherland, 1947, p. 131
৯৪. R. H. Bainton, *Ibid,* p. 125
৯৫. R. H. Bainton, *Ibid*
৯৬. L. W. Spitz, 'Headwaters of the Reformation', H. A. Oberman edited, *Luther and the Dawn of the Modern Era, Ibid,* pp. 89-116
৯৭. W. J. Bouwsma, 'Renaissance and Reformation—An Essay in their Affinities and Connection', Oberman (ed), *Ibid,* p. 131
৯৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্মতত্ত্ব',* বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৯১১
৯৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৯০৭
১০০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা', তদেব,* পৃ. ১০১৫
১০১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্মতত্ত্ব', তদেব,* পৃ. ৮৪৮-৮৪৯
১০২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'কৃষ্ণচরিত্র',* বঙ্কিমরচনাবলী, প্রবন্ধ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পূর্ববৎ, পৃ. ৫০৬
১০৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'দেবী চৌধুরাণী',* বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পূর্ববৎ, পৃ. ৮২০

১০৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'চন্দ্রশেখর', তদেব,* পৃ. ৩৯০-৩৯৮
১০৫. L. W. Spitz, *Ibid,* p. 294
১০৬. R. H. Bainton, *Ibid,* p. 101 onward
১০৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'ধর্মতত্ত্ব',* বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পূর্ববৎ, পৃ. ৮১৩
১০৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৮৬৩
১০৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৯১৪
১১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৯০০
১১১. R. H. Bainton, *Ibid,* p. 379
১১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'আনন্দমঠ',* বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পূর্ববৎ, পৃ. ৭৩২
১১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৭৩৬
১১৪. L. W. Spitz, *Ibid,* pp. 292-294
J. H. Hexter, *More's Utopia : The Biography of an Idea,* Princeton, 1952
Karl Kautsky, *Thomas More and his Utopia,* New York, 1927
১১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্য', বঙ্কিম রচনাবলী, প্রবন্ধ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পূর্ববৎ, পৃ. ৩৯৫
১১৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব,* পৃ. ৪০৬
১১৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদেশের কৃষক', *বিবিধ প্রবন্ধ, তদেব,* পৃ. ২৮৭
১১৮. R. H. Bainton, *Ibid,* p. 273
১১৯. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম-জীবনী,* (অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃ. ৭৫
১২০. সৌমেন্দ্রকুমার গুপ্ত, "বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' : উৎসের সন্ধানে", "*অনীক*", ফেব্রুয়ারি, মার্চ, ১৯৯০ (বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা)
১২১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদেশের কৃষক', *তদেব,* পৃ. ২৮৭
১২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*
১২৩. R. H. Bainton, *Ibid,* p. 280
১২৪. Michel Eisenhart, a citizen of Rothenburg-an-der-Tauber (Germany) witnessed the peasant revolt of 1525. He wrote in his diary day to day incidents from march 21 to May, 1525. He wrote, eight thousand peasants were slaughtered at Luther's call.—L. L. Snyder, ***The Making of Modern Man,*** U. S. A. , 1967, p. 117
১২৫. "*বঙ্গদর্শন*"-এ মীর মশারফ হোসেনের *জমিদার দর্পণ* গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন : "প্রজার হিতকামনা আমরা কখন ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।" এবং এই জন্যই গ্রন্থকারকে তিনি এ গ্রন্থ বিতরণ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। — রণজিৎকুমার সমাদ্দার, *বাংলা গণসংগ্রামের পটভূমিকা,* এপ্রিল ১৯৯১, পৃ. ১৯৯

অষ্টম অধ্যায়

মুসলমান সমাজ : "একই বৃন্তে দুইটি কুসুম"

আলোকিত অভ্যুদয়ের তত্ত্ব দাঁড় করানোর জন্য আনতে হয় অন্ধকারের তত্ত্ব। রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পেত্রার্কা যখন আলোকিত জাগরণের কথা বলেছিলেন, তখন তিনিও মধ্যযুগীয় অন্ধকারের কথা বলেছিলেন। উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, আমাদের ভাষ্যকাররা কেউ-কেউ ভুলভাবে একটি অন্ধকারের তত্ত্ব এনেছেন। যদুনাথ সরকার পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয় ও ইংরেজদের বিজয়ের ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে ১৭৫৭ সালকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাবিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাতে ইংরাজ শাসনকে আলোক-যুগ ও মুসলমান শাসনকে অন্ধকার-যুগ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে।[১] রমেশচন্দ্র মজুমদার আরও একধাপ এগিয়ে তাঁর '*গ্লিমসেস অব বেঙ্গল ইন দ্য নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী*'-গ্রন্থে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন, দীর্ঘস্থায়ী মুসলমান শাসনের (রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় 'বিদেশী শাসন') কারণে হিন্দুসমাজে দীর্ঘক্রিয় অবক্ষয় বা অধঃপতন দেখা দিয়েছিল ; ব্রিটিশ শাসনের আমলে তার থেকে মুক্তি ঘটে।[২] ব্রিটিশ আমলে হিন্দুসমাজের জাগরণের তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মুসলমান শাসনকালকে অন্ধকার-যুগ হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে আর যাই হোক, কোনও সমাজবিজ্ঞান নেই। সমাজের ভিত্তিগত স্তরে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ব্যাপারটিকে সেদিক থেকে না দেখে, প্রাক-আধুনিক যুগে শাসকের জাতিগত পরিচয়টিকে অন্ধকারত্বের কারণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে একরকম বিভ্রান্তির অবকাশ তৈরী করেছেন তাঁরা।

স্বধর্ম-গৌরবস্ফীত জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা বাংলার রেনেসাঁস ও মুসলমান-সমাজ প্রসঙ্গে যে বিভ্রান্তির সূচনা করেছিলেন, সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর কিছু ভাষ্যকার সেই বিভ্রান্তিকেই অন্যভাবে পুষ্ট করেছেন। ইতিবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জয়গান করতে গিয়ে মুসলমান-শাসন ও মুসলমান-সমাজকে বিড়ম্বনা জ্ঞান করেছেন, অপরপক্ষে নেতিবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা রেনেসাঁসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন এই যুক্তিতে যে, মুসলমান-সমাজকে এড়িয়ে এই রেনেসাঁস ঘটেছিল, বাংলার রেনেসাঁস ছিল হিন্দু-জাগরণ মাত্র।[৩]

বলা বাহুল্য, আমরা এই ধরনের সরল সমীকরণের পক্ষপাতী নই। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখাব, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান-সমাজ যে রেনেসাঁসের বৃত্তে প্রবেশ করতে পারেনি, তার কারণ নিহিত ছিল সেই সমাজেরই নিজস্ব গতিপ্রকৃতির মধ্যে। প্রথমার্ধের রেনেসাঁস-পুরুষরা কোনও প্রত্যাখ্যানধর্মী সংকীর্ণ হিন্দু-মানসিকতার দ্বারা চালিত ছিলেন না। অন্তত তাঁদের হিন্দুত্ববাদী মনোভাব মুসলমান-সমাজের জাগরণের পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল এমত প্রমাণ মেলে না।[৪] দ্বিতীয়ত, মুসলমান-সমাজ জাগরণের বলয়ে কখনোই প্রবেশ করেনি একথা ঠিক নয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে

অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলমান-সমাজে ধীরে ধীরে জাগরণ আসে। এবং নানা বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে সূচিত ও প্রবাহিত সেই জাগরণ তাদের একটি ঠিকানাতেও পৌঁছে দেয়।[৫]

মুসলমান-সমাজের জাগরণ বিষয়ে আমাদের মূল বক্তব্যগুলি সূত্রাকারে এইরকম—

১. উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান-সমাজ রেনেসাঁস-বৃত্তের বাইরে ছিল ;
২. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান-সমাজে ধীরে ধীরে জাগরণ আসে ;
৩. হিন্দুদের তুলনায় নবজীবনের দৌড়-পাল্লায় অন্যূন পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে মুসলমান-সমাজ দৌড় শুরু করে। আধুনিকতার দিকে মুসলমান-সমাজের এই অনুযাত্রার সূচনা ১৮৬৩ বা ১৮৭০-এর কাছাকাছি সময় ;
৪. প্রথমাবধি এই জাগরণ ছিল দ্বিমুখী—ইসলামিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন (revivalism) ও আধুনিকতা (modernism)-কে বরণ ;
৫. বিলম্বিত এই জাগরণ নানা বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের পড়তে হয়েছিল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের চ্যালেঞ্জের মুখে। এছাড়া উর্দু-বাংলা বিতর্কে ঘনীভূত একটি সাংস্কৃতিক সংকটকেও তাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল ;
৬. সূচনাবিন্দু, প্রকৃতি ও ঠিকানার দিক থেকে এই জাগরণের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। একে বলা যেতে পারে বাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয় রেনেসাঁস ;
৭. সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখলে, এই রেনেসাঁসের ক্লাইমেক্স বা চরমোৎকর্ষ ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬-এ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর আত্মপ্রকাশ ও আন্দোলনে প্রদীপ্ত হয়েছে। দু'টি রেনেসাঁস এইপর্বে এসে মিলেছে এক বিন্দুতে ;
৮. মুসলমান-সমাজে জাগরণের সূচনা থেকেই রিভাইভালিজমের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তা তাদের নিয়ে যায় দেশভাগের পথে, তাদের পৌঁছে দেয় পূর্ব পাকিস্তানে (১৯৪৭) ;
৯. বাঙালী মুসলমান সমাজে রেনেসাঁসের সদর্থক সত্য জয়যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিতে (১৯৭১)।

এখন সূত্রগুলি একে একে বিশদ করা যাক—

প্রথমার্ধে রেনেসাঁস-বৃত্তের বাইরে

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান-সমাজ যে রেনেসাঁস-বৃত্তের বাইরে ছিল এ বিষয়ে প্রশ্ন বা সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এখানে দু'টি প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত জরুরি। এক, প্রথমার্ধের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের রূপকারদের প্রত্যাখ্যানধর্মী সংকীর্ণ মানসিকতা এর জন্য কতটা দায়ী? দুই, মুসলমান-সমাজের নিজস্ব গতিপ্রকৃতির মধ্যে এই অ-প্রবেশের কারণ কতটা নিহিত ছিল?

দায়ী নন বঙ্গীয় জাগরণের রূপকাররা

ডিরোজিওকে বাদ দিলে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রথমার্ধের রূপকাররা সকলেই ছিলেন হিন্দু ; সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণে খতিয়ে না দেখেই একে অ্যান্টি-মুসলিম বা সম্প্রদায়-চিহ্নিত-

রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু রামমোহন থেকে দীনবন্ধু মিত্র এঁদের সকলের কর্মধারা ও রচনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রাথমিক পর্বে এঁরা সকলেই ছিলেন রেনেসাঁসোচিত সেকুলার মানব-সংস্কৃতির প্রবক্তা। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ রামমোহন তাঁর নবপ্রবর্তিত ধর্মমতের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন ইসলাম ধর্মের ভিত্তিভূমি থেকে। তাঁর 'তুহ্‌ফাৎ উল্‌ মুওয়াহিদ্দিন্‌' নামক প্রস্তাব, যাকে আমরা মধ্যযুগীয় জড়তার বিরুদ্ধে উত্থিত প্রথম শাণিত ছুরি হিসাবে উল্লেখ করেছি, তা লেখা হয়েছিল ফারসিতে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের পূর্বেই তাঁর চরিত্র, চিন্তা-চেতনা পরিণত রূপ পেয়েছিল। 'মাজমা-উল্‌-বাহরাইন্‌' বা 'দুই সমুদ্রের মহামিলন'-এর প্রবক্তা দারা শিকোহ্‌'র উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁকে ব্যাখ্যা করেছেন কেউ কেউ। মোট কথা যে কোন রকম জাতিগত বা সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের এই সেকুলার মানবতাবাদের ঐতিহ্য অম্লান ছিল দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও ছিলেন সেকুলার হিউম্যানিজমের পরাকাষ্ঠা। সম্প্রদায় তো দূরের কথা, ধর্ম নিয়েই তিনি মাথা ঘামাতে প্রস্তুত ছিলেন না। মানুষকে তিনি দেখতেন জাতি, অর্থ, পদ-নির্মুক্ত মানুষের পরিচয়ে। ডিরোজিও সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছিল হিন্দু-সন্তানদের তিনি নাস্তিক করে দিচ্ছেন বলে। তাঁর কাব্য ভুবন পরিক্রমা করলে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলিম এসব পরিচয়ের বাইরে তিনি নবজাগ্রত মানবতার দিক থেকে সতীদাহের মতো সমস্যাকে দেখেছেন। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মধ্যেও তিনি এই মানবতাবাদের দীক্ষা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বৈজ্ঞানিক মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা, 'বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থ'-এর একনিষ্ঠ পাঠক। প্রকৃত জ্ঞান উপার্জনের দ্বিতীয় কোন পথ আছে বলে তিনি মানতেন না। ঈশ্বর, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তাঁর মতামত ছিল সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয়-ভ্রান্তির সংকীর্ণতা বিমুক্ত। নবযুগের কবি মাইকেলের কাব্য, বিশেষ করে *'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'* নামক প্রহসনের পাঠকরা জানেন, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের এমন মুক্ত ও শুদ্ধ শিল্পী বাস্তবিক বঙ্গীয় রেনেসাঁসের গৌরব। মাইকেল ভক্তপ্রসাদের মতো বাস্তুঘুঘুদের মুখোশ খুলে দেবার জন্য বাচস্পতি ও হানিফকে যেমন এনেছেন জোটবদ্ধ ভূমিকায়, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর *'নীলদর্পণ'*-এ তেমনি নবীনমাধব ও তোরাপকে দেখিয়েছেন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠিনতর সংগ্রামী ভূমিকায়। সুতরাং যাঁরা বলেন, বঙ্গীয় রেনেসাঁস প্রথমাবধি ছিল সম্প্রদায়বুদ্ধি-চালিত ও প্রত্যাখ্যানধর্মী, তাঁরা কিছু ভিত্তিহীন কথা বলেন মাত্র।[৬]

*'হুতোম প্যাঁচার নকশা'*য় চক-বাজারের প্যালানাথবাবুর কথা এই প্রসঙ্গে একটু স্মরণ করে নিই—

> "সৌখিনের রাজা...... ইংরেজি কেতা বাবুর ভালো লাগে না, মনে করে ইংরেজি লেখাপড়া শুদ্ধ কাজ চালাবার জন্য ; মোসলমান সহকারে প্রায় দিবারাত্রি থেকে থেকে ঐ কেতাই এর বড় পছন্দ। সর্বদা নবাবী আমীরী ও নবাবী মেজাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়।"[৭]

অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে পাওয়া যায় বাংলাদেশের পাঁচটি জেলায় ফারসি জানা হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,০৯৬ জন, যখন ফারসি জানা মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৫৫৮ (Adam's Report)। দ্বারকানাথ, রামমোহন, রাজনারায়ণ দত্ত (মাইকেলের পিতা), কার্তিকেয় চন্দ্র (দেওয়ান), অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপদ চট্টোপাধ্যায় (গীতকার), রামকমল সেন এঁরা সকলেই ফারসি জানতেন। বিশপ হিবার লিখেছিলেন, 'পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে হিন্দুরা আমাদের অনুকরণ করে না।'[৮]

বিলাস-ব্যসন, আদব-কায়দা, নৃত্য-গীত, আমোদ-স্ফূর্তি বহু ব্যাপারেই কলকাতার অভিজাত হিন্দুমহল ছিল মুসলমানী সংস্কৃতির অনুগামী। 'বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র' হিসাবে আখ্যাত ঠাকুরবাড়ির বাহির-অন্দর দুই মহলেই ইসলামী সংস্কৃতির হাওয়া বইত। শুধু দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলাতে রাজসিক খানাপিনার আসরেই নয়, বিষয়-বিরাগী দেবেন্দ্রনাথ যখন অরণ্যে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন, তখন তিনি উচ্চৈস্বরে হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন।[৯] এসব থেকে আন্দাজ করা যায়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রথমার্ধের রূপকাররা যে মুসলমানদের সম্পর্কে কোনো রকম প্রত্যাখ্যানধর্মী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করতেন না, তার পশ্চাতে একটা সমন্বয়মূলক সামাজিক ভিত্তিও ছিল।

কারণ মুসলমান সমাজের নিজস্ব গতিপ্রকৃতির মধ্যে

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মূলকথা যদি 'medievalism' থেকে 'modernism'-এর দিকে যাত্রা হয়, তবে তার সহায়ক কারণগত উপাদান (cause element) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি। মেকলে লিখেছিলেন,

> "What the Greek and Latin were to the contemporaries of (Thomas) Moore and (Roger) Ascham, our tongue is to the people of India. The literature of England is now more valuable than that of classical antiquity."[১০]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান-সমাজ রেনেসাঁসের সেই কারণগত উপাদান থেকে দূরে ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার সঙ্গে কেন তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, তার অনেক কারণ নির্দেশ করা যায়। তার মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি এই রকম :

ক. বৃটিশরা মুসলমানদের স্খলিত করেছিল রাজার জাতির মর্যাদা থেকে। সেই কারণে তাদের প্রতি স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল।

খ. ওয়াহাবী আন্দোলনের ঘোষিত 'জিহাদ-তত্ত্ব'এ বলা হয়েছিল ভারত 'দার্-উল্-হারাব্'। বিধর্মী শাসকের দেশ, শত্রুর দেশ। প্রথমে এটি উচ্চারিত হয় শিখদের বিরুদ্ধে, তারপর প্রযুক্ত হয় বৃটিশদের বিরুদ্ধে। সুতরাং ঘোষিত-তত্ত্বের কারণে তাদের বৃটিশ বিরোধিতা ছিল।

গ. ঐতিহাসিক A. F. Pollard মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকার উপর জোর দিয়ে বলেছেন, 'Where you had no middle class, you had no Renaissance and Reformation.'[১১] বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'পোলার্ডের এই উক্তি ও যুক্তির সমর্থন

আধুনিক ইতিহাস ধারার মধ্যে পাওয়া যায়। ইংলন্ডের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসও প্রধানতঃ মধ্যবিত্তের হাতে গড়া।'[১২] নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন, মুসলমান-সমাজে আশরাফ (অভিজাত)-শ্রেণী ছিল, আতরাফ (নিম্নবিত্ত)-শ্রেণী ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না।[১৩]

ঘ. রেনেসাঁস হয়েছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে। কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থানহেতু হিন্দুপ্রধান জেলা হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর থেকে হিন্দুদের পক্ষে বিকাশমান নতুন জীবনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের দূরবর্তী জেলাগুলি থেকে মুসলমানেরা তেমনভাবে আসতে পারেনি।[১৪]

ঙ. মুসলমানদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। ভূমির স্থায়ী আর্থিক নির্ভরতা ত্যাগ করে শহরের অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়নি।

চ. আহমদ ছফা বলেছেন, সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ঘটনা-পরম্পরার চাপে বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের মত। নতুন জীবনস্রোত তাঁদের অবস্থানগত স্তরে সহজে পৌঁছুতে পারেনি।[১৫]

দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থার পরিবর্তন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান-সমাজ ধীরে ধীরে জাগরণের বৃত্তে প্রবেশ করে। জাগরণের কারণগত উপাদান থেকে প্রথম দিকে তারা যে দূরত্বে ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেই দূরত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। এই অবস্থা (situation) পরিবর্তনের বহু কারণ আছে। গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি এই রকম :

ক. ভারতে বৃটিশ-বিরোধিতার মূল তত্ত্বটি ছিল 'জিহাদ তত্ত্ব'। W. W. Hunter-এর *'The Indian Mussalmans'* গ্রন্থ যাঁদের পড়া আছে, তাঁরা জানেন, রীতিমতো সভা করে লিখিত বয়ান মারফৎ মুসলমান ধর্মনেতারা এই 'জিহাদ তত্ত্বে'র ব্যাখ্যা বদল করে দেন। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন,

"1868 the year of Wahabi trial may be regarded as a decisive year for the Mussalmans of Bengal and India in as much as it witnessed on the one hand the dying members of militant Wahabism and on the other hand the beginning of the era of Mussalmans loyality to and co-operation with the British way of governance."[১৬]

খ. এই মনোভাব পরিবর্তনের ব্যাপার শুধু মুসলমানদের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছিল তা নয়, বৃটিশদের পক্ষ থেকেও হয়েছিল। W. W. Hunter-এর *'The Indian Mussalmans'* গ্রন্থটি বৃটিশদের সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব বিষয়ক থিসিস। এই থিসিসের ভিত্তিতে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের ক্রমোত্থানের যুগে বৃটিশরা মুসলমান-সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

গ. ইতোমধ্যে মুসলমান-সমাজের নবযুগের নেতৃবৃন্দ এসে যান। ইংরাজি শিক্ষিত নবাব আবদুল লতিফ ইংরাজি শিক্ষা ও মুসলমান-সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ আহ্বান করে

পুরাতন মনোভাবের অনড় বরফটি ভাঙেন। ১৮৬৩ সালে 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি' তাঁর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ. ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাট-শিল্পের বিকাশ ঘটে; ফলে কৃষিজীবী মুসলমান-সমাজের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে।[১৭] M. N. Roy তাঁর '*India in Transition*' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কৃষিজাত পণ্য কিভাবে ধনতান্ত্রিক পণ্যব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৮] এর ফলে কৃষিজীবী মুসলমান-সমাজের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি যেমন হয়, তেমনি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সঞ্চারিত হয় নতুন জীবনধারার বীজ। বাণিজ্যিক চলাচলের পথ ধরে ভৌগোলিক দূরত্বের অচলতা স্বাভাবিক কারণেই অনেকখানি অপসারিত হয়েছিল।

এগুলি হচ্ছে বৃটিশ ও ইংরাজি শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে মুসলমান-সমাজের অবস্থান বা মনোভাব পরিবর্তনের প্রেক্ষিত। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে রাজভাষা পরিবর্তনের সরকারি নির্দেশনামার কথা। আগে আরবি ফারসি পড়ে সরকারি চাকরি পাওয়া যেত। ইংরাজি সরকারিভাবে রাজভাষার স্বীকৃতি পাওয়ায় মুসলমানদের সে-সুযোগটুকুও গেল।[১৯] ইংরাজি শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা তাদের পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব হল।

অন্যূন পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে

নবজীবনের দৌড়-পাল্লায় মুসলমান-সমাজ অন্যূন পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে দৌড় শুরু করেছিল— ওয়াকিল আহমদের এই বক্তব্য অস্বীকার করা যায় না। হিন্দু-সমাজের জাগরণের প্রাথমিক চিহ্নগুলির সূচনা-বর্ষ ও মুসলমান-সমাজের জাগরণের প্রাথমিক চিহ্নগুলির সূচনা-বর্ষ পাশাপাশি অনুধাবন করলে দেখা যাবে—

১৮১৫ রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'
১৮১৭ 'হিন্দু-কলেজ' স্থাপন
১৮১৮ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের "*বাঙ্গাল গেজেটি*" প্রকাশ
১৮৪৮ বালিকা বিদ্যালয়
১৮৫০-এর পর বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ

অপর পক্ষে

১৮৬৩ আবদুল লতিফের 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি'
১৮৭৫ 'আলিগড় মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' (উত্তর ভারত)
১৮৭৩ আবদুর রহিম কর্তৃক "*বালারঞ্জিকা*" প্রকাশ
১৮৭০ নাগাদ মোশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ
১৮৯৭ 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'

সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের দিক থেকে আনিসুজ্জামান ১৮৭০কে বাঙালী মুসলমান-সমাজে জাগরণের সূচনাবর্ষ ধরতে চেয়েছেন।[২০] 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি'র স্থাপন-কাল ১৮৬৩কে সূচনাবর্ষ ধরলেও, হিন্দু-সমাজের সঙ্গে জাগরণের সময়গত ব্যবধান কাছাকাছি পঞ্চাশ বছরই থাকে।

জাগরণের ঘটনাগত লক্ষণ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-সমাজে যখন তুমুল আলোড়ন চলছে, তখন বাংলার মুসলমান-সমাজ যে-তিমিরে সেই-তিমিরে ছিল। সেই তুলনায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটা স্পষ্ট পালাবদল চোখে পড়ে। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, বাদ-প্রতিবাদ, শিক্ষা-দীক্ষা, সৃজনশীল-মননশীল সাহিত্যসাধনা সমস্ত দিক থেকেই একটি জাতির ক্রমজাগরণ স্ফুটতর হয়ে ওঠে। ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর '*উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*' (২ খণ্ড) গ্রন্থে প্রচুর তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে মুসলমান-সমাজের জাগরণের সেই তরঙ্গভঙ্গগুলি দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। ড. আনিসুজ্জামান তাঁর '*মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মিশ্র-ভাষারীতির জগাখিচুড়ি-পর্ব পেরিয়ে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা সৃষ্টিশীল সাহিত্য-কর্মের বলয়ে কিভাবে উত্তীর্ণ হন।

সভা-সমিতির মধ্যে দিয়ে নবজাগরণ-যুগের ধর্ম, জাতি-সংগঠন, সমাজ-সংস্কার, মননশীলতার আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৮৫৫—'*আঞ্জুমন-ই-ইসলামিয়া*', ১৮৬৩—'*মহমেডান লিটারারি সোসাইটি*', ১৮৭৫—'*মাদ্রাসা লিটারারি অ্যান্ড ডিবেটিং ক্লাব*', ১৮৭৮—'*সেন্ট্রাল মহমেডান এসোসিয়েশন*', ১৮৮৩—'*ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী*', ১৮৯৩—'*কলিকাতা মহমেডান ইউনিয়ন*', ১৯০৩—'*বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি*' ইত্যাদি সভা-সমিতি মুসলমান-সমাজের ভালোমন্দ আলোচনায় যে সচেতন সক্রিয়তা দেখিয়েছিল, তা প্রথমার্ধের হিন্দুসমাজের প্রাথমিক জাগরণ-পর্বের মতোই।

পত্র-পত্রিকায় মঞ্জরিত হয় জাগরণ-পর্বের লিখিত সামাজিক ব্যাকুলতাগুলি। শেখ আবদুর রহিম অন্তত ৯টি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। "*বালারঞ্জিকা*" (১৮৭৩), "*সুধাকর*" (১৮৮৯), "*মিহির*" (১৮৯২), "*হাফেজ*" (১৮৯২), "*মিহির ও সুধাকর*" প্রভৃতি। মীর মোশাররফ হোসেন সম্পাদিত "*হিতকরী*" (১৮৯০); রওশন আলির "*কোহিনুর*" (১৮৯৮), "*এসলাম-প্রচারক*"; এমদাদ আলির "*নবনূর*" (১৯০৩), "*আল-এসলাম*" (১৯১৫) প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যক পত্র-পত্রিকা সমাজ-মানসের আলোড়নকে প্রতিবিম্বিত করেছিল। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর '*সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন সাময়িকপত্রে ব্যক্ত মুসলমান সমাজের জাগরণের ব্যাকুলতার ছবি। সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের দিক থেকে মীর মোশাররফ হোসেনই মুসলিম সমাজের প্রথম আধুনিক সাহিত্য-প্রতিভা। গদ্যকে নবজাগরণের প্রধান ভাষা-মাধ্যম বলা হয়। মোশাররফ ছিলেন গদ্যশিল্পী। তাঁর '*বিষাদ-সিন্ধু*' (১৮৮৫, ১৮৯১), '*জমিদার দর্পণ*' (১৮৭৩), '*গোজীবন*' (১৮৮৯) *উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কবি কায়কোবাদের* '*মহাশ্মশান*' (১৯০৪), মোজাম্মেল হকের '*কুসুমাঞ্জলি*' (১৮৮১), '*প্রেমের হার*' (১৮৯৮), ওসমান আলির '*দেবলা*' (১৯০১), মাইকেল অনুসারী হামিদ আলির '*কাসেমবধ*' (১৯০৪), ইসমাইল হোসেন সিরাজীর '*অনল-প্রবাহ*' '*রায়নন্দিনী*' (১৯১৫), নারীমুক্তির অগ্রদূতী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের '*সুলতানার স্বপ্ন*' (১৯০৫) প্রভৃতির পাশাপাশি, তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনারও জোয়ার আসে। শেখ আবদুর রহিমকে এজাতীয় রচনার পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর

'হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭), *'ইসলামী ইতিবৃত্ত'* (২ খণ্ড), রেয়াজ-অল দীন আহম্মদের *'অগ্নিকুক্কুট ও সমাজসংস্কারক',* (১৮৯৬), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর *'ভারতে মুসলমান সভ্যতা',* এয়াকুব আলি চৌধুরীর *'মানবমুকুট'* (১৯২২), রেয়াজুদ্দিন আহম্মদের *'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ'* (১৮৯৯-১৯০৮), মোহম্মদ নইমুদ্দিনের বঙ্গানুবাদিত *'কোরাণ শরীফ'* প্রভৃতি রচনাদিব মধ্যে নবযুগের অনুসন্ধিৎসা মূর্ত হয়েছিল। পুঁথি-বিশারদ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, সাহিত্যচর্চা প্রভৃতির মতো মুসলমান সমাজে শিক্ষাদীক্ষার ক্রমপ্রসার, সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ প্রভৃতি দিক দিয়েও দেখানো যায় মুসলমান-সমাজের অচলায়তন প্রবলভাবে নাড়া খেয়েছিল।

জাগরণের দ্বিমুখী ধারা

বাংলার প্রথম রেনেসাঁসটির মতোই এই মুসলিম রেনেসাঁসেরও একটা ডায়লেকটিক্যাল চেহারা ছিল। এবং সে টানাপোড়েন আরো তীব্র। মুসলিম রেনেসাঁসের সম্মুখে দু'টি আদর্শ স্থাপন করা হয়েছিল। একটিব নাম ইসলামিক ঐতিহ্যবাদ, অপরটির নাম আধুনিকতা। মুসলিম সমাজেব প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে হলে ইসলামিক ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ অবগাহন করতে হবে। এই মতাদর্শেব পাশাপাশি যুক্তিবাদ ও মানবিকতা-বোধের সম্যক অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে হবে যুক্তি ও উপযোগিতার কষ্টিপাথরে ঘষে। এইসব চিন্তাধারার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত মুসলমান-জাগরণের অন্তর্কক্ষে ঘটে চলেছে। তাদের সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, সাহিত্যচর্চার ইতিহাস অনুধাবন করলে এই অন্তর্নাটকটি স্পষ্ট দেখা যায। মীর মোশাররফ হোসেন *'গোজীবন'* লিখলে বা কাজী আবদুল ওদুদ 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন শুরু কবলে অন্ধকারের শক্তি বিপুলভাবে তাঁদের প্রত্যাঘাত করেছিল। প্রথম রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখের বিরুদ্ধে যে আঘাত-প্রবণ সামাজিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছিল, এঁদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার দেখা যায়। একই ব্যাপার বলা ভুল। রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাদের শক্তি এক্ষেত্রে ছিল অনেক বেশি। সেই কারণে বলা হয়েছে মুসলিম-জাগরণের ইতিহাস একদিক থেকে তাদের পুনর্জাগরণেরই ইতিহাস (revivalism)।[২১] তথাপি এই সত্যটি স্বীকার্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর মুসলমান-সমাজের কোনো শিবিরই নিষ্প্রদীপ নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল না। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সেই সমাজের বিপুল প্রাণশক্তি ও জাগরণের সত্যটিই প্রমাণিত হয়েছিল।

বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে জাগরণ

ইসলামিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন ও আধুনিকতার পথে অগ্রগমন—দুই বিপরীত মতাদর্শের টানাপোড়েন ছাড়াও মুসলিম-জাগরণকে পথ চলতে হয়েছিল নানা বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে। তার মধ্যে দু'টি সংকটশৃঙ্খল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংকট-সূত্রগুলি অনুধাবন করতে না পারলে মুসলিম-জাগরণের মৌল চরিত্রটি ভেদ করা সম্ভব নয়।

ক. হিন্দু জাগরণ ও পুনর্জাগরণের চ্যালেঞ্জ

মুসলিম-সমাজ যখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাগরণের বৃত্তে প্রবেশোন্মুখ, তখন হিন্দু-সমাজের জাগরণ হিন্দু-জাতীয়তাবাদ বা হিন্দু-পুনর্জাগরণের পথে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি উল্টো নাটক এসময় দেখা গেল। প্রথমার্ধে বৃটিশদের সঙ্গে হিন্দুদের যখন গলাগলি সম্পর্ক, মুসলিমরা তখন বিরূপ দূরত্বে। আবার দ্বিতীয়ার্ধে জাগ্রত জাতীয়তাবোধের কারণে হিন্দুরা যখন ক্রমশ বৃটিশ-বিরোধী, মুসলিমরা তখন বৃটিশদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে নিবিষ্ট। Jayanti Maitra তাঁর '*Muslim Politics in Bengal 1855-1906*' গ্রন্থে খুব সুন্দর বলেছেন,

> "As the Anglo-Muslim gulf was bridged, the Hindu-Muslim gulf widened."[২২]

হিন্দু-জাতীয়তাবাদ বা পুনর্জাগ্রত হিন্দু-সংস্কৃতির ক্রমপ্রসারমান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে মুসলিম-জাগরণ তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে মুসলিম-রিভাইভালিজমে পরিণত হয়। তার সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা এমন কি সাহিত্যচর্চার জগৎটি অনুধাবন করলে এই নির্মম সত্যটি প্রতিভাত হয় যে, তা যতখানি জাগরণের ক্রিয়াজাত, ঠিক ততখানিই হিন্দু-পুনর্জাগরণের প্রতিক্রিয়াজাত।[২৩] সাহিত্যে দেখা যায় বঙ্কিমের ওপর রাগটাই বেশি। ইসমাইল হোসেন সিরাজী শক্তিশালী লেখক। কিন্তু তাঁর অন্তত চারখানি উপন্যাস প্রতিক্রিয়াজাত। '*রায়নন্দিনী*' উপন্যাসের উপক্রমণিকায় তিনি পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন, হিন্দু লেখকদের প্রতিবাদে তাঁর লেখনী ধারণ। এই প্রতিক্রিয়া যে কোনো কোনো শক্তিশালী লেখককে বিকারের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, তার উদাহরণ সৈয়দ আবুল হোসেন। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম এই রকম— '*দুর্গেশনন্দিনী বা ত্রিজারজা*', '*কপালকুণ্ডলা বা সখের সতীন*', '*ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ*', '*আনন্দমঠ বা নন্দের বন্দী*', '*সীতারাম বা কাগজরাজ্য*'।[২৪]. মনে রাখতে হবে, প্রথমার্ধের হিন্দু-সমাজের জাগরণের সামনে এরকম কোনো বিপরীত চ্যালেঞ্জ ছিল না।

খ. মুসলমান বনাম বাঙালী মুসলমান

বাঙালী মুসলমানের আনুপূর্বিক ইতিহাস একটি পরিচয় সংকটের ইতিহাস। তার প্রকৃত পরিচয় কি? তা নিয়ে দু'টি অভিমত আছে, খোন্দকার ফজলে রাব্বি তাঁর '*The Origin of Musalmans of Bengal*' (১৮৯৫) গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন, বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই খাস আরব, পারস্য, তুরস্ক থেকে আগত। দ্বিতীয় মতটি সকলেরই জানা— বাঙালী মুসলমান আসলে এদেশেরই কৃষিভিত্তিক আদিম কৌম সমাজের মানুষ।[২৫] সেই অনার্য মানবগোষ্ঠী আর্য জাতির দ্বারা বিজিত হয়ে বর্ণাশ্রম ভিত্তিক বিন্যাসে শূদ্র পর্যায়ে স্থান পেয়েছিল। সামাজিক সুবিচারের আশায় তারা একসময় বৌদ্ধ হয়। বৌদ্ধ ধর্মকে মুছে দেওয়া হলে, তারা আসে ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে। বাঙালী মুসলমান আসলে সেই দুর্ভাগা মানবগোষ্ঠী, যে সামাজিক সুবিচারের আশায় বারবার ঠিকানা বদল করেছে কিন্তু, লাভের লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। এমনকি মুসলমান এই পরিচয়ের মলাটও তাদের উপকারে

তেমন লাগেনি। সামাজিক বা অর্থনৈতিক শোষণের ব্যাপারটা তুলে রেখে শুধু সাংস্কৃতিক সংকটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছি। নবাব আবদুল লতিফকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি? তিনি বলেছিলেন আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানের ভাষা উর্দু, আর আতরাফ শ্রেণীর মুসলমানের ভাষা বাংলা।[২৬] বিশ শতকের গোড়ায় Titus তাঁর *'Indian Islam'* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশে উর্দুভাষী মুসলমান ১৭,৮০,০০০ আর বাংলাভাষী মুসলমান ২,২২,৪৫,০০০।[২৭] উর্দুভাষীরা আশরাফ পর্যায়ের আর বাংলাভাষীরা আতরাফ পর্যায়ের। খুব ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, নিম্নবর্গের বাঙালী মুসলমানরা উচ্চবর্গের অবাঙালী বা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপনিবেশের বাসিন্দামাত্র ছিল।

> "It was a natural tendency of Muslims of the lower provinces of Bengal to look up to the Ulema of the North-West for leadership and religious guidance."[২৮]

উত্তর-পশ্চিমা উলেমা ও উর্দুভাষী আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানদের ধর্মীয় উপনিবেশের অন্ধপ্রজা হিসাবে বাংলার নিম্নবৃত্তের মুসলমান মানবগোষ্ঠী শত-শত বছর ধরে শোষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের জাগরণ বাঙালী মুসলমান সমাজকে আর কিছু না দিক, অন্তত মুসলমান-পরিচয়ের অন্তরালে তারা একটি নিগূঢ় সাংস্কৃতিক সংকটের শিকার, এই সচেতনতার দিকে তাদেব মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। জাগরণ-পর্বের একটি প্রধান সংকট ছিল উর্দু না বাংলা? তাদের জাগরণের ইতিহাস এই সংকট মুক্তিরই ইতিহাস।

বাঙালী মুসলমানের ভাষা-সঙ্কট

বাঙালী মুসলমানের ভাষা-সঙ্কটের স্বরূপটি আহমদ ছফা *'বাঙালী মুসলমানের মন'* গ্রন্থে খুব সুন্দর করে বলেছেন।[২৯] বাঙালী মুসলমানরা আরবি, ফারসি, উর্দু এই তিনটি ভাষায় তালিম গ্রহণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যখন দেখলেন, কোনোটাই তাঁদের পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব নয়, তখন ওই বর্ণমালাতে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন। যখন দেখা গেল, আরবি হরফে বাংলা লিখে চালানো যায় না, তখন বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবি ফারসি শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। বাংলার জনগণের কাছে সে ভাষা গ্রাহ্যও হয়েছিল। কিন্তু কোন জনগণ? এঁরা ছিলেন সেই জনগণ,

> "সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবি অজানা, ফার্সীর নাম শুনেছেন এবং উর্দু ভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।"

কোরআনের ভাষা আরবি, রাজভাষা ফারসি এবং স্বাতন্ত্র্যগর্বী অভিজাত মুসলমানদের ভাষা উর্দু। বাঙালী মুসলমান মনে করতো, এই তিনটি ভাষার মধ্যে মুসলমানত্বের আসল রহস্য ও আস্বাদ বিদ্যমান। কিন্তু মনে করলেই তো হবে না। সামাজিকভাবে সে-সব ভাষা রপ্ত করার কোনো সাংস্কৃতিক বা ঐতিহ্যগত ভিত্তি তাঁদের ছিল না। তাহলে উপায়? তাঁরা প্রবেশ করলেন আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দী মিশ্রিত একটি জগাখিচুড়ি ভাষাদর্শের মধ্যে।

দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। নবাবী আমলের পতন ও কোম্পানি শাসনের অভ্যুদয়ের কাল হচ্ছে এই ভাষাদর্শের বিকাশ কাল। নিজধর্মের শক্তির কাছে বহিঃশক্তির তুচ্ছতা প্রদর্শন ও কাল্পনিক গৌরববোধের আত্মকুণ্ডয়নে পতিত এই মিশ্র ভাষারীতির কাব্যাদর্শকে আনিসুজ্জামান ক্ষয়িষ্ণু-সংস্কৃতি ধারার নিদর্শন হিসাবে গণ্য করেছেন।[৩০] মফিজউদ্দীন আহাম্মদ রচিত *'কেচ্ছা আলেফ লায়লা'* থেকে দু'টি ছত্র উদ্ধার করছি—

ভেজ আয় রব মেরে দরূদ ছালাম।
আপন পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম।।[৩১]

এই ভাষাদর্শ বাঙালী মুসলমানদের নিজস্ব মুখের ভাষা থেকে দূরে সরিয়ে নেবার একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। মিশ্র ভাষারীতির এই পুঁথিসাহিত্যে আছে অলৌকিকতার প্রতি সমর্পিতচিত্ততা, নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা, আদর্শবোধের বৈকল্য, সমকালীন জীবনের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ, বিস্মৃত অতীতের কাল্পনিক পুনর্গঠন এবং পরধর্মবিদ্বেষ। এই ভাষাদর্শে রচিত সাহিত্য গরিষ্ঠসংখ্যক বাঙালী মুসলমানকে প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎপদ মানসিকতার শিকলে বেঁধে রাখার কাজটি নিপুণভাবে করেছিল। এই ক্ষয়িষ্ণুতা থেকে বাঙালী মুসলমানের জাগরণ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষার্ধে। উত্তর-পশ্চিমা উলেমা ও উর্দুভাষী আশরাফ শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যগর্বী মুসলমানরা মূলত আরবি, ফারসি ও উর্দুর দুরূহ পবিত্রতা ও রাজসিক আভিজাত্য দিয়ে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা উপর থেকে আরোপ করে রেখেছিলেন। তার সঙ্গে মিশ্র ভাষারীতির ক্ষয়িষ্ণু 'এছলামী' ভাষাদর্শ দিয়ে বাঙালী মুসলমানকে আর একরকমভাবে নিচে থেকে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। এই দ্বিবিধ আক্রমণের সাঁড়াশি চাপ ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের শেষপর্যন্ত বেছে নিতে হয়েছিল ভাষা-আন্দোলনের পথ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত রেনেসাঁসের 'রথে' ঐস্লামিক ঐতিহ্যবাদের যে ঘোড়াটি জোতা হয়েছিল, তাতে কারা মদত দিয়েছিলেন তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বড় কথা হচ্ছে, সে-ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন মিশ্র ভাষারীতির শিকলে জড়ানো বাংলার গরিষ্ঠসংখ্যক জনগণকে। বিভিন্ন সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকার মধ্যে দিয়ে লালিত রিভাইভালিজমের ধারাটি অনুকূল পরিস্থিতি পেয়ে 'মুসলিম লিগ' নামে রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে স্পষ্ট মূর্তি পায়। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম লিগ' হচ্ছে সেই স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক সংগঠন যা 'pro-British and anti-Hindu'।[৩২] ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পালাবদলের জটিল ইতিহাসকে কাজে লাগিয়ে এই পুনর্জাগরণবাদী ধারা বাংলার মুসলমান-সমাজকে পৌঁছে দেয় কৃত্রিম আরবে—পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৪৭-এ জয়ী হয় রেনেসাঁসের সমান্তরালে প্রবাহিত পুনর্জাগরণবাদী ধারা।

অন্যদিকে ঐস্লামিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি পূর্ব-উল্লেখিত দ্বিতীয় রেনেসাঁসে যে কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত প্রগতিশীলতার ধারাটি নানা ঘাতপ্রতিঘাত, সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, সংস্কার-আন্দোলন, মননশীল-সৃজনশীল সাহিত্য-সাধনার মধ্যে দিয়ে পথ চলছিল ; *'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'*-এর (১৯২৬-৩৬) 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মধ্যে যার গৌরবময় সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ লক্ষ্যগোচর হয় ; ১৯৫২-তে এসে তা কেন্দ্রীভূত হয় ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচীতে। এই

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই মুসলমান-সমাজে সূচিত রেনেসাঁসের ইতিবাচক ধারাটি একটি সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছয় ১৯৭১ সালে। জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

সুতরাং উর্দু-বাংলা লড়াই শুধু মাত্র একটি ভাষা-সংকটের প্রশ্ন নয় ; এর মধ্যে নিহিত ছিল মুসলমান বনাম বাঙালী মুসলমানের লড়াই, সমাজের পুনর্জাগরণবাদী ধারার সঙ্গে রেনেসাঁসের প্রগতিশীলতার লড়াই।

রেনেসাঁসের স্বাতন্ত্র্য

সূচনাবিন্দু, প্রকৃতি এবং ঠিকানার দিক থেকে মুসলমান-সমাজের এই রেনেসাঁসকে বাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয় এবং স্বতন্ত্র একটি রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সূচিত তথাকথিত হিন্দু-জাগরণ যে-পথ দিয়ে যে-পোশাক পরে এগিয়ে গিয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম-জাগরণ ঠিক সেই পথ দিয়ে একই রকম নাটকের অভিনয় করতে করতে একইভাবে এগিয়ে গিয়েছিল, এটা দেখানো যায়। কিন্তু তা দেখাতে গেলে মুসলিম-জাগরণটিকে হিন্দু-জাগরণের ব্যর্থ প্রতিচ্ছবি বলে মনে হবে। কিছুতেই ধরা যাবে না তার সত্যকার স্বরূপ ও দানটি কি? সূত্রাকারে এই রেনেসাঁসের স্বাতন্ত্র্য ও অবদানগুলি চিহ্নিত করা যাক—

ক. হিন্দু-জাগরণ মুখ্যত হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে। মুসলিম-জাগরণের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় পাশ্চাত্য-শিক্ষা সংস্কৃতি ছাড়াও প্রাচীন ও আধুনিক কালের মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি বেশ শক্তিশালী 'cause element' হিসাবে কাজ করেছিল। আরব্য বিদ্যা, তুরস্কের ইতিহাস, কামাল আতাতুর্কের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল।

খ. মুসলিম জাগরণের ফলে বাংলা ভাষায় মননশীল ও সৃজনশীল রচনার যে ধারা প্রবাহিত হয় তার উৎকর্ষগত দিক বাদ দিলেও আবহ ও বিষয়গত দিকটি খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, ইসলামিক ঐতিহ্যের একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক দ্বীপ জেগে উঠেছে। উৎস বা উপজীব্য যাই হোক, লিখিত বা উত্তীর্ণ সাহিত্য সততই সাধারণের সম্পদ। বাংলা সাহিত্যের এটা একটা বড় প্রাপ্তি।

গ. কলকাতার রেনেসাঁসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক দিক হচ্ছে নিম্নবৃত্তের সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে তা ছুঁতে পারেনি। তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে থেকে গিয়েছে। মুসলিম-সমাজের রেনেসাঁস যে সেদিক থেকে সর্বসাধারণের জন্য কোনো স্বর্গ রচনা করেছিল তা নয়, তবে বহুকাল ধরে চলে-আসা একটি সাংস্কৃতিক সংকট থেকে বাঙালী-মুসলমানদের তা উদ্ধার করেছিল। উর্দু-বাংলা ভাষা-বিতর্কের পথ ধরে নিম্নবৃত্তের বাঙালী মুসলমান-জনগোষ্ঠী ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত করেছে তার সাংস্কৃতিক মর্যাদা। আপন ভাগ্যকে জয় করার জন্য একসময় সত্যিকারের যুদ্ধে যেতেও তারা পিছপা হয়নি। একটি বিড়ম্বনাতাড়িত দুর্বলতর রেনেসাঁসের কাছ থেকে এসব পাওনা কম কিছু নয়। যদি কেউ মনে করেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে

সূচিত কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁসের ভিতর থেকেই এসব ঘটনার জন্ম, একটি রেনেসাঁস মানলেই বাংলার মুসলিম-সমাজের জাগরণ ও বিকাশের ব্যাপারগুলিকেও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই।

রেনেসাঁসের ক্লাইমেক্স

১৯৬৩ বা ১৯৭০ সালে যে রেনেসাঁসের সূচনা, নানা বিড়ম্বনা বা সংকট-শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে যার পথ-চলা, তার ক্লাইমেক্স বা চরমোৎকর্ষ ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬, এরকম বলা যায়। *'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'* এই দশ বছরে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনে রেনেসাঁসের যদি কোনো সর্বোচ্চ চূড়া থাকে তবে এই দশ বছরের ইতিহাস সেই চূড়াকে ছুঁয়ে আছে। খোন্দকার সিরাজুল হক তাঁর *'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম'* নামক গবেষণা-গ্রন্থে এই দশ বছরের মুসলিম চিন্তা-চেতনার বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ও কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ, আনোয়ারুল কাদির, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ মূলত *"শিখা"* পত্রিকাকে আশ্রয় করে ইয়ং বেঙ্গলের অনুরূপ 'ইয়ং মুসলিম' আন্দোলন শুরু করে। পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে এঁরা মুসলমান সমাজের অচলায়তনে যেভাবে আঘাত করেছিলেন, তার তুলনা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন। যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের কাঠগড়ায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গগুলিকে দাঁড় করানো হয়েছিল। এঁরা বলেছিলেন, বর্তমান যুগ বুদ্ধির যুগ ; বাংলাই আমাদের মাতৃভাষা ; সাহিত্য চর্চা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না ; প্যান-ইসলাম ও খেলাফত আন্দোলন অন্তঃসারশূন্য, ললিতকলার চর্চা যদি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হয় তবে শাস্ত্র মানার চেয়ে সংগীত ও চিত্রকলার চর্চা শ্রেয় ; হজরত মুহম্মদ (দঃ)-কে দেখতে হবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে; আরবি ভাষায় খোতবা পাঠ অর্থহীন, কেননা আরবি আমাদের মাতৃভাষা নয় ; 'বুদ্ধির মুক্তি' সবচাইতে বড় জিনিস ; হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা আলাদা নয়, এক ইত্যাদি ইত্যাদি ......।[৩৩] একদিক দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ, অন্যদিক দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম এই বুদ্ধির মুক্তি বা মুসলমান সমাজের সংকট মুক্তির আলোকিত বলয়ে এসে দাঁড়ালেন।[৩৪] ১৯২৭ সালে *'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'*-এর এক অনুষ্ঠানের শেষে নজরুল বলেছিলেন,

> "আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দবার্তা ঘোষণা করছি, বহুকাল পরে কাল রাতে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নতুন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াবো।"

১৯২৭ সালে *'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'*-এর বার্ষিক সভায় পঠিত প্রবন্ধের তালিকা এই রকম :

১. বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা — কাজী আবদুল ওদুদ
২. বাঙলার লোক-সঙ্গীত — আবদুল কাদির

৩. বাঙালী মুসলমানের সমস্যা — রফীকউদ্দিন আহমেদ
৪. বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ — কাজী আনোয়ারুল কাদির
৫. হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতিভা — শামসুল হুদা
৬. সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান — কাজী মোতাহার হোসেন
৭. শিক্ষা সমস্যা — মমতাজউদ্দীন আহমদ
৮. আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত — আবদুল রশীদ
৯. নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ — আবদুস সালাম খাঁ
১০. বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা — আবুল হুসেন
১১. মুসলমানের আর্থিক সমস্যা — আনোয়ার হোসেন

প্রবন্ধের এই তালিকা নিঃসন্দেহে ইয়ং বেঙ্গলদের *'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'* বা *'বীটন সোসাইটি'র* কথা মনে করিয়ে দেয়।

মুসলিম সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে যদি কাউকে আধুনিকতার প্রথম কবি হিসাবে চিহ্নিত করতে হয় তবে তিনি নজরুলই। বাঙালী মুসলমান-সমাজের সংকট-শৃঙ্খলগুলি ছিন্ন করে তিনি বীরের মত এসে দাঁড়িয়েছেন রেনেসাঁসের পৃথিবীতে। মীর মোশাররফ হোসেনকেও শেষজীবনে ধর্মীয় গোঁড়ামির পায়ে কদমবুসি করতে হয়েছিল আর নজরুল ছিলেন চির বিদ্রোহী—'বল বীর চির উন্নত মম শির।' এই *'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'*-এর উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে সাহিত্যিক সংবর্ধনা দিয়েছিল তাও মনে রাখার মতো। রক্তগোলাপ দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সেই সংবর্ধনা সভার পথ ও মঞ্চ।[৩৫] এক রেনেসাঁস যেন আরেক রেনেসাঁসের সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষকে বরণ করল আপন অঙ্গনে। শরৎচন্দ্রকেও সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, ওদুদ, আবুল ফজল এঁরা যে মানস-পরিমণ্ডলের ঐকিক বৃত্তে সে-সময় এসেছিলেন তাতে একথা অনায়াসেই বলা যায়, দুই রেনেসাঁস এই বিন্দুটিতে এক জায়গায় মিলেছিল।

পুনর্জাগরণের পথ ধরে পূর্ব-পাকিস্তানে

মুসলিম-সমাজের জাগরণের সূচনা থেকেই দু'টি উল্টো চলন দেখা গিয়েছিল। একটি ইসলামিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের দিকে। মুসলিম-জাগরণ যে একার্থে পুনর্জাগরণে পরিণত হয়েছিল এ সত্য অনস্বীকার্য। স্বাতন্ত্র্যবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী যে সামাজিক চিন্তাটি লালিত হচ্ছিল পুনর্জাগরণবাদের মধ্যে, নানা সভাসমিতি-পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যচর্চায়, তা অনুকূল পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে স্পষ্ট মূর্তি পায়। বাংলার মুসলমান-সমাজকে তার পুনর্জাগরণবাদী ধারা পৌঁছে দেয় কৃত্রিম আরবে—পূর্ব পাকিস্তানে। A. F. Salahuddin Ahmed তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ইংরাজি শিক্ষায় হিন্দুসমাজের এগিয়ে যাওয়া ও মুসলমান সমাজের পেছিয়ে পড়ার ব্যাপারটি 'profoundly affected the subsequent developments of two communities.'[৩৬] দু'টি সমাজের অসম সাংস্কৃতিক বিকাশ পূর্ণ উদ্যমে তাদের স্বতন্ত্র লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেছে। আরো স্পষ্ট কথায় বলা যায়, দেশভাগের পিছনে

যে কট্টর সম্প্রদায়বুদ্ধি বা স্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রিয়াশীল ছিল তার কারণ কেউ খুঁজেছেন রাজনীতির মধ্যে। তার সঙ্গে আমরা একটা নতুন কারণ-সূত্র যোগ করতে পারি। দু'টি সমাজের জাগরণ যদি একটি রেনেসাঁসের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসত, তাহলে পরিণতিটা এইরকম না হতে পারত। দুই রেনেসাঁস থেকে দুই বঙ্গের জন্ম।

রেনেসাঁসের জয় বাংলাদেশের মুক্তিতে

ইসলামিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি রেনেসাঁসের যে সদর্থক ধারাটি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, সংস্কার-আন্দোলন, মননশীল, সৃজনশীল সাহিত্য-সাধনার মধ্যে পথ চলছিল ; *'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'*-এর বৌদ্ধিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যার সাংস্কৃতিক ক্লাইমেক্স লক্ষ্যগোচর হয় ; উর্দু-বাংলা ভাষা-বিতর্কের মধ্যে বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক মর্যাদা যে প্রতিষ্ঠা চাইছিল, ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে তা একদিন সত্যিকারের যুদ্ধ পেরিয়ে একটি ইষ্ট রাজনৈতিক ভূমিতে পৌঁছয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় (১৯৭১) রেনেসাঁসের সেই অন্তর্লীন শক্তি ও সত্য জয়যুক্ত হয়েছে বলা যায়। বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস পরিচয়-সংকটের ইতিহাস। রেনেসাঁস তাকে আর কিছু না দিক, অন্তত একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিচয়পত্র দিয়েছে এবং বলা বাহুল্য সে-রেনেসাঁস কলকাতাকেন্দ্রিক বহু আলোচিত রেনেসাঁস নয়। বাংলার মুসলমান-সমাজের জাগরণ, সংগ্রাম ও অর্জনের প্রায় শতবর্ষব্যাপী ইতিহাস তার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। ১৮৭০ সাল যদি মুসলমান সমাজের জাগরণের সূচনাবর্ষ হয়, তবে শতবর্ষ পরে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেই জাগরণ তাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠামূলক ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে। প্রথম থেকেই এই জাগরণের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল পুনর্জাগরণবাদী ধারা ও আধুনিকতার ধারা। ১৯৪৭-এ রেনেসাঁসের পুনর্জাগরণবাদী ধারার জয় হয়েছিল, ১৯৭১-এ জয় হয় রেনেসাঁসের প্রগতিশীল ধারার।

'বাংলাদেশ মুক্তি-যুদ্ধ'-এর পর বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন—

> "প্রথম রেনেসাঁস ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁস হচ্ছে ঢাকা কেন্দ্রিক। ...... রিভাইভালের স্রোতের তোড়ে দেশ ভেঙ্গে যায়। তারপরে যখন ভাষার প্রশ্নে একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদদের রক্তে ঢাকার মাটি রঞ্জিত হয় তখন সে মাটিতে জন্ম নেয় দ্বিতীয় রেনেসাঁস। মুক্তি-যুদ্ধের শহীদদের রক্ত তাকে আরো শক্তি জোগায়। বাংলার রেনেসাঁস না বলে এর নাম রাখা যাক বাংলাদেশের রেনেসাঁস।"
>
> (*'বাংলার রেনেসাঁস'*—ভূমিকা)

স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি জাজ্বল্যমান সত্য হিসাবে প্রত্যক্ষ করে ঢাকাকেন্দ্রিক রেনেসাঁসকে একটি স্বতন্ত্র সূচনা হিসাবে দেখেছেন অন্নদাশংকর। আমরা এখানে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছি, বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক ঘটনা মাত্র নয়, ক্রমজাগ্রত বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর শতবর্ষব্যাপী সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ফসল।

বাংলার মুসলমান সমাজের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ

বাংলার মুসলমান-সমাজের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের ইতিহাস বাংলার মুসলমান-সমাজের জাগরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, বাঙালীর সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের ভাষা উর্দু না বাংলা—এই প্রশ্নের মীমাংসা তাদের জাগরণের মধ্যে দিয়ে স্থিরীকৃত হয়। রিভাইভালিজম-এর টান ছিল উর্দু ভাষার দিকে। অপরপক্ষে রিভাইভালিজম-এর লক্ষ্য ছিল বাঙালী মুসলমানকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না করে মুসলমান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রগতিশীল রেনেসাঁসের ধারা বাঙালী মুসলমানকে মুসলমানত্বের পরিচয় খুলে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিল। সাহিত্যিক দিক থেকে এই সংগ্রাম ও সাফল্যের শুভ সূচনা মীর মোশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) মধ্যে দিয়ে। একটি পত্রিকায় লেখা হয়—

> "আমাদের সাহিত্যের যুগ পরিবর্ত্তক কে এবং কোন্ মহাত্মার যত্ন-প্রচেষ্টায় আমাদের সাহিত্য পয়ার ত্রিপদীর প্রচলিত নাগপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে—এই প্রশ্নের উত্তরে মরহুম মীর মোশাররফ হোসেনের নাম স্বতঃই আমাদের মনের দ্বারে উঁকি দিয়া থাকে।...... আমরা মীর সাহেবকেই আমাদের বর্তমান সাহিত্যের প্রবর্ত্তক—বাঙ্গলার মোসলেম সাহিত্য-গুরু বলিয়া মনে করি। তিনিই যে চিরপ্রচলিত অশুদ্ধ দোভাষী গদ্যকে কোণঠাসা করিয়া সুকুমার বিশুদ্ধ গদ্য-পদ্যকে বঙ্গভারতীর কনক আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা কে যেন অলক্ষ্য হইতে আমাদের বলিয়া দেয়। বাণী-বালাখানা গঠনের সেই প্রাথমিক যুগে আমরা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার যে পরিচয় পাই, তাহাতে তাঁহাকে মোসলেম সাহিত্যের যুগ পরিবর্ত্তক মহাচার্য্য আখ্যায় বিভূষিত না করিলে তাঁহার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইবে বলিয়া মনে করি।"[৩৭]

১৮৬৯ সালে *'রত্নাবতী'* লিখে যাঁর সাহিত্যিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, তিনি *'গো-জীবন'* (১৮৮৮) বিশেষ করে *'বিষাদসিন্ধু'* (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯০) লিখে বাঙালী মুসলমানের হৃদয় জয় করে নেন। *'গো-জীবন'*-এর মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছিলেন হিন্দু এবং মুসলমানের সৌহার্দ্য রক্ষা ছাড়া বাঙালী জাতির অগ্রগতি হতে পারে না। এজন্য তাকে মুসলিম পুনর্জাগরণবাদীদের হাতে চরম নিগৃহীত হতে হয়। *'বিষাদসিন্ধু'র* বিষয়বস্তু তিনি সংগ্রহ করেছিলেন পারস্য আরব্য গ্রন্থ থেকে ; যা ছিল ধর্মীয় বিষয়, তাকেই তিনি মানবভাগ্যের আবেগময় কাহিনীতে রূপান্তরিত করলেন। শুধু গদ্যশিল্পী হিসাবে নয়, সেকুলার ও মানবতাবাদী জীবন-কাহিনীর রূপকার হিসাবেও মীর মোশাররফ হোসেন মুসলমান-সমাজের নবযুগের সাহিত্যের প্রথম রূপকার হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন।

বাঙালী মুসলমান-সমাজের জাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। মুসলিম বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাসে তিনি অগ্রদূতী। একদিকে *'মতিচুর'*, *'পদ্মরাগ'*, *'অবরোধবাসিনী'* প্রভৃতি রচনা, অন্যদিকে মুসলমান

মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য (সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস) স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার দ্বারা তিনি নারী জাগরণের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' নামক রচনায় তিনি লিখেছেন,

> "অতএব, জাগ, জাগ গো ভগিনী।" প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি ; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে, জানি ; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের "কৎল"-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন জানি। (এবং ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই জানি) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত, কোন ভালো কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে "but nevertheless it (Earth) does move"। আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে।"[৩৮]

'অবরোধবাসিনী' নামক রচনায় রোকেয়া প্রচুর উদাহরণ সহযোগে দেখিয়েছেন পাক-ভারতের অবরোধবাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস। গ্রন্থটির নিবেদন অংশে রোকেয়া লিখেছেন,

> "জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজ সেবা করিয়া কাঠ মোল্লাদের অভিসম্পাৎ কুড়াইতেছি........ আমাব ত প্রত্যেকটি লোম গুনাহ্‌গার ; সুতরাং পুস্তকের দোষ-ত্রুটির জন্য এবার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম না।"[৩৯]

রেনেসাঁস-এর প্রগতিশীল ধারার সক্রিয় কর্মী হিসাবে যাঁরাই কাজ করেছেন তাঁদেরই কাঠ মোল্লাদের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। জাগরণের পক্ষেই হোক বা মুক্তির পক্ষেই হোক, এঁদের বলা যেতে পারে মানবতাবাদেরই সৈনিক। বেগম রোকেয়া মুসলমান সমাজের অবরোধ প্রথা ও মহিলাদের সম্পর্কে অমর্যাদাকর সমস্ত রকম দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সাহিত্যিক রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে দুঃসাহসিক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদ

বাংলার মুসলমান-সমাজের জাগরণের ইতিহাসে কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী নজরুল ইসলামের নাম প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারণের যোগ্য। আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, মননশীল প্রবন্ধকার, আর নজরুল ইসলাম ছিলেন আবেগদীপ্ত কবি ও সঙ্গীতকার। ওদুদ নবজাগরণের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি'র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন মননশীল রচনার মধ্য দিয়ে তিনি আঘাত করতে চেয়েছিলেন মুসলমান-সমাজের বদ্ধমূল মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাকে। তিনি তাঁর বৌদ্ধিক সংগ্রামের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন যেমন প্রাচীন ইসলামিক ঐতিহ্য থেকে, তেমনি আধুনিক ইওরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকেও। হজরত মহম্মদের সঙ্গে তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, জার্মান সাহিত্যিক গ্যেটের সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন তিনি প্রেরণাময় ব্যক্তিত্বের মর্যাদা। তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনার মধ্যেই ছিল জাগরণের আহ্বান। সেই আহ্বান

যেমন সমালোচনায় তীক্ষ্ণ তেমনি জড়তামুক্ত চিত্তের পরিচায়ক। তাঁর বক্তব্যের কিছু নিদর্শন এখানে আনা যায়—

"আপনারা ঠিক করে বসে আছেন যে, ইসলাম (আপনাদের মতে ধর্মের চরম) কোরআন-হাদিসের দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে আছে। সেখান থেকে বচনের গোলাগুলি আহরণ করে না আনতে পারলে ধর্মযুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কারোরই নেই। কিন্তু আফসোস মুসলমান-সমাজও যে মানুষেরই সমাজ। আর সেই মানুষের সন্ধানী চিত্ত একালে শাস্ত্র বচন-রূপ গোলাগুলির range পেরিয়ে গেছে। তাই একালে ধর্মযুদ্ধে জয়ী হতে চাইলে শাস্ত্রের যা থেকে উদ্ভব সেই মানববুদ্ধি ও মানবকল্যাণের কারখানায় নতুন অস্ত্র তৈরীর চেষ্টা ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না।"[৪০]

ওদুদরা *'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে* আশ্রয় করে যে যুক্তিবাদী মানবতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার মূল কথা ছিল সমাজসংস্কার। তাঁরা বলেছিলেন—

"আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি, অন্ধ বিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, এবং বর্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা।"[৪১]

তাঁরা আরো বলেছিলেন,

"যাঁহাদের মস্তিষ্ক সজীব, তাঁহারা নিত্য-নতুন পথের আবিষ্কার করিবেন, ইহাতে যদি অতীতের বিরুদ্ধতা হয়, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অতীতের বিরুদ্ধতা মুসলমানের জন্য বড় ক্ষতির নয়। কিন্তু অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার জীবনে চলার পথে একটা ফুলস্টপ দেওয়াই তাহার পক্ষে মারাত্মক। অতীতকে অস্বীকার করিতে আমি বলি না। অতীতের দিকে ফিরিয়া যাওয়াতেই আমার আপত্তি। কিন্তু অতীতের কাছে যতখানি আলো পাওয়া যায় তাহা আমি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত । কিন্তু পুরাতনের গৌরব দিয়া তাহার অন্ধকারকে নিতে আমি রাজী নই।"[৪২]

'তরুণ-আন্দোলনের গতি' নামক একটি প্রবন্ধে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবুল ফজল একথা লিখেছিলেন। এই চেতনার পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছিলেন আবদুল ওদুদ। তিনি 'শিক্ষার সংকট' নামক একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন,

"একদিন খাওয়ায় যেমন অন্যদিনের চলতে চায় না, এক যুগের চিন্তায়ও তেমনি অন্য যুগের চলে না।"[৪৩]

স্বাভাবিক কারণেই এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল ইসলাম-বিরোধিতার। এই অভিযোগের উত্তরে 'বাদ-প্রতিবাদ' নামক একটি রচনায় ওদুদ লিখেছিলেন,

"আমাকে অমুসলমান বলেছেন। .... আমি মুসলমান কিনা একথা প্রমাণ করবার জন্য খুব ব্যস্ত আমি নই, কেননা মুসলমান হিন্দু এ সব হচ্ছে মানুষের সামাজিক বা শ্রেণীগত পরিচয়।"[৪৪]

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদকে শরিয়ত পন্থীরা যে দৃষ্টিতে দেখতেন ওদুদ তার

পরিবর্তে নিয়ে আসেন নতুন দৃষ্টি। মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ রচিত *'মোস্তাফা চরিত'* সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> "আপনাদের যুক্তিবাদ যে কত অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক তার প্রমাণ মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের বিরাটকায় *'মোস্তাফা চরিত'*। সেখানে সহি হাদিস নির্ণয়ের চেষ্টা বেশ আছে, ...কিন্তু নেই মানুষ মোহম্মদের চরিত্র ; কেমন করে তাঁর চিত্তকোরক দিনে দিনে বিকশিত হয়েছে, কেমন করে তিনি পরিজনকে ভালবেসেছেন, মানুষকে ভালবেসেছেন, জীবনকে ভালবেসেছেন, কেমন করে সময় সময় ভুলও করেছেন, কেমন করে তার আদর্শ বুকে ধরে সর্বস্ব পণে অগ্রসর হয়েছেন, অনন্ত অত্যাচার-অবিচার প্রেম ও ক্ষমার অতলে নিমজ্জিত করেছেন—অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্ব যখন জাগে তখন তা কেমন করে এমনিভাবে সমস্ত অন্যায়....অত্যাচারের শীর্ষে জীবনের অপরূপত্ব ফুটিয়ে তোলে—নেই সেই সমস্ত কথা। কেমন করেই বা থাকবে? পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে যদি আপনারা সমস্ত প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতেন তা হলে আপনাদের হাতে মহাপুরুষ মোহম্মদকে না পাওয়া গেলেও মানুষ মোহম্মদকে ও সেই ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর আববকে হয়ত অনেকখানি পাওয়া যেত।"[৪৫]

'শাশ্বত বঙ্গ', 'বাংলার জাগরণ', 'Creative Bengal' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ওদুদ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সূচিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষদের একটি ভারসাম্যযুক্ত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন রচনা করেছেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের দান-অবদান নিয়ে মুসলমান-সমাজের বিভিন্ন অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর তিনি এর মধ্যে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন, 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' নামক একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জন্য কি করেছেন?'—এই প্রশ্নের উত্তর হওয়া উচিত এই রকম— "আকাশের সূর্য মুসলমানদের জন্য বিশেষ কি করেছেন?"[৪৬]

বাংলার দ্বিতীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রতিভূ হিসাবে তিনি বাংলার প্রথম রেনেসাঁসের যে মূল্যায়ন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। তিনি বলেছিলেন,

> "বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের....... প্রায় সমস্ত ঝঙ্কার রবীন্দ্রনাথের চিত্তবীণায় অনুরণিত হয়েছে.......বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর অথবা ভারতের উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট নবজাগরণের তিনি ঘনীভূত রূপ—গ্যেটেকে যেমন বলা হয় ইয়োরোপের বিরাট রেনেসাঁসের সংহত ব্যক্তিরূপ।"[৪৭]

কাজী আবদুল ওদুদ যে শাশ্বত বঙ্গের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার জন্য তিনি আজীবন বৌদ্ধিক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। তাঁরই চিন্তা-চেতনার উত্তরসূরিরা রিভাইভালিজমের কবল থেকে বাংলাকে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলার মুসলমান-সমাজে যে জাগরণের সূচনা হয়েছিল মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে, কাব্য এবং সুর-শিল্পের ক্ষেত্রে সেই জাগরণের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিভূ হচ্ছেন **কাজী নজরুল ইসলাম** (১৮৯৯-১৯৭৬)। মননশীলতার দিক থেকে কাজী আবদুল ওদুদের যে মর্যাদা, সৃজনশীলতার দিক থেকে নজরুল ইসলামের মর্যাদা এবং অবদান ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম-জাগরণের প্রায় সমস্ত লক্ষণ কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে ঘনীভূত রূপ লাভ করেছিল। তাই তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব আমাদের সবিশেষ মনোযোগ দাবী করে। বাংলার মুসলিম-জাগরণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রগতিশীলতার দু'টি ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। কাজী নজরুল ইসলাম প্রগতিশীলতার ধারাটিকে সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা দান করেছেন। তাই তাঁর আবির্ভাবে কাঠমোল্লারা যেমন প্রমাদ গুণেছিলেন, তেমনি তরুণ বাংলার আগুয়ান মুসলমান সমাজ তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিলেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বঙ্গ-সংস্কৃতির অগ্রপথিকরা। প্রথমে আমরা কাঠমোল্লাদের বক্তব্য তুলে আনি, *"ইসলাম দর্শন"* পত্রিকা নজরুল সম্পর্কে লিখেছিল,

> "এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। হতভাগ্য যুবকটি ধর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানের সংসর্গ কখনও লাভ করে নাই. অন্ততঃ সেটুকু লাভ করিলেও পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বীয় পৈশাচিক খড়্গ উত্তোলন করিত না। থাকুক তাহার লেখার যথেষ্ট শক্তি, হউক সে বিখ্যাত কবি, তজ্জন্য মুসলমানের গৌরব করিবার কিছুই নাই। ...... নরাধম ইসলাম ধর্ম্মের মানে জানে কি? খোদাদ্রোহী নরাধম নাস্তিকদিগকেও পরাজিত করিয়াছে। ...... লোকটা শয়তানের পূর্ণাবতার। ইহার কথা আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। দুঃখের বিষয় একদল ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য মুসলমান *"ধূমকেতু"*র এই সকল শয়তানী ও পৈশাচিক উক্তি পাঠ করিয়া লেখককে "বাহবা" দিয়া তাহার মাথাটি বিষম বিগড়াইয়া দিয়াছে। তাহাতে উহার বুকের পাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কলমের মুখে যা আসিতেছে, তাই লিখিতেছে। খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়ই।"[৪৮]

নজরুলের প্রতিভাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তরুণ মুসলমান সমাজ—

> **"কবি নজরুলের পূর্ব্বে বঙ্গ-মোসলেম সমাজে কাব্য-সাহিত্যিকের অভাব অনুভব হইতেছিল ; কিন্তু আজ এ-সমাজ একজন মুসলমান কাব্য-সাহিত্যিকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি সম্পদের মহান দানে বঙ্গ-সাহিত্যের আসর গৌরবান্বিত হইয়াছে দেখিয়া বুক ভরা তৃপ্তি গৌরব অনুভব করতঃ ক্রমশঃ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে। *'বিষের বাঁশী'*র বাদক এই কবি মরণোন্মুখ মোসলেমের—শুধু মোসলেমের নয়, অমোসলেমেরও প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য, ছন্দ-নৈপুণ্য,**

শব্দচয়ন-চাতুর্য্য ও উদ্দাম-উদ্দীপনাময় বিচ্ছুরিত বহ্নিশিখা বঙ্গ-সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। আর মুসলমান আজ তাহার একজন ভাইকে বঙ্গ-সাহিত্যের সুউচ্চ আসনে সমাসীন দেখিয়া জাতীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে।"[৪৯]

নজরুলের এই আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত-প্রেরণা জুগিয়েছিলেন,

"দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন। ......
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।"[৫০]

মোহিতলাল মজুমদারের মতো বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক লিখেছিলেন,

"মুসলমান-সমাজের নবজাগরণের অনেক লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায় ...... এইবার এক নতুন রসধারা নবজীবনের আবেগ প্রবাহে, আমার এই অতি আদরের, আজন্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ অনুচিকীর্ষার ধন বঙ্গ সাহিত্যের অকাল প্রৌঢ়ত্ব মোচন করিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে যৌবন-হিল্লোল সঞ্চারিত করিবে। পারশ্যের গোলাব বাগিচার বুলবুল তাহার বৈতালিক হইবে, আরবের মরু প্রান্তরে দূর মরুদ্যানের খর্জুর কুঞ্জের আড়াল দিয়া যে বৃহৎ চন্দ্রোদয় হয়, তাহার আলোকে বঙ্গ ভারতীর জরীন শাড়ী ঝকমক করিয়া উঠিবে, ... একটা অভিনব সম্ভাবনা, অপূর্ব সম্পদ নূতন সুর সংযোজনার আশা আমাকে সত্যই চঞ্চল করিয়াছে।
মুসলমান লেখকদের সকল লেখাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্ব-শ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। ...... আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।"[৫১]

জাগরণের জয়গান

নজরুলের কাব্য-কবিতার জগৎ অনুধাবন করলে দেখা যায়, তিনি সচেতনভাবে বহু কবিতায় ও গানে জাগরণের জয়গান করেছেন।

"পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিম,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর-সকলের দিন
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ মুসলমান ....."[৫২]

তখন নজরুল এসেছিলেন জাগরণের গান গাইতে। ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর মুখপত্র দ্বিতীয় বার্ষিক *"শিখা"*য় 'নূতনের গান' নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে ছিল এই রকম উদ্দীপক সব ছত্র—

"উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।"[৫৩]

'জীবন' নামে একটি কবিতায় কবি লিখেছেন,

"মাটির নীচে পায়ের তলায় সেদিন যারা ছিল মরি,
শ্যামল তৃণাঙ্কুরে তারা উঠল বেঁচে নতুন করি
সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আসবে কখন ফাগুন হোলি
বজ্রাঘাতে ফুটল না যে, ফুটবে আনন্দে সে কলি।"[৫৪]

ঐস্লামিক সংস্কৃতির পরিগ্রহণ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সূচিত কলকাতা কেন্দ্রিক রেনেসাঁসের প্রধান উজ্জীবক উপাদান ছিল পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি। আর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান-সমাজে যে রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম উদ্দীপনী উৎস ছিল ঐস্লামিক সংস্কৃতি। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য এবং সংগীতের জগৎ পরিক্রমা করলে দেখা যাবে আরব্য এবং পারস্য ভাষার মঞ্জুষায় যে সম্পদ রক্ষিত ছিল, নজরুল তা বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যের মধ্যে এনে দিয়েছেন। তিনি অনুবাদ করেছেন হাফিজের রুবাইয়াৎ, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ এবং *'কাব্য আমপারা'* নামক একটি কাব্যে কোরানের অংশ বিশেষ। *'কাব্য আমপারা'র* ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

"ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সব কিছু—কোর-আন মজীদের মণিমঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবি ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা বাঙালী মুসলমানেরা–তা নিয়ে অন্ধ ভক্তি ভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষায় যে কোন মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি।"[৫৫]

সুতরাং বোঝাই যায় রেনেসাঁসের মূল স্পিরিটটুকু নজরুলের মধ্যে যথাযথভাবে বিদ্যমান ছিল। ইতালীয় রেনেসাঁসেও হিউম্যানিস্টরা প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান বিদ্যাকে অনুবাদের মাধ্যমে সমকালের পাঠকদের গোচরে এনে দিয়েছিলেন।[৫৬] মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য দিয়ে নজরুল পুষ্ট করতে চেয়েছিলেন বঙ্গসংস্কৃতির ভাণ্ডার। 'উমর ফারুক' নামক একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"মলয় শীতলা সুজলা এদেশে আশিষ করিও খালি—
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু'মুঠো বালি।"[৫৭]

'অঘ্রানের সওগাত', 'ঈদ মোবারক', 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়', 'নওরোজ', 'অগ্রপথিক', 'সুব্‌হ্ উম্মেদ', 'খালেদ', 'আমানুল্লাহ', 'উমর ফারুক' প্রভৃতি অজস্র কবিতায় তিনি ঐস্লামিক সংস্কৃতিকে যে ভাবে বঙ্গসংস্কৃতির প্রাঙ্গণে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য।

শব্দ, ছন্দ এবং সুর এই তিনদিকেই তিনি আরবি, ফারসির জগৎ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। তাতে ঋদ্ধ হয়েছে বাংলার সাহিত্য এবং সংস্কৃতি। *'আরবি ছন্দের কবিতা'*

(১৯২৩) নামক রচনায় তিনি আঠারো রকমের আরবি ছন্দের কবিতা রচনা করেছেন। হজয, রমল, মোতাকারেব, সরীত্র, খফীফ ইত্যাদি ছন্দ তিনি প্রথম বাংলায় নিয়ে আসেন। তাঁর 'কটির কিঙ্কিণ/চুড়ীর শিঞ্জিন' কবিতাটি আরবি হজয ছন্দে রচিত। তিনি আরবি ছন্দ সম্পর্কে লিখেছেন,

> "আরবি ছন্দ যেমন দুরূহ তেমনি তড়িৎ-চঞ্চল ; প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চমকে-ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি এক রকম শুনালেও সত্যি সত্যিই এক রকমের নয়।"[৫৮]

নজরুলের বহু গানের মধ্যে এসেছে মধ্য-প্রাচ্যের সুর। যেমন—

> "রুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম
> খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়"—

এই গানটির সুর আরবি। তেমনি—"চমকে চমকে ধীর ভীরু পায় পল্লী বালিকা বনপথে যায়।" এই গানটির সুর আরবি নৃত্যের সুর থেকে নেওয়া।

এই ভাবে দেখা যায় মধ্য প্রাচ্যের সংস্কৃতি নজরুলের কবিতায় এবং সংগীতের জগতে যেন নূতন করে প্রাণ পেয়ে উঠে এসেছে। তাই তাঁকে দেওয়া একটি সংবর্ধনাপত্রে লেখা হয়েছিল,

> "তুমি বাঙ্গলার মধুবনের শ্যাম কোয়েলার কণ্ঠে গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ; রসালের কণ্ঠে সহকার সাথে আঙুর লতিকার বাহুবন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরাণী সাকীর লাল শিরাজীর আবেশ বিহ্বলতা দান করিয়াছ।"[৫৯]

পৌরুষপূর্ণ জীবন চেতনা

নজরুলের কাব্য-কবিতায় আমরা পাই পৌরুষপূর্ণ বলিষ্ঠ জীবন চেতনার প্রকাশ। নানা বাধা-বন্ধনে শৃঙ্খলিত মুসলমান-সমাজের জাগরণের কবি হিসাবে তিনি যে বলিষ্ঠ জীবন চেতনার সুর কাব্যের কণ্ঠে দিয়েছেন তা বাংলা কবিতার রাজ্যে একটি নূতনতর সংযোজন। 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট' বা 'বল বীর বল উন্নত মম শির' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে যে তেজীয়ান সুর ফুটে উঠেছে, তা বাংলা কাব্য-কবিতায় নজরুলের বিশিষ্ট অবদান হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলমান-সমাজের জীবন চর্যায় যে প্রাণশক্তির ঐশ্বর্য ছিল তাই যেন নজরুলের কবিতায় ফুটে বেরিয়েছে। বাঙলার প্রতিবাদ ও সংগ্রামের ইতিহাসে তিতুমীর এবং দুদু মিঞার কথা স্মরণে রাখলে, মাইকেলের *'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'* প্রহসনে হানিফ চরিত্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের *'নীলদর্পণ'* নাটকে তোরাপ চরিত্রের প্রতিবাদী ভূমিকা বিস্মৃত না হলে অনায়াসে অনুধাবন করা যায় যে, কৃষি নির্ভর বাংলার মুসলমান-সমাজের দৈহিক প্রাণশক্তি অটুট ছিল। সুতরাং মুসলিম-জাগরণের কবি হিসাবে নজরুল যখন আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন মুসলমান-সমাজের সেই অটুট প্রাণশক্তিই যেন উদ্দীপিত এবং দুর্বার প্রকাশ লাভ করল।

জীবনবাদের জয়গান

ইতালিতে রেনেসাঁস ছিল মধ্যযুগীয় চার্চতন্ত্রের বিশুষ্কতা থেকে জীবনের একটি উদ্ধার-প্রকল্প। লরেঞ্জো ভাল্লার মতো ধার্মিক হিউম্যানিস্টও *'অন প্লেজার'* নামে ভোগবাদের উপর একটি তাত্ত্বিক প্রস্তাব রচনা করেছিলেন।[৬০] রেনেসাঁসের শিল্পীরা রাফায়েল থেকে টিশিয়ান, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি থেকে জর্জিনো প্রায় সকলেই উপভোগবাদী জীবনযাপন করতেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সূচিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সৌজন্যে নীতিবাদী শুদ্ধতাবোধ প্রাধান্য পেয়েছিল বেশি। মুসলমান সমাজের নবজাগরণের কবি হিসাবে নজরুল বাংলার সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির জগতে জীবনবাদের একটি বলিষ্ঠ ধারা সংযোজিত করেন।[৬১] ঐস্লামিক সংস্কৃতির মধ্যে পারস্য-সূত্রে আগত ভোগবাদের রাগতপ্ত ধারাটিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় এবং গানে বিশুষ্ক নীতিবাদ নয়, অনেক বেশি পরিমাণে ছাড়পত্র পেয়েছে প্রেম, প্রীতি, জীবনসম্ভোগের মদিরা ঝঙ্কৃত দিকগুলি। 'বাদল প্রাতে শরাব' নামে একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"ফুটলো উষার মুখটী অরুণ, ছাইলে বাদল তাম্বু ধরায়,
জমলো আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকী লাও ভর-পিয়ালায়।
ভিজলো কুঁড়ির বক্ষপরাগ হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে
হম্‌দম! হরদম দাও মদ্, মস্ত্ করো গজল গেয়ে।"[৬২]

হাফিজের একটি রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদে তাঁর অনুমোদিত জীবনবাদ এই রকম—

"পরাণ ভরে পিয়ো শরাব
জীবন যাহা চিরকালের
মৃত্যু-জরা-ভরা-জগৎ
ফিরে কেহ আসবে না ফের।
ফুলের বাহার গোলাব-কপোল,
গেলাস সাথী মস্ত ইয়ার,
এক লহমায় খুশীর তুফান,
এই ত জীবন!—ভাবনা কিসের।"[৬৩]

'নব নবীনের গাহিয়া গান'

ডিরোজিও 'তরুণ-বঙ্গ'এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তরুণ যাত্রীরা তোমাদের হাতে এখন হাল, এগিয়ে চলো।'[৬৪] রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সবুজের অভিযান'। নজরুলও জয়গান করেছেন তারুণ্যের। তাঁর 'চল চল চল' গান, বা 'কামাল পাশা' কবিতার মধ্যে আছে দামাল জীবনের অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রার বন্দনা।

"নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহা শ্মশান

আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।"[৬৫]

'ভেঙে ফেল কর্‌রে লোপাট'

সাইমন্ডসের ভাষায়, 'মানব মুক্তির নাটকে রেনেসাঁস প্রথম অঙ্ক।'[৬৬] অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে মুক্তি দিতে। গুরুর হাত থেকে, শাস্ত্রের হাত থেকে, প্রথার হাত থেকে, শাসক ও শোষকের হাত থেকে।[৬৭] ইতালীয় রেনেসাঁসে প্রখ্যাত হিউম্যানিস্ট সালুতাতি ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর থাকা-কালে মিলানের সন্ত্রাসবাদী রাজন্যক ভিসকন্তির হাত থেকে ফ্লোরেন্সকে রক্ষা করার জন্য 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে প্রায় তাদের পতাকায় পরিণত করে দিয়েছিলেন।[৬৮] নজরুল যখন বাংলা কাব্যের রঙ্গমঞ্চে, তখন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন বহুমাত্রিক আকার গ্রহণ করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের রেনেসাঁস-পথিকরা ঐতিহাসিক কার্যকারণেই ছিলেন পরাধীনতার বেদনা থেকে অনেকখানি মুক্ত। নজরুলের সময় তা থাকা সম্ভব ছিল না। তাই নজরুলের কবিতায়, গানে পাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার সপক্ষে শৃঙ্খলমুক্তির পৌরুষপূর্ণ জেহাদ—

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, কর্‌রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ।
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।"[৬৯]

বৈশ্বিকতা

রেনেসাঁস মানুষকে নিখিল বিশ্বের অধিবাসী করে দিয়েছিল, করেছিল বৈশ্বিক মানুষ। তীব্র স্বদেশাভিমান সত্ত্বেও নজরুল এমন সাম্যের গান করেছেন—

"যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
সেখানে মিশিছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান।"[৭০]

'বিংশ শতাব্দী' কবিতায় লিখেছেন,

"পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
য়ুরোপ, রাশিয়া, আরব, মিশর, চীনে
আমরা আজিকে এক প্রাণ এক দেহ।"[৭১]

ঐস্লামিক সংস্কৃতির অনিবার্য উত্তরাধিকার ও সামরিক চাকরির সূত্রে তিনি বাংলার প্রত্যন্ত ভূগোল অতিক্রম করে মানসিকভাবে মধ্য-প্রাচ্যে পৌঁছেছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি অনায়াসে

অর্জন করেছিলেন বিশ্বমানবতাবাদের রেনেসাঁসোচিত উত্তরণ। রেনেসাঁসের কবিই তো বলতে পারেন—

"পাতাল ফেঁড়ে নামব নীচে, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।"[৭২]

ক্রিটিক্যাল-ম্যান

রেনেসাঁস জন্ম দিয়েছিল 'ক্রিটিক্যাল' মানুষের। ইতালিতে ক্রিটিক্যাল-ম্যানরা এসেছিলেন 'not sword but pen'[৭৩] নিয়ে। নজরুল তাঁর কলমকে প্রায় অসিতে পরিণত করে ফেলেছিলেন। ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-জ্বালাময়ী কবিতায় নজরুল সত্যি অনন্য। তাঁর 'ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ' 'চন্দ্রবিন্দু' 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' কবিতায় আছে সেই ক্রিটিক্যাল-ম্যানের চারিত্র্য। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"অমরকাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে।
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি, যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।"[৭৪]

'জাতের নামে বজ্জাতি' নামক বিখ্যাত কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া।।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান্‌
তাই ত বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান।
এখন দেখিস ভারত-জোড়া
পচে আছিস বাসি মরা
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কা হুয়া।।"[৭৫]

নজরুলের সমালোচনার তীর যেমন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, তেমনি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও। ফলে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন উভয় দিক থেকেই। কাঠমোল্লারা যেমন তাঁকে 'শয়তান' নামে অভিহিত করেছিল, তেমনি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল তাঁর অনেকগুলি রচনা। *'বিষের বাঁশি' 'ভাঙার গান' 'প্রলয়শিখা' 'চন্দ্রবিন্দু' 'যুগবাণী'*—সরকারী আদেশে নজরুলের এই রচনাগুলিকে রাজদ্রোহের অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।[৭৬] নজরুলও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এই ধরনের ক্রিটিক্যাল কাব্য-কবিতা রচনার জন্য। তাঁর এই পরিণাম মনে করিয়ে দেয় ইতালীয় রেনেসাঁসের লরেঞ্জো ভাল্লা বা পিকোর কথা। বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট টমাস মোরের মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছিল রাজদ্রোহের অপরাধে।

'আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'

রেনেসাঁস মানুষকে অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়শীল করেছিল। আলবের্তি বলেছিলেন, 'মানুষ সব পারে।'[৭৭] তাই রেনেসাঁসের মানুষ আত্মাভিমানী ও তীব্র অস্মিতা-বোধযুক্ত। মিলানের ডিউকের একজন করে চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি ও মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার দরকার জেনে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যে দরখাস্তটি পাঠিয়েছিলেন, তার ছত্রে ছত্রে আছে যেমন আত্মপ্রত্যয় তেমনি অহংকারের পরিচয়।[৭৮] এই রকমই অস্মিতাবোধ ছিল নজরুলের। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ"।[৭৯]

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর একটি স্মৃতিচারণে নজরুলের অপরিসীম আত্মগৌরব-বোধের একটি গল্প শুনিয়েছেন। নজরুল বলেছিলেন, তিনি কোনো খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না। তিনি কবি। তাঁর চলার পথের দু'পাশে খান সাহেবরা বরং এসে দাঁড়াবেন নত মস্তকে।[৮০]

•

'অর্ধেক তার নারী'

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থা ছিল বেদনাদায়ক ও অবহেলিত অবস্থায়। রেনেসাঁসের আমলে বিশেষ করে তার চিত্রকলার দিকে তাকালে দেখা যায়, নারীকে তাঁরা রূপায়িত করেছেন অপরিসীম বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। বুর্খহার্ডট লিখেছেন, 'ইতালীয় রেনেসাঁসে নারী পেয়েছিল পুরুষের সমকক্ষ মর্যাদা।'[৮১] এদেশেও কি মুসলিম সমাজ, কি হিন্দুসমাজ— উভয় ক্ষেত্রেই নারী ছিল নানাভাবে অত্যাচারিত এবং শোষিত। রেনেসাঁসে শুরু হয় সেই নারীত্বের উদ্ধার-প্রকল্প। ডিরোজিও তাঁর *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* কাব্যে বলেছিলেন 'নারী অপরের খেলনা মাত্র নয়।'[৮২] রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত গোটা রেনেসাঁস জুড়ে চলেছিল. সামাজিক শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে নারীকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার ধারাবাহিক সংগ্রাম। মুসলিম-জাগরণের ইতিহাসেও এই সংগ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। অবরোধবাসের বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়ার সাহসিক সংগ্রামের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মুসলিম-সমাজে নারীকে কি চোখে দেখা হতো তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'মিশ্র ভাষা রীতি'র কাব্যের পাতায় পাতায়।

"আওরত বদজাত কভু ভালো নাহি বোঝে।
নেকজাত এক কভু হাজারের মাঝে।।"[৮৩]

সে-জায়গায় নজরুল তাঁর কাব্যে নারীকে কি ধরনের মর্যাদা দান করেছেন তা তাঁর কবিতা পড়লে টের পাওয়া যায়—

"আজও রবি শশী ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে
নামে সখ্য ও সাম্য, শান্তি নারীর প্রেমের টানে।

নারী আজও পথে চলে
তাই ধূলি পথ হয় বিধৌত শুদ্ধ মেঘের জলে।
নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজও সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব।"[৮৪]

সেকুলার মানবতাবাদ

প্রাক-রেনেসাঁস যুগে ইওরোপে মানুষ বলতে বোঝাত একজন খ্রীশ্চানকে। রেনেসাঁস মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল ধর্ম ও সম্প্রদায়-বিমুক্ত মানবিক পরিচয়ের মৌলিক ভিত্তিভূমিতে। রেনেসাঁসের মানুষ তাই পারতপক্ষে সেকুলার। নজরুল যখন সাহিত্যের আসরে, তখন হিন্দু-মুসলিম উভয়পক্ষের পুনর্জাগরণবাদীদের পরস্পর বিরুদ্ধ-সম্পর্কের মধ্যে পথ চলতে হচ্ছিল দু'পক্ষের রেনেসাঁস-পথিকদের। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে রামমোহন উনিশ শতকীয় (প্রথম) রেনেসাঁসের ফিতে কেটেছিলেন। রিভাইভালিস্টদের প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিলেন পরবর্তী রেনেসাঁস-পথিকরা। মুসলিম-জাগরণের সূচনা-মুহূর্ত থেকেই সেই সমাজের রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক-শক্তি পথ আগলাতে শুরু করেছিল রেনেসাঁসের অগ্রপথিকদের। নজরুল হচ্ছেন মুসলিম-জাগরণের সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্প্রদায়-চেতনাকে যিনি জীর্ণ বাসের মতো পরিত্যাগ করেছিলেন। ইসলামী-সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু-সংস্কৃতিকে তিনি সম মর্যাদায় তাঁর সাহিত্যে-সঙ্গীতে গ্রহণ করেছেন।[৮৫] *'কাব্য আমপারা'য়* যিনি কোরআনের অনুবাদ করেছেন তিনিই 'রক্ততিলক' কবিতায় লিখেছেন,

"কোটি কর ভরি কোটি রাঙা হৃদি-জবা লয়ে করি পূজা,
না দিস আশিস, চণ্ডীর বেশে নেমে আয় দশভূজা।"[৮৬]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর *'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক'* নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

> "মনে রাখা দরকার সমগ্র আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন। উভয় ঐতিহ্য থেকে অবলীলাক্রমে তিনি বিষয়, উপমা, রূপক, বাকভঙ্গি প্রভৃতি আহরণ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'কালী-কীর্তন' রচয়িতা, তেমনি অন্যদিকে তিনি বাংলা ইসলামী গানের প্রবর্তক।"[৮৭]

মধ্যযুগের 'মিশ্র ভাবারীতি'র কাব্যে যেখানে বলা হয়েছিল,

"দেওপূজা ক্ষমা দেহ ঝুটি মালা ছাড়।
একভাবে নবীর কলেমা মুখে পড়॥

কাঁধে রশি ছেড়ে ঝুটি গলে রাখ মালা।
হিন্দু বলাইতে কেন কর এত জ্বালা॥
আমার নবীর দীনে কোন লেঠা নাই।
সব ছাড়ি দাড়ি রাখ শুন মেরা ভাই॥"[৮৮]

ধর্মান্তরণের এই মৌলবাদী আগ্রহের পথ ছেড়ে নবজাগরণের কবি নজরুল ইসলাম মানসিকভাবে কোন স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে তাঁর লেখা 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে—

"হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিতত্ব। তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব'-মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। ......অবতার, পয়গম্বর কেউ বলেনি, 'আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি।' তাঁরা বলেছেন, 'আমি মানুষের জন্য এসেছি—আলোর মত, সকলের জন্য।"[৮৯]

১৯২৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় তিনি রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' কবিতা—

"হিন্দু না ওবা মুসলিম। ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।"[৯০]

সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক-চেতনার ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে পেরেছিলেন বলেই লিখেছেন,

"এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।"[৯১]

দুই রেনেসাঁস, একটি সেতু

রিভাইভালিজম হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষকে টান দিয়েছিল দুই বিপরীত দিকে—রেনেসাঁসের মানবতাবাদী প্রগতিশীলতার ধারা দুই সম্প্রদায়কে সন্নিবিষ্ট করতে চেয়েছে একটি ঐকিক মানবিক বৃত্তে। মুসলিম জাগরণের মধ্যে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীলতার ধারা ছিল 'pro-British and anti-Hindu'।[৯২] রেনেসাঁসের কবি নজরুল, যে চেতনা সঞ্চারিত করেছিলেন তা ছিল 'anti-British and pro-Hindu'। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে দু'টি সমাজের জাগরণের যাত্রা-বিন্দু ছিল পৃথক ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই রেনেসাঁস উভয় সমাজের মানুষকে একই মানবিক চেতনার বলয়ে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছে। নজরুল হলেন সেই কবি যাঁর মধ্যে সংরচিত হয়েছিল দুই রেনেসাঁসের একটি প্রতীকী সেতুবন্ধ। নজরুলে আমরা পাই দুই রেনেসাঁসকে একই সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সেই অবিস্মরণীয় আলোক-ছত্র,

"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মোসলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥

এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান।"[১৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দুই রেনেসাঁসের মধ্যে রিভাইভালিজমের যে-ধারা ছিল তা বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে দু'টি পৃথক ভূগোলে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু রেনেসাঁসের সদর্থক আলো দু'টি সমাজের মানসিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে যে জায়গায় উত্তীর্ণ করেছে, সেখানে কোনো কাঁটাতার বসেনি। সেই *'শাশ্বত-বঙ্গ'*-এর প্রতিভূ কবি হিসাবে যাঁকে চিহ্নিত করা চলে, তাঁর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। অন্নদাশঙ্কর রায় একটি ছড়ায় সে-কথা অনবদ্যভাবে বলেছেন,

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।"[১৪]

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. J. N. Sarkar, *History of Bengal,* vol. II, The University of Dacca, 1948, pp. 497-499

২. R. C. Majumdar, *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century,* Calcutta, 1969, p. 14

৩. S. C. Sarkar, *On the Bengal Renaissance,* Calcutta, 1979 edition, p. 69

৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁসের কয়েকটি চরিত্র', *"ঐকতান",* ১৪০০ বঙ্গাব্দ, সংহতি সংখ্যা ১৯৯৩-৯৪, পৃ. ১৯০-২০৩

৫. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁস ও বাংলার মুসলমান সমাজ', *ইতিহাস অনুসন্ধান*-৬ প. ব. ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৪১-২৬১

৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, দ্রষ্টব্য-৪

৭. কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* সং সাহিত্য গ্রন্থাবলী—১, পৃ. ৩১-৩২

৮. R. Heber, *Narrative of Journey Through the Upper Provinces of India etc.,* II, London, 1828, pp. 233-234

৯. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী* (১৮৯৮), চতুর্থ সং ১৯৬২, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ৪১৭

১০. H. K. Sharp, *Selection From Educational Records,* Part-I, Calcutta, 1970, p. 111

১১ উদ্ধৃত বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১৬৮

১২. উদ্ধৃত বিনয় ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১৬৮-১৬৯

১৩. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, 'বাংলা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথম পর্যায়', *ইতিহাস গবেষণা,* কলকাতা

১৪. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,* ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩২

১৫. 'দিনের পর দিন গিয়েছে, নতুন ভাবাদর্শ এদেশে তরঙ্গ তুলেছে, নতুন রাজশক্তি এদেশে নতুন শাসন পদ্ধতি চালু করেছেন, কিন্তু তাঁরা (*বাঙালী মুসলমান*) মনের দিক থেকে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের মতোই বারবার বিচ্ছিন্ন থেকে গিয়েছেন।'—আহমদ ছফা, *বাঙালী মুসলমানের মন,* ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২২

১৬. A. C. Gupta (ed.), *Studies in the Bengal Renaissance,* Jadavpur University, 1957, p. 475

১৭. Vera Anstey, *The Economic Development of India,* London, 1929, pp. 279-280

১৮. M. N. Roy, *India in Transition,* Bombay, 1971, p. 51

১৯. ওয়াকিল আহমদ, *তদেব,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬

২০. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩

২১. 'মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত প্রায় সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ড এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ভিত্তিক।' —আহমদ ছফা, *তদেব,* পৃ. ২৪

২২. J. Maitra, *Muslim Politics in Bengal 1855-1906,* Calcutta, 1984, p. 6

২৩. ওয়াকিল আহমদ, *তদেব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬ ; আনিসুজ্জামান, *তদেব,* পৃ. ৩৮৭, 'হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ আর মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ পূর্ণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল।'

২৪. রশীদ আল ফারুকী, *মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া,* কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩০

২৫. আহমদ ছফা, *তদেব,* পৃ. ১৯ ;নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা,* কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩০

২৬. রশীদ আল ফারুকী, *তদেব,* পৃ. ৩৩

২৭. M. T. Titus, *Indian Islam,* Oxford, 1930, উদ্ধৃত কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৮৪

২৮. J. Maitra, *Ibid*

২৯. আহমদ ছফা, *তদেব,* পৃ. ১৬

৩০. 'মিশ্র-ভাষা-রীতির কাব্যকে আমরা ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি ধারার নিদর্শন বলে গণ্য করতে পারি। সমাজ জীবনের ক্ষয়ের চিহ্ন এতে স্পষ্ট।' —আনিসুজ্জামান, *তদেব,* পৃ. ১৪৭

৩১. মফিজউদ্দীন আহাম্মদ, *কেচ্ছা আলেফ লায়লা,* তৃতীয় সং, কলিকাতা, ১৩২৯, পৃ. ১

৩২. J. Maitra, *Ibid,*

৩৩. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম,* ঢাকা, ১৯৭৪
৩৪. খোন্দকার সিরাজুল হক, *কাজী আবদুল ওদুদ,* ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৫ ; শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁস ও বাংলার মুসলমান সমাজ', *"সুন্দরম",* শরৎসংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, পৃ. ১১৩
৩৫. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র,* চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ. ১৩০-১৩১
৩৬. A. F. Salahuddin, *Social Ideas and Social Changes in Bengal 1818-35,* Calcutta, 1976, p. 19
৩৭. আবু নুর, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য ও সাহিত্যিক', *"ইসলাম দর্শন",* ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩২
৩৮. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'স্ত্রী জাতির অবনতি', *রচনা-সংকলন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন,* বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭
৩৯. ঐ, *'অবরোধবাসিনী', তদেব,* নিবেদন অংশ, পৃ. ৯৫
৪০. আবদুল হক (সম্পাদিত), *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮
৪১. আবুল হুসেন, 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা', *"শিখা",* প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।
৪২. আবুল ফজল, 'তরুণ আন্দোলনের গতি', *"শিখা",* তৃতীয় বর্ষ, ১৩৩৬
৪৩. আবদুল ওদুদ, 'শিক্ষা সংকট' (চৈত্র, ১৩৩৮), *শাশ্বত বঙ্গ,* পৃ. ২৪৭
৪৪. *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, তদেব,* ১ম খণ্ড, ১৯৮৮, পৃ. ৪৫
৪৫. *তদেব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২
৪৬. আবদুল ওদুদ, 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ', *তদেব,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০২
৪৭. আবদুল ওদুদ, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', *তদেব,* পৃ. ৫১৫
৪৮. মুন্‌শী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, '*লোকটা* মুসলমান না শয়তান', *"ইসলাম-দর্শন",* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা; কার্তিক, ১৩২৯
৪৯. সম্পাদক *"মোয়াজ্জিন",* 'নজরুল সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে একটি কথা', *"মোয়াজ্জিন",* ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫
৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *"ধূমকেতু"* পত্রিকার আশীর্বাণী, ১৯২২, ১২ আগস্ট
৫১. মোহিতলাল মজুমদার, *"মোসলেম ভারত",* ভাদ্র, ১৩২৭
৫২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাংলার আজিজ', *"মোহাম্মদী",* কার্তিক ১৩৩৫, *সন্ধ্যা* গ্রন্থে সংকলিত
৫৩. ঐ, 'চল্ চল্ চল্', *"শিখা",* দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায় 'নূতনের গান' নামে প্রকাশিত
৫৪. ঐ, 'জীবন', *সন্ধ্যা* কাব্যগ্রন্থে সংকলিত (সম্ভবত ১৯২৯)
৫৫. ঐ, *'কাব্য আমপারা'*র ভূমিকা, উদ্ধৃত সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল চরিতমানস,* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ সং, পৃ. ২৪৫

৫৬. J. A. Symonds, *Renaissance in Italy*, vol. 2, Revival of Learning, 1969

৫৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', *জিঞ্জীর কাব্য*, ১৯২৮

৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম, *আরবি ছন্দের কবিতা*, ১৯২৩ ; *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সং ১৯৭৫, পৃ. ২৮৯-২৯৪

৫৯. ঐ, 'উমর ফারুক', *তদেব*

৬০. L. Valla, *De Voluptate* (on Pleasure), 1431

৬১. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৩), বিশ্ববাণী সং, ১৯৮৩

৬২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাদল প্রাতে শরাব', *"মোসলেম ভারত"*, ১৩২৭, আষাঢ় *পূর্বের হাওয়া* গ্রন্থে সংকলিত

৬৩. ঐ, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, ১৯৩০, ১৭ নং রুবাই, উদ্ধৃত সুশীলকুমার গুপ্ত, *তদেব*, পৃ. ২৪০

৬৪. পল্লব সেনগুপ্ত, *ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও*, ১৯৭৯, ১৯৮৫ সং, পৃ. ১২৪

৬৫. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', *অগ্নিবীণা*, ১৯২২

৬৬. J. A. Symonds, *Renaissance in Italy*, vol. 1, p. 7

৬৭. অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস*, ১৯৭৪

৬৮. W. Rospigliosi, *Writers in the Italian Renaissance*, London, 1978

৬৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'কারার ঐ লৌহ কপাট', *ভাঙার গান*, ১৯২৪

৭০. ঐ, *সাম্যবাদী*, ১৯২৫

৭১. ঐ, 'বিংশ শতাব্দী', *প্রলয় শিখা*, ১৯৩০

৭২. ঐ, 'সংকল্প' বা 'দেখব এবার জগৎটাকে'

৭৩. I. Thompson, Article in *"R. Q."*, vol. XLIV, No. 2, 1991

৭৪. ঐ, 'আমার কৈফিয়ৎ', *"বিজলী"*, ১৩৩২, আশ্বিন, সর্বহারা, ১৯২৬

৭৫. ঐ, 'জাতের বজ্জাতি' (১৯২৩), *'বিষের বাঁশী'*, ১৯২৪

৭৬. আজাহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, প্রথম প্রকাশ ১৩৬১

৭৭. 'Man can do all', Alberti the 'many sided man' told and did it in his life

৭৮. W. Durant, *The Story of Civilization*, vol. V, The Renaissance, N.Y., 1953

৭৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহী', *"বিজলী"*, ২২ পৌষ ১৩২৮ প্রকাশিত, *অগ্নিবীণা*, ১৯২২

৮০. K. W. Wadud, *Creative Bengal*, Calcutta, 1950, pp. 127-128

৮১. J. Burckhardt, *The Civilization of Renaissance in Italy*, London, 1945, p. 240

৮২. H. L. V. Derozio, *The Fakheer of Jangheera*, 1928

৮৩ সাহা গরীবুল্লা ছৈয়দ হামজা, *আমির হামজা,* কলিকাতা, ১৩৩৬
৮৪ কাজী নজরুল ইসলাম, 'নারী', *সাম্যবাদী,* ১৯২৫
৮৫. সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল চরিতমানস,* দে'জ সং ১৯৭৭
৮৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'রক্ততিলক', *প্রলয় শিখা,* ১৯৩০
৮৭. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,* ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৩১৫
৮৮. সৈয়দ হামজা, *জৈগুণের পুঁথি,* কলিকাতা, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৫৫ ; উদ্ধৃত আনিসুজ্জামান, *তদেব,* পৃ. ১৩২
৮৯. কাজী নজরুল ইসলাম, 'হিন্দু-মুসলমান', *রুদ্রমঙ্গল* (১৩৩৩)
৯০. ঐ, 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার', ১৩৩৩, জ্যৈষ্ঠ, *"বঙ্গবাণী"* তে প্রথম প্রকাশিত, *সর্বহারা,* ১৩৩৩
৯১. ঐ, 'মানুষ', *সাম্যবাদী,* ১৯২৫
৯২. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *তদেব*
৯৩. কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা*
৯৪ অন্নদাশঙ্কর রায়, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল' ; উদ্ধৃত সুশীলকুমার গুপ্ত, *তদেব,* পৃ. ৯৮

নবম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ : বঙ্গীয় রেনেসাঁসের স্বর্ণ-শতদল

রেনেসাঁস হচ্ছে ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণের যুগ। ইতালির চেয়েও স্বল্পকালের মধ্যে মননশীল ও সৃজনশীল প্রতিভার ভঙ্গিল পর্বত বাংলাদেশে মাথা তুলেছে এবং দেশের সাংস্কৃতিক আবহে নিয়ে এসেছে যুগান্তরের পালা। বঙ্গসংস্কৃতির রাজ্যে প্রতিভার এই বহুধাবিস্তৃত পর্বতমালার মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম রবীন্দ্রনাথ। রামমোহনে যে রেনেসাঁসের বলিষ্ঠ সূচনা, রবীন্দ্রনাথে তার চূড়ান্ত সমুৎকর্ষ। ডেভিড কফ একে ফেলতে চেয়েছেন রিফরমেশনের ছকে।[১] সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এই বিচার। রামমোহন ও দ্বারকানাথের যুগলবন্দীর আসরে একদা যে সম্প্রসারণ উদ্ভাসিত হয়েছিল, অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধ-মৈত্রীতে দেবেন্দ্রনাথ তাকে মুড়ে এনেছিলেন অন্তর্মুখী প্রশান্তিতে ; সেই বহির্মুখী সম্প্রসারণ ও অন্তর্মুখী প্রশান্তির গভীর টানাপোড়েন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঁধলেন তাঁর বিশ্ববীণার তার। তাতে যে গান বেজেছিল রিফরমেশন দিয়ে তার ব্যাখ্যা হয় না। রেনেসাঁসের যে-সব মূলসূত্র উনিশ শতকের বাংলায় অঙ্কুরিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে আমরা লক্ষ করি তার পুষ্পিত পরিণাম। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় রেনেসাঁসের স্বর্ণ-শতদল।

প্রাচীন ঐতিহ্যের সাগ্রহ চর্চা ও স্বীকরণ

রেনেসাঁস একঅর্থে 'রিভাইভাল অব লার্নিং'। রেনেসাঁস আমলে ইতালি জীবনবাদী প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সংস্কৃতির নিবিড় চর্চায় নিরত হয়েছিল। রামমোহন বেদান্ত ও উপনিষদাদির অনুবাদের মধ্যে দিয়ে যার সূচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম তাঁদের অনুবাদমূলক বা সৃজনধর্মী গদ্য-পদ্য রচনার মধ্যে যে বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন মনন ও সৌন্দর্যচর্চাকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই যেন পরিপূর্ণতা দান করেছেন তাঁর আজীবন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সাধনার মধ্যে দিয়ে।

সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রতি তাঁর আবেগ ছিল রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পেত্রার্কার মতোই বা তার থেকেও তীব্র। পেত্রার্কার মতো তিনিও সমকালের মালিন্যময়, খণ্ডিত জীর্ণ সংস্কৃতি থেকে বারে-বারে মানসিকভাবে ফিরে যেতে চেয়েছেন স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত যুগের পৃথিবীতে। পেত্রার্কা বলেছিলেন, 'আমি যদি লিভির যুগে জন্ম নিতাম কী ভালোই না হতো।'[২] প্রায় পেত্রার্কার মতোই রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে"[৩]

'মেঘদূত' কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা-সিপ্রা-নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।"[৪]

গ্রীক ও লাতিন ভাষার আশ্রয়ে স্থিত প্রাচীন ধ্রুপদী সংস্কৃতির প্রতি রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা যে সানুরাগ আস্থা স্থাপন করেছিলেন ; অনুবাদ, সটীক সম্পাদনা ও বিশ্লেষণাত্মক বা সৃজনাত্মক রচনাকর্মের মধ্যে দিয়ে তাকে সমকালে পুনর্বাসিত করার যে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা করেছেন বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ব' অনুরাগের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি একটি নিবন্ধে বলেছেন,

> "ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত-ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল।"[৫]

ইতালীয় রেনেসাঁসে বলদাসর কাস্তিলিওনে তাঁর বিখ্যাত *'কোর্টিয়ার'* গ্রন্থে ভাষাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি সেই ভাষাদর্শেরই পক্ষপাতী যাতে আছে শুদ্ধ লাতিন-মূল শব্দের প্রাচুর্য।[৬] লরেঞ্জো ভাল্লা তাঁর বিখ্যাত *'এলিগেন্সিজ্ অব দ্য লাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ'* নামক প্রস্তাবে লাতিন ভাষার ওজস্বিতা ও প্রকাশ-সামর্থ্য সম্পর্কে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন,[৭] রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে প্রায় সেই ধরনের উচ্চ ধারণাই পোষণ করতেন,

> "সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কনসার্ট বাজিয়া উঠে—তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে ..."[৮]

রামমোহনের ভাব-দীক্ষিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে অতি বাল্যবয়সেই তিনি পেয়েছিলেন সংস্কৃত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ। পিতৃ-নিযুক্ত গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য প্রমুখদের কাছে নিয়েছিলেন সংস্কৃত-শিক্ষার প্রথম-পাঠ। তারপর কবিজনোচিত আকর্ষণে তিনি ক্রমশ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করেন। উপনিষদের আলোকিত মন্ত্রগুলি তাঁকে প্রাণিত করতে থাকে ; *'অমরু শতক'*-এর 'মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোক' জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ' শ্লোকের ধ্বনিপুঞ্জ, *'মেঘদূত'*-এর মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুরণন তাঁকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায় বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের পৃথিবীতে—

যার একদিকে বেদ-পুরাণেতিহাস-মহাকাব্য-কাব্য-নাটক, অন্যদিকে ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র। রবীন্দ্রপ্রতিভায় সকল দিকেরই স্পর্শ রয়েছে।[৯] রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতানুশীলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিতপ্রবর সুখময় ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, তাঁর সংস্কৃতানুরাগ এত পরিব্যাপ্ত যে তার পরিচয় দিতে যাওয়া মানে প্রদীপ জ্বেলে মধ্যাহ্ন সূর্যকে দেখাবার চেষ্টা। তিনি লিখেছেন,

> "সারাজীবন তাঁর মতো সংস্কৃতচর্চা আর ক'জন করেছেন? তিনি তাঁর সাহিত্যে সংস্কৃতের ব্যবহার তো কম করেননি। তাঁর সাহিত্যে, বিশেষতঃ তাঁর মননমূলক প্রবন্ধে সংস্কৃতের আধিপত্যই সবচেয়ে বেশী। তাঁর সমগ্র রচনার উৎকৃষ্ট অংশগুলির অর্ধেকের মতো সংস্কৃতনির্ভর এবং সংস্কৃতগন্ধী। সংস্কৃত সাহিত্য পড়া না থাকলে কবির সেইসব রস আস্বাদন কেউ করতে পারেন না, পারবেনও না। সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়তে হলে সংস্কৃতজ্ঞান অপরিহার্য। ইংরাজি ও পালির আলোচনাও তাঁর সাহিত্যে রয়েছে, পরন্তু সংস্কৃতের তুলনায় তা নগণ্য।"[১০]

বেদ

রবীন্দ্রনাথ মানেননি বেদ 'অপৌরুষেয়'। অক্ষয় দত্তের মতো তিনিও মনে করতেন 'মানবরচিত গ্রন্থ'। ঋষিরাই এর রচয়িতা। প্রত্যেক বেদের দু'টি অংশ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ *'শান্তিনিকেতন'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> "মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দেয় না।"[১১]

আচার ও অনুষ্ঠানগত সমস্তরকম শুষ্ক জটিলতাকে অগ্রাহ্য করে রামমোহন ঐকিক বিশ্বাসের, যে বেদ ও উপনিষদ-সম্মত, মৌল সরলতাকে আহ্বান করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ যার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন অনুভূতি-সঞ্জাত আত্মগত আবেগ, রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যেরই ধারানুসারী। তিনি 'ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন,

> "ভারতবর্ষে এই উদবোধনের মন্ত্র অছে তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা গায়ত্রী মন্ত্র। ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। ইহার মধ্যে তর্ক-বিতর্কের কোন স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।"
>
> "ও ভূর্ভুবঃস্বস্তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
> ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।"

মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক, অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে

হইবে। তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত্র বিশেষ দেশবাসী নহি।"[১২]

বিখ্যাত প্লেটোবিদ ফিকিনো তাঁর *'দে ভিতা'* গ্রন্থে মানুষকে যে ভাবে তার জৈবিক ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়ে কসমিক বিশ্বের বাসিন্দা করেছিলেন,[১৩] রবীন্দ্রনাথও তেমনি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে খুঁজেছিলেন ব্যক্তি মানুষের আলোকিত সম্প্রসারণ।

বৈদিক মন্ত্রকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করেছেন রেনেসাঁসের একাধিক সূত্রকে। এ শুধু প্রাচীন বিদ্যার চর্চা নয়, প্রাচীন মন্ত্রের সমর্থনে মানুষকে সর্বপ্রকার খণ্ডতা ও সংকীর্ণতা মুক্ত করে কসমিক-বিশ্ব ও নিখিল মানবিক-বিশ্বের অধিবাসী করে দেওয়া। প্রাচীন বৈদিক-ভারতের আনন্দমন্ত্রকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার কবিতা রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ বারে-বারে,

"আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভর
অনন্ত অমৃত বার্তা।"[১৪]

প্রাচীন সংস্কৃতির স্বর্ণিল ভুবনকে ফিরিয়ে আনার সাধনায় ব্রতী ছিল ইতালির রেনেসাঁসও।

উপনিষদ

বেদান্ত সাহিত্যে ও প্রধান উপনিষদ গ্রন্থগুলি অনুবাদ করে রামমোহন বাংলায় সংস্কৃত-চর্চার একটি প্রায়-নিরুদ্ধ দরজা খুলে দিয়েছিলেন। রামমোহন সম্পাদিত ও অনূদিত *'ঈশোপনিষদ'*-এর একটি ছিন্নপত্র কিভাবে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, তা তাঁর আত্মজীবনীর পাঠক মাত্রই জানেন। উপনিষদের শ্রুতিগুলি রবীন্দ্রনাথের মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। সুখময় ভট্টাচার্য বলেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের রচনায় উপনিষদের প্রভাব খুব বেশি। তাঁর প্রবন্ধ সমূহের এক-তৃতীয়াংশ উপনিষন্মূলক তথা উপনিষদ্‌গন্ধী—একথা বললে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হয় না। উপনিষদকে অবলম্বন করে তাঁর অনেক কবিতাও রয়েছে। উপনিষদের কিছু কিছু ভাষান্তর বা রূপান্তরও তাঁর রচনায় দেখতে পাই।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, 'উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি।'[১৬] হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত এক পত্রে কবি লিখেছেন—

"আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে........"[১৭]

রবীন্দ্ররচনায় ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর

ও উত্তরনারায়ণ—এই এগারোখানি উপনিষৎ হতে শ্রুতি আহৃত হয়েছে। রেনেসাঁসের বহু সূত্র ক্রিয়াশীল ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ও কবিজনোচিত উপনিষদ-চর্চায়।

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'র বৈদান্তিক শঙ্কর-ভাষ্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের 'সোইহং'-তত্ত্বের নতুন ভাষ্য দিয়েছিলেন, যার মর্মার্থ হল 'আমি তাঁর সঙ্গে এক, যিনি আমার চেয়ে বড়ো।'[১৮] উপনিষদের এই মন্ত্রটির সরল অর্থ ছেড়ে যাঁরা ভ্রান্তপথে চলেন, তাঁদের তিনি বিদ্রূপ করেছেন এই ভাষায়,

> "আমাদের দেশে একদল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা 'সোইহং'-তত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্য ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়।.........তাঁরা যাকে ভূমা বলেন, তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন ; তাঁদের ভূমা সব কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তার মধ্যে কর্ম-তত্ত্ব নেই।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষের অভিব্যক্তির দু'টি মেরু। একটি তার 'অহং', যা 'আপনাতে আপনি সীমাবদ্ধ' ; অন্যটি 'আত্মা', যা 'সর্বত্র পরিব্যাপ্ত'। উপনিষদে মানুষের অন্তর্নিহিত এই দ্বৈত সত্তার কথা বলা হয়েছে। মানবজীবনে অহরহ চলছে এই অহং ও আত্মার দ্বৈত লীলা। তিনি মনে করেন ভূমাকে লাভ করার জন্য লোকালয় ছেড়ে গিরিগহ্বরে যাবার প্রয়োজন নেই। ভূমার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তা মানবিক সাধনা।

> "আমার বুদ্ধি মানব বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব হৃদয়, আমার কল্পনা মানব কল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্তকে কখনোই ছাড়াতে পারে না।........মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।"[২০]

এই জীবনবাদী মানবিকতাই হচ্ছে রেনেসাঁসের মূলকথা। পেত্রার্কা বা বোক্কাচিওর সাহিত্যে, রাফায়েল বা টিশিয়ানের চিত্র-চর্চায়, ফিকিনো বা পম্পোনাজ্জির দর্শন-চর্চার এমন কি জুলিয়াস-২য় বা লিও-১০ম-এর মতো পোপের জীবনচর্যাতেও ব্যক্ত হয়েছিল এই জীবনবাদী দৃষ্টি। ভাল্লার মতো বিশ্বাসী হিউম্যানিস্ট, যিনি বলতেন—'যুক্তি নয়, আমরা থাকি বিশ্বাসের বলে', তিনিও জীবনের সম্ভোগবাদ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ '*নৈবেদ্য*'-এর একটি কবিতায় বলেছেন,

> "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥........
> ইন্দ্রিয়ের দ্বার
> রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
> যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
> তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥"

'*তৈত্তিরীয়*' উপনিষদে ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে বলা হয়েছে—

> 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
> আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'.......

সব কিছু আনন্দ থেকে জাত হয়েছে, আনন্দের দ্বারা জীবিত রয়েছে, আনন্দের দিকে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই ঔপনিষদিক আনন্দবাদকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জীবনে ও সৃষ্টি কর্মে। নেতিবাদী বিষাদ বা শুষ্কতা নয়, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আনন্দবাদ, যা দুঃখকে শেষ বলে মানে না, মানে সোপান বলে, তা তাঁর সৃষ্টি-মূলে বিদ্যমান।

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।"[২১]

তাঁর আনন্দবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে *'খেয়া'*র 'আগমন', 'দান' প্রভৃতি কবিতায় ; *'গীতালি'*র নানা গানে ; *'শারদোৎসব'*, *'মুকুট'*, *'অচলায়তন'*, *'রাজা'*, *'ডাকঘর'*, *'ফাল্গুনী'* নাটকে। *'শ্বেতাশ্বতর'* (৩/৮) উপনিষদে ধ্বনিত হয়েছে অন্ধকারের মধ্যে থেকে জ্যোতির্ময় সত্তার আলোকিত জাগরণের মন্ত্র।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

'কল্পনা' কাব্যে 'রাত্রি' কবিতাটি তারই উপর ভিত্তি করে লেখা—

"স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।........."[২২]

'কঠোপনিষদ'-এর (১/৩/১৪) ঋষি ডাক দিয়ে বলেছিলেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

রবীন্দ্রনাথ অন্তত পঁচিশবার এই শ্রুতিটিকে স্মরণ করেছেন। *'ধর্ম'* গ্রন্থে 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটিতে কবি বলছেন—

"পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়ে মানুষকে যাহা পাইতে হইবে তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এই জন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে —উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ......"[২৩]

ইতালীয় রেনেসাঁসে পিকো দেল্লা মিরান্দোল্লো তাঁর *'অন দ্য ডিগনিটি অব ম্যান'* নামক সুবিখ্যাত প্রস্তাবে মানুষের ব্যক্তিত্বের নিরন্তর কর্ষণের কথা বলেছিলেন। ইতালির বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আলবের্তি লিখেছেন,

"মানুষ হচ্ছে লোহার তরবারি, নিরন্তর ঘর্ষণে তাকে শাণিত করে
তুলতে হবে, নইলে তাতে মরচে পড়ে যাবে।"

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ (৩/৩৩) শুনঃশেফের উপাখ্যানে বলা হয়েছে—

> "চলতে যে শ্রান্ত তার শ্রী-র অন্ত নেই—হে রোহিত এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও তার সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে। অতএব এগিয়ে চল। এগিয়ে চল।" ('চরৈবেতি চরৈবেতি')[২৪]

রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় ও সৃজনকর্মে এই গতিশীলতার সূত্র বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করেছে। তাঁর *'বলাকা'* কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে এই গতির গান।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি সমগ্রতার বোধ, সমস্ত রকম বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বিদ্যমান একটি সামঞ্জস্য-সুষমা ; গতিময়, আনন্দ-স্পন্দিত জীবনবাদে সুগভীর বিশ্বাস —এসবই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন উপনিষদের জগৎ থেকে।

> "সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতি সূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নইলে সেই জানার বালাই মাত্র থাকিত না—যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে· পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।"[২৫]

১৩২১ বঙ্গাব্দে ৭ই পৌষের উৎসব-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি উচ্চারণ করে বলেছিলেন,

> "আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে পিতা-মাতার গভীর স্নেহে—মাধুর্য ধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত ; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে ভোগ করো, পরিপূর্ণ রূপে ভোগ করো।"[২৬]

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা যেমন 'ভিতা একতিভা' বা 'সক্রিয়তাই জীবনের ধর্ম'—একথা বলেছিলেন, তেমনি বলেছিলেন 'ভিতা কনতেমপ্লাতিভা'র কথাও। পেত্রার্কা তাঁর 'ফেমিলিয়ারিজ'-এ (৮.১.১৮) বলেছেন, 'If you have yourself that is enough.' রেনেসাঁস হিউম্যানিজম তাই কারো কারো মতে 'Self cultivation of life'.[২৭] মন্ত্রে যে কথা বলা হয়েছিল সূত্রাত্মক নির্দেশে—'আত্মানং বিদ্ধি' বা 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত', রবীন্দ্রনাথে এসে তা পল্লবিত মুখরতা লাভ করেছে—

> 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।'[২৮]

উপনিষদ থেকে আহৃত অন্যতর মূলসূত্রটি হচ্ছে বিশ্ববোধ। নিজেকে প্রসারিত করে বিশ্বজগৎ ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করার অভিমন্ত্র তিনি উপনিষদ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *'জীবনস্মৃতি'*তে লিখেছেন,

> "আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূ র্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।"

"আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূ র্ভুবঃ স্বঃ,
অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী, আমাদের চেতনা।"[২৯]

বিশ্বের দিকে মুখ করে উদাত্ত-চিত্ত যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতে—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা.........." রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তারই উত্তরসূরি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলনের সূত্রও তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদ থেকেই।

"পশ্চিম-মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে ; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা ; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা, আর পূর্ব-মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে ; তাই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ ইত্যাদি।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশ-কালের ছাপ নেই—তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের বাধতে পারে।......... তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।"[৩১]

রেনেসাঁসের সংস্কৃতি কসমোপলিটান। দেশ-বিশেষে তার সূচনা হলেও তার হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা রেনেসাঁসের জ্ঞান ও শিল্পচর্চায় এনে দিয়েছিলেন এক সর্বজনীন বৈশ্বিকতা। লিওনার্দোর *'মোনালিসা'* ও রাফায়েলের *'স্কুল অব এথেন্স'* ইতালির একান্ত ছবি নয়, সারা পৃথিবীই তার অংশভাক্‌। রবীন্দ্রনাথ কেন উপনিষদের প্রতি জ্ঞাপন করেছিলেন তার অনুরাগকম্পিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, তা বোঝা যায় তাঁর বিচারশীল পরিগ্রহণ, প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা থেকে। রেনেসাঁসের বহুতর মৌলিক সূত্রের প্রেরণা ও সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদের পৃথিবী থেকে। তাই কেউ-কেউ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের বিকাশে উপনিষদের মন্ত্ররাজির প্রভাব ছিল অতিশয় সুদূরপ্রসারী।"[৩২]

রামায়ণ-মহাভারত

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয়, যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।"[৩৩]

"রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"[৩৪]

'রামায়ণ' সম্পর্কে কবি বলেছেন,

"ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।..........ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানাঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।" [৩৫]

'মহাভারত' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত এই রকম,

"আমার অল্প বয়স হইতেই মহাভারত আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের হিমালয়ের মতো যেমন উত্তুঙ্গ তেমনি সুদূর প্রসারিত।.........একাধারে এমন বিপুল বিচিত্র সাহিত্য আর কোনো ভাষায় নাই। ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, মহাভারত না পড়িলে আমাদের দেশের কাহারো শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।" [৩৬]

'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর মহাগীতি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে কি ধরনের সুরমূর্ছনা জাগিয়ে তুলেছিল তার পরিচয় আছে *'সোনার তরী'* কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতায়। *'রামায়ণ'* দেবতার কথা নয়, নরচন্দ্রমার কথা।

"রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজ গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।" [৩৭]

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে বলেছেন,

"দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দ গানে।" [৩৮]

'রামায়ণ'-এর প্রসঙ্গ ও উপাদান, উপকাহিনী ও ভাবগত আবেগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যে-পদ্যে ফিরে-ফিরে এসেছে। *'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্যক', 'পরিচয়', 'শিক্ষা', 'ইতিহাস', 'পঞ্চভূত'*, প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থে ; *'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া'* প্রভৃতি গীতিনাট্যে ; 'ভাষা ও ছন্দ', 'পতিতা', 'অহল্যার প্রতি', 'পুরস্কার', প্রভৃতি কবিতায় ; *'রক্তকরবী'* নাটকের ভূমিকাংশে এসেছে রামায়ণের প্রসঙ্গ ও উপাদান।

আদর্শ মনুষ্যরূপে *'মহাভারত'*-এর কৃষ্ণচরিত্র বঙ্কিমের কাছে যে গুরুত্ব পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে সেই গুরুত্বে দেখেননি, তবে *'মহাভারত'*কে তিনি মর্যাদার দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। *'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি'*র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

"এক মহাভারত পড়িলেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল।..........তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোক-অন্ধকারে জীবন-লক্ষণাক্রান্ত ছিল।..........সেই বিপ্লব সংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা জাগ্রত শক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।" [৩৯]

ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা গ্রীক সভ্যতাকে আকর্ষণীয় মনে করত তার পেগান পৌরুষের জন্য ও বলিষ্ঠ জীবনবাদের জন্য। রবীন্দ্রনাথের মহাভারতানুরাগের মধ্যে সেই একইরকম দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান।

'মহাভারত' থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন —*'চিত্রাঙ্গদা'* (১২৯৮), *'বিদায় অভিশাপ'* (১৩০১), *'গান্ধারীর আবেদন'* (১৩০৪), 'নরকবাস' (১৩০৪), *'কর্ণকুন্তী সংবাদ'* (১৩০৬)।

'মহাভারত'-এর আদিপর্বে (অর্জুন বনবাস পর্ব—*মহাভারত*—২১৫। ১৩-২৭) আছে ভ্রাম্যমাণ অর্জুন মণিপুর-রাজ চিত্রবাহনের কন্যা চারুদর্শনা চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হন এবং তার পাণিগ্রহণ করেন। সমালোচক বলেছেন,

> "কাহিনীর বীজটুকু মহাভারতের। কিন্তু এর শাখা, পল্লব, ফুল, ফল—সবই রবীন্দ্রনাথের গড়া বস্তু।"[৪০]

'বিদায়-অভিশাপ' বা কচ ও দেবযানীর কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতের আদি-পর্বের ৭৫ অধ্যায়—যযাতির উপাখ্যান থেকে। যা ছিল মাত্র ২৩টি অনুষ্টুপ শ্লোকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই দূরস্মৃতির তর্পণ-চিত্রকল্পে ও রোমান্টিক সৌন্দর্যে ভরপুর করে এঁকেছেন।

'মহাভারত'-এর বিভিন্ন পর্বে ছড়ানো গান্ধারী চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ একটি নাট্যমুহূর্তের মধ্যে সংহত করেছেন ও তাকে যুগোচিত আধুনিকতায় স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছেন *'গান্ধারীর আবেদন'*-এ। *'কর্ণকুন্তী সংবাদ'* এই অনবদ্য নাট্য-কাব্যটির আখ্যান তিনি নিয়েছেন *'মহাভারত'*-এর উদ্যোগ পর্ব (১৪৫-১৪৬ অধ্যায়) থেকে। বলা বাহুল্য, কর্ণ বা কুন্তী কোন চরিত্রকেই তিনি মূলানুগ করে আঁকেননি। ধ্রুপদী-সাহিত্যে চরিত্রগুলি ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে এনে দিয়েছেন অন্তর্দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত ; পরিস্থিতি ও চরিত্রের ব্যাখ্যায় তিনি তাদের *'মহাভারত'*-এর সরল পৃথিবী থেকে সরিয়ে এনে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। সিস্টিন চ্যাপেলের বিশ্ববিমোহী ফ্রেস্কোমালায় মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ওল্ড টেস্টামেন্টকেই যেন রূপময় করে তুলেছিলেন। কিন্তু চরিত্রগুলির পেশল ভঙ্গিমা ও পরিস্থিতির উপস্থাপনা লক্ষ করলে দেখা যায়, সম্পূর্ণ আবহটিতে রেনেসাঁসের শিল্পী এনে দিয়েছেন যুগোচিত যন্ত্রণা ও তীব্রতার অভূতপূর্ব অভিব্যক্তি। *'আদমের জন্ম'* ছবিতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্রের অবস্থান মুহূর্তটি অ্যাঞ্জেলো বৈদ্যুতিক অভিভবে আপূর্ণ করে যে ভাবে রচনা করেছেন, বাইবেলে তার খোঁজ পাওয়া যাবে না। প্রাক্তনকে আশ্রয় করলেও তাকে যুগোচিত স্বাতন্ত্র্যে নতুন করে ব্যাখ্যা করা ও সাজিয়ে নেওয়ার কাজ রেনেসাঁসে পূর্ণমাত্রায় চলেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সেই সূচনাযুগেই দেখা যায় একই ছবি বিভিন্ন জন এঁকেছেন বিভিন্ন ভাবে। *'লাস্ট সাপার'* ছবিটি লিওনার্দো, অ্যাঞ্জেলো উভয়েই এঁকেছেন, কিন্তু কত

তফাৎ উভয় ছবির কম্পোজিশন ও পরিস্থিতির ব্যাখ্যায়। রবীন্দ্রনাথে অবলম্বিত প্রাচীন 'যেমন আছ তেমনি এসো' রূপে যে আসেনি, তার ব্যাখ্যা আছে রেনেসাঁসে সূচিত ব্যক্তি-ভাবনার অনন্যতার মধ্যে। তাই 'রামায়ণ মহাভারত ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষে সমালোচককে লিখতে হয়—

"রবীন্দ্র সাহিত্যে অনুসরণ যতটুকু, স্বীকরণ ও নবায়ন তার চেয়েও অনেক বেশী।"[৪১]

কালিদাস

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের অখিল কাব্যসংসারে রবীন্দ্রনাথ গেছেন অনেকটা দূরের অতিথি হিসাবে ; সংস্কৃত সাহিত্যের ভুবনে যিনি ছিলেন তাঁর আত্মার আত্মীয়, তাঁর নাম কালিদাস। ইতালীয় রেনেসাঁসে দান্তে যেমন ভার্জিলের হাত ধরেছিলেন, বঙ্গীয় রেনেসাঁসে রবীন্দ্রনাথ তেমনি ধরেছেন কালিদাসের হাত।

> "As Dante looked across the centuries and hailed Virgil as master......so Rabindranath turned back to Kalidasa."[৪২]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান।"[৪৩]

কালিদাসের *'মেঘদূত'* কবির চোখে কি রূপে ধরা দিয়েছিল তার পরিচয় আছে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে ও কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতৃষ্ণা ধাবিত হয়েছিল কালিদাস কল্পিত সৌন্দর্যলোকের দিকে।

> "দূরে বহুদূরে
> স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
> খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদী পারে
> মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে
> মুখে তার লোধ্র রেণু, লীলাপদ্ম হাতে,"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ভাবনা যেমন *'মেঘদূত'*-এর দ্বারা প্রাণিত হয়েছিল, তাঁর প্রেমভাবনা তেমনি অনুপ্রাণিত হয়েছিল *'কুমারসম্ভব'* *'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'*-এর দ্বারা। *'চিত্রা'* কাব্যে সদ্য স্নানোত্তীর্ণা, অনাবৃতা বিজয়িনীর পায়ের কাছে মদন নামিয়ে রাখে তার পুষ্পধনু।

> ".........পরক্ষণে ভূমি-'পরে
> জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে,
> নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
> সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপাচার
> তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
> চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"[৪৫]

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য যে কামনার দ্বারা অপবিত্র হতে পারে না, তা যে অপাপবিদ্ধ—এ অনুভব কালিদাসের *'কুমারসম্ভব'*-এ ছিল। ইতালীয় রেনেসাঁসে *'ভেনাসের জন্ম'* খ্যাত বতিচেল্লি থেকে জর্জিনো অনেকেই এ ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

প্রেম-চেতনার মতো প্রকৃতি-চেতনার দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কালিদাসের অনুগামী। প্রকৃতির সঙ্গে একই লয়ে মেলানো-মেশানো জীবনের গল্প কালিদাস আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন কাব্যে। *'শিক্ষা'* গ্রন্থে কবি 'তপোবন' প্রবন্ধে বলেছেন,

> "ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে।.........কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে।"[৪৬]

প্রকৃতির পরিবর্তমান ঋতু-সৌন্দর্যকে কাল্দিাস বিভিন্ন কাব্যে বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব দিয়ে রূপায়িত করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়,

> "In Meghaduta he describes the rainy season, in Sakuntala the summer, in Vikramorbasi the winter, again in Kumarsambhaba the untimely spring, in Malavikagnimitra the spring in royal garden and in Raghuvansa almost all the seasons....But the germs of all these magnificient descriptions are to be found in the Ritusamhara."[৪৭]

'চৈতালি' কাব্যের 'ঋতুসংহার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে বন্দনা করেছেন ষড়ঋতুর অধিরাজ হিসাবে। কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথও ষড় ঋতুর কবি। বিভিন্ন গীতি-আলেখ্যের মধ্যে দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন ঋতু-বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য। তাঁর *'নটরাজ'* (ঋতু-রঙ্গশালা) গীতি-আলেখ্যতে আছে ছয় ঋতুর পৃথক পৃথক বৈভব। প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেখেছেন কালিদাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন,

> "বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না ; সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়।"[৪৮]

মানুষ ও প্রকৃতির এই পরস্পর-সাপেক্ষ জীবনের বন্দনা ইতালীয় রেনেসাঁসের চিত্রকলাতেও মেলে। সেখানে বতিচেল্লির ভেনাস সমুদ্র থেকে উঠে আসে, লিওনার্দোর *'ভার্জিন অব দ্য রক'* পার্বত্য প্রতিবেশে বসে আদর করে সনাতন খ্রীষ্টীয় শিশুটিকে, জর্জিনোর *'স্লিপিং ভেনাস'* তার অনাবৃত সৌন্দর্য নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে প্রকৃতির অদিগন্ত পটভূমিতে। রবীন্দ্রনাথ

কালিদাসের প্রকৃতি চেতনাকেই যেন বিস্তীর্ণ করে এঁকেছেন তাঁর অজস্র গানে ও কবিতায়। সেখানে আছে নিদাঘ-বন্দনা ও 'বর্ষা-মঙ্গল' ; 'এসেছে শরৎ' ও 'হায় হেমন্ত লক্ষ্মী' ; 'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে' ও 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'।

আসলে সমানধর্মা কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মুকুরে দেখেছিলেন নিজেরই অতিমার্জিত মুখ। একজন সমালোচক তাই বলেছেন,

> "বহুকাল পরে বাংলা কবিতায় কালিদাস আবার নতুন করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, শত মল্লিনাথেও এতকাল যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তাহা একজন কবির দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। মেঘদূতের কবি-স্বর্গকে বাঙালী আজ যেমন করিয়া জয় করিয়া লইতে পারিয়াছে, তেমনি করিয়া আর কেহ কখনও করিতে পারে নাই।.........তাই আজিকার দিনে কালিদাস শুধু বাঁচিয়া আছেন বলাই যথেষ্ট নয়, বলিতে হইবে—কালিদাসের পুনর্জন্ম হইয়াছে।" [৪৯]

অন্যান্য সংস্কৃত কবি

কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে স্বীকার করেছেন, সেভাবে আর কাউকে নয়। কিন্তু অন্যান্য সংস্কৃত-কবির কাব্যও তাঁর অনুরাগমিশ্রিত শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। সম্ভবপর ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের প্রেরণাও মেনেছেন। ভবভূতি, বাণভট্ট, মাঘ, বিশাখ দত্ত ; *'অমরুশতক'*, বিহ্লনের *'চৌর-পঞ্চাশিকা'*, জয়দেবের *'গীতগোবিন্দ'*—এদের উল্লেখ, অনুবাদ ও প্রভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যে অসুলভ নয়। ভবভূতি প্রেমতাপস। প্রেমের মূলে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক বিদ্যমান—'পুরানো বা জন্মান্তর নিবিড়বন্ধঃ পরিচয়ঃ।' (উঃ চঃ ৫।১৬।১৬) রবীন্দ্রনাথের কবিমানসেও এ-প্রত্যয়ের পরিচয় আছে—

> "তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
> শতরূপে শত বার
> জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।" [৫০]

রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন আর একজন সংস্কৃত কবি। তিনি *'কাদম্বরী'* রচয়িতা বাণভট্ট। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে—

> "সমস্ত কাদম্বরীকাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে ; বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন ; এজন্য তাঁহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘনসংলগ্ন, ধারাবাহিক তাহা নহে, এক-একটি ছবির চারিদিকে প্রচুর কারুকার্য বিশিষ্ট বহু বিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া। ফ্রেম-সমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য-আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগা।" [৫১]

নারী-সৌন্দর্যের নিষ্কলুষ রূপ-কল্পনা বাণভট্টে ছিল। অচ্ছোদ সরোবরে রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় তপস্যারতা মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। শিবোপাসনারতা বা স্নানার্থিনী মহাশ্বেতার ছবি রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা জায়গায় ছায়া বিস্তার করেছে। *'চিত্রা'* কাব্যের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় আছে—

"............মহারণ্যে যেথা
বীণা হস্তে লয়ে তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তর-বেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা সিঞ্চিত ;"[৫২]

*'চিত্রা'*র 'বিজয়িনী' কবিতায় আছে সংযম-সংহত নারী-সৌন্দর্যের অপরূপ বাসন্তিক বর্ণনা। ইতালীয় রেনেসাঁসের শিল্পীরা ঐন্দ্রিয়িক ও অপাপবিদ্ধ নারী-সৌন্দর্যের বিশ্ববিমোহী উৎসব রচনা করে গেছেন তাঁদের রঙ তুলি দিয়ে। জোত্তো, বতিচেল্লি, রাফায়েল, লিওনার্দো, করেরিজ্জো, বেলিনি, জর্জিনো, টিশিয়ান প্রমুখ চিত্রকরদের তুলিতে শত শত ভার্জিন, ভেনাস, মিউজ্, ম্যাডোনা বিচ্ছুরিত করেছে তাদের সৌন্দর্য-গরিমা। শিল্পরসিকের বিচারে বতিচেল্লির *'ভেনাস'*, বা জর্জিনোর *'নিদ্রারতা ভেনাস'* তাদের সমূহ নগ্নতা নিয়েও পাপপুণ্যের অতীত সৌন্দর্যের অধিকারিণী। রবীন্দ্রনাথ যখন *'কাদম্বরী'*র মহাশ্বেতার প্রেরণায় এবং তার সঙ্গে আপন সৌন্দর্যচেতনা যুক্ত করে 'বিজয়িনী'র পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়ে তোলেন, তখন রেনেসাঁসের সৌন্দর্য চেতনাটিকেই ফিরে পাওয়া যায়।

"সোপানে-সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী—
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে ; তারি শিখরে-শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র ললাটে, অধরে,
উরু'পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।"[৫৩]

*'জীবনস্মৃতি'*তে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন হেবর্লিন সংকলিত *'পুরাতন সংস্কৃত কাব্য-সংগ্রহ'* গ্রন্থে তিনি *'অমরু শতক'*-এর 'মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর' শ্লোকগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শুধু ছন্দের হিল্লোল নয়, তার নায়িকা পরিকল্পনা যে রবীন্দ্রনাথের মনে ছায়া বিস্তার করেছিল তা তাঁর *'মহুয়া'* কাব্যের 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছ পড়লে আন্দাজ করা যায়।

জয়দেবের ছন্দই আকর্ষণ করেছিল বেশি। *'ছন্দ'* গ্রন্থে তিনি বারংবার *'গীতগোবিন্দ'*-এর ছন্দকে স্মরণ করেছেন।

> "আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমাল গাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশী কিছুই নয় ; খবরটা একবারের বেশী দুবার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। কবি বরাবরের মতো বলতে থাকলেন—মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। কবিমনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।"[৫৪]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাকালে সংস্কৃত-চর্চা মূলত নিবদ্ধ ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও শাস্ত্রিক অনুবাদ কর্মের মধ্যে। ক্রমশ বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সৃজনশীল প্রতিভার সৌজন্যে সেই সংস্কৃত-চর্চা তীব্র গতিশীল নদীর আকার নেয়। রবীন্দ্রনাথে এসে সেই বহুধারাযুক্ত সংস্কৃত-চর্চার নদী যেন সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও আকার গ্রহণ করে। সংস্কৃত সাহিত্যের এমন শিখর নেই যেখান থেকে রবীন্দ্র প্রতিভার মহাসমুদ্রে নেমে আসেনি জীবনরসের সঞ্জীবনী ধারা। প্রাচীন সংস্কৃতির এমন সুপরিব্যাপ্ত ও সৃজনময় নবায়ন ইতালীয় রেনেসাঁসেও অদৃষ্ট ছিল।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি

উনিশ শতকে বাঙালী লিপ্ত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের অনুসন্ধানে। জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার জন্য তাদের এই অতীত প্রয়াণ প্রথম দিকে সংস্কৃত ভাষাশ্রিত বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাস-ভবভূতির দিকে নিবদ্ধ থাকলেও, ক্রমশ এ-সত্য তাদের গোচরে আসে যে, বাঙালী-সভ্যতার বুনিয়াদ হিন্দু-স্তরের দু'হাত নীচেই বৌদ্ধ-স্তর বিদ্যমান।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি এদিকে পড়েনি। বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ এসেছিল একটু ঘুরপথে। উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত *'এশিয়াটিক সোসাইটি'* (১৭৮৪) বাংলার নবজাগরণে সে ধরনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে না পারলেও প্রাচীন শাস্ত্র ও পুঁথি উদ্ধারের যে কর্মসূচি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সেই পথ ধরে এসেছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার নিষ্ঠাবান কর্মী ও পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)। বলতে গেলে রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ছিলেন বাংলায় বৌদ্ধ-চর্চার অগ্রণী পথিকৃৎ। তাঁর ভূমিকা ছিল (রেনেসাঁসের আদি অর্থে) হিউম্যানিস্ট সুলভ। রবীন্দ্রনাথ জীবনবাদী শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি জ্ঞাপন করেছিলেন তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অর্ঘ্য। সুকুমার সেন বলেছেন,

> "বৌদ্ধ সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলতে যদি কেউ থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো রাজেন্দ্রলাল-দীক্ষিত শিষ্য বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে ভালো গবেষণা করেছেন জানি। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সাহিত্যরস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেননি, না এদেশে, না বিদেশে।"[৫৫]

সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় লিখেছিলেন,

"বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মহা-আবরণ—
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে, এ-ভারতে তোমার স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।"[৫৬]

বুদ্ধ-গয়ায় মন্দির দর্শনে কবির মনে যে ভাব জেগেছিল তাও এ-প্রসঙ্গে উদ্ধারের যোগ্য—

"যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল, তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাইনি, সমস্ত শরীর-মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্য প্রভাব অনুভব করিনি?"[৫৭]

পেত্রার্কা তাঁর *'লেটার্স টু দ্য এনসিয়েন্ট ডেড'* এ লিভির যুগে জন্মগ্রহণ না করতে পারার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন প্রায় এই রকমই ভাষায়।

বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন 'শ্রেষ্ঠ মানব'-এর মর্যাদা। বুদ্ধের সময় ভারত-সভ্যতার যে ব্যাপ্তি ও বিচ্ছুরণ ঘটেছিল সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও মনোভাব ধরা পড়েছে তাঁর একটি ভাষণে—

"ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে.........তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে, সকল কালের জন্যে।"[৫৮]

বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান বিশিষ্টতা এই যে মানবতার ঐশ্বর্যকে সে উদ্বোধিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ *'জাভা-যাত্রীর পত্র'*-এ লিখেছেন—

"সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্‌বোধিত করেছিল—স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে, তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে, দ্বীপে-দ্বীপান্তরে, দুর্গমস্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে, নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানব চিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ-সে মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।"[৫৯]

রবীন্দ্রনাথ একটি নিবন্ধে লিখেছেন—

"একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, চীন-জাপান-ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ-তিব্বত-মঙ্গোলিয়া—এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল।"[৬০]

এই জয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসারিত বৌদ্ধ-ভারতের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এশিয়ার দেশে-দেশে। তিনি গেছেন চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ,

সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ। সেই সম্পর্কের পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চীনে গেছেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

"My friends in China,

The truth that we received when your pilgrims came to us in India and ours to you—that is not lost even now. What a great pilgrimage was that! What a great time in history ! It is our duty today to revive the heroic spirit of the pilgrimage following the ancient path..........reaching the spiritual home where man is in bonds of love and co-operation.........."[৬১]

জাপানে গিয়ে কবি দেখেছিলেন তাদের জীবন সাধনায় শক্তি ও সৌন্দর্যবোধের ঐকান্তিক মিলন। বৌদ্ধধর্মের প্রসাদেই তাঁরা পেয়েছে সংযম ও সৌন্দর্যবোধ। তিনি লিখেছেন,

> "শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল।"[৬২]

কবি চীনের উদ্দেশে যা লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, যবদ্বীপের উদ্দেশে 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতায় তাকে প্রকাশ করেছেন কাব্যিক ব্যঞ্জনায়। শ্যামদেশে গিয়েও তিনি দেখতে পেলেন বৌদ্ধ-সংস্কৃতির সজীব মূর্তি। সে কথা লিখেছেন 'সিয়াম' কবিতায়।

'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি' গ্রন্থে সুধাংশুবিমল বড়ুয়া লিখেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত দেশসমূহ পরিভ্রমণ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। একদা বুদ্ধদেব মৈত্রীর বাণীতে সমগ্র এশিয়া খণ্ডকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এশিয়া-পরিক্রমার মূলেও ছিল এই মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শকে জয়যুক্ত করার সাধনা। আর এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের সার্থক উত্তরসাধক।"[৬৩]

বোরোবুদুরের শিল্পনিকেতনের সৌন্দর্য সম্ভারের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের জীবন্ত প্রাণের স্পন্দনে সৃষ্ট অবিনশ্বর কীর্তির আবেষ্টনের মধ্যে দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথকে দেখে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাষায়—

> "ভারতের প্রাচীন প্রতিভার লীলাক্ষেত্রে এসেছেন ভারতের আধুনিক যুগের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, প্রাণরসের উৎসের সন্ধানে ;—এ দৃশ্য অপূর্ব ;.............বোরোবুদুর—রবীন্দ্রনাথ ; ভারতের শাশ্বত চিন্তা আর কল্পনাশক্তির দুইটি বিরাট প্রকাশ—একদিকে ভাস্কর্যমণ্ডিত সৌধে, অন্যদিকে অলৌকিক কবি-প্রতিভায়।"[৬৪]

রেনেসাঁসের সূত্র সন্ধান

বৌদ্ধ-সংস্কৃতির প্রাচীন উৎস থেকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন বহুতর আদর্শ ও শিক্ষা। তার মধ্যে ছিল রেনেসাঁসের বেশ কয়েকটি মূলসূত্র। মানবতাবাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে অবতার বা দেবতা হিসাবে নয়, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' হিসাবে।

> "ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন।..........মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।" [৬৫]

দ্বিতীয়ত, রেনেসাঁসে যে-মানুষের কথা বলা হয়েছিল তার জোর পড়েছিল দু'দিকে ঃ এক হচ্ছে, 'Self Cultivation' আত্মসংস্কৃতি ; দুই হচ্ছে, 'Vita Activa' বহু মানুষের জন্য ব্যক্তি মানুষের প্রসারিত কর্মময় জীবন। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মধ্যে পেয়েছিলেন, আত্মসংস্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিত্বের কর্ষণ আর বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পেলেন সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর জীবনাদর্শের পরাকাষ্ঠা। করুণা ও মৈত্রীর যে বাণী বুদ্ধদেব তাঁর জীবনে ফলিয়ে তুলেছিলেন, তার প্রসারিত মহত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন এইরকম—

> "মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণ শক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশনুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভী মাতার পূর্ণ-স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থ প্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য।" [৬৬]

তৃতীয়ত, রেনেসাঁস মুখ্যত সৌন্দর্যের উপাসক। ইতালীয় রেনেসাঁসের চিত্রকলার কথা মনে রাখলে এ-সত্য অনস্বীকার্য মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরে উদ্বুদ্ধ করেছে সংযম ও সৌন্দর্যচেতনা। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ-সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন।

চতুর্থত, রেনেসাঁসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জ্ঞানের উচ্চ মর্যাদা। রবীন্দ্রনাথের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিরূপ ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগেই দেখা গিয়েছিল তিনি লক্ষ করেছেন—

> "নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশ-বিদেশ সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা।" [৬৭]

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রম বা বিশ্বভারতীর মূলে শুধু প্রাচীন ভারতের

তপোবনের প্রেরণাই ছিল না, সত্যকারের ইতিহাসের প্রেরণাও ছিল। সে-ইতিহাস বৌদ্ধযুগের ইতিহাস। একজন বলেছেন—

> "আধুনিক বিশ্বভারতীর মধ্যে প্রাচীন নালন্দাই যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বভারতীর জ্ঞানের অন্নসত্রও আজ দেশ-বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য উন্মুক্ত।" ৬৮

একথা বিশেষ ও সাধারণ দুই অর্থেই সত্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা নববর্ষের (১৩৪৪) দিন চীনের অধ্যাপক তান য়ুনশান ও রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক উদ্যোগে বিশ্বভারতীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'চীন ভবন'। সেদিন বৌদ্ধ-সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক গৌরবময় অধ্যায়। বৌদ্ধ ভাবধারার দ্বারা বিশ্বভারতী কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে, তা তাঁর অন্য একটি উক্তি থেকেও স্পষ্ট হয়।

> "আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগালিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়-ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, একথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্য-সাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্য-সাধনার ক্ষেত্রকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার।" ৬৯

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৌদ্ধ-কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "এক সময়ে যখন আমি বৌদ্ধ-কাহিনী এবং ঐতিহাসিক-কাহিনীগুলি জানলুম, তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মনের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ '*কথা ও কাহিনী*'র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।" ৭০

বস্তুতপক্ষে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় '*সংস্কৃত অবদান সাহিত্য*' (১৮৮২) প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ এর অন্তর্গত বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বন করে ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বহু আখ্যান কবিতা ও নাটক রচনা করেন। একজন যথার্থই বলেছেন, 'আমাদের দেশে বৌদ্ধ কাহিনীর জনপ্রিয়তার মূলে রবীন্দ্রনাথের দান সর্বাপেক্ষা বেশি।' বৌদ্ধ উৎস থেকে আহৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটকগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে—

'অভিসার'—কবিতা (*কথা*) : '*অবদান-কল্পলতা*' (ক্ষেমেন্দ্র ব্যাস রচিত) বা 'দিব্যাবদান' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'—কবিতা (*কথা*)	:	*'অবদান-শতক'* থেকে গৃহীত।
'মস্তক-বিক্রয়'—কবিতা (*কথা*)	:	*'মহাবস্তু-অবদান'* থেকে সংগৃহীত।
'পূজারিনী'—কবিতা (*কথা*)	:	*'অবদান-শতক'* থেকে নেওয়া। 'পূজারিনী'রই নাট্য-সংস্করণ *'নটীর পূজা'* (১৯২৬)।
'পরিশোধ'—কবিতা (*কথা*)	:	*'মহাবস্তু-অবদান'*-এর অন্তর্গত 'শ্যামাজাতক' -এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। পরে রবীন্দ্রনাথ এটিকে *'শ্যামা'* নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করেন (১৯৩৯)।
'সামান্য ক্ষতি'—কবিতা (*কথা*)	:	*'দিব্যাবদান-মালা'*র ছত্রিশ সংখ্যক অবদান-এর একটি উপকাহিনী শ্যামাবতীর কাহিনী থেকে আহৃত।
'মূল্যপ্রাপ্তি'—কবিতা (*কথা*)	:	উৎস *'অবদান-শতক'*-এর প্রথম বর্গের সাত সংখ্যক আখ্যান।
'নগরলক্ষ্মী'—কবিতা (*কথা*)	:	এর মূল *'কল্পদ্রুমাবদান'*-এর সুপ্রিয়ার কাহিনী।
'মালিনী'—নাট্যকাব্য (১৮৯৬)	:	*'মহাবস্তু-অবদান'*-এর 'মালিন্যা-বস্তু' থেকে এসেছে এর উপাদান।
'রাজা'—নাটক (১৯১০)	:	এ নাটকের আখ্যানভাগ *'মহাবস্তু-অবদান'*-এর অন্তর্গত 'কুশ-জাতক'-এর কাহিনী থেকে গৃহীত।
'অচলায়তন'—নাটক (১৯১২)	:	এর উৎসমূলে রয়েছে *'দিব্যাবদান-মালা'*র অন্তর্গত পঞ্চকের কাহিনী।
'চণ্ডালিকা'—নাটিকা (১৯৩৩) কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নৃত্যনাট্য (১৯৩৮)	:	*'দিব্যাবদান-মালা'*র অন্তর্গত 'শার্দুলকর্ণ-অবদান'

এক অসাধারণ প্রজ্ঞার আলোকে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধযুগের মানবিক মর্মসত্যটিকে তাঁর এই সব কবিতা ও নাটকের মধ্যে নতুন করে সঞ্জীবিত করেছেন যেন। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ-আখ্যান মূলক নাটকগুলির মধ্যে *'মালিনী'*, *'নটীর পূজা'* ও *'চণ্ডালিকা'* প্রধান। এই তিনটি নাটকেই তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারনিষ্ঠা ও সংকীর্ণতার পাশে বৌদ্ধ ধর্মের মানবিক আদর্শকেই জয়ী করেছেন।

বহুক্ষেত্রেই তিনি উৎসের আক্ষরিক অনুসরণ করেননি। তার সঙ্গে নিজের কল্পনা ও ভাবনাচিন্তার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে মূলকাহিনী থেকে রচিত-কাহিনী রূপান্তরিত হয়ে

গেছে। রেনেসাঁসের (ইতালি) পুরাণাশ্রিত চিত্রকর্মগুলির মধ্যে এই 'রি-ক্রিয়েশন'-এর সূত্র ক্রিয়াশীল ছিল। এতে মূল কাহিনী বিকৃত হয়নি, হয়েছে নবায়িত।

'পূজারিনী'তে শ্রীমতী বুদ্ধস্তূপের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাতে এগিয়ে চলেছে রাজার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে। সকলের শঙ্কা ও আপন প্রাণের মায়া পেরিয়ে সে স্তূপপদমূলের গহন আঁধারে সারি সারি প্রদীপ জ্বেলে দেয়। মুক্ত-কৃপাণ পুররক্ষক ছুটে আসে। নির্ভীক প্রণামের রক্তে রঞ্জিত হয় শুভ্র পাষাণ ফলক।

"সে দিন শুভ্র পাষাণ ফলকে
পড়িল রক্ত লিখা
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।"[৭১]

'মূল্যপ্রাপ্তি কবিতায় সুদাস মালীর দেখা বুদ্ধ এই রকম—

"বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মুরতি
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি।"[৭২]

বুদ্ধের যে মূর্তি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, তার সৌন্দর্য যে কোনো ইতালীয় রেনেসাঁসের ভাস্কর ও চিত্রকর অঙ্কিত খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়।

'পরিশোধ' কবিতায় (যা পরবর্তী কালে *'শ্যামা'* নৃত্যনাট্যে পরিবর্ধিত হয়েছিল) সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা শ্যামা বজ্রসেনের রূপদর্শনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। চুরি অপবাদের দায়ে ধৃত বজ্রসেনকে কারাগার ও মৃত্যুদণ্ড থেকে সে উদ্ধার করে, তার প্রতি একান্তভাবে প্রণয়াসক্ত উত্তীয় নামে এক যুবকের প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে। মিলনকালে শ্যামার মুখে বজ্রসেন শোনে সে-কাহিনী। বিবেক ও ভালোবাসার পরস্পরস্পর্ধী ঢেউ তাদের দুজনকে একবার কাছে টানে, একবার দূরে ঠেলে। *'মহাবস্তু-অবদান'*-এর এই বৌদ্ধ কাহিনীটিকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ও চিত্তাকর্ষক শিল্পরূপ দান করেছেন।

রামমোহন জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রাচীন প্রমাণ সন্ধান করতে নেমে পৌঁছেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়াচার্য বিরচিত *'বজ্রসূচী'*তে। তিনি *'বজ্রসূচী'*র প্রথম অধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন। তার বেশি কিছু করণীয় ছিল না তাঁর। রবীন্দ্রনাথ শুধু হিউম্যানিস্ট নন, তিনি শিল্পী। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্যকে তিনি *'দিব্যাবদান মালা'*র বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করে *'চণ্ডালিকা'*য় ছন্দিত ও পুষ্পিত করে তুললেন। আনন্দ একদিন বৌদ্ধ বিহারে ফেরবার পথে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির হাতে জলপান করে তৃষ্ণা দূর করলেন। একে চণ্ডালকন্যা অভিহিত করে 'নূতন জন্মের পালা' হিসাবে। প্রকৃতি নতুন করে আবিষ্কার করেছে, উপলব্ধি করেছে মানবাত্মার মর্যাদা। মায়ের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে সে বলে,

"আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এতে বড়ো আশ্চর্যকথা।"[৭৩]

নারীর ক্ষুধার্ত প্রেম প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়ল আনন্দের পায়ে।

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ পুরাণাশ্রিত কবিতা ও নাটকের মধ্যে দিয়ে যেমন পুনর্জীবিত করেছেন, বৌদ্ধ-ভাবধারা ও ইতিহাস, তেমনি এর মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগের ঔচিত্যপূর্ণ জীবন সত্যগুলিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের কবিতাগুলি পড়তে-পড়তে সেকালের একটি ভৌগোলিক-চিত্রও আমাদের মানসপটে জেগে ওঠে। শ্রাবস্তীর গগন-লগ্ন প্রাসাদ ও অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠির জেতবন-বিহার, গৃধ্রকূট-পর্বতের পাদদেশে বিম্বিসারের প্রাসাদ-কাননের স্তূপ, বরুণার তীরে ব্রহ্মদত্তের রাজধানী বারাণসী, মথুরাপুরীর হর্ম্যরাজি যেন আবার নতুন করে দেখতে পাই। আর সর্বোপরি দেখতে পাই বুদ্ধের কল্যাণ-সুন্দর দীপ্তি। ত্যাগে-প্রেমে-সেবায়-ক্ষমায়-ভক্তিতে সে যুগের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে, তা যেন ভগবান বুদ্ধের দীপ্তি থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি।

'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে এক 'পথ-খেপা' শোভনলাল বেরিয়েছিল আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে ; কেননা ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন-সাঙের তীর্থযাত্রা। এবার ইচ্ছা হয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথায় গেছে সেইটে দেখার।

"পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ওই পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানব বিধাতার নিজের লেখা।"[৭৪]

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা হাতে লেখা পুঁথির মধ্যে পথ খুঁজেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বের হয়েছিলেন পথের পুঁথি পড়তে যা মানব বিধাতার নিজের হাতে লেখা।

পুরাতনের স্মরণ ও উদ্ধার সব সময়ই ছিল এবং আছে, কিন্তু তাকেই আমরা বলব রেনেসাঁস যেখানে পুরাতনকে আনা হয় নতুনের সপক্ষে। মুক্তি ও মানবতাবাদের বিপন্ন সত্যকে রক্ষা করার জন্য পুরাতনের অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা। রামমোহন যার সূচনা করেছিলেন বেদান্তের অনুবাদ করে, রবীন্দ্রনাথ প্রসারিত ঔদার্যে ও শৈল্পিক সুষমায় সেই সত্যটিকেই নানাভাবে পল্লবিত ও পুষ্পিত করে তুলেছিলেন —বেদ উপনিষদের দিগন্ত থেকে তিনি একই উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিলেন বৌদ্ধ ভারতে।

সামঞ্জস্যের অধিরাজ

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্য সাধনের ইতিহাস।"[৭৫]

ইতালীয় রেনেসাঁসে চলেছিল প্যাগান জীবনবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় পবিত্রতাবাদের সংশ্লেষণের কাজ। রেনেসাঁসের 'fullest man' হিসাবে প্রকথিত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি পর্যবেক্ষণশীল বিজ্ঞানদৃষ্টির সঙ্গে আশ্চর্য সমন্বয়ে এনে মিলিয়েছিলেন বিশ্বরহস্যের অপার সৌন্দর্য-সুষমাকে। মনন এবং সৃজনের এমন সেতু আগে কখনো বাঁধা হয়নি। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শতবর্ষব্যাপী ইতিহাসের ধারা-পথে যতরকম ইতিবাচক ও বিপরীত উপাদান অঙ্কুরিত হয়েছিল, সেগুলির সামঞ্জস্য-সংঘটনের দুরূহ সাধনায় আজীবন ব্রতী ও প্রায়-সফল একটি উত্তুঙ্গ ব্যক্তিপ্রতিভার নাম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে বলা যেতে পারে সামঞ্জস্যের অধিরাজ। একদিকে চওড়া হয়ে যাওয়া কোনো জ্যামিতিক মানুষ তিনি নন, ধনুকের দুই বিপরীত প্রান্তকে টেনে বাঁধা ছিলার মতো জ্যা-বদ্ধ অব্যর্থ ভূমিকা তাঁর। কতরকম বিপরীতকে যে তিনি টেনে বেঁধেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। যে সব বিপরীত ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ কর্তব্য পালন করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের স্বর্ণশতদল এখন আসব সেই প্রাসঙ্গিক আলোচনায়।

ক. আধ্যাত্মিকতা ও সেকুলার জীবনবাদ

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে বিশ্বাস-নিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার যেমন একটি ধারা ছিল, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবাদের একটি ধারাও ছিল। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ভাষ্যকারদের অনেকে মনে করেন, রেনেসাঁসে বিশ্বাসনিষ্ঠ অধ্যাত্মিকতার কোনো স্থান নেই। ইওরোপে নাকি রেনেসাঁসের বিকাশ ঘটেছিল ধর্মকে বাদ দিয়ে। এ ধারণাটি ভিত্তিহীন। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও আর্টিস্টরা প্রায় সকলেই ছিলেন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী। 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' নামে খ্যাত এরাজমুস বলেছিলেন,

> "All studies, Philosophy, Rhetoric are followed for this one object, that we may know Christ and honour Him. This is the end of all learning and eloquence."[১৬]

পড়ে মনে হয় রবীন্দ্ররচিত গীতাঞ্জলির খ্রীষ্টীয় অনুবাদ পড়ছি। আসলে ইতালীয় রেনেসাঁসে আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও প্যাগান জীবনবাদ সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। ফলে দেখা যায়, লরেঞ্জো ভাল্লা (যিনি এক সময় পোপের সেক্রেটারি হয়েছিলেন) 'ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট' হিসাবে খ্যাত হলেও বলতেন, 'যুক্তি নয়, বিশ্বাসের জোরে আমাদের থাকা।' অন্যদিকে সম্ভোগবাদী জীবনের সপক্ষে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাব 'অন প্লেজার'। টিশিয়ান খ্রীষ্টীয় অলৌকিকতার ধর্মীয় ছবি এবং সৌন্দর্য-চুম্বিত নগ্ন ভেনাস—দুরকম ছবিই আঁকতেন সমান দক্ষতায়। রেনেসাঁসে সুখ ও সৌন্দর্যবাদী প্যাগান জীবন চেতনা এবং খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও শুদ্ধতাবাদের সেই নিগূঢ় মৈত্রী-সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চলেছিল।

যার ফলে সামঞ্জস্যবাদীরা বলেছেন, রেনেসাঁস হিউম্যানিজম হচ্ছে 'medieval fusion of classical wisdom with Christian faith.'[৭৬ক]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ রামমোহন। ধর্মবোধহীন অমানবিকতার চাপে সমাজ যখন মানুষকে অপমানিত করছে তখন তিনি ধর্মের শুদ্ধ দীপটিকে প্রজ্জ্বলিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিশ্বাসনিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার বৃন্তেই ধরা ছিল রামমোহনের চারিত্রিক ঐশ্বর্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে।..........কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার (*রামমোহনের*—শ. মু.) মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন।"[৭৭]

রামমোহন ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা ও বেদান্তাদির অনুবাদ করে যে বিশ্বাসনিষ্ঠ পরিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার সূচনা করেছিলেন, তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা বাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছেছিল। দেবেন্দ্রনাথ খুঁজে বেড়িয়েছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী—এই প্রশ্নের উত্তর। বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত বিশালতায় তিনি অনুভব করতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মহিমা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কাল যাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, সেই অনুভূতি তাঁর কাছে বাইরের জিনিস ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারা খচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা দান করেছেন। যিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।"[৭৮]

রামমোহনের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজে ফিরেছিল সত্যকে, সেই সত্যের আলোয় তিনি দেখেছিলেন সমাজ-সংসারকে। তাঁর কর্মক্ষেত্র মনুষ্যত্ব। আর দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের আলোয় প্রক্ষালিত করেছিলেন তাঁর আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ-হৃদয়। সমাজ-সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি তাকিয়েছিলেন নিজের অন্তরের দিকে ও বিশ্বপ্রকৃতির দিকে। সামাজিক পৃথিবীর জন্য কর্মচঞ্চলতা ও আত্মগত উপলব্ধিতে ধ্যানমগ্নতা—রেনেসাঁসের দুই অভিমন্ত্র আধ্যাত্মিক চেতনার দিক থেকে মঞ্জরিত হয়েছিল রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছেছিল এই দুয়েরই আনন্দিত উত্তরাধিকার। একত্ববাদী উপনিষদের আলোয় তিনি

মানুষ ও প্রকৃতিকে দেখেছিলেন প্রসারিততর উজ্জ্বলতায়। শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন এই দুইকে একটি পরিপূর্ণ অখণ্ডতায়।

"এই আশ্রমের মধ্যে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুই সুরধারার সংগমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত।"[৭৯]

মালিন্যমুক্ত মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সদা উদ্বিগ্ন এবং বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্যরহস্যে বিস্ময়-বিনত এক কবি রচনা করেন পরস্পরের পরিপূরক দুটি কাব্যগ্রন্থ—*'নৈবেদ্য'* ও *'গীতাঞ্জলি'*। *'গীতাঞ্জলি'*তে ধ্বনিত হয় সর্বসমর্পিত মানুষের আশ্চর্য সুন্দর বিশ্বাসের গান।

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"[৮০]

'স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে 'আত্মসমাহিত' দেবেন্দ্রনাথ এসে বসেন সপ্তপর্ণীর ছায়াতলে। কবি লেখেন,

"আকাশ তলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়াল দিক্-দিগন্তরে
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই আছি বসে,
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।"......[৮১]

যা ছিল মহর্ষির ধ্যানলব্ধ ধন তাই হয়ে উঠল কবির পরম সম্পদ—

"আমি কবি, আমি পরম সম্পদ বহন করে এনেছিলুম। কি আনন্দ ছিল, আমার সঙ্গে আমার চারিদিকের যোগে। আমার সেই ঘরের সামনে নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী, শরতের আলোতে তার পল্লবের ঝালর ঝলোমলো ; শিশির সিক্ত তৃণাগ্রগুলির পরে প্রভাত সূর্যের কিরণ বীণাতন্ত্রীতে সুরবালকের আঙুলের স্পন্দনের মতো। এই শ্যামলা ধরণী, এই নদী, প্রান্তর অরণ্যের মধ্যে আমার বিধাতা আমাকে অন্তরঙ্গতার অধিকার দিয়েছেন ; ...."[৮২]

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার নিভৃত অধিকারে বিশ্বসৌন্দর্যের বিস্ময়-রসকে কবি যে

তাঁর কবিতা ও গানের পাত্রে নিবেদন করে গেছেন, তার দীক্ষা তিনি প্রথমত পেয়েছিলেন মহর্ষির কাছ থেকেই।

অন্যদিকে রামমোহন জানিয়েছিলেন মনুষ্যত্বের জন্য সংগ্রামের আহ্বান। *'নৈবেদ্য'*তে কবি রচনা করেন চরিত্রবান মানুষের ম্যানিফেস্টো। মানুষকে এখানে বীর্যের, প্রতিবাদের, আত্মমর্যাদার দীক্ষা দেওয়া হয়েছে।

"তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে, ..."[৮৩]

কবি বলেন,

"আমারে সৃজন করি যে মহা সম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা।........"[৮৪]

বিশ্বাসনিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার আধারে লালিত আবহমান জীবন যখন অর্থহীন বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে, তখন তাকে মুক্ত করার জন্য দ্বিবিধ প্রয়াস শুরু হয়—অনাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিকতার সত্য স্বরূপটির পুনরুদ্ধার এবং ধর্মনিরপেক্ষ বলিষ্ঠ মানবতাবাদের প্রয়োগ। ইতালীয় রেনেসাঁসেও হিউম্যানিজমের দু'টি ধারা ছিল ঃ 'ক্লাসিক্যাল হিউম্যানিজম' ও 'ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিজম'। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার আদর্শে সৌন্দর্য ও সম্ভোগবাদী জীবনবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে টমাস মোরে, এরাজমুস প্রমুখ হিউম্যানিস্টরা 'ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিজম'-এর চর্চাও করেছিলেন। বঙ্গীয় রেনেসাঁসে বিশুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনার মৌল আলোকে জীবনকে পরিস্নাত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ। পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের পতাকা বহন করেছিলেন ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ সরিয়ে দিয়েছিলেন দুয়ের মধ্যবর্তী পর্দাটুকু। যদিও তিনি বিশ্বাসনিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার পথ ধরেই এসেছিলেন, তথাপি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের জয়পতাকা যাঁরা বহন করেছিলেন, তাঁদের আন্দোলনের সার-সত্যটিকে তিনি স্বীকার করেছিলেন সমুচিত শ্রদ্ধায়। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা বিশ্বাসীর। কিন্তু পরিভাষার পর্দাটুকু সরালে শোনা যায় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদেরই নির্মল কণ্ঠস্বর।

"চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার

কেবল জড়ত্বপুঞ্জ, ধর্ম প্রাণহীন

ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।

বৃথা চেষ্টা ভাই
সব সজ্জা লজ্জাভরা চিত্ত যেথা নাই।"[৮৫]

তিনি যখন বলেন,

"চিরদিন
জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত ; শৃঙ্খলবিহীন।"[৮৬]

বা লেখেন,

"করো মোরে সম্মানিত নব বীর বেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষত চিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।"[৮৭]

তখন জ্ঞানবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত, বা অজেয় পৌরুষ-সম্পন্ন বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী জীবনাদর্শের ছবিই চোখের সামনে ভাসে।

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে'র কবি 'ধর্মমোহ' নামে একটি কবিতায় লিখেছেন,

"ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না মানে মানুষের ভালো।"[৮৮]

কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয় এখানে পায়ে-পায়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন শতবর্ষ পূর্বের এক তরুণ শিক্ষক ও কবি, নাস্তিকতার দীক্ষা দেওয়ার অভিযোগে যাঁর চাকরি গিয়েছিল হিন্দু কলেজ থেকে।

বিশ্বাসনিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার আবরণ ভেদ করে 'সেকুলার' মানবতাবাদের অপাবৃত সত্যটিকে মর্মস্থ করতে না পারলে ঈশ্বরের জায়গায় মানুষকে বসিয়ে তিনি কী অনায়াসে বলতে পারতেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' বা লিখতে পারতেন, 'ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা ভালো', বা সৃষ্টি করতে পারতেন *'চতুরঙ্গ'*-এর জ্যাঠামশাই-এর মতো একটি

চরিত্র। বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত ঐশ্বর্যে যিনি একের মহিমা দেখে আশ্চর্যান্বিত হতেন, রাশিয়ায় নাস্তিকের দেশে পৌঁছেও তিনি লিখেছেন,

"রাশিযায় অবশেষে আশা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে।"[৮৯]

'সেকুলার হিউম্যানিজম'-এর বিশুদ্ধ সত্যে তিনি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এমন কথা লেখা সম্ভব হয়েছিল—

> "অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে?"[৯০]

খ. জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

ইতালীয় রেনেসাঁসে দুই হিউম্যানিস্টের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল স্বদেশ-চেতনা ও বিশ্বচেতনার দু'টি পৃথক ধারা। ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর সালুতাতি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মুখে 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে প্রায় ফ্লোরেন্সের জাতীয় পতাকায় পরিণত করে দিয়েছিলেন। অপর দিকে 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' আখ্যাত এরাজমুস সম্পর্কে বলা হয়, 'hc belonged to no nation.' তিনি বলতেন, 'শিক্ষিত মানুষের কোনো স্বদেশ নেই।' প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রেম নয়, বৈশ্বিকতার আদর্শই ছিল রেনেসাঁসের প্রধান স্তম্ভ-স্বরূপ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। ফলে এখানে সৃষ্টি হয়েছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের একটি পরিসর, অন্যদিকে দেশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার দ্বারা কবলিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তীব্র হয়ে উঠেছিল স্বাদেশিকতার অভিমান। রামমোহন থেকে মাইকেল পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আগ্রহের বাতায়ন বাইরের দিকে খোলা ছিল ; বঙ্কিমে তীব্র হয়ে ওঠে এর পাল্টা চেতনা। দেশপ্রেম তাঁর 'বন্দেমাতরম' গান ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসে উদ্ভূত বিশ্বচেতনা ও দেশচেতনার দু'টি বিপরীত ধারাকে রবীন্দ্রনাথ ভারসাম্যযুক্ত সামঞ্জস্যে কিভাবে মিলিয়েছিলেন, তা লক্ষ করার বিষয়।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা-পুরুষ রামমোহনে বৈশ্বিকতার লক্ষণ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইয়ংবেঙ্গলদের পাশ্চাত্য-প্রীতি সুবিদিত। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের তদানীন্তন বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে লেখা পাসপোর্টের জন্য আবেদনপত্রে রামমোহন লিখেছিলেন—

> ...."all mankind are one great family of which numerous nations and tribes are only various branches."[৯১]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য ও জীবন সাধনায় এই বিশ্বমানবতার বাণীকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন,

> "সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার দেশ বলে বরণ করে নিয়েছি।.........পৃথিবী থেকে যাবার আগে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন সম্বন্ধ অনুভব ও স্বীকার করে

যেতে পারলুম এইটেতেই আমি আমার জীবন সার্থক বলে জেনেছি। আমাদের বাংলদেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া উঠেছে এইটে আমাদের সকলের অনুভব করা উচিত। এইখানে রামমোহন রায় সার্বজনীন ধর্মের আলোকে জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন—সেই প্রভাতের আলোকেই বাংলাদেশের নবজাগরণের উষালোক। সেই আলোকে যে বিশ্বের সুর বেজেছে সেই সুরই আমাদের সুর—সেই সুরই মানব ইতিহাসের আসন্ন ভাবীযুগের সুর।........."[৯২]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসে আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমাবধি স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির একটি ধারা প্রবহমান ছিল। স্বাদেশিকতার এই অভিমান এমনকি বিদ্যমান ছিল অতিপাশ্চাত্যপন্থী নামে নিন্দিত ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যেও। ডিরোজিওর কবিতায় আছে আকাশ বাতাস সহ দেশকে ভালোবাসার আবেগ ঃ

"O! lovely is my land
With all its skies of cloudless light ......"[৯৩]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যা ছিল ক্ষীণতর, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর আশাভঙ্গের বেদনাজনিত কারণে তা ক্রমশ বলিষ্ঠ ধারা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ *'জীবনস্মৃতি'*তে ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া সম্পর্কে লিখেছেন,

"বেশ-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।"[৯৪]

১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ বসুর পৃষ্ঠপোষকতায় ও নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে 'হিন্দুমেলা'র সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।'[৯৫]

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে শিক্ষিত দেশবাসীর আশাভঙ্গের বেদনা ও ক্ষোভ থেকে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালীর স্বদেশাভিমান তীব্রতা অর্জন করে। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন ভাইসরয়ের কাছে 'before any leader had spoken out.'[৯৬] প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছিলেন সেদিন কবির 'কী গম্ভীর, কী স্তব্ধ মূর্তি।'[৯৭] যেমন আগ্নেয় প্রতিবাদে, তেমনি মমতাসিক্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত ধারাটিকে বাণীমূর্তি দিয়ে গেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমব্যাপ্ত এই স্বদেশ ও স্বাজাত্যাভিমানের আবেগ কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বইতে থাকে। — ১. বঙ্গপ্রীতি, ২. হিন্দুত্ব প্রীতি, ৩. পলিটিক্যাল সংগঠন। *"বঙ্গদর্শন"* পত্রিকাকে আশ্রয় করে বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতি ঝলসে উঠেছিল 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রভৃতি মননশীল রচনায়। বঙ্কিম-

পোষিত দেশপ্রেমের এই বঙ্গমুখী ধারাটি বঙ্গভঙ্গের কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে উচ্ছ্বসিত প্রকাশ লাভ করে। কবি লেখেন,

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।।"[৯৮]

বাংলার প্রতি মমতাময় দেশপ্রেমের যে আবেগ একদা উদগত হয়েছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁসে, ইতিহাসের নানা প্রক্রিয়া অতিক্রম করে অপরিম্লান সেই আবেগ থেকেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন 'বাংলাদেশ'। দেশপ্রেমের সেই অনিবার্য ধারায় রবীন্দ্রনাথ যে-ফুলগুলি উৎসর্গ করেছিলেন, তারই একটি আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয়-সঙ্গীত রূপে শোভা পাচ্ছে—

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি......' [৯৯]

২. স্বদেশ ও স্বধর্মকে একাকার করে স্বাজাত্য গৌরবের একটি ধারা উনিশ শতকের শেষার্ধে বিশেষ স্ফীত হয়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩) বিষয়ে একটি প্রস্তাব রচনা করেন। বঙ্কিম বচনা করেন প্রাচীন হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মের সবিস্ময় মহত্ব। তাঁর উপন্যাসের একটি চরিত্র ললিতগিরি দেখতে দেখতে বলে ওঠে,

"তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"[১০০]

স্বধর্ম ও স্বাজাত্য-গৌরবের এই আবেগ স্বদেশী আন্দোলনকে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করে। বঙ্কিমের *'আনন্দমঠ'*-এ এই পৌত্তলিক দেশপ্রেমের উদ্বোধন, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে এই ধারাই প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুত্বাভিমানযুক্ত এই স্বাদেশিকতার আবেগ রবীন্দ্রনাথকে গ্রাস করতে না পারলেও তাকে স্পর্শ করেছিল। 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় আছে তার সাক্ষ্য। যেখানে তিনি বলেছেন,

"এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল।"[১০১]

কিন্তু পরে তিনি পুনরুত্থানবাদীদের আওতার বাইরে চলে যান।[১০২] দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন,

"ধর্মের মিলেই যে দেশ মানুষকে মিলায়, সে দেশ হতভাগ্য।"[১০৩]

তাঁর *'গোরা'* উপন্যাস সেই মোহমুক্তির ফসল।

৩. কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক সংগঠনের একটি অধিবেশনে (১৮৮৬-দ্বিতীয় অধিবেশন) উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পরমোৎসাহে গেয়েছিলেন 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি। ক্রমশ তিনি 'রাজপুরুষ ও ভদ্রলোকে মিলে রাজগদি ভাগাভাগি করে নেওয়ার পলিটিক্সে' বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের তিনদিন ব্যাপী অধিবেশনের পর তারক পালিত প্রদত্ত এক নৈশভোজে অনুরোধের চাপে সেই রবীন্দ্রনাথই গাইলেন,

"এসেছে কি হেথা যশের কাঙালি, কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি—
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশি যাপনা
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা?
একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা. শুধু মিছে কথা ছলনা?"

'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন,

"গান শুনে সকলে স্তব্ধ। ডিনার পার্টি মাটি হয়ে গেল। মুখ বিষণ্ণ করে একে একে সবাই চলে গেলেন।"[১০৪]

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল যাঁরা, অগ্নিযুগের সেই যুবশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা যোগাননি তা নয়—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
ওনিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"[১০৫]

তথাপি নানা প্রসঙ্গে তিনি অসহিষ্ণু তারুণ্যের 'হৃদয়বিদারক প্রমাদ'-এর গৌরবের কথাও তুলে ধরেছেন। 'দেশানায়ক' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্রে। দেশে তারা দীপ জ্বালার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করলো নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো দেখিনি।"[১০৬]

বয়কটপন্থী স্বাদেশিক আন্দোলনের সমর্থন যিনি তাঁর গানে তুলে এনেছিলেন একদা—

"ওমা. গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর. মা, তোর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।"[১০৭]

তিনিই *'ঘরে বাইরে'* উপন্যাসে নিখিলেশের মুখ দিয়ে বললেন,

"আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধার জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।.........মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়া পরা চলাফেরা ভাবনাচিন্তা সমস্তই সমস্ত পৃথিবীর যোগে।"[১০৮]

উনিশ থেকে বিশ শতকের বাংলায় স্বদেশপ্রীতির নদীতে যতরকম ঢেউ উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ তার প্রত্যেকটিতেই অবগাহন করেছেন, কিন্তু কোনো স্রোতেই তিনি ভেসে যাননি। আতিশয্য ও সংকীর্ণতা কখনো তাঁকে গ্রাস করে ফেলতে পারেনি। স্বদেশচেতনা ও বিশ্বচেতনার দুই বিপরীত মেরুকে তিনি যেভাবে রেনেসাঁসোচিত মানবতাবোধের ঐকিক সামঞ্জস্য-সূত্রে মিলিয়েছিলেন, তাতে শুধু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নয়, বিশ্বসংস্কৃতির উদীয়মান সংকটেরও সমাধান সূত্র বিদ্যমান।

বাংলার প্রতি মমতামেদুর ভালোবাসার গান তিনি অনেক লিখেছেন, কিন্তু একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন—

"বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে যে মাটিতে গাছ বেড়ে উঠেছে, সেই উপরিতলের মাটি হলো বাংলা দেশের ; কিন্তু একথা জানতে হবে যে নিচেকার ভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে ; সুতরাং এ জায়গায় সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার গভীরতম নাড়ীর যোগ।"[১০৯]

হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বকে সমার্থক করে যে জাতীয়তাবাদের পত্তন হচ্ছিল, তিনি *'গোরা'*য় রচনা করলেন সেই মোহ থেকে মুক্তির মহাকাব্যিক সংগ্রাম। গোরা বলছে

"আপনি আমাকে সেই দেবতার মন্ত্র দিন.........যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"[১১০]

স্বাজাত্যবোধের উগ্র অভিমান মানসিকভাবে এক একটি জাতিকে যেমন গৌরবস্ফীত করে, তেমনি সঙ্কীর্ণও করে। অপরাপর জাতি বা ধর্ম সম্পর্কে একটি প্রত্যাখ্যানধর্মী আবেগ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। শুধু এদেশে নয়, ন্যাশানালিজমের এই আদর্শ সারা পৃথিবীতেই উৎকট রূপে দেখা দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে আদর্শগতভাবে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন—

"Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত ; সেই ভূত ঝাড়বার দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তার আয়োজন করছি। দেবতার নাম করলে তবেই অপদেবতা ভাগে, আমাদের শান্তিনিকেতনের দরজায় সেই দেবতার নাম লেখা ; আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথছি।.........যে ভারতবর্ষকে বহুকাল পৃথিবী একঘরে করে রেখেছে, সেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করবার পত্র নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম।"[১১১]

জাগৃত স্বাজাত্যবোধের নামে 'বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে নিজের ঘরে অন্ধকারকে পূজা' করার যে আয়োজন তখন মহিমান্বিত আকার নিতে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার বিরুদ্ধে। তিনি লিখেছেন,

> "বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটে-ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।........ঘরের কোণে বসে আত্মীয়-স্বজনের বৈঠকে যে অহংকার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে।"[১১২]

জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের দু'টি ধারা রবীন্দ্রনাথে এসে মিলেছে একই সূত্রে—

> "মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা. মোর সনাতন স্বদেশে।" [১১৩]

গ. হিন্দু-জাগরণ ও মুসলিম-জাগরণ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু-সমাজে যে জাগরণের সূচনা হয়েছিল বিভিন্ন কার্যকারণে বাংলার মুসলমান-সমাজ তাতে যোগ দিতে পারেনি। অন্যূন পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে বাংলার মুসলমান-সমাজ নবজীবনের দৌড় শুরু করে। ফলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান-সমাজের জাগরণ দু'টি স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

এছাড়া লক্ষ করা যায়. উনিশ শতকের বাংলায় দু'টি সমাজে যে-জাগরণ সূচিত হয়েছিল, উভয় জাগরণের মধ্যেই রেনেসাঁসের প্রগতিশীলতা ও পুনরুত্থানবাদের সূত্র-দু'টি ক্রিয়াশীল ছিল। জাগরণ যখন প্রগতিমুখী, বিচারশীল ও মানবতাবাদী তখন তার নাম রেনেসাঁস, আর জাগরণ যখন স্বধর্মের অতীত মহিমার পুনরুজ্জীবক তখন তার নাম রিভাইভ্যাল।

রামমোহন থেকে মাইকেলে প্রবাহিত হিন্দু-সমাজের জাগরণে পুনরুত্থানবাদের ধারা ছিল ক্ষীণ, বলিষ্ঠ ছিল রেনেসাঁসের প্রগতিশীলতার ধারা। উনিশ শতকের শেষার্ধে নব্য-হিন্দুত্ববাদের ধারা প্রবল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মুসলিম সমাজের জাগরণের দু'মুখেও জোতা হয়েছিল দু'টি ঘোড়া। একটি ঘোড়ার নাম ঐস্লামিক ঐতিহ্যবাদ, অপরটি আধুনিকতা। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে প্রবাহিত প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী রেনেসাঁসের যে ধারা ছিল, তা উভয় সমাজকে একই লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারত ; কিন্তু উভয় সমাজে স্ব-স্ব ধর্মের গৌরবময় পুনরুজ্জীবনের যে ধারা ছিল, তা দু'টি সমাজকে পরস্পর বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদের পথে নিয়ে যেতে ছিল বদ্ধপরিকর। প্রকৃতপক্ষে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে দু'টি সমাজের এই দ্বিসূত্রিক জাগরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জনিত কার্যকারণের দ্বারাই।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল হিন্দু-জাগরণের মধ্যে। এখন লক্ষ করাব বিষয় হল, হিন্দু জাগরণের অন্তর্কক্ষে রেনেসাঁস ও রিভাইভ্যালিজমের যে নাটক অভিনীত হচ্ছিল, তার সংকট কিভাবে তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন ও হিন্দু রিভাইভ্যালিজম ও মুসলিম বিভাইভ্যালিজমের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংকট অতিক্রম করে মুসলিম সমাজের মানবতাবাদী রেনেসাঁসের ধারাটিকে তিনি কিভাবে বরণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে আসেন তখন 'হিন্দু-মেলা'র (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। স্বাজাত্যবোধ ও স্বধর্ম-গৌরবকে একাকার করার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়া'। রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন। রামকৃষ্ণদেব চুম্বকের মতো টেনে নিচ্ছেন এমনকি র‍্যাডিক্যাল ব্রাহ্মদেরও। শশধর তর্কচূড়ামণির দল হিন্দুধর্মের আচার-বিচারেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিচ্ছেন—হিন্দুধর্মই জগতের শ্রেষ্ঠধর্ম। স্বধর্মপ্রীতির অত্যুগ্রতাবশত বঙ্কিমচন্দ্র ভবানন্দের কণ্ঠে পরধর্ম-বিদ্বেষী ডায়লগ বসিয়ে দিচ্ছেন,

> "ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে।"[১১৪]

অরবিন্দ প্রমুখ চরমপন্থী স্বদেশী আন্দোলনকারীদের হাতে গীতা, চোখে হিন্দু সুবর্ণযুগের স্বপ্ন। স্বভাবতই এই জাতীয় মানস-আবহে তিরস্কৃত হয় মুসলিম-সমাজ ও তার জাতিগত মর্যাদা। হিন্দু-রিভাইভ্যালিজমের তিরস্কার ও মুসলিম-রিভাইভ্যালিজমের সংগঠিত আবেগ থেকে জন্ম নেয় 'মুসলিম লীগ' (১৯০৬)। ইংরেজ শাসকরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। জয়ন্তী মৈত্র বলেছেন, এর ফলে 'As the Anglo-Muslim gulf was bridged, the Hindu-Muslim gulf widened.'[১১৫]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের প্রথম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কাটে এই-ধরনের পুনরুত্থানমূলক নব্য-হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে। এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেননি। হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব বদলের উদ্দেশ্যমূলক ঘটনাটিতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছিলেন, মুসলমানদের জন্য 'ইংরাজের স্তনে ক্ষীর সঞ্চার' এবং 'হিন্দুর জন্য পিত্তসঞ্চার' হয়েছে।[১১৬]

শিবাজীকে স্বাধীনতা ও জাতীয় বীরের প্রতীকরূপে কল্পনা করে মহারাষ্ট্রে যে শিবাজী উৎসবের সূচনা করেছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, তার হাওয়া এসে লাগে বাংলা দেশেও। রবীন্দ্রনাথ সেই আবেগকে একটি কবিতায় রূপায়িত করেন। সেই কবিতা 'শিবাজী উৎসব' (১৯০৪)। তাতে বলা হয়—

> "এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষত ভারত
> বেঁধে দিব আমি"

বর্গীর হাঙ্গামাকেও তিনি মোহগ্রস্ত ব্যাখ্যা দান করেন—

> "তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিল
> বঙ্গের আকাশে

সে ঘোর দুর্যোগ দিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা
লুকানু তরাসে।"[১১৭]

সময়ের ঝোড়ো হাওয়া রবীন্দ্রনাথকে স্বল্প-সময়ের জন্য হলেও গ্রস্ত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু রিভাইভ্যালিজমের এই গণ্ডী তিনি সবলে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

রিভ্যাইভ্যালিজমের ধারাবাহিক উত্থানের মধ্যে বিজাতীয় প্রণয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক আখ্যান রচনার চাপান-উতোর হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চলত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (*'অঙ্গুরীয় বিনিময়'*), বঙ্কিমচন্দ্র (*'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজসিংহ'*) এঁকেছেন হিন্দু-নায়ক ও মুসলিম-নায়িকার প্রণয় কাহিনী ; আর মুসলিম-লেখকরা লিখতেন মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকার প্রণয়ের গল্প (স্মরণীয় কায়কোবাদের *'অশ্রুমালা'*, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর *'রায়নন্দিনী'* প্রভৃতি)। রবীন্দ্রনাথ এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে *'সতী'*তে হিন্দু-নায়িকা (অমা) ও যবন-নায়ক (ফৌজদার) এবং *'দুরাশা'*তে নায়িকা মুসলমান-নবাব নন্দিনী ও নায়ক ব্রাহ্মণ কেশরলালের হৃদয়ধর্মনিষ্ঠ প্রণয়াখ্যান রচনা করলেন।

"যবন ব্রাহ্মণ
সে কাহার ভেদ। ধর্মের সে নয়
অন্তরে অন্তর্যামী সেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।" (*'সতী'*)[১১৮]

হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট ও মুসলিম রিভাইভ্যালিস্টরা যখন স্বজাতিকে পরস্পর-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের দিকে টান দিচ্ছেন তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন, ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি—

> "আমাদের ভারতবর্ষের সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয় জাতীয় গুণীরই হাত আছে ; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।........চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই ; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে।"[১১৯]

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে-পেছিয়ে থাকার জন্য জাগরণের সুফল বাংলার দুই সমাজ সমানভাবে পায়নি। এর ফলে একটা ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলমান-সমাজ যখন জাগরণের কক্ষে প্রবেশ করে, তখন শঙ্কিত হয়ে ওঠে আগে থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমজাগ্রত মুসলিম সমাজের দাবী ও পূর্ব থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু-সমাজের শঙ্কার টানাপোড়েনে দু'পক্ষে একটা পরস্পর-বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে দু'পক্ষের রিভাইভ্যালিস্টরা পরাক্রম প্রদর্শন

করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই ঐক্যের ধারায়—

> "আমরা ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করিযাছি বলিয়া গবর্নমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে।.........যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।"[১২০]

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ব্যাধি নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা ও বক্তব্য অপ্রচুর নয়। ইংরাজদের উস্কানি মূলক বা পক্ষপাতিত্ব মূলক ভূমিকাটিকে এ-বিষয়ে একমেবাদ্বিতীয় কারণ হিসাবে দেখে থাকেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে সর্বাংশে একমত নন। এ-বিষয়ে তাঁর কঠোর সমালোচনা ছিল। একে, এক অর্থে, আত্ম-সমালোচনাও বলা যায়।

> "শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্পর্কে সাবধান হইতে হইবে।"[১২০ক]

মুসলমানদের সঙ্গে মিলনেব চেষ্টার মধ্যে যে ফাঁকি আছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। লিখেছেন—

> "আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।"[১২১]

'আনন্দমঠ'-এর ঔপন্যাসিক দেশপ্রেমের আবেগকে স্বধর্ম-প্রেম অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে গুলিয়ে দিয়েছিলেন, *'গোরা'*য় রবীন্দ্রনাথ প্রায় *'ফাউস্ট'* (গ্যেটে)-ধরনের একটি সংকটপূর্ণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দেশপ্রেমকে স্বধর্মপ্রেমের গণ্ডী থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। যে-গোরা হিন্দুয়ানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে জীবন-মন সমর্পণ করেছিল, পদে-পদে নিজের চারপাশে জড়িয়ে নিয়েছিল অতি-স্বধর্মকেন্দ্রিকতার বন্ধন, উপন্যাসের শেষে সে সেই বন্ধনের জড়তা ভেঙে মুক্ত মানবতার কণ্ঠে বলেছে,

> "আপনি আজ আমাকে সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"[১২২]

এ তো শুধু গোরার সংকটমুক্তি নয়, *'আনন্দমঠ'* থেকে *'গোরা'* পর্যন্ত বিস্তৃত সময় জুড়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে ঘনীভূত সংকটের জাল ছিঁড়ে বেরোনো। অন্নদাশংকর রায় তাই বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবনে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন......... গোরার পর তিনি পুনরুত্থানবাদীদের আওতার বাইরে চলে যান।"[১২৩]

ইসলাম ধর্মের বিবর্তনের যে ইতিহাস আছে তাতে মূলত তিনটি ধারার ছবি আমরা পাই।[১২৩ক]

১. শরীয়তী ধারা (মক্কা-মদিনায় ধর্মীয় বিকাশের প্রাথমিক-স্তরে তার যে-নীতি-কঠিন শুদ্ধতাবাদী রূপ ছিল)।
২. সৌন্দর্য সম্ভোগবাদের ধারা (ইসলাম-ধর্ম পারস্যে আসার পর তাতে যে রাজসিক ঐশ্বর্য ও সম্ভোগের চারিত্র্য যুক্ত হয়)।
৩. সুফিবাদের ধারা (এঁরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের সন্ন্যাসী। নীতিবাদের বিশুষ্কতা ও ঐশ্বর্য লালিত সম্ভোগবাদের পথ ছেড়ে এঁরা মানুষের সহজ হৃদয়ধর্মের উপর জোর দিয়েছিলেন)।

শবীয়তী ধাবার নীতি-শুষ্ক শুদ্ধতাবাদ উগ্র হয়ে উঠলে অন্য সম্প্রদায় বা জাতি সম্পর্কে তার ব্যবহার হয়ে ওঠে বিদ্বেষমূলক ও প্রত্যাখ্যানধর্মী। আর সুফিবাদ মানবিক হৃদয়ধর্মের উপর অধিষ্ঠিত বলে তার মধ্যে মিলনধর্মী উদারতা ক্রিয়াশীল থাকে বেশি। ভারতবর্ষে ইসলাম-ধর্মের এই তিনটি ধারাই প্রবহমান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুসলমান-সমাজে জাগরণ শুরু হলে তার পুনর্জাগরণবাদী ধারা হতে চেয়েছিল শরিয়তী ধারার অনুগামী ; আর তার রেনেসাঁসমুখী ধারা অষ্টম শতাব্দীতে আরবের মুতাজেলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী ধারার অনুসারী হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং সুফিবাদের মানবিক ঔদার্যকে বরণ করেছিল তাদের পথ হিসাবে।

রবীন্দ্রনাথ পারতপক্ষে নীরব ছিলেন বাংলার মুসলমান-সমাজের পুনর্জাগরণবাদী ধারার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে। কেননা এ-বিষয়ে কিছু বলতে হলে তাঁকে বলতে হতো বিরোধেব কণ্ঠে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ যে মুসলমান ঈশ্বরের ভজনায় প্রণত ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে, তার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে—'মণিহারা' গল্পের এক স্থানে কবি মাঝির নামাজের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা অনুপম।

> "তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে........বোটের ছাদের উপরে মাঝি নামাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে-ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল।"[১২৪]

'বিজয়া সম্মিলনী'র প্রসন্ন সম্ভাষণে তিনি তাই বলেন,

"শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো।"

('বিজয়া সম্মিলনী' কার্তিক ১৩১২)[১২৫]

শঙ্খমুখরিত দেবালয়ের পূজার্থীর সঙ্গে নামাজ পাঠরত মুসলমানকে একই মর্যাদায়, একই সম্ভাষণে এই মেলানোর আহ্বান তখন আর কার পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল?

২. 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'দুরাশা' গল্পের মধ্যে ধরা পড়েছে ঐশ্লামিক ঐতিহ্যের সম্ভোগ ও সৌন্দর্য-বিলসিত ছবি—

"ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগের জরির-চটি-পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিক পাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।" ('ক্ষুধিত পাষাণ')[১২৬]

কবি কালিদাসের *'মেঘদূত'* যে বার্তা বহন করে আনে রবীন্দ্রনাথের কাছে, শাজাহানের 'তাজমহল'ও সেই বার্তাই বহন করে আনে—

"তোমার সৌন্দর্য দূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"[১২৭]

৩. ঐশ্লামিক ঐতিহ্যের তৃতীয় ধারাটি সুফিবাদের ধারা। ভারতীয় জীবনের লৌকিক স্তরে ইসলামের শিকড় নেমেছিল এই সুফিবাদের পথ ধরে। সুফিরা গানে, কবিতায়, গজলে খুলে দিয়েছিলেন সর্বমানবের দিকে প্রাণের, আনন্দের ধারা। এই ধারায় ছিল ঔদার্যের ও মিলনের বার্তা। হাফিজের সমাধিস্থলে গিয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন,

"আমরা দুজনে একই পাঠশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভর্তি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজাল আমাকে বাঁধতে পারেনি ; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধ প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়।........এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।"[১২৮]

অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে ক্রিটিক্যাল হওয়ার আগে তিনি তাকিয়ে দেখতেন স্বপক্ষের অবস্থা। পারস্যে বেড়াতে গিয়ে তিনি ইস্পাহান শহরের মাদ্রাসে-ই-চাহারবাগ নামক মসজিদ দর্শন করেন। এর নির্মাণ-সৌন্দর্য দেখে তাঁর মনে হয় 'রমণীয়, যেন গীতিকাব্য'। মসজিদ-প্রাঙ্গণে কিছু সংখ্যক মোল্লা বসেছিলেন। কবির মনে হলো তাঁরা অতিথিদের দেখে প্রসন্ন হননি। তিনি শুনলেন, আর দশ বছর আগে এখানে তাঁদের প্রবেশ সম্ভব হতো না। কবি মন্তব্য করলেন,

"শুনে আমি বিস্মিত হব সে রাস্তা আমার নেই। কারণ বিশ বছর পরেও পুরীতে

> জগন্নাথের মন্দিরে আমার মতো কোনো ব্রাত্য যে প্রবেশ করতে পারবে সে আশা করা বিড়ম্বনা।"[১২৯]

মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন সেখানকার মুসলিম দুনিয়ায় লেগেছে মধ্যযুগীয় মূঢ়তা থেকে মুক্তির হাওয়া তখন তিনি তাকে স্বাগত জানালেন। বিশেষ করে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কের নবজাগরণ তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। নব্যতুরস্ক গঠনে কামালের বিচক্ষণতার প্রশংসা করে তিনি বলেছেন,

> "নব তুরস্ক একদিকে য়ুরোপকে যেমন সবলে নিরস্ত করলে আর এক দিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ করলে অন্তরে-বাহিরে। কামাল পাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরস্ককে মুক্তি নিতে হবে। আধুনিক য়ুরোপে মানবিক চিত্তের সেই মুক্তিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন...........পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্বোধন সকলের আগে করা চাই।"[১৩০]

বুঝতে অসুবিধা থাকে না মুসলিম দুনিয়ায় রিভাইভ্যালের ধারা নয়, রেনেসাঁসের ধারাকেই তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন সাগ্রহ-চিত্তে।

মজিরউদ্দীন মিয়া *'রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম-সমাজ'* নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে অনপুঙ্খ তথ্য ও বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন,

> "রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান সমাজ এবং জীবনের সামগ্রিক পরিচয় নেই, কিন্তু তার যে পরিচয় আছে তা মহৎ অনুরাগে বিভূষিত, শ্রদ্ধায় অনুরঞ্জিত, সত্যবোধে দীপ্ত।........জাতি বৈরিতা এবং হিংসাবিদ্বেষের দ্বারা তাঁর সমালোচনা কলঙ্কিত নয়। রবীন্দ্রনাথের মুসলিম প্রসঙ্গ বিচার এবং মুসলিম উপাদান ব্যবহারের মধ্যে আসলে মানবতার বিজয়সুরই অনুরণিত হয়েছে।"[১৩১]

মুসলমান সমাজের জন্য তিনি যা করতে পারেননি, তা অন্যভাবে অন্য কারো দ্বারা হোক এই ছিল তাঁর আকুতি। মৃত্যুর এক বছর আগে, যখন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তখন অধ্যাপক আবুল ফজলকে লিখেছেন,

> "আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এর প্রয়োজন আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে।"[১৩২]

নজরুল ইসলামকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে (১৯২৩), জসীমউদ্দীনকে উপন্যাসের প্লট (*'বোবাকাহিনী'*) দিয়ে বন্দে আলি মিয়াকে প্রশংসাপত্র দিয়ে, শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল উৎসবে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা করে, শান্তিনিকেতনে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকদের এনে, বিশ্বভারতীতে নিজাম বক্তৃতার ব্যবস্থা করে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ হাবিব, পারস্যভাষা ও সংস্কৃতির ইরানি অধ্যাপক আগাপুরে দাউদ

(১৯৩৩), 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রখ্যাত সহযোগী কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতিকে এনে একদিকে তিনি মুসলমান সমাজকে জানবার আকুলতা প্রকাশ করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, উৎসাহিত করেছেন ; অন্যদিকে দেশ-বিদেশের মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে, জ্ঞানের বিকাশ ও সংস্কৃতির প্রবৃদ্ধি সাধনে নিরন্তর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

মুসলিম প্রতিভার পরিচর্যায় এবং তাঁদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে তাঁর প্রয়াস ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি যখন বয়সের ভারে এবং রোগে ক্লান্ত-অশক্ত, তখনও মুসলমান সমাজের কথা নিরন্তর ভেবেছেন, অসুস্থ অবস্থাতেও মুসলমান ছাত্রদের জন্য আন্তরিক বাণী দিয়েছেন। 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন'-এর একটি দল কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে শান্তিনিকেতনে (১৯৩৭, ৬ মার্চ)। অসুস্থ অবস্থাতেই কবি একটি কবিতা লিখে তাদের উপহার দেন :

"আমার আত্মার মাঝে ঘন হলো কাঁটার বেড়া এ
কখন সহসা রাতারাতি
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে
ওরে মূঢ়, ওরে আত্মঘাতী!
ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন শয়তান!
ও কাঁটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্ম-ধ্বজী দলে
ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই,
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে
জানিব আমরা দোঁহে ভাই।"[১৩৩]

এক রেনেসাঁসের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি আরেক সমাজের জাগরণের প্রগতিশীল ধারার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন তার প্রসারিত কর। উনিশ শতকের শেষদিকে মুসলিম সমাজে জাগরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, নানা টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে তার প্রগতিশীল মুক্তিকামী ধারাটি (১৯২৬-১৯৩৬) 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামক সংগঠন ও *"শিখা"* পত্রিকাকে আশ্রয় করে বিচ্ছুরিত করে তার জাগরণগত ঐশ্বর্য। কাজী আব্দুল ওদুদ বা নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৈত্রী-মিলনের যে হার্দ্য অধ্যায় এ সময় স্থাপিত হয় তা শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক-মৈত্রীর কাহিনী নয়, এক রেনেসাঁসের সঙ্গে আরেক রেনেসাঁসের মৈত্রী-মিলনের কাহিনীও। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের তরুণ প্রবক্তরা রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন।

রক্তগোলাপ দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মঞ্চ ও পথ। আবুল ফজল তাঁর *'রেখাচিত্র'* (পৃ. ১৩০-১৩১) গ্রন্থে তার বর্ণময় বিবরণ দিয়েছেন।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এগিয়ে-পেছিয়ে পড়ার কারণে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল, দু'পক্ষের রিভাইভ্যালিস্টদের তৎপরতায় যে বিড়ম্বনা এই উপমহাদেশে উগ্র দূরত্ব রচনা করেছিল, রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে জাগরণের সেই অসামঞ্জস্য যেন একটি ঐকিক বৃত্তে এসে মিলেছিল। কবি নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ-মৈত্রীর ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে নানা টানাপোড়েনে বিড়ম্বিত দুই জাগরণের প্রগতিশীলতারই পরস্পর-চুম্বিত রূপক পরিণাম।

রিভাইভ্যালিজমের উদ্ভবে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যে সংকট ঘনীভূত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়ে যান। তাই তাঁর 'শুচি' কবিতায় রামানন্দ মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে নাভা চণ্ডালকে দু'হাত বাড়িয়ে বক্ষে ধারণ করেই শেষ করেন না তার শুচিতার যাত্রা। তিনি আরও এগিয়ে যান সেই দিকে যেখানে—

> "কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
> কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুনগুন স্বরে॥
> রামানন্দ বসলেন পাশে,
> কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
> কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
> "প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
> আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।"
> রামানন্দ বললেন, "এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি বন্ধু,
> তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
> চিত্ত আমার ধূলায় মলিন,
> আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
> আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।"[১৩৪]

ঘ. নগর-জীবন ও পল্লী-জীবন

শ্লোগানটা জে. আর. হেল-এর গ্রন্থ অনুসারে এইরকম—'নো সিটি, নো রেনেসাঁস।'[১৩৫] রেনেসাঁসের সংস্কৃতি বিশেষভাবেই নাগরিক। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয়লগ্নে ইতালিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভরকেন্দ্র ভূমিনির্ভর গ্রাম্যজীবন থেকে বৃহৎ উৎপাদন ও বাণিজ্য-নির্ভর শহরে চলে আসে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের ইতালিতে রেনেসাঁস বলতে যা কিছু হয়েছিল, তা মূলত শহরকে কেন্দ্র করেই।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল, স্বভাবতই তা ছিল

নগরকেন্দ্রিক। উনিশ শতকের কলকাতা চুম্বকের মতো টানতে থাকে বিদ্যা ও বিত্তে অগ্রণী ও আগুয়ান হতে ইচ্ছুক মানুষদের। হুগলী জেলার এক জাতক রামমোহন জীবন ও ভূগোলের অনেক পথ পেরিয়ে ১৮১৪ সালে কলকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে আসেন, বিদ্যাসাগর মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম থেকে পিতার হাত ধরে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসেন আট বছব বয়সে ; বর্ধমানের চুপী গ্রাম থেকে আসেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ভাগলপুরের চাকরি ছেড়ে হিন্দু কলেজে এসে যোগ দেন ডিরোজিও নামে প্রাণোম্মাদনা সৃষ্টিকারী তরুণ শিক্ষক ; মাইকেল আসেন তাঁর জন্মস্থান যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম থেকে। কলকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গে এঁরা জীবনে-মরণে কি ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তার উদাহরণ সুপ্রচুর। দিন কয়েকের জন্য মাইকেল তমলুক গিয়ে গৌরদাস বসাককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'I am dying for Calcutta.'[১৩৬] রাফায়েলও তাঁর কাকা সিমোনকে লিখেছিলেন, 'রোম ছাড়া আর কোথাও আমার পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয়।'[১৩৭] লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বলেছিলেন, 'Florence has made me and ruined me.'[১৩৮] নগরই সৃষ্টি করে রেনেসাঁসের মানুষদের।

রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রেই ছিলেন নাগরিক—খাস কলকাতার বাসিন্দা। তাঁকে বিদ্যাসাগরের মতো প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় আসতে হয়নি। পিতার প্রকৃতিপিপাসু ভ্রামণিকতা ও জমিদারী কর্তব্য পালনের বৈষয়িক দাযিত্বের হাত ধরে তিনি ইটে গাঁথা কলকাতার নগরজীবনের বাইরে বেরিয়েছিলেন। এই বেরিয়ে-পড়া-পথ দিয়ে তিনি শেষপর্যন্ত যেখানে পৌঁছেছিলেন তার নাম শান্তিনিকেতন।

*'জীবনস্মৃতি'*তে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'বাহিরে যাত্রা'র অভিজ্ঞতার কথা। ডেঙ্গু জ্বরের তাড়নায় সেবার তাদের বৃহৎ পরিবার কলকাতা থেকে পেনেটিতে ছাতুবাবুর বাগানে আশ্রয় নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।.........প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালী-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কি অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।........কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম।"[১৩৯]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পীঠস্থান কলকাতা সম্পর্কে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতক রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কি? *'ভানুসিংহের পত্রাবলী'* (৪৮ নং চিঠি)-তে তিনি লিখেছেন,

> "কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইট কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেছে।"[১৪০]

অন্যত্র লিখেছেন,

> "কোনো কালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাকতে পারব না।"[১৪১]

তাই কলকাতা থেকে পালিয়ে বেড়ানোর আনন্দ থেকে তিনি কখনোই বঞ্চিত করেননি নিজেকে। শিলাইদহ থেকে এক চিঠিতে (ছিন্নপত্র-১) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে একটা প্রকাণ্ড পাতা উল্টে দিচ্ছে সেই-বা কী আশ্চর্য লিখন—"[১৪২]

উনিশ শতকের আগুয়ান অভিভাবকরা ছেলে মানুষ করার জন্য গ্রাম থেকে এনে তাদের কলকাতার স্কুলে-কলেজে ভর্তি করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পড়লেন সমস্যায়। লিখছেন,

"রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুল পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয় বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়।........তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন কবেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে।"[১৪৩]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলার দু-রকম পৃথিবীতে পৌঁছেছিলেন। বীরভূমের কঙ্করময় রুক্ষ ধূধূ মাঠ ও শিলাইদহ-সাজাদপুরের সজল-শ্যামল ভূগোল। শান্তিনিকেতন ছিল দেবেন্দ্রনাথের শান্তির সাধনস্থল। শিলাইদহ-সাজাদপুর ছিল তাদের জমিদারীর ক্ষেত্র। শান্তির সাধনস্থলকে রবীন্দ্রনাথ রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যার আনন্দপ্রাঙ্গণে। বিশ্বভারতীতে পৌঁছনোর আগে তাঁকে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল পূর্ববঙ্গের শ্যামল-সজল প্রাকৃতিক ভূগোল, জমিদারী বৈষয়িকতার অন্তর্বর্তী প্রজাপুঞ্জের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা-পীড়িত লোক-সাধারণের সাংসারিক পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

শ্রীনিকেতনে এক সম্ভাষণে (১৩৪৩) রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন,

"যখন আমি পদ্মাতীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ এবং কত বড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল।........গ্রামের লোকের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায় ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন

আমি গল্প কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দেব সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করছিলাম।"[১৪৪]

তাঁর *'গল্পগুচ্ছ'*-এর ফসল ফলেছে গ্রাম-গ্রামান্তবের পথে ফেবা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়. শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ যেমন উপলব্ধি কবেছেন, 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী', তেমনি দেখেছেন গ্রামেব মানুষদেব সংসারের অন্ধকার ছবি—

"বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকাব।"[১৪৫]

'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে *'পল্লীসমাজ'*. বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র. আভিজাতিক রাজকাহিনী থেকে পল্লী বাংলার আভ্যন্তর বাস্তবতায বাংলা কথাসাহিত্যেব একটা অভিযাত্রা আছে ; আমাদের ভুলে গেলে চলবে না রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি সেই অভিযাত্রার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তীরের মতো পৌঁছেছিল তাদেব লক্ষ্য স্থানে।

রেনেসাঁসের প্রকৃতিগত কারণেই নগরজীবন ও গ্রামজীবনেব মধ্যে উপ্ত হয় বিচ্ছেদের বীজ। মিল হয় না ব্যথায় ও বুদ্ধিতে। স্বপ্নের আড়াল দিযে কবি ছেলে ভুলানো পদ্যে লেখেন সেই ট্রাজেডিব কাহিনী,

"কিসেব শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই
দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।"[১৪৬]

এ শুধু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সংকট নয, এ সংকট ছিল খোদ ইতালীয় রেনেসাঁসেও। যে-সময় রাফায়েল বোম থেকে তার কাকাকে লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন,

"আমি খুব ভালো আছি। বোমে আমার সঞ্চিত অর্থ ৩০০০ ডুকাট। আরো ৫০ ডুকাট পাবার কথা। এছাড়া সেন্ট পিটাব নির্মাণের তদারকির জন্য ৩০০ ডুকাট বেতন পাচ্ছি—যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন এটা বন্ধ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর রয়েছে পোপের প্রাসাদ অলঙ্করণের জন্য ১২০০ স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্তির অঙ্ক।"[১৪৭]

এল. এল. স্নাইডার লিখছেন, সেই রেনেসাঁসের আমলেই গ্রামে ইতালির কৃষকরা যাপন করছিল এক দুর্বিষহ জীবন,

"Badly clothed, wretchedly fed, ill housed, he lived in ignorance, spualor and misery."[১৪৮]

আমাদের জানা নেই, সেখানে রেনেসাঁসের খ্যাতনামা হিউম্যানিস্ট বা শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ বলেছিলেন কিনা—

"..........এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,".. [১৪৯]

ধনিক-বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আরামের শয্যাতল শূন্য করে কোনও শিল্পী বা হিউম্যানিস্ট সেখানে এই ধরনের সামাজিক সংকল্পে নিজেদের টানটান করে বেঁধেছিলেন কিনা তারও হদিশ নেই—

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।"[১৫০]

প্রত্যাখ্যানধর্মী আত্মগরবিত নাগরিক সংস্কৃতির ত্রুটি সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা ছিল বিদ্যাসাগরের। তিনি লাট-বেলাট, রাজা-মহারাজা, দেশী-বিদেশী সাহেব-সুবো-সেবিত কলকাতায় তালতলার চটি আর ধুতি উড়ুনি পরে প্রাচীন গ্রাম্য পোশাকে ঘুরে বেড়াতেন নির্ভীক পায়ে; তাঁর আপ্রাণ সমাজ সংস্কার ও মানব হিতৈষণায় ছিল দারিদ্র-নিপীড়িত মানুষদের জন্য দরাজ হৃদয়—রবীন্দ্রনাথের সামাজিক কাব্য-সংকল্পে ছিল বিদ্যাসাগর-বাহিত দরদী হৃদয়ের বীর্যময় ঐতিহ্য।

অবস্থান বদলের পারস্পরিক ছেদবিন্দুতে ফেলে রবীন্দ্রনাথ গ্রামকেও দেখেছেন, দেখেছেন শহরকেও। পরিণাম দু-ক্ষেত্রেই প্রায় এক। 'ছুটি' গল্পে তিনি গ্রাম থেকে ফটিককে শহরে এনেছেন, আর 'পোস্টমাস্টার' গল্পে শহরকে নিয়ে গেছেন গ্রামে। কলকাতায় এসে ফটিকের যে অবস্থা হয়েছিল তা প্রায় বনের পাখিকে খাঁচায় পোরার সামিল, আর শহরের ছেলে পোস্টমাস্টার হয়ে গ্রামে গেলে তার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল জলের মাছকে ডাঙায় তোলার মতো। তবু পরিণাম দু-ক্ষেত্রে এক নয়। ফটিকের মৃত্যু কলকাতাকে জীবনের আদালতে ক্ষমার অযোগ্য আসামী করে রেখে যায়, কিন্তু পোস্টমাস্টারের বিদায় দৃশ্যটি এইরকম—

"নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্যবালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।"[১৫১]

রচনাকারের বেদনাকম্পিত পক্ষপাত দু'ক্ষেত্রেই ঝুঁকে আছে গ্রামের দিকে।

রামমোহন কলকাতায় এসে *'আত্মীয় সভা'* (১৮১৪) প্রতিষ্ঠা করে নাগরিক সংস্কৃতির দ্বারোদঘাটন করেছিলেন ; ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রে জমে উঠেছিল নগরকেন্দ্রিক বিদ্যাচর্চার আবেগ ; উনিশ শতক জুড়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসে যা কিছু ঘটেছে তার প্রাণকেন্দ্র ছিল ডিহি কলকাতা। ফলে পল্লীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সংস্কৃতি রূপেই গড়ে উঠছিল উনিশ শতকের বঙ্গীয় আধুনিকতার আন্দোলন। পল্লী জীবনের প্রতি সহমর্মিতার

একটি ক্ষীণ ধারা অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথই প্রথম পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে গ্রামজীবনের অবহেলিত পৃথিবীকে অভ্যর্থনা করলেন ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করলেন। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মানস স্থাপত্যে নাগরিক সংস্কৃতির অভ্রভেদী চূড়া একটানা রচিত হচ্ছিল উনিশ-শতক জুড়ে ; রবীন্দ্রনাথ এসে পল্লীজীবনের প্রাচীন ও আবহমান উপাদান-উপাচার দিয়ে রচনা করলেন সমান্তরাল ও বিকল্প একটি সাংস্কৃতিক স্তম্ভ। শিলাইদহে এসে স্ত্রীকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন,

> "আমি কলকাতার স্বার্থ দেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের নিভৃত পল্লী গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।"[১৫২]

১৮৩৫ সালে মেকলে তাঁর শিক্ষানীতিতে কেরানী তৈরীর কারখানা নির্মাণের যে প্রকল্প রচনা করে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে খারিজ করলেন শান্তিনিকেতনে *'বিশ্বভারতী'* ও *'শ্রীনিকেতন'* প্রতিষ্ঠা করে। তিনি বললেন,

> "এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালি ছেলেরা এখানে মানুষ হবে। রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে জ্ঞানের হৃদয় শতদল পদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে।"[১৫৩]

শুধু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অতিনাগরিকতার উল্টোটান রাখার জন্য নয়, বিশ্বসভ্যতার ভয়ঙ্কর বিপরীত গতির সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষেত্রেও এর আদর্শগত তাৎপর্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন তিনি। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত শ্রী ও সৌন্দর্যের উপাসক জাপান যখন 'লোহার জাপানে' পরিণত হয়ে যাচ্ছে, আমেরিকা যখন 'বস্তু সঞ্চয়ের অন্ধ ভাণ্ডারে বদ্ধ' ; য়ুরোপে 'যখন ভুক্ত-অভুক্ত দুই পক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়া-কামড়ি' ; মানুষ যখন 'কলের গলায় পরিয়ে দিচ্ছে তার বরমাল্য', তখন রবীন্দ্রনাথ যন্ত্ররাজ বিভূতির তৈরী বাঁধ ভেঙে মুক্তধারাকে প্রবাহিত করে দিচ্ছেন শিবতরাইয়ের কৃষিক্ষেত্রে, তাল তাল সোনার অধিকর্তা রাজাকে জালের আড়াল থেকে বের করে এনে নাটক শেষ করছেন এই গান দিয়ে—

> "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে,
> আয় আয় আয়।
> ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
> মরি হায় হায় হায়।"[১৫৪]

রাফয়েল বাল টিশিয়ান, সালুতাতি বা পোল্লিও ইতালীয় রেনেসাঁসের বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট ও আর্টিস্টরা নাগরিক সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নগর-কলকাতার জাতক হয়েও ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর শেষ ইচ্ছা এই ভাষায়—

> "আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
> বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে, ...
> সেই মাটিতে গাঁথব
> আমার শেষ বাড়ির ভিত

যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে.........
আমার দু'চোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে..........."[১৫৫]

ঙ. কবিতা ও বিজ্ঞান

জগদীশচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন,

"তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।"[১৫৬]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একাধারে অপার্থিব রসানুভূতি ও বস্তুতন্ত্র বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় ; সেই জন্যই তাঁহার রচনা ও আলোচনা উভয়ই কল্পনা ও বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল।.......গণিত, ফলিতবিজ্ঞান, দ্যুলোকতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব.........সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য ও সংস্কৃতিপূত চিত্তের উপযোগী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তাঁহার আছে। তাঁহার মধ্যে রসসৃষ্টির অপরিহার্য্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতা না থাকিলে, এই মন লইয়া রবীন্দ্রনাথ হয়তো একজন বড়ো দরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইতে পারিতেন।"[১৫৭]

কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বসুর মতো একজন বরেণ্য বিজ্ঞানী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানীর এই বক্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

সাহিত্যে সৌন্দর্যের সাধনা, বিজ্ঞানে সত্যের। সাহিত্যিকের জগৎ হৃদয়ানুভূতির, বিজ্ঞানের জগৎ মনন ও বুদ্ধিবৃত্তির। সাহিত্যিক অন্তর্গত জীবন ও পারিপার্শ্বিক জগৎকে উপলব্ধি ও অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করেন এবং তাকে সর্বজনীন একটা প্রকাশ-সৌন্দর্য দান করেন, যাতে তার অনুভূত আবেগ ও ভাবসৌন্দর্যের অংশীদার অপরেও হতে পারেন। যা সচরাচর সাধারণের বোধের বাইরে পড়ে থাকে, তাকে কবি-সাহিত্যিকরা সকলের বোধ ও অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত করে দেন। বিজ্ঞানের কাজ চারপাশের জগৎ ও জীবনকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা, বিচার-বিশ্লেষণ করা। যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে পড়ে আছে, তাকে সকলের জ্ঞানের গোচরে নিয়ে আসা। সত্য ও সৌন্দর্যের এই মেলবন্ধন সহজ কথা নয়। ইতালীয় রেনেসাঁসে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির প্রতিভায় সত্যসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী ও সৌন্দর্য-পিপাসু শিল্পী একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছিল। পর্যবেক্ষণশীল বিজ্ঞানীর নিখুঁত ভিত্তি নিয়ে তিনি চিত্র-

শিল্পের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। মানবদেহের আভ্যন্তর অস্থিসংস্থান ও পেশী, শিরা ও উপশিরার এমন চিত্র তিনি এঁকেছেন, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানীরও অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করতে পারে ; অন্যদিকে তিনিই এঁকেছেন বিশ্ব-সৌন্দর্যের দুরধিগম্য রহস্য মাখানো সহাস্য *'মোনালিসা'*র ছবি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি। বিজ্ঞানের শুভ্র আলোকে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে আপন উপলব্ধির রসে অভিসিঞ্চিত করে সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার অত্যাধুনিক কাজটি রবীন্দ্রনাথও করে গেছেন। এর ফলে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার যে-চারিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে, তা বাস্তবিকই তুলনারহিত। বিজ্ঞানের এই সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান শুধু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বিজ্ঞান

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যখন ইতালীয় রেনেসাঁসের অভ্যন্তর-কক্ষে বসে শিল্প সংস্কৃতির সাধনা করছিলেন তখনও চলছিল ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের যুগ—বিজ্ঞানের ইতিহাসে যা 'প্রথম্-বিজ্ঞান' নামে চিহ্নিত। অ্যারিস্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-খ্রীঃ পূঃ ৩২২), টলেমি (খ্রীঃ ১০০-১৭০), টমাস একুাইনাস (ত্রয়োদশ শতাব্দী)—এঁদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসা বিজ্ঞানবোধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ধর্মবোধেব সঙ্গে যুক্ত। যদিও এর ভিত্তি ছিল যুক্তির উপর, প্রতিষ্ঠা যদিও এমপিরিক্যাল (empencal) পদ্ধতিতে, তবুও সার্বিকভাবে বিশ্বাসের উপরই এই বোধ দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতির উপর কোনো মানুষী নিয়ামক রীতি প্রযোজ্য হতো না। দৃষ্টিটা ছিল পৃথিবীকেন্দ্রিক (Geocentric)। পৃথিবী স্থির এবং একে কেন্দ্র কবে আকাশের তারা নক্ষত্রমণ্ডলী ঘুবছে। সময়ও ছিল স্থির। প্রায়-স্বাধীন মানুষটিও তখন বিশ্বপিতার দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে পারেনি তার চোখ ও আঙুল, তা অ্যাঞ্জেলোর *'আদমের জন্ম'* ফ্রেস্কো চিত্রে দৃশ্যমান।

দ্বিতীয় বিজ্ঞান

এরপর আসেন বেকন, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও। বেকন তাঁর *'অ্যাডভান্সমেন্ট অব লার্নিং'* (১৬০৫) বা *'নোভাম অরগ্যান'* গ্রন্থে চার্চের পুরোহিতদের রচিত প্রথাগত বিশ্বদৃষ্টির বন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করে সত্যকে স্বাধীন দৃষ্টিতে গ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। গ্যালিলিও, কোপারনিকাস বললেন, সূর্য স্থির, পৃথিবীই ঘুরছে। শুরু হলো 'দ্বিতীয়-বিজ্ঞান'-এর যুগ। বিশ্বধারণা আমূল বদলে গেল। আগে যা ছিল পৃথিবীকেন্দ্রিক (Geo-centric) এখন থেকে তা হলো হেলিওসেন্ট্রিক বা (Helio-centric) সূর্যকেন্দ্রিক। শুরু হলো যুক্তির যুগ। বিশ্বাস থেকে যুক্তি, সংশ্লেষণ থেকে বিশ্লেষণের দিকে স্পষ্ট অভিযাত্রা। প্রকৃতিকে জানতে গেলে অংশগুলিকে জানতে হবে। অংশগুলিকে জানতে হবে কার্যকারণ-তত্ত্বের

পরিপ্রেক্ষিতে 'Nature has to be hounded in her wanderings bound into service, made a slave.'[১৫৮]

সব কিছুকে বিচাব করতে হবে 'dry light of reason'-এর আলোকে। দেকার্তে বললেন, একমাত্র সত্য তাকেই বলা যাবে, যা গাণিতিক তর্কশৃঙ্খলায় ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বিতীয়-বিজ্ঞানের এই যুক্তিবাদী ও সত্য-নির্ণায়ক দর্শন আমাদের সামাজিক জীবনের অনেক নৈরাজ্য ও পুঞ্জীভূত সংস্কারের জঞ্জাল সরাতে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

এদেশে রামমোহন অভ্যর্থিত পাশ্চাত্য শিক্ষার জ্ঞানবাদী ধারার প্রথম স্নাতক ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলরা। দ্বিতীয় বিজ্ঞানের সত্যান্বেষী ও যুক্তিবাদী জীবনদর্শনের ধারালো হাতিয়ার নিয়ে তাঁরা যখন *'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'* বা *'পার্থেনন'*-এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন যুগ-সঞ্চিত অন্ধকারের রাজ্যে যে ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠেছিল, তা সকলের জানা। অ্যালেকজান্ডার ডাফ জানিয়েছেন, তাঁদের আলোচনার বিষয় বিজ্ঞান হলে তাঁরা নিউটন ও ডেভি থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। সুশোভন সরকার লিখেছেন, সব কিছুকে তাঁরা এনেছিলেন 'at the bar of reason'।[১৫৯] এদেশের গতানুগতিক সমাজজীবনে তাঁদের আবির্ভাব ছিল বিস্ফোরণের মতো। আসলে 'দ্বিতীয় বিজ্ঞান'-প্রসূত যুক্তিবাদের বিদ্যুৎপ্রভ আলোয় তাঁরা ঝলকিত করেছিলেন এদেশীয় সমাজকে। তার অনতিপরে অক্ষয়কুমার দত্ত যুক্তিবাদী বিশ্বদর্শন ও বিদ্যাসাগর যুক্তিময় মানবিক ব্যক্তিত্ব দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্রের *'কৃষ্ণচরিত্র'*-এর পাঠক জানেন, নানা প্রক্ষেপ ও অতিপল্লবায়ণ থেকে যুক্তির পথ ধরে তিনি কিভাবে পৌছুতে চেয়েছেন তাঁর অন্বিষ্ট সত্যের দিকে। রবীন্দ্রনাথের মানস-সরোবরে কল্পনার পাখায় ভর করা রঙিন কবিতার পাখিই এসে পৌছোয়নি, 'দ্বিতীয় বিজ্ঞান'-এর সর্বত্র সঞ্চারী সত্যের আলোকিত অর্জনগুলিও এসে পৌছেছিল।

রবীন্দ্রনাথ জানেন মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে বিজ্ঞান কিভাবে পুরোহিততন্ত্রের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে সত্যের অধিকার। তিনি একটি নিবন্ধে লিখেছেন,

> "ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল।........একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্র বাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্ত বাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।"[১৬০]

'দ্বিতীয় বিজ্ঞান' মানুষকে যে আলোকিত প্রত্যয় দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি সম্পূর্ণ

আস্থাশীল ছিলেন। একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন,

"সংসারের নিয়মকে জেনেছি। মূঢ়ের মত তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি।........ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে।...........তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরে স্থান দিতে চেয়েছি।"[১৬১]

বেকন থেকে সূচিত 'দ্বিতীয় বিজ্ঞান'-এর শুভ্র নিরঞ্জন আলো রামমোহন, ডিরোজিও, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে একটি পরিচ্ছন্ন ও প্রসারিত প্রকাশময় পরিণাম অর্জন করেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় বিজ্ঞানে কিছু হুঁশিয়ারিও ছিল। বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে মূলে পৌছুনোর কথা বলেছিল সেই বিজ্ঞানদর্শন। বলেছিল অংশকে বুঝলেই সমগ্রকে বোঝা যাবে। বলেছিল যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণই সত্যনির্ণয়ের সারপথ। তাঁদের ব্যাখ্যা-মতে গড়ে উঠেছিল নিয়মচালিত এক যান্ত্রিক বিশ্বদর্শন। বিজ্ঞানের এই বিশ্লেষণবাদী সত্য-সন্ধানের তুমুল জয়যাত্রায় শুধু পুরাতন পৃথিবীর পুরোহিতরাই বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, শিল্প-সহিত্য ও সৌন্দর্যের সেবকবাও প্রমাদ গুণলেন। কীটস ও চার্লস ল্যাম্ব বললেন,

"Newton has destroyed all the poetry of the rainbow by rendering it to the prismatic colours."[১৬২]

আতঙ্কিত টেনিসন তাঁর *'ইন মেমোরিয়াম'* কাব্যে নির্ধারণ করে দিতে চেয়েছেন বিজ্ঞানের সীমা—

"Let her know her place
She is the second, not the first."[১৬৩]

কবি সাহিত্যিকদের বিচলিত হয়ে ওঠার কারণ ছিল। দ্বিতীয় বিজ্ঞানের অতিযান্ত্রিক, বিশ্লেষণবাদী 'dry light of reason' ভেঙে দিচ্ছিল 'প্রথম বিজ্ঞান'-যুগের সমগ্রতাবোধ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বা পিকো দেল্লা মিরানদেল্লোর পৃথিবীতে সত্য ও সৌন্দর্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েনি। গাণিতিক শৃঙ্খলায় যা বাঁধা যাবে তাই সত্য, বাকি সব অনৃতভাষণ। সমগ্রের মধ্যে যে সুষমা তা নয়, বিশ্লেষণের দ্বারা নিরূপিত কার্য-কারণের নিয়মই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। জেরেমি বেন্থাম *'র‍্যাশনাল অব রিওয়ার্ড'* গ্রন্থে পরিষ্কার বলেই দিলেন,

"The poet always stands in need of somethings false........Truth, exactitude of every kind is fatal to poetry."[১৬৪]

কবির পক্ষে সবসময়ই তাই মিথ্যার প্রয়োজন। সতেরো শতক থেকে শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে শুরু হয়েছিল অসেতুসম্ভব চিন্তার ব্যবধান। এই ব্যবধানের মধ্যেই কিন্তু চলছিল বিজ্ঞান ও সাহিত্যের একটা পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সংকোচ-বিজড়িত প্রয়াস।

ইংরাজি সাহিত্যের 'মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস' নামে খ্যাত জন ডান প্রমুখ কবি, মহাকবি জন মিল্টন, জার্মান কবি ও নাট্যকাব গ্যেটের মতো সাহিত্যিকদের সাহিত্য- সাধনায় তার প্রমাণ আছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য ও বিজ্ঞান-প্রসূত জীবনবোধগুলি ক্রমাগত এসে পৌঁছুচ্ছিল শিল্প-সাহিত্যের সীমানায।

বিজ্ঞানের সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকবণের ধারায় রবীন্দ্রনাথকে বলা যায় পরিণততম কবি, যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে সুদুর্লভ। বিজ্ঞানেব দু'টি দিক আছে তত্ত্বের দিক ও যন্ত্রের দিক। তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতবকম তাত্ত্বিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ব্লটিং পেপারের মতো সেগুলি শুষে নিয়েছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির চক্রাবর্তন গতি, বিশ্বসৃষ্টি, মানুষের আগমন-রহস্য, বিবর্তনবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলি তিনি সহজে মিলিয়ে নিয়েছেন তাঁর রচনার মধ্যে।

'চিত্রা' কাব্যের 'সন্ধ্যা' কবিতায় কবি লিখেছেন,

> "যেন মনে পড়ে সেই বাল্যনীহারিকা,
> তারপরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
> তারপরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
> জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
> লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
> কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।"[১৬৫]

নীহারিকা থেকে পৃথিবীর উদ্ভব-চিত্রটি এখানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা যথেচ্ছ কল্পনার ফসল নয়, ভূ-বিজ্ঞান প্রমাণিত সত্যের অনুগামী। *'সোনার তরী'* কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধরা পড়েছে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "আমি ঠিক বুঝতে পারিনে—এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান—এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তরের কত দেশ দেশান্তরের জলস্থলপর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে—আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত পুলকিত সূর্যস্নাতা আদিম পৃথিবীর ভাব।"[১৬৬]

সৃষ্টির আদিম ইতিহাস থেকে চৈতন্যময় মানুষের আগমনের কাহিনী বিজ্ঞান যেভাবে

সাজিয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের পাতায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে আত্মস্থ করে রূপায়িত করেছেন তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায়।

"লক্ষ কোটি নক্ষত্রেব
অগ্নি-নির্ঝরে যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।"

এর পর জ্যোতির্বাষ্পরূপ ত্যাগ করে একদিন পৃথিবী আকাব নিয়েছে।

"এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।"

সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষে জলস্থল বিভাগের পর যখন জীবলোক অনাবির্ভূত, তখন—

যে প্রাণ নিস্তব্ধ ছিল মরুদুর্গতলে
প্রস্তর শৃঙ্খলে
কোটি কোটি যুগ যুগান্তরে

সেই প্রাণের বার্তা নিয়ে উদ্ভিদ এল শাখা-পল্লবের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে।

"তুমি, বনস্পতি
মোর জ্যোতি বন্দনায় জন্মপূর্ব প্রথম প্রণতি।"

ক্রমে সমুদ্র থেকে ঘটল প্রাণের বিস্তার। মাটিতে প্রাণের বিস্তার হতে স্তন্যপায়ী জীব জন্মাতে আরো বহু কোটি বছর লেগেছে। বানর জাতীয় প্রাণীর বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে এখন থেকে আড়াই কোটি বছর আগে, মানুষের পূর্ব পুরুষ দেড় কোটি বছর আগে। মানুষ এসেছে কয়েক লক্ষ বছর মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিব্যক্তির ছবি সংহত করেছেন কয়েকটি ছত্রে—

"অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘযুগ ধরি ;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবস-রাত্রি-অবসানে

মন্থর গমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে।"[১৬৭]

'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ' স্থাপনের যে আকাঙক্ষা একদিন উৎসারিত হয়েছিল বিজ্ঞানভাবুক অক্ষয়কুমার দত্তের মনে, রবীন্দ্রনাথ সেই বিজ্ঞানেরই নিরূপিত সত্য-সূত্রগুলিকে আপন কবি-হৃদয়ের রসে অভিসিঞ্চিত করে রচনা করে দিলেন এক আশ্চর্য সম্বন্ধসূত্র।

"............যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যা স্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদবুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে
সেথায় নিশান্ত যাত্রী আমি
চৈতন্য সাগর-তীর্থ পথে।"[১৬৮]

তৃতীয় বিজ্ঞান

'দ্বিতীয় বিজ্ঞান' বিভাজন ও বিশ্লেষণের পথে গিয়েছিল, বিজ্ঞানের ইতিহাস এখন পেরিয়ে এসেছে তার বিচ্ছেদের সীমা। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই শুরু হয় তৃতীয় বিজ্ঞানের যুগ। 'তৃতীয় বিজ্ঞান' আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাংক, নীলস বোর, লুই দ্য ব্রগলি, শ্রোডিংগার, হাইজেনবার্গ, পৌলি ও পল ডিরাকের বিজ্ঞান। 'রিলেটিভিটি' ও 'কোয়ান্টাম থিয়োরি'র বিজ্ঞান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই এই তৃতীয় বিজ্ঞান-ভাবনা রূপ নিতে শুরু করে। বিভাজন থেকে আবার সংশ্লেষণের দিকে যাত্রা। 'দ্বিতীয় বিজ্ঞান' যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিণাম অর্জন করেছিল, সেই নিউটনকে নিয়ে এক কবি লিখেছিলেন,

"Nature and Nature's laws lay hid in night
God said, "Let Newton be ! and all was light."
—Alexander Pope[১৬৯]

উইলিয়াম ব্লেক তাঁকে নিয়ে লিখলেন,

"May God keep
From single vision and Newton's sleep."[১৭০]

এখন নিউটনেব ঘুমিয়ে পড়ার সময়, এখন জাগবেন 'থিয়োরি অব আনসার্টেনিটি'ব, 'থিয়োবি অব প্রোবাবলিটি'র প্রবক্তাবা। দ্বিতীয় বিজ্ঞান বলেছিল, অংশকে ভাঙতে ভাঙতে মূলে চলে যাও। এই মূল একটা নির্দিষ্ট পদার্থ—'ফান্ডামেন্টাল ইউনিট।' নিউটন নিজে মনে করতেন, যেসব নিয়ম মেনে এই বিশ্ব-মেসিনটি চলেছে, সে সব নিয়মগুলিই মূল নিয়ম (ফান্ডামেন্টাল)। সে দর্শনে জড় জড়, জীবন জীবন। জড় থেকে জীবনের উদ্ভব অসম্ভব। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আবির্ভূত হলেন 'থিয়োরি অব রিলেটিভিটি' নিয়ে। তিনি বলছিলেন, $E=MC^2$ অর্থাৎ আলোকের গতিতে 'মাস' বা ভর এবং 'এনার্জি' বা শক্তি সমান হয়ে যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জড় ও জীবনের কোনো পার্থক্যই থাকলো না। রাদারফোর্ড, চারউইক, ম্যাক্স প্লাংক, নীলস বোর ইলেকট্রন-প্রোটনেব গতিপ্রকৃতি নিয়ে এমন সব কথা বললেন, যা থেকে সৃষ্টি হলো 'থিয়োরি অব আনসার্টেনিটি'ব। 'তৃতীয় বিজ্ঞানে'র এই নবীন বিস্ময় সঞ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের চেতনায়। ইন্দিরাদেবীকে একটি চিঠিতে লিখছেন,

> "কি আশ্চর্য রহস্যময় এই জগৎ........মনে করতে পারো এই যে হাতখানা এ খালি নৃত্যশীল অণু পরমাণুর সমষ্টি।"[১৭১]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা একটি কবিতায় তিনি লিখছেন,

> "অণু পরমাণু অসীম দেশে কালে
> বানিয়েছে আপন নাচের চক্র
> নাচছে সেই সীমায় সীমায়
> গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
> তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ
> সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা
> ঘাসের ফুল থেকে শুরু করে
> আকাশের তারা পর্যন্ত।"[১৭২]

'নৈবেদ্য'-এর একটি কবিতায় লিখেছেন,

> "শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়
> মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোকে লোকান্তরে
> গ্রহে সূর্যে—তারকায় নিত্যকাল ধরে
> অণু পরমাণুদের নৃত্য কলরোল।"[১৭৩]

মহাবিশ্ব ব্যাপারের সঙ্গে নিসর্গ ও মানবিক অস্তিত্ব যে একই সংশ্লেষে বাঁধা এ সত্য-দৃষ্টি তৃতীয় বিজ্ঞান থেকে আহৃত। ডেভিসন ও থম্পসন 'ওয়েভ পার্টিকল ডুয়েলিটি' থিয়োরির জন্য ১৯২৭ সালে নোবেল প্রাইজ পেলেন। বস্তুর স্বরূপ যে সত্যিই কি তা বোঝা যায় না। তা ঢেউ হলেও হতে পারে, পার্টিকল হলেও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ

তত্ত্বটির জটিলতায় না গিয়ে সহজ ভাবে লিখেছেন,

"আকাশে আলোর এই চলাচলের খবর পেয়ে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠলো। তার চলার ভঙ্গিটি কি রকম। সেও এক আশ্চর্য কথা। উত্তর পাওয়া গেছে, তার চলা অতি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সেকথা ভেবে পাওয়া যায় না। কেবল আলোর ব্যবহার থেকে মোটামুটি জানা গেছে ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু মানুষের মনকে হয়রাণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়ি খবর তার সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে হাজির হলো। জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে, অতি খুঁদে ছিটেগুলির ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উল্টো খবরের মিলন হলো কোনখানে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উল্টো কথা আছে, সে হচ্ছে এই যে, বাইরে যেটা ঘটছে সেটা একটা ঢেউ আর বর্ষণ, আর ভিতরে আমরা যা পাচ্ছি তা, না এটা, না ওটা, তাকে আমরা বলি আলো—এর মানে কি কোনো পণ্ডিত তা বলতে পারলেন না।"[১৭৪]

রবীন্দ্রনাথ এখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কথা বলছেন।

এডুইন হাবল ১৯২৯ সালে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের তত্ত্ব প্রচার করলেন। সেই তত্ত্বই পরে Big Bang Hypothesis নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আনুমানিক দু'হাজার কোটি বছর আগে সমস্ত শক্তি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত ছিল। এক মহাবিস্ফোরণের পর সেই শক্তি থেকে সৃষ্টি হয় সৌর জগৎ। তারপর থেকে ক্রমাগত তা সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। *'শেষ সপ্তক'*-এর একুশ সংখ্যক কবিতায় ('নতুন কল্পে') আছে সৃষ্টি রহস্যের সেই ঐতিহাসিক সূচনা তত্ত্বের কাব্যায়ন—

"নতুন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
    আলোর বেড়া দিয়ে।
সবচেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বছরের মাপে।
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক পতঙ্গ দিয়েছে দেখা
    গণনায় শেষ করা যায় না
তারা কোন প্রথম প্রত্যূষের আলোকে
কোন গুহা থেকে উড়ে বেরল অসংখ্য
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে
    আকাশ থেকে আকাশে।

অব্যক্ত তারা ছিল প্রচ্ছন্ন
ব্যক্তের মধ্যে ধেয়ে এল
মরণের ওড়া উড়তে ;... ....
ধরার ভূমিকায় মানবযুগের
সীমা আঁকা হয়েছে।
ছোট মাপে
আলোক-আঁধারের পর্যায়ে,
নক্ষত্র লোকের বিরাট দৃষ্টির
অগোচরে।
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে
এখানকার সৃষ্টি ⌒ প্রলয়।
বড়ো সীমানার মধ্যে
ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল
আঁকা হচ্ছে, মোছা হচ্ছে।"[১৭৫]

বিজ্ঞান যাকে বলে 'বিগ ক্রান্‌চ' (Big Crunch) সেই 'বিগ ক্রান্‌চ'-এর প্রতিপাদ্যে এসে কবিতাটি শেষ হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ব্যাপ্তিতে বিশ্বরহস্যকে আর কোনো কবি কখনো দেখেনি। তৃতীয় বিজ্ঞানের পরিচ্ছন্ন ভিত্তি ও বিজ্ঞান সম্ভব (Probability Theory) কল্পনার বিস্তার ছাড়া সৃষ্টি রহস্যের এই সূচনা (Big Bang Theory) ও সৃষ্টি রহস্যের সম্ভাব্য সমাপ্তির (Big Crunch) এই আশ্চর্য কবিতাটি তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় বিজ্ঞানদর্শন যান্ত্রিক বিজ্ঞানদর্শন, যার থেকে ব্যবসার মনোবৃত্তি জন্মায়, যার থেকে প্রতিযোগিতার মনোভাব জন্মায়, যার থেকে আত্মসর্বস্বতা জন্মায়, যার থেকে অন্যের প্রতি উদাসীনতা জন্মায়, যার থেকে মানসিক চাপ বাড়ে, সমাজ মানসিকভাবে এবং শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিজ্ঞান অংশের বিজ্ঞান, সমগ্রের নয়।[১৭৬] তৃতীয় বিজ্ঞানে কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে, বস্তুর স্বরূপ বোঝা যায় না, নিজেকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় না, সমগ্রতার বোধ জায়মান হয়ে ওঠে, জড় ও জীবনের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে নিজেকে ও বিশ্বপ্রবাহের অংশীদার মনে হয়। ফলত পরিবেশ সচেতনতা বাড়ে। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে হয়। যত দূরেই থাকি, আমাদের যৌথ পরিবার ভেঙে গেলেও আমরা সবাই গাছ-পালা, নদ-নদী সবকিছুই সংযোগসূত্রে বাঁধা। এই সংযোগ সূত্রই 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব'-এর আসল অবদান। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করা নয়, একেবারে সংযোগ সূত্রে নিজেকে নিয়েই গ্রথিত, গ্রন্থিত করা, এই বোধ—এ এক নতুন ধরনের মানবতাবোধ। দ্বিতীয় বিজ্ঞান মানুষকে ক্রমাগত 'এলিয়েনেটেড' করে, 'আউট সাইডার' করে দেয়। তৃতীয় বিশ্ববোধ বলে,

"এ সাত মহলা ভবনে আমার চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে........
যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই ধূলারেও মানি আপনা—
ছোটো বড়ো হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা।
হই যদি মাটি, হই যদি জল
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল, কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তবিহীন আপনা।।"[১৭৭]

বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সম্বন্ধতত্ত্ব ও কবির সর্বগ্রাহী বিশ্বপিপাসা এখানে একই সূত্রে মিলেছে যেন। 'দ্বিতীয় বিজ্ঞান' মানুষকে নিক্ষেপ করে ত্রিশঙ্কু অবস্থায়। কবি বলেন,

"We are between two worlds. The one lost and the other too powerless to be born." —M. Arnold[১৭৭ক]

রবীন্দ্রনাথ লেখেন প্রত্যয়ের কবিতা, আনন্দের কবিতা ; প্রত্যয় ও আনন্দজড়ানো বিস্ময়ের কবিতা। 'তৃতীয় বিজ্ঞান' মানুষকে যে অন্তহীন বিস্ময়ের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে নতুন বিশ্ববোধের দরজা, রবীন্দ্র-কবিতায় ছড়িয়ে আছে তারই গহন পরিচয়। উপনিষদের প্রাচীন বিশ্ববোধ দিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের যে শিথিল বিচার চালু আছে, 'তৃতীয় বিজ্ঞান'-এর নবীন সংশ্লেষণধর্মী বিস্ময় বোধ দিয়ে তাদের আরো সুচারু ব্যাখ্যা সম্ভব। 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' বা *'গীতিমাল্য'*-এর 'দেহ' কবিতাটির কথা ধরা যাক।

"তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
তারে মোহন মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন,
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ যুগান্তরের স্তন্য
ভুবন কত তীর্থ জলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।"[১৭৮]

এ-কবিতার ব্যাখ্যায় উপনিষদের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান নির্ণীত প্রাণের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি সূত্র। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে সাহিত্যের সত্যে রূপান্তরিত করার আনন্দকর্মটি যথাযোগ্য ভাবে পালন করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ঋষি নন, কবি। দেবেন্দ্রনাথ বিশ্ব-রহস্যের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সন্ধান করেছিলেন উপনিষদের আলোয়—তাই তিনি মহর্ষি ; অক্ষয় দত্ত

বস্তু-বিশ্বের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তিনি বিজ্ঞান সাধক। রবীন্দ্রনাথ এই দু'য়ের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন 'তৃতীয় বিজ্ঞান' প্রসূত নতুন বিশ্ববোধের আলোয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ও আবিষ্কারককে এক জায়গায় যিনি মেলাতে পারেন রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন সেই কবি। বিজ্ঞানের এই আধ্যাত্মিক স্বাঙ্গীকরণ ঘটিয়েছিলেন ইতালীয় রেনেসাঁসের মহাশিল্পীরা। তাঁরা ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানের মানুষ, দ্বিতীয় বিজ্ঞানের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর বিজ্ঞানের সত্যকে কাব্যিক সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন আর এক রেনেসাঁসের কবি—মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।

চ. ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

উনিশ শতকে সূচিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উজ্জীবক উপাদান হিসাবে ধনবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শিক্ষিত বাঙালী সেই হিসাবেই বরণ ও গ্রহণ করেছিল। রামমোহন থেকে শুরু হয়েছিল সেই অভ্যর্থনাকর্ম। ইয়ংবেঙ্গলরা তো তাকে সাগ্রহে আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন। ডেভিড হেয়ার, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, মাইকেল এঁদের জীবন সাধনাতেও সেই বরণমূলক আগ্রহ ও সঞ্চরমূলক সক্রিয়তা দৃশ্যমান। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলাম তা নয়, আমরা পেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ ; শুনতে পেয়েছিলাম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা ; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন।......য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণ বিধির সার্বভৌমিকতা ; আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্র বাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।"[১৭৯]

ইংরাজ বাহিত ধনবাদী সভ্যতার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর অতিবিশ্বাস ক্রমশ টলে যেতে থাকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। নানা হতাশা থেকে তখন বাঙালীর মনে ক্রমশ স্ফুটতর হতে থাকে ইংরাজ বিরোধী মনোভাব। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছিলেন,

> "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে।.........কিন্তু এখন বাণিজ্য প্রবাহের মতো রাজত্ব প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রপ্তানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নতুন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব। এবং সেই দেশ সমুদ্রের দুই পারে। এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব আর কখনও ছিল না। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া আফ্রিকা।"[১৮০]

নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সেই সভ্যতার আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপটি উদঘাটিত করছিলেন। এক বিশ্বযুদ্ধ থেকে আর এক বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভেঙে যায় য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি তার পুরানো বিশ্বাস। বিশ্বজোড়া ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকট তার সামনে এসে দাঁড়াল কলঙ্কিত মূর্তি নিয়ে। তিনি লিখলেন,

> "কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদাগরী শাবক প্রসব করতে শুরু করেছিল। তারা খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এসিয়া আফ্রিকার পাড়ায়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ গিলেছিল মোটা মোটা পিণ্ড চর্ব্য চোষ্য লেহ্য নানাবিধ আকারে। এই ভোজের লোভনীয় মাংসগন্ধ পৌঁছুচ্ছিল য়ুরোপীয় নাসারন্ধ্রে।.......একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা এবার শুরু হলো শিকারী এবং শিকারীর পালা। য়ুরোপ জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ। আজ সে কাতর কণ্ঠে বলছে শান্তি চাই।"[১৮১]

ইওরোপীয় সভ্যতার প্রতি বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও তার শ্রেষ্ঠ প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের ছিল সীমাহীন ভরসা। লিখেছেন,

> "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"[১৮২]

১৯৩৮ সালে ১৪ এপ্রিল অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন,

> "একদিকে অমানুষিক স্পর্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাইনে।"[১৮৩]

লতায়-পাতায় জড়ানো, নানা সম্পর্কসূত্রে গাঁথা প্রভৃত মোহ, মায়া ও নিষেধের বন্ধন ভেঙ্গে বিশ্বভ্রামণিক রবীন্দ্রনাথের অনেক দেরী হয়ে যায় নতুন সমাজ-সভ্যতার জন্মভূমি রাশিয়ায় পৌঁছুতে (১৯৩০)। প্রথম দর্শনেই নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার মর্মবাণী তাকে বিস্মিত করে। তিনি বললেন,

> "রাশিয়ায় অবশেষে আশা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।"......[১৮৪]
>
> "মস্কৌয়ের পথে চলেছি। আমার মনে হয় মানুষের ভাবী ইতিহাসেরও রথ চলেছে ঐ পথে।"[১৮৫]

লক্ষ করার বিষয়, একদিকে যখন অবক্ষয়িত ধনতান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে পরিহারমূলক যন্ত্রণা-কাতর ঘোষণা, অন্য দিকে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কে তখন তিনি ব্যক্ত করছেন শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তের বিস্ময় ও আশার কথা।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দিকে মানসিক ভাবে তিনি অনেক আগে থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। তার রচনাকর্মের তন্নিষ্ঠ পাঠকের চোখে তা ধরা না পড়ার কথা নয়। *"প্রবাসী"* পত্রিকায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে অর্থাৎ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়ী' নামে একটি কবিতা লিখলেন, যার শেষাংশে রয়েছে,

"শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ওই যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন-আগে।
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মরণ শুভ্ররাগে ;
মশাল-ভস্ম লুপ্তি-ধূলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।"[১৮৬]

একজন সমালোচক বলেছেন, রুশ দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (১৯১৭) প্রেক্ষাপট ভিন্ন এ অংশের কোনো ব্যাখ্যা হয় না।[১৮৭] ১৯১৮ সালের জুলাইতে *'মডার্ন রিভিয়্যু'* পত্রিকায় কবি 'At the Crossroad' প্রবন্ধে লিখেছেন,

"This is an age of transition. The Dawn of a great tomorrow is breaking through its banks of clouds and the call of New life comes with its message."

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বঞ্চিত কৃষক সাধারণের মর্মন্তুদ অবস্থা জমিদার হিসাবে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রয়েছে সেই ছবি—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী",........[১৮৮]

এদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কবি কি করতে পারেন?

"এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥"

যে আদর্শ-স্বদেশের ছবি তিনি এঁকেছিলেন তার 'প্রার্থনা' কবিতায়—

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত........
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥"[১৮৯]

যা ছিল ভাববাদী কবির প্রার্থনার বিষয়, রাশিয়ায় গিয়ে কবি বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে দেখলেন, বস্তুবাদের পথিকরা তাদের দেশের সমাজকে সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে নিয়ে চলার পথে ব্রতী হয়েছেন। কিছু লোকের জন্য সুবিধা সম্ভোগ ও বিকাশের আয়োজন নয়, সব

লোকের জন্য সেই আয়োজনকে সম্প্রসারিত করে দেওয়া।

> "এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশের জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।"[১৯০]

রাশিয়া ভ্রমণকালে সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য—

> "আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্য সভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির সব মানুষ শিক্ষা সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন, যুগযুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"[১৯১]

'এবার ফিরাও মোরে' (১৩০০ বঙ্গাব্দ) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন, কৃষকদের 'গীত শূন্য অবসাদপুরে'র ছবি ; জমিদার-ত্রাসিত বঙ্গদেশে কৃষকরা কোন অবস্থায় পৌছেছিল— 'শাস্তি' 'দুর্বুদ্ধি', 'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে আছে তার উদঘাটন ; *'রাজর্ষি'* উপন্যাসে (১৮৮৭) গোবিন্দমাণিক্যের সংলাপে রাজভোগের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে—

> "তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া যে সোনার অলংকার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা।"[১৯২]

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৮) নাটকে পাওয়া যাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-খারিজকারী দুঃসাহসিক সংলাপঃ

> "প্রতাপাদিত্য।......মাধবপুরের প্রায় দু'বছরের খাজনা বাকি—দেবে কিনা বলো।
>
> ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।
>
> প্রতাপাদিত্য। দেবে না। এত বড় আস্পর্ধা।
>
> ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।......আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।"[১৯৩]

প্রজাবিদ্রোহের এই নির্ঘোষ, জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষককুলকে দাঁড়ানোর আহ্বান 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাতেও ছিল—

> "মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
> যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
> যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"[১৯৪]

বিদ্রোহমন্ত্রের এই দীক্ষা, ও 'গীতশূন্য অবসাদপুরে আশার সংগীত' ধ্বনিত করার কাব্য রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন ধরেই রচনা করছিলেন। *'রথযাত্রা'*য় শোনা গিয়েছিল শ্রমিক-কর্মিকদের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর—

> "আমরাই তো জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ। আমরা বুনছি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।"[১৯৫]

*'কালের যাত্রা'*র উৎসর্গপত্রে কবি লিখলেন,

> "মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তার রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।"[১৯৬]

'মুক্তধারা' (১৯২২) ও *'রক্তকরবী'* (১৯২৬) নাটকে রবীন্দ্রনাথ আগেই সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদী শোষণচক্রকে আঘাত করেছিলেন। *'রক্তকরবী'*তে তাল তাল সোনা জমিয়ে রাজা চলে যায় জালের আড়ালে। সেখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করে তার (পুঁজিবাদী) শোষণ ব্যবস্থা। আর *'মুক্তধারা'*য় যন্ত্ররাজ বিভূতির সাহায্যে নদীর উপর বাঁধ দিয়ে শিবতরাইয়ের চাষের জল বন্ধ করে তার উপর উত্তরকূট কায়েম রাখতে চায় তার (সাম্রাজ্যবাদী) প্রভুত্ব। লোক-সাধারণের শক্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রবীন্দ্রনাটকে *'অচলায়তন'* থেকে *'রক্তকরবী'*, *'মুক্তধারা'* পেরিয়ে *'রথযাত্রা'*ও *'রথের রশি'*তে একটা পরিণত রূপ পেয়েছে। ১৯৩৬ সালে 'সারা ভারত কৃষক সভা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কালেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন *'শ্যামলী'*র 'অমৃত' কবিতাটি। মহীভূষণের মতো বিপ্লবী সংগঠক ও কর্মী তখন পার্টি বেআইনী (১৯৩৪) হওয়ার জেলখানায় নিক্ষিপ্ত। যাদের—

> "বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
> রাশিয়ার লক্ষ্মী খেদানো বাদুড়টা।"[১৯৭]

রবীন্দ্রনাথ 'অমৃত' কবিতায় অমিয়ার হাত দিয়ে তাঁদের গলায় দিয়েছেন বিজয় মাল্য পরিয়ে। মানব সভ্যতার পালাবদলের সেই ইতিহাসকে তিনি স্বীকার করে স্পষ্টই বলে গেছেন,

"আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাটকায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখ শান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই পরে। অর্থোপার্জনের কঠিন বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশ পথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল আজ নির্ধনকে বললাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে।"[১৯৮]

রেনেসাঁসের যুগ হচ্ছে ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণের যুগ। ইতালীয় রেনেসাঁসে বিকশিত হয়েছিল বহুসংখ্যক অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক প্রতিভাময় ব্যক্তিত্ব। রেনেসাঁসের সংস্কৃতি এইসব প্রতিভার মনন ও সৃজনে সমৃদ্ধ। সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধের আমূল পরিবর্তন তাঁদের দ্বারা ঘটলেও জনসাধারণের অবস্থা পরিবর্তনের কোনো দর্শন তাঁরা রচনা করেননি।

সঠিক অর্থে জনগণের সঙ্গে রেনেসাঁসের জৌলুসময় সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক ছিল না।[১৯৯] রেনেসাঁসের আমলে ইতালিতে 'পিপল' বা জনগণের অবস্থা কেমন ছিল সেই দুর্গতির ছবি ই. আর. চেম্বারলিন তাঁর *'এভরিডে লাইফ ইন রেনেসাঁস'* গ্রন্থে তুলে এনেছেন।[২০০] রেনেসাঁসের বুদ্ধিজীবীরা নানা বিষয় নিয়ে প্রস্তাব রচনা করেছিলেন, রেনেসাঁসের চিত্রীরা এঁকেছিলেন অজস্র বিশ্ববিমোহী ছবি ; কিন্তু তাঁদের প্রস্তাবে বা ছবিতে জনসাধারণের সুখ-দুঃখ-সমস্যার কাহিনী প্রায় অনুপস্থিত।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসেও আমরা দেখি রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটেছে। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক জীবন-দর্শনের শৃঙ্খল থেকে আমাদের চেতনা ও সংস্কৃতিকে মুক্তি দেওয়ার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিরুদ্ধে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার যে অভিযোগ আনা হয় তা-ও অনেকাংশে সত্য। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের কারণে যে নতুন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, বাংলাদেশে তাঁরাই মুখ্যত রেনেসাঁসের স্রষ্টা ও ভোক্তা। ইতালীয় রেনেসাঁসের মতো বঙ্গীয় রেনেসাঁসেও লোকসাধারণ অনেকাংশে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। শুধু তাদের সুখ, দুঃখ, সমস্যার রূপায়ণ নয় ; ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে তাদের পূর্ণ স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দিয়েছেন তাতে অনায়াসেই বলা যায় রেনেসাঁসের মূল ভিত্তিবিন্দুটি এখানে পরিবর্তিত। রেনেসাঁসের মূল ভিত্তিবিন্দু ছিল ব্যক্তি। বিকশিত ব্যক্তিপ্রতিভার চূড়ান্ত শিখরে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

> "মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
> আমি তোমাদেরই লোক।"[২০১]
>
> "Q. Who is the greatest king ?
> Ans. The people." [২০১ক]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সমাপ্তি-রেখা

বিশ শতকের ত্রিশের দশকের উপান্তে ও চল্লিশের দশকে এক নতুন উজ্জীবনী উপাদানকে আশ্রয় করে অন্যতর একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ এখানে সূচিত হয়েছিল। সেই উজ্জীবনী উপাদানটির নাম মার্কসবাদ। ধনবাদী সভ্যতার সংস্পর্শে উনিশ শতকে সূচিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিতে ও বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই রূপান্তরণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে গণমুখী নতুন মানব-সংস্কৃতিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের সমাপ্তি রেখাটি টেনে দিয়ে যান। রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের রহস্য নিহিত আছে এক রেনেসাঁসের সমাপ্তি (ধনবাদী) ও অন্যতর মানব সংস্কৃতির (সমাজবাদী) ক্রমবিকাশগত সমাজ-মানসের রূপান্তরের মধ্যে। বিভিন্ন রেনেসাঁস-ব্যাখ্যাতার স্বকপোল-কল্পিত বক্তব্য মতো রেনেসাঁসের সমাপ্তি-রেখা—১৮৩৫,

১৮৫৬, ১৮৬০, ১৮৮৫, ১৯০৫, ১৯১১, ১৯২১ সাল। এ সব সাল-তারিখের অন্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের সমাপ্তি-রেখা হিসাবে ঐসব সাল তারিখের কোনো গুরুত্ব নেই।[২০২] চল্লিশের সংস্কৃতি তার নতুন চারিত্র্য নিয়ে পাল্টা একটা ধারা যখন সূচিত করল, তখনই হলো উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের সত্যিকারের ধারা-ভঙ্গ। এবং রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথই রইলেন তার রাজসাক্ষী স্বরূপ।[২০৩]

"বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।"[২০৪]

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. D. Kopf, *The Brahmo Samaj and Shaping of the Modern Indian Mind,* New Delhi, 1988
২. Quoted L. W. Spitz, *The Renaissance and Reformation Movement* Chicago, 1971, p. 137 ; F. Petrarcha, *Lives of the Illustrious Men*
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সেকাল', *ক্ষণিকা* (১৩০৭ শ্রাবণ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প. ব. সরকার, জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৮৮৮
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেঘদূত', *প্রাচীন সাহিত্য* (১৯০৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, প. ব. সরকার, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১১৩
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৯৪১), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড. প. ব. সরকার, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪
৬. W. A. Rebhorn, 'The Enduring Word : Language, Time and History in *IL Libro Del Coregiano'*, R. W. Hanning and D. Rosand (ed.), *Castiglione : The Ideal and the Real Renaissance Culture,* Yale Univ. Press, London, 1983, p. 79
৭. L. Valla, *Elegancies of the Latin Language,* 1444
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বরী চিত্র', *প্রাচীন সাহিত্য,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪
৯. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য,* ১৯৮০, পৃ. ১
১০. সুখময় ভট্টাচার্য, *সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ,* ১৯৮৪, পৃ. ৩৪৪
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শান্তিনিকেতন* (১৯১৬), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খন্ড প. ব. সরকার, ১৯৯২

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ধর্ম* (১৯০৯), রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, প. ব. সরকার, ১৯৯২
১৩. M. Ficino, *De Vita*, 1489 ; M. M. Bullard, 'The Inward Zodiac A Development in Ficino's Thought on Astrology', *"R. Q."*, vol. XLIII, No. 4, Winter 1990
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৈবেদ্য* (আষাঢ় ১৩০৮), ৬০ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড *তদেব*, পৃ. ৯৮৯
১৫. সুখময় ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ. ৫০
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শান্তিনিকেতন*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ৬৬৬
১৭. উদ্ধৃত সুখময় ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ. ৫০
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানুষের ধর্ম* (১৯৩৩), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১০৩৫
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *তদেব*
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *তদেব*
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রোগশয্যায়* (· পৌষ ১৩৪৭), ২৫ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, নভেম্বর ১৯৮৩, প. ব. সরকার, পৃ. ৮০৪
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাত্রি', *কল্পনা* (বৈশাখ ১৩০৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ৮৫৩
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মনুষ্যত্ব', *ধর্ম* (১৯০৯), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ৫৮৫
২৪. উদ্ধৃত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *'বাংলার সংস্কৃতি'*, ক্ষিতিমোহন সেন কৃত অনুবাদ
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপ ও অপরূপ', *সঞ্চয়* (১৯১৬), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ৯৫১
২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দীক্ষার দিন', *শান্তিনিকেতন*, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৪২, পৃ. ৪১৬
২৭. R. E. Proctor, 'The Studia Humanities : Contemporary Scholarship and Renaissance Ideals', *"R. Q."*, vol. XLIII, No. 4, Winter 1990, pp. 816-817
২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৮৬, পৃ. ৩৬
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি* (১৯১২), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, প. ব. সরকার, আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ২৭
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার মিলন', *শিক্ষা* (১৯০৮), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ৩৮৭
৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অগ্রসর হবার আহ্বান', *শান্তিনিকেতন*, ২য় খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ৩৯১-৩৯৪
৩২. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ*, ২য় সং ১৯৭৮, পৃ. ১৪৭
৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উদ্ধৃত কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, *তদেব*
৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামায়ণ', *প্রাচীন সাহিত্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ১১০

৩৫. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, *তদেব,* পৃ. ১১২-১১৩

৩৬. উদ্ধৃত সুখময় ভট্টাচার্য, *তদেব,* পৃ. ১৬৪

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, রামায়ণ, *প্রাচীন সাহিত্য,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড *তদেব,* পৃ. ১১০

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভাষা ও ছন্দ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, *তদেব,* পরিশিষ্ট-৪, পৃ. ১২৮৫

৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি* (১২৯৩), ভূমিকা

৪০. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, *তদেব,* পৃ ১৩৪

৪১. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, *তদেব,* পৃ. ১৬০

৪২. E. Thompson, *Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist*, Oxford University Press, 1928, p. 74

৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত', *প্রাচীন সাহিত্য,* ববীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ১১৪

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বপ্ন', *কল্পনা* (বৈশাখ ১৩০৭), সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, ১০ম সং, বৈশাখ ১৩৮৯, পৃ. ৩০০

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিজয়িনী', *চিত্রা* (ফাল্গুন ১৩০২), সঞ্চয়িতা, *তদেব,* পৃ. ২৬১

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তপোবন', *শিক্ষা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব*

৪৭. Haraprasad Shastri, 'Kalidasa : Chronology of his Works and Learning, *"Journal of the Bihar and Orissa Research Society"*, vol. II, part II, p. 184

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তপোবন', *শিক্ষা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৩৪৮

৪৯. মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্যকথা,* ২য় সং, ১৩৬৬

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অনন্ত প্রেম', *মানসী* (পৌষ ১২৯৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৪০৮

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বরী চিত্র', *প্রাচীন সাহিত্য,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ১৩৯

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রেমের অভিষেক', *চিত্রা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৫৬৫

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিজয়িনী', *চিত্রা, তদেব*

৫৪. উদ্ধৃত সুখময় ভট্টাচার্য, *তদেব,* পৃ. ৩১৬

৫৫. সুকুমার সেন, *পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ,* পৃ. ৩৪-৩৫

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বুদ্ধদেবের প্রতি', *পরিশেষ* (ভাদ্র ১৩৩৯), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৯৭৬

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বুদ্ধদেব', *চারিত্র পূজা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ২৫৫

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩৫ সালে কলকাতায় শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখী-পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাভা-যাত্রীর পত্র,* পত্র-১ (১৯২৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, প. ব. সরকার, ১৯৮৯, পৃ. ২৭৫

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দেশীয় রাজ্য', *আত্মশক্তি* (১৯০৫), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, প. ব. সরকার ১৯৯০, পৃ. ১০৮

৬১. উদ্ধৃত সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতি,* ১৩৭৪, পৃ. ৬৭-৬৮ ; Tan-Yun-Shan, *Twenty Years of the Visva-Bharati China Bhavan (1937-57)*, Appendix-one, p. 2

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপান-যাত্রী* (১৯১৯-১৪), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, প. ব. সরকার, *তদেব,* পৃ. ১৮২-১৮৩

৬৩. সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, *তদেব,* পৃ. ৬৬

৬৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ,* পৃ. ৫৫৯

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মন্দির', *ভারতবর্ষ* (১৯০৬), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ১৭২

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'উৎসবের দিন', *ধর্ম,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৬১৫

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', *শিক্ষা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ৪০৫

৬৮. সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, *তদেব,* পৃ. ১৫৪

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী-৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৫০২-৫০৩

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা', *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪১), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৫৮৯

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পূজারিনী', *কথা* (মাঘ ১৩০৬), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৭৩৮

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মূল্যপ্রাপ্তি', *কথা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৭৫৬

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চণ্ডালিকা'* (১৯৩৩), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প. ব. সরকার, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ৪২৯

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষের কবিতা* (১৯২৯), রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সং, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৭৪

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শান্তিনিকেতন,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ, ৮৭৯

৭৬. D. Bush, *Renaissance and English Humanism,* Canada, 1939, p. 64

৭৬ক D. Bush, *Ibid*

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চারিত্রপূজা* (১৯০৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ২১৯

৭৮. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৫০৯

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শান্তিনিকেতন* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৭০৭

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি* (শ্রাবণ ১৩১৭), ১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড *তদেব,* পৃ. ১৯৫

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি,* ৪৮ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ২২১

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শান্তিনিকেতন,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ২২১

৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৈবেদ্য,* ৯৯ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ১০০৬

৮৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৈবেদ্য,* ৫৪ সংখ্যক কবিতা, ববীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৯৮৬

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৈবেদ্য,* ৯৬ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-বচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ১০০৫

৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৈবেদ্য.* ৫৫ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-বচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৯৮৭

৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৈবেদ্য,* ৪৭ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৯৮৩

৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধর্মমোহ', *পরিশেষ,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ ১০০৫

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩১), ১ সংখ্যক পত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৩৭৭

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি,* ৯ সংখ্যক পত্র, *তদেব,* পৃ. ৪০৪

৯১. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *রামমোহন-রচনাবলী,* হরফ সং, ১৯৭৩, পৃ. ৪৮৬

৯২. উদ্ধৃত জয়ন্তী ঘোষ, *বিদেশ-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ,* ১৯৮৬, পৃ. ২৫৩

৯৩. H. L. V. Derozio, 'To India—My Nativeland', পল্লব সেনগুপ্ত, *ঝড়ের পাখি ঃ কবি ডিরোজিও,* ১৯৮৫, পৃ. ১২১

৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৪১

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, তদেব,* পৃ. ৪৯

৯৬. S. Sarkar, *On the Bengal Renaissance,* 1979, p. 67

৯৭. উদ্ধৃত অমিতাভ ঘোষ, *বিশ্ববিদ্যার আনন্দপ্রাঙ্গণে,* পৃ. ২২৩

৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখণ্ড), স্বদেশ-২০ সংখ্যক গান, বিশ্বভারতী, পৃ. ২২৫
৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *তদেব,* পৃ. ২৪৩
১০০. গোপাল হালদার সম্পাদিত, বঙ্কিম-রচনাসংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৪, উপন্যাস খণ্ড, *সীতারাম,* পৃ. ৮৪১
১০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিবাজী-উৎসব' (১১ ভাদ্র ১৩১১), *পূরবী*-সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৭০৮
১০২. 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবনে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন গোরার পর তিনি পুনরুত্থানবাদীদেব আওতার বাইরে চলে যান।' অন্নদাশঙ্কর রায়, *রবীন্দ্রনাথ,* ১৯৬২, পৃ. ৬০
১০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর* (১৯৩৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ৫৮৭
১০৪. উদ্ধৃত রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* আধুনিক যুগ, ২য় সং ১৩৮১, পৃ. ৫৬৬
১০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুপ্রভাত', *পূরবী*-সংযোজন, সঞ্চয়িতা, *তদেব*, পৃ. ৪৮০
১০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দেশনায়ক', *সমূহ* (১৯০৮) ; উদ্ধৃত প্রণব বসাক, *ভারতপথ দুই পথিকৃৎ,* ১৯৯১, পৃ. ১৬৯
১০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখণ্ড), স্বদেশ পর্যায়, পৃ. ২৪৩
১০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, প. ব. সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ১০৫
১০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিশ্বভারতী* প্রবন্ধমালা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সং, পৃ. ৭৭৫
১১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা* (১৯১০), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, প. ব. সরকার, ১৯৮৫, পৃ. ৯২৪
১১১. উদ্ধৃত অমিতাভ ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ২৮৭
১১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিশ্বভারতী,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, প. ব. সরকার, *তদেব,* পৃ. ৫০২
১১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *উৎসর্গ* (১৩১০), ১৬ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৭৬-৭৭
১১৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ,* বঙ্কিম-রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৬৪, পৃ. ২৩
১১৫. J. Maitra, *Muslim Politics in Bengal, 1855-1906,* 1984, p. 6
১১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুবিচারের অধিকার', *রাজা প্রজা* (১৯০৮), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ২১৩

১১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিবাজী উৎসব, তদেব*

১১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দুরাশা', *গল্পগুচ্ছ,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ২৬৫

১১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কোট চাপকান', *সমাজ* (১৯০৮) ; উদ্ধৃত মজিরউদ্দীন মিয়া, *রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ,* ১৯৯০, পৃ. ২৬

১২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতির অভিভাষণ, [illegible]. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ২৬৪

১২০ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্যাধি ও প্রতিকার', সমাজ-পরিশিষ্ট, উদ্ধৃত মজিরউদ্দীন মিয়া, *তদেব* পৃ. ৩২

১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৬, পৃ. ৪৭৪

১২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ৯২৩

১২৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, *তদেব*

১২৩ক. কে. এল. আশরাফ, *হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্যা* (অনু), মার্চ ১৯২০, পৃ. ৩৭-১৪২

১২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মণিহারা', *গল্পগুচ্ছ,* বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৭, পৃ. ৩৯৫

১২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিজয়া সম্মিলনী', কার্তিক ১৩১২, উদ্ধৃত মজিরউদ্দীন মিয়া, *তদেব*

১২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ক্ষুধিত পাষাণ', *গল্পগুচ্ছ,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, প. ব. সরকার, *তদেব,* পৃ. ২৪৬

১২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাজাহান', *বলাকা* (১৩২৩), সঞ্চয়িতা, তদেব, পৃ. ৫৩৯

১২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পারস্যে', *বিচিত্রা,* আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ২৯৭ ; উদ্ধৃত মজিরউদ্দীন মিয়া, তদেব, পৃ. ২১৭

১২৯. উদ্ধৃত মজিরউদ্দীন মিয়া, *তদেব,* পৃ. ১১৯

১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পারস্যে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, পৃ. ৪৪৬

১৩১. মজিরউদ্দীন মিয়া, *তদেব,* পৃ. ১৪-১৫

১৩২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী,* বিশ্বভারতী ১৩৭১, পৃ. ১৬১-১৬২

১৩৩. মজিরউদ্দীন মিয়া, *তদেব,* পৃ. ৩৮

১৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শুচি', *পুনশ্চ* (আশ্বিন ১৩৩৯), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ৯৯

১৩৫. J. R. Hale, *A Concise Encyclopaedia of Italian Renaissance,* G. B., 1982

১৩৬. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *মধুসূদন-রচনাবলী,* হরফ সং, ১৪ নং চিঠি (ইং), পৃ. ২৮১

১৩৭. W. Durant, *The Story of Civilization,* vol. V, The Renaissance, 1953, p. 497

১৩৮. I. A. Richter, *Selection from the Note Books of Leonardo Da Vinci,* G. B., 1953

১৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাহিরে যাত্রা', *জীবনস্মৃতি,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ১৭-১৮

১৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভানুসিংহের পত্রাবলী,* ৪৮ নং চিঠি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ৩৬৩

১৪১. উদ্ধৃত অমিতাভ ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৮

১৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্র*-১০ সংখ্যক পত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৩০১

১৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৯৪১), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৪৮১

১৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনিকেতন প্রদত্ত সম্ভাষণ (১৩৪৩), উদ্ধৃত কান্তি গুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথ : ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,* ১৯৯১, পৃ. ৮১

১৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'এবার ফিরাও মোরে', *চিত্রা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ৫৬৯

১৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজপাঠ-২, *কৈশোরক রচনা সংকলন,* লীলা মজুমদার সম্পাদিত, বৈশাখ ১৩৯৩, পৃ. ৬

১৪৭. Guicciardini, *Ricordi,* XXVIII

১৪৮. L. L. Synder, *The Making of Modern Man,* New York, 1967, p. 115

১৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'এবার ফিরাও মোরে', *তদেব*

১৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *তদেব*

১৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পোস্টমাস্টার', *গল্পগুচ্ছ,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ২৯

১৫২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবন কথা,* ৩য় আনন্দ মুদ্রণ, ১৩৯৫, পৃ. ৫১

১৫৩. উদ্ধৃত, অমিতাভ ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ৬১৮

১৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রক্তকরবী* (১৯২৬), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ২৩৫

১৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষ সপ্তক* (বৈশাখ ১৩৪২), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ২১৫

১৫৬. উদ্ধৃত অমিয়কুমার মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস,* ১৯৬৫

১৫৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাক্‌পতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ', *মনীষী স্মরণে,* ১৯৭২, পৃ. ৪৮-৪৯

১৫৮. উদ্ধৃত অমলেন্দু বসু, 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান', *সাহিত্যচিন্তা,* ১৩৭৯

১৫৯. S. Sarkar, *Ibid,* p. 72

১৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্ববিদ্যালয়েব. রূপ', *শিক্ষা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৪০৪

১৬১. উদ্ধৃত অমিয়কুমাব মজুমদার, *তদেব*

১৬২. অমলেন্দু বসু, *তদেব* , পৃ. ১১৫

১৬৩. অমলেন্দু বসু, *তদেব*

১৬৪. অমলেন্দু বসু, *তদেব,* পৃ. ১২২-১২৩

১৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সন্ধ্যা', *চিত্রা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৫৬৭

১৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, *'ছিন্নপত্র',* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৩০১

১৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জন্মদিনে,* ৫ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৮৪৫-৮৪৬

১৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রোগশয্যায়* (১৯৪০), ২০ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৮০১

১৬৯. উদ্ধৃত আনন্দ ঘোষহাজরা, 'কবিতা ও তৃতীয় বিজ্ঞান', *"চতুরঙ্গ",* শরৎ ১৪০০

১৭০. উদ্ধৃত আনন্দ ঘোষহাজরা, *তদেব*

১৭১. উদ্ধৃত অমিযকুমার মজুমদার, *তদেব*

১৭২. উদ্ধৃত ক্ষুদিরাম দাশ, *রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার,* ২য় মুদ্রণ জুন ১৯৮৮, পৃ. ১১৪

১৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৈবেদ্য,* ২৩ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৯৭২

১৭৪. উদ্ধৃত আনন্দ ঘোষহাজরা, কবির দায় ঃ কবিতার বিষয়, ১৯৯৩, পৃ. ৭৮-৭৯

১৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষ সপ্তক,* ২১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ১৭৩-১৭৫

১৭৬. আনন্দ ঘোষহাজরা, 'কবিতা ও তৃতীয় বিজ্ঞান', *তদেব*

১৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রবাসী'. *উৎসর্গ,* সঞ্চয়িতা, *তদেব,* পৃ. ৪৬৫-৪৬৭

১৭৭ক. উদ্ধৃত আনন্দ ঘোষহাজরা, *তদেব*

১৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিমাল্য* (১৩২১), ৯৯ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩

১৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর* (১৯৩৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৬৮৭

১৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লড়াইয়ের মূল', *কালান্তর,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৬০৪-৬০৬

১৮১. উদ্ধৃত নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮

১৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সভ্যতার সংকট* (১৯৪১), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, *তদেব,* পৃ.৭৩৩

১৮৩. উদ্ধৃত অমরেশ দাশ, *রবীন্দ্রচিন্তায় সমাজতন্ত্র,* ১৩৯৪, পৃ. ৪৫

১৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩১), ১ সংখ্যক চিঠি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ৩৭৮

১৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপ্রকাশিত রচনা, রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত, উদ্ধৃত অমরেশ দাশ, *তদেব*

১৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিজয়ী', *পূরবী* (শ্রাবণ ১৩৩২), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, *তদেব*, পৃ. ৫৮৭-৫৮৮

১৮৭. অমরেশ দাশ, *তদেব*, পৃ. ৬৪

১৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'এবার ফিরাও মোরে', *তদেব*

১৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রার্থনা', *নৈবেদ্য*, সঞ্চয়িতা, পৃ. ৪৪২

১৯০. উদ্ধৃত অমরেশ দাশ, *তদেব*, পৃ. ১০৮

১৯১. উদ্ধৃত অমরেশ দাশ, *তদেব*, পৃ. ১২০

১৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজর্ষি* (১৮৮৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী,৭ম খণ্ড, অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ. ১২৪

১৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯০৯), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, *তদেব*, জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৬৩৩

১৯৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'এবার ফিরাও মোরে', *তদেব*

১৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রথযাত্রা* (প্রবাসী, ১৩৩০ অগ্রহায়ণ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ৩০১

১৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালের যাত্রা*, ১৩৩৯, উৎসর্গপত্র

১৯৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অমৃত', *শ্যামলী* (ভাদ্র ১৩৪৩), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২২

১৯৮. উদ্ধৃত কান্তি গুপ্ত, *তদেব*, পৃ. ৪৯

১৯৯. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'ইতালীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি মিথ', প. ব. ইতিহাস সংসদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে বহির্ভারত বিভাগে পঠিত নিবন্ধ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ নভেম্বর ১৯৯১), *ইতিহাস অনুসন্ধান-৭ম খণ্ডে* মুদ্রিত, পৃ. ৬৮৪

২০০. E. R. Chamberlin, *Everyday Life in Renaissance*, G. B., 1965

২০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ওরা কাজ করে', *আরোগ্য* (ফাল্গুন ১৩৪৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২৭

২০১ক. রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি, *রামমোহন স্মরণ*, ১৯৮৯, পৃ. ৮২৭

২০২. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'চল্লিশের দশক : অন্য এক রেনেসাঁস', ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত), *বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা*, ১৯৯২, পৃ. ৫২০

২০৩. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'চল্লিশের দশক : অন্য এক রেনেসাঁস', ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত), *বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা*, ১৯৯২, পৃ. ৪৮৩-৫২৫

২০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলাকা*, ৩৭ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃ. ৪৭১

দশম অধ্যায়

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ দান ঃ বাংলা সাহিত্য

‘আ মরি বাংলা ভাষা’

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রেক্ষাপট যখন সবে আঁকা হচ্ছিল, তখন বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছিল ওরিয়েন্টালিস্ট ও অ্যাংলিসিস্টদের মধ্যে। ভাষা ও শিক্ষার প্রশ্নে সংস্কৃত না ইংরাজি—এ প্রশ্নের নীতিগত সমাধান সম্পন্ন হয়েছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ রামমোহনের একটি নির্ণায়ক পত্রের দ্বারা (১৮২৩)।[১] এদেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলে (১৮১৩) ওরিয়েন্টালিস্টরা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দেন। অ্যাংলিসিস্টরা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে। বিবাদ ও বিতর্কটা ছিল ভিন্ন মতাবলম্বী দু'দল সাহেবের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। রামমোহনই হলেন প্রথম ভারতীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি এ বিষয়ে নির্ণায়ক অভিমত জ্ঞাপন করেন। যে অর্থে সংস্কৃত কলেজের জন্য বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল, অতঃপর সিদ্ধান্ত হয়, নির্মিত এই প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্যটির একদিকে চলবে সংস্কৃত কলেজ, অন্যদিকে হিন্দু কলেজ। প্রাচ্য সংস্কৃত শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ইংরাজি শিক্ষার দু'টি ধারা সংহত হয়েছিল এই কলেজ-গৃহের স্থাপত্যে (১৮২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি)। কলেজ গৃহটির পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

> “মনে হয় বাস্তব রাজ্যের নয় ভাব রাজ্যের কোন আর্কিটেক্ট যেন কলেজ গৃহটির পরিকল্পনা করেছিলেন।”[২]

দু'টি ভিন্ন ধারার ভাষা ও শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সংহতির মূলে যাঁর চিঠি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়, সেই রামমোহন কিন্তু তথাকথিত অর্থে ওরিয়েন্টালিস্টও ছিলেন না, ছিলেন না অ্যাংলিসিস্টও। তিনি সংস্কৃত ভাষার বিস্মরণ থেকে উপনিষদাদি অনুবাদের মাধ্যমে যেমন বাংলায় এনে দেন, তেমনি ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারকে স্বাগত জানান। উভয় বিদ্যাকে সমান গুরুত্বে অভ্যর্থনা করার মতো ভারসাম্যযুক্ত ক্রান্তদর্শী মনন তাঁর ছিল।

পরে দেখা যায় কলেজ-গৃহটির এক অংশ থেকে (সংস্কৃত কলেজ) বের হয়ে আসছেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগর, অন্য অংশ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছেন নবযুগের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই বিপরীত বিদ্যা-চর্চার পথ ধরে বের হয়ে আসা দু'টি বিপরীত ব্যক্তিপ্রতিভার মিলন-মৈত্রীর বাস্তব কাহিনী আসলে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের একটি রূপক গল্পের মতোই। বাংলা গদ্য ও পদ্যের নবায়নে এক পরস্পরসাপেক্ষ যুগলবন্দীর আসর যেন।

বিদ্যাসাগর *‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব’*-এ স্পষ্টই লিখেছেন,

> “ইহা একপ্রকার বিধিনির্বন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় (*বাংলার মতো নব্য-ভারতীয় ভাষায়—শ. মু.*) সন্নিবেশিত

না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি করা যাইবে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।"[৩]

ইতালীয় রেনেসাঁসে কাস্তিলিওনের সুবিখ্যাত *'কোর্টিয়ার'* গ্রন্থে গৃহীত ভাষাদর্শ সম্পর্কে লিখেছেন,

"He prefers his native lombard dialect because it sustains Latin words in forms that are 'pure, whole, proper and unchanged in any part."[৪]

প্রায় একই কথা। রেনেসাঁসের আমলে ইতালি ভাষা যে পুষ্পিত উদ্যান হয়ে উঠেছিল, তার কারণ ছিল প্রাচীন লাতিন ভাষার উৎস থেকে রস ও রসদ সংগ্রহ করা। শুধু লাতিন ভাষা নয়, জীবনবাদী ও পৌরুষপূর্ণ গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের দিকেও ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও সাহিত্যিকরা মেলে দিয়েছিলেন তাদের আগ্রহের নিবিড় পত্ররাজি। প্রায় একই ব্যাপার ঘটে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের দিকে ইয়ং বেঙ্গলরা প্রসারিত করেছিলেন তাদের সূর্যপিপাসু আগ্রহ। মাইকেল এক চিঠিতে পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য চর্চার নিবিড় রুটিনের ছবি তুলে ধরে লিখেছিলেন, "আমি কি আমার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এতদূর পরিশ্রম করছি না।' ইতালীয় রেনেসাঁসে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ভাষা-চর্চার প্রতি যে আতিশয্যপূর্ণ আগ্রহ প্রথম দিকে দেখা গিয়েছিল, পরে তা মন্দীভূত হয় এবং মাতৃভাষা ইতালির চর্চায় কেন্দ্রীভূত হয়। প্রবাস ও প্রত্যাবর্তনের এই নাটক বঙ্গীয় রেনেসাঁসে ইয়ং বেঙ্গলদের ভাষা-চর্চাতেও দেখা যায়। মাইকেল লেখেন,

"ভাই সত্যই বলিতেছি, আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর।....এই ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছা হয়।"[৫]

একদিকে সংস্কৃত পথযাত্রী বিদ্যাসাগর, অন্যদিকে ইংরাজিয়ানার বিপরীত যাত্রী প্যারীচাঁদ মিত্র ও মাইকেল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজীবন সঞ্চারে পালন করলেন কার্যকরী ভূমিকা। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যের 'সাহিত্যসম্রাট' হতে পেরেছিলেন, তার পিছনে ছিল এই আপাতদ্বৈত সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার মিলনমুখী ও সৃজনময় পটভূমিকা। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার ভূতল থেকে বঙ্কিম সংগ্রহ করেছিলেন তার রস, আর আধুনিক ইংরাজি ভাষার মধ্যে প্রবাহিত আলো-হাওয়া থেকে নিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় অন্য রসদ।

'দুইটি গুরুতর বিপদ'

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে 'দুইটি গুরুতর বিপদ' ছিল। *'অতি-ইংরাজিয়ানা'* ও 'অতি-সংস্কৃতানুসারিতা'। ১৮৩৫ সালে মেকলে প্রবর্তিত সরকারী শিক্ষানীতির মদতে সৃষ্টি হয়েছিল 'অতি-ইংরাজিয়ানা'র ঝোঁক আর এদেশীয় 'ভট্টাচার্য অধ্যাপক'দের রক্ষণশীলতার কারণে 'অতি-সংস্কৃতানুসারিতা'র প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্কিম এই দ্বিবিধ বিপদের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না।......পণ্ডিতদের

কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।"[৬]

তারাশঙ্কর তর্করত্নের *'কাদম্বরী'* অনুবাদের মধ্যে মেলে সংস্কৃতানুসারিতার পীড়নময় মূর্তি। অন্যদিকে মেকলে গৃহীত শিক্ষানীতি. ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র ও উন্নতিকামী শিক্ষিতশ্রেণীর দাসসুলভ মনোভাবের পারস্পরিক সম্মিলনে ইংরাজিয়ানার যে অসংগত প্রভাব বৃদ্ধি পায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তার স্বরূপচিত্র এইরকম,

"লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেক্চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে।"[৭]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসেব ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে অতি-সংস্কৃতানুসারিতা ও অন্ধ ইংরাজি-ভক্তির 'দুইটি গুরুতর বিপদ' হইতে মুক্তিযাত্রার ইতিহাস। ভাষা ও বিদ্যাচর্চার দুই বিপরীত তীরকে ছুঁয়ে, কিন্তু অতিক্রম না করে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ভাষাচর্চা এগিয়ে চলেছিল আপন স্বাতন্ত্র্যকে শক্তিশালী করতে করতে, নদী যেমন চলে অনতিক্রম্য দুই পাড়ের প্রভুত্ব মেনে দু'পাড়-গড়ানো জলরাশি আকর্ষণ করতে করতে।

'ইংরাজি মৃত সিংহের চর্ম্ম-স্বরূপ'

বামমোহন থেকে ববীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রায় সকল অগ্রপথিককেই সামিল হতে হয়েছিল এই মুক্তিযাত্রার সংগ্রামে। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের মানস-সংগ্রামে শিক্ষিত বাঙালী ইংরাজি ও মাতৃভাষার মধ্যে দোদুল্যমান ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, প্যারীচাঁদ মিত্রের পরেও বঙ্কিমকে তাই ঔপনিবেশিক দাসত্বের বরণীয় বিকারকে ধিক্কার জানিয়ে সংকীর্ণতা-বর্জিত ভাষায় লিখতে হয়,

"ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতী ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয় ততই ভাল।......অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না।........ আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম্ম-স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব।..........যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"[৮]

মাতৃভাষার সপক্ষে এই সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথে এসে লাভ করে দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য। সংস্কৃত ও ইংরাজি-বিদ্যার উৎস থেকে মাতৃভাষাকে সম্পদশালী ও শস্যশালিনী করার যে দ্বৈত প্রবাহ বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রে এসে মিলেছিল, রবীন্দ্রনাথে দেখা যায় তারই সাঙ্গীকৃত শ্রীময়ী রূপ। সংস্কৃত ভাষার ভাষাগত ঐশ্বর্য ও ভাবগম্ভীর স্বরূপটিকে তিনি সম্যক শ্রদ্ধায় আত্মস্থ করেছেন, তাঁর মননশীল ও সৃজনশীল রচনার মধ্যে। রবীন্দ্র-

রচনাবলীর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, 'ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার ভাষা সংস্কৃত ভাষা'র মর্মরিত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। অন্যদিকে ইওরোপীয় ভাষা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিকেও তিনি 'আধুনিক ভারতের চিত্তদূত' রূপে বরণ করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। শিক্ষা ও ভাষার প্রশ্নে সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ইংরাজি ও বাংলা ভাষার মধ্যে উপাদান ও নির্মাণমূলক পারস্পরিক সম্পর্কের যে পটভূমি প্রস্তুত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বাগত জানালেন তাঁর শিক্ষাদর্শের মিলনতীর্থে। বললেন,

> "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা তীর্থস্থান হইবে।"[৯]

'প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়'

ঔপনিবেশিক শিক্ষার চাপে বেঁকে যাওয়া এদেশের একদল উচ্চশিক্ষিত মানুষের অতি-ইংরাজিবাদ ও মাতৃভাষার প্রতি প্রত্যাশিত সহজ স্বাভাবিক অনুরাগের মধ্যে একটি মামলা অনেকদিন ধরে চলছিল বঙ্গসংস্কৃতির মাননীয় আদালতে। এই মামলায় বঙ্কিমচন্দ্র নামে এক সম্মানিত ডেপুটির রায় আমরা আগে জেনেছি, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথকেও এ বিষয়ে দিতে হয়েছিল তাঁর চূড়ান্ত মতামত। বলা বাহুল্য সে মতামত গেছে দ্বিধাহীনভাবেই মাতৃভাষার সপক্ষে—

> "দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।"[১০]

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলা ভাষার সমাদৃত মর্যাদা—

> "শান্তিনিকেতনে শিক্ষার বাহন বাংলা বলিলে কম বলা হয়। এখানকার জীবনের বাহনই বাংলা ভাষা।"[১১]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অভিভাষণে তিনি আবেগকম্পিত ভাষায় যে প্রার্থনাটি ব্যক্ত করেছিলেন তা এইরকম—

> "বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি : তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালি চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।"[১২]

নানা নদী যেমন এসে মেলে সমুদ্রের আকাশচুম্বিত নীল তরঙ্গে, রবীন্দ্রনাথে তেমনি এসে মিলেছিল নানা উৎস থেকে বের হয়ে আসা নানা বিদ্যা ও চেতনার অপরিমিত ধারা। কোনো কিছুকেই অগ্রাহ্য না করে, তিনি যে সমুদ্রে তাদের আশ্চর্য সঙ্গতি-সূত্রে সাঙ্গীকৃত করেছিলেন তার নাম বাংলা ভাষা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বলেছেন,

> "রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার মুখ্য প্রকাশ ঘটিয়াছে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে।"[১৩]

আসলে উনিশ শতকে সূচিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসেবই সম্যক আত্মপ্রকাশ ঘটে ভাষা ও সাহিত্যে।

ইতালীয় রেনেসাঁসে যেমন চিত্র

প্রত্যেক সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই নিজস্ব ভাষা থাকে—আত্মপ্রকাশের ভাষা। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার আত্মপ্রকাশের ভাষা ছিল ভাস্কর্য. মধ্যযুগে জোর পড়েছিল স্থাপত্যের উপর। ইতালীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ শিল্প-মাধ্যম ছিল অবিসংবাদিতভাবে চিত্রকলা,

"Painting was the art of arts of Italy."[১৪]

রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর নোটবইতে চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্য, ও ভাস্কর্যের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনায় প্রতিপন্ন করেছেন চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্ব। চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ সেই আলোচনায় তিনি লিখেছেন,

> "কবি যদি লিখে লিখে কোনো বিষয়ের রূপ বর্ণনা করেন, চিত্রকর আলো ও ছায়ার সাহায্যে তাকেই প্রত্যক্ষ এবং সজীব করে তোলেন। কবি তাঁর কলম দিয়ে যা করতে পাবেন না, চিত্রকব তার তুলি দিয়ে তা সম্ভব করে তোলেন।......ধরো, একজন কবি এক বমণীব প্রণয-সৌন্দর্য বর্ণনা করলেন এবং একজন চিত্রকর তাকে আঁকলেন ছবিতে. দেখবে. বিচারক স্বভাবতই কার দিকে প্রেমমুগ্ধ ভাবে ঝুঁকে পড়ে।"[১৫]

ইতালীয় রেনেসাঁসে অঙ্কিত চিত্রেব সংখ্যা এবং তাঁদের গুণগত মান আমাদের বলে দেয়. তার প্রকাশগত শ্রেষ্ঠ মাধ্যম চিত্রই। ইতালীয় রেনেসাঁসে যেমন তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত দিক থেকে প্রতিপাদিত হয়েছিল চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মাননিক ও নান্দনিক অভিব্যক্তির চূড়ান্ত স্ফূর্তি ঘটেছে তার সাহিত্যে। সাহিত্যেই সে রেখেছে তার উজ্জীবিত জীবনবাদেব নিগূঢ় ঐশ্বর্য। ইতালীয় রেনেসাঁসে তত্ত্বগত দিক থেকে চিত্রশিল্পের সপক্ষে যে বক্তব্য রেখেছিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, বঙ্গীয় রেনেসাঁসে তাত্ত্বিকভাবে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক সেই বক্তব্য রাখেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তব্যকে আরো গভীরতা, আরো প্রসারিত ও প্রমাণসিদ্ধ সংহতি দান করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ণয়ে সাহিত্য

'আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

> "কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা......
> *সৌন্দর্য্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে।*"[১৬]

এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? সে-সম্পর্কে সরাসরি কোনো তুলনামূলক আলোচনা না করলেও তাঁর বক্তব্য অন্যত্র ব্যক্ত হয়েছে। *'রজনী'* উপন্যাসে অমরনাথ প্রবৃত্ত হয়েছে সেই আলোচনায়—

"সেক্সপীয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে......ঐ পুস্তকস্থিত চিত্রসকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে যাহা বাক্য ও কার্য্য দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করতে যাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণই হইতে পারে না.......আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সতীত্বের অহঙ্কার কৈ? জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?"[১৭]

চিত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। কবি বা সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় বঙ্কিম *'উত্তরচরিত'*-এ লিখেছেন,

"উদ্দেশ্য ও সফলতা বিবেচনা করিলে রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্বপক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্ত্তা এবং সর্বাপেক্ষা মানসিক শক্তিসম্পন্ন।......সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"[১৮]

রবীন্দ্র নির্ণয়ে সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলা

রবীন্দ্রনাথ *'সাহিত্য'* গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ' নামক প্রবন্ধে বলেছেন,

"সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয়ে পাই, তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্য দ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে; ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য, ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা।"[১৯]

লিওনার্দো যেমন চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে অপরাপর শিল্পমাধ্যমগুলিকে খাটো করে দেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। তিনি ছবি, গান ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন ছবির যেমন নিজস্ব একটা ক্ষেত্র আছে, গানেরও তা আছে। কবিতা চলে উভয়কে মিলিয়ে নিয়ে। *'জাপানযাত্রী'*তে তিনি লিখেছেন,

"ছবি জিনিসটা অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি ; অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপ-রাজ্যের কলা ছবি, অরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওঠে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একদিকে অর্থ, আর একটা দিক সুর ; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।"[২০]

'সাহিত্যের তাৎপর্য' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন,

"চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।......ভাষার মধ্যে

ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষাব মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।"[২১]

রবীন্দ্রনাথের কাছে সুর ছিল 'কথার মেলোডিক এক্সটেনশন', 'বাণীর সুদূরপ্রসারী অস্তিত্ব, তার আলোকিত বিকাশ'।[২২] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যেখানে সকল বিশ্বের harmony-র মূল আমার গানে আমি সেখানে পৌঁছুই।'[২৩]

"কথাব সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিযে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখ দুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত সন্ধ্যায় দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অপরূপতা লাভ কবে। তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে।"[২৪]

ছবি বা নাচের গুরুত্বই বা কেন রবীন্দ্রনাথের মতো শব্দ-শিল্পীর কাছে অপরিহার্য? লিখেছেন,

"বিপুল বিশ্বের অন্তহীন নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দের জগৎ ক্ষুদ্র একটি বুদবুদ মাত্র। অঙ্গভঙ্গির ভাষাই হচ্ছে বিশ্বজগতের ভাষা। সে যখন কথা বলে—আপনাকে প্রকাশ করে তখন তা করে ছবি ও নাচের ভাষায়।"[২৫]

আকাশে কান পেতে যিনি শুনেছেন বিশ্বপ্রকৃতির সুর, রূপের রাজ্যে চোখ মেলে স্পষ্ট বুঝেছেন 'জগৎটা আকারের মহাযাত্রা', তাঁর কাব্য তাই শব্দ ও অর্থের সমারোহ মাত্র নয় একাধিক শিল্পাঙ্গিকের সংহত বাণীরূপ। 'বিজয়িনী' কবিতার উদাহরণ দিয়ে অনায়াসে সপ্রমাণ করা যায় বাংলা কাব্যের সেই শিল্পিত স্বরূপটি। সঙ্গীত এবং চিত্র সহসা যেন জমে গিয়ে একটি অনিন্দ্য ভাস্করকীর্তিকল্প নারীরূপে দেখা দেয়—

"অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে ; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে, অধরে,
উরু'পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।......
—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুতবসনের মতো রহিল পড়িয়া ;
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।"[২৬]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সর্বোত্তম প্রকাশ সাহিত্যে

ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বোত্তম প্রতিফলন ঘটেছিল তার চিত্রকলায়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন ক্ষেত্র তেমনি তার সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আশ্রয় করেই

জাতি হিসাবে বাঙালী স্বাক্ষর রেখেছে তার সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক প্রতিভার। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অল্পাধিক শতবর্ষের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে পরিমাণগত ও গুণগত বিকাশ ঘটেছে বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে তার নজির নেই। ইতালীয় রেনেসাঁস তার শিল্প ও চিত্র-প্রতিভার ঔৎকর্ষে যে মর্যাদাপূর্ণ নান্দনিক আসন অধিকার করেছে বিশ্ব-সংস্কৃতিতে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ তা অধিকার করেছেন সাহিত্য-চর্চার সৌজন্যে।

রবীন্দ্রনাথ কোনো বিক্ষিপ্ত, অব্যাখ্যাসম্ভব, দৈবী ব্যক্তিত্বের নাম নয়, রামমোহনের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে যে জাগরণের সূচনা, সাহিত্যাশ্রিত সেই বহু ধারাময়ী, ও ক্রমশ-সমৃদ্ধ মনন ও সৃজনময় সামাজিক আত্মপ্রকাশের শতবর্ষব্যাপী তুমুল আন্দোলনের উত্তুঙ্গ পরিণামের নামই রবীন্দ্রনাথ।

রেনেসাঁস-পথিকদের হাতিয়ার ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যকে রেনেসাঁসের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিফলনক্ষেত্র বলছি আমরা যে যে কারণে তা এইরকম ঃ

১. 'রেনেসাঁস-ম্যান' বলতে যা বোঝায় তা সে হিউম্যানিস্ট অর্থেই হোক, আর আর্টিস্ট অর্থেই হোক ; মননশীল ব্যক্তি অর্থেই হোক, আর সৃজনশীল ব্যক্তি অর্থেই হোক ; বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিপ্রতিভার প্রায় প্রত্যেকেই যুক্ত ছিলেন ভাষা ও সাহিত্য সাধনার সঙ্গে। জীর্ণ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার বহ্ন্যুৎসবের নায়ক যাঁরা এবং নতুন জীবনবাদের পুষ্পময় উদ্যানের যাঁরা রচয়িতা, তাঁরা সকলেই ছিলেন কোন-না-কোন ভাবে ভাষাপথিক বা সাহিত্য সাধক। পুরাতন জীবনধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে, বা নতুন জীবনবাদের সৌন্দর্য-স্বপ্ন রচনা করতে গিয়ে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অগ্রপথিকরা শেষ পর্যন্ত হাতিয়ার হিসাবে তুলে নিয়েছিলেন ভাষাকেই। রামমোহন, ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ—ধারাবাহিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্রমশ-সমৃদ্ধ এক ইতিহাস। ইতালীয় রেনেসাঁসে জোত্তো থেকে বতিচেল্লি, ভেরোচিও থেকে লিওনার্দো, জর্জিনো থেকে টিশিয়ান, রাফায়েল থেকে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো—তাদের সৃজনময় আত্মপ্রকাশের গোটা ব্যাপারটা মুখ্যত চিত্রকলাকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে মূর্ত রেনেসাঁসের লক্ষণমালা

২. রেনেসাঁসের মৌল লক্ষণগুলি বঙ্গীয় রেনেসাঁসে মূর্ত হয়েছিল প্রধানত সাহিত্যে।

ক. 'রিভাইভাল অব লার্নিং' অর্থাৎ প্রাচীন বিদ্যার পুনর্বাসন রেনেসাঁসের প্রধানতম লক্ষণ। রামমোহনের উপনিষদ অনুবাদ, বিদ্যাসাগরের *'শকুন্তলা'*, *'সীতার বনবাস'* প্রভৃতি অনুবাদ, মাইকেলের রামায়ণ-মহাভারতাশ্রিত *'মেঘনাদবধ কাব্য'*, *'শর্মিষ্ঠা'* রচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের *'কৃষ্ণচরিত্র'* রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধ-সংস্কৃতির নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিপুল পরিগ্রহণ রেনেসাঁসের মৌল আবেগটিকেই সপ্রমাণ করে।

খ. অন্যতর জীবনবাদী সংস্কৃতিকে (গ্রীক) সাগ্রহে বরণ করার ব্যাপার ইতালিতে যেমন ঘটেছিল, এখানেও তা দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপগত ও ভাবগত প্রভাব স্বীকার করে বাংলা সাহিত্যের নবায়ন ঘটে। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, গীতিকবিতা, সনেট প্রভৃতি সাহিত্যিক রূপ ও রীতি দেখা দেয়। টম পেইন, হিউম, স্টুয়ার্ট মিল, কোমতে প্রমুখ চিন্তাবিদদের সঙ্গে সেকস্‌পীয়র, স্কট, বায়রণ, শেলী, কীটস্‌, ক্যাম্পবেল, মুর প্রমুখ সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যের ভাব ও প্রকাশগত শৈলীর ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। মাইকেল থেকে রবীন্দ্র-চর্চিত বাংলা সাহিত্যে আছে সেই পশ্চিমী হাওয়ার অবিরাম প্রবাহ। মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্য থেকে আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের মৌলিক তফাৎ ঘটে যায় এই **পাশ্চাত্য প্রভাবের** কারণেই।

গ. রেনেসাঁসে ঘোষিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় অমানবিক সমাজনীতি ও জীবনবিমুখতার বিরুদ্ধে একটি তীক্ষ্ণ সংগ্রাম। বঙ্গীয় রেনেসাঁসে সেই রণধ্বনি রামমোহনের সতীদাহ-প্রথা রদের চেষ্টায়, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলনের মধ্যে ; অক্ষয় দত্তের বিজ্ঞাননিষ্ঠ রচনাদিতে, ডিরোজিওর *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* কাব্যে, মাইকেলের প্রহসনগুলির মধ্যে শোনা যায়। সতীদাহ-প্রথা রদের জন্য রামমোহন রচিত পুস্তিকায়, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে যে **সংগ্রামী চারিত্র্য** বিদ্যমান—রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ রচনার মধ্যেও ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার সেই আহ্বান সদাক্রিয় ছিল।

ঘ. রেনেসাঁসে শুরু হয়েছিল ধর্মীয় নিগড় থেকে মানুষের উদ্ধার-প্রকল্প। ধর্ম-সম্প্রদায়-জাতিগত পরিচয়ের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার সেই নির্মল প্রয়াস বঙ্গীয় রেনেসাঁসে প্রথমাবধি ক্রিয়াশীল ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, অক্ষয় দত্ত, মাইকেলের রচনাদি অনুধাবন করলে দেখা যাবে দেববাদ-বিনির্মুক্ত পৌরুষপূর্ণ, জ্ঞানোজ্জ্বল ও হৃদয়ধর্মনিষ্ঠ মানবিক জীবনকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস রয়েছে। মাইকেলের *'মেঘনাদবধ'* থেকে রবীন্দ্রনাথের *'নৈবেদ্য',* বিদ্যাসাগরের *'সীতার বনবাস'* থেকে রবীন্দ্রনাথের *'চতুরঙ্গ',* ডিরোজিওর *'দ্য ফকির অব্ জঙ্গীরা'* থেকে রবীন্দ্রনাথের *'গোরা'*য় পরিস্ফুটিত বিশুদ্ধ **মানবতাবাদের** আলোকোজ্জ্বল রূপ রেনেসাঁসের অন্যতম দান।

ঙ. ইতালীয় রেনেসাঁসে সৌন্দর্যের যে বাসন্তিক লাবণ্যপ্রভা মঞ্জরিত হয়েছিল, লিওনার্দোর *'মোনালিসা'* বা বতিচেল্লির *'ভেনাসের জন্ম'* ছবিতে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসে চিত্রকলায় না হোক, সাহিত্যচর্চায় তার সাক্ষাৎ মেলে। ডিরোজিওর নলিনী, মাইকেলের প্রমীলা বা কৃষ্ণকুমারী, বঙ্কিমের তিলোত্তমা বা কুন্দনন্দিনী, রবীন্দ্রনাথের 'নান্নী' কবিতাগুচ্ছ বা 'বিজয়িনী'র কথা স্মরণে রাখলে, একথা স্বীকার করতেই হয়, **সৌন্দর্য সৃষ্টিতে**—বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কবি-সাহিত্যিকরা কোন অংশেই পেছিয়ে ছিলেন না।

চ. রেনেসাঁস মানুষকে নিখিল বিশ্বের বাসিন্দা করে দিয়েছিল। রেনেসাঁসের সংস্কৃতি মূলত কসমোপলিটান। রামমোহন, ডিরোজিও, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সৌজন্যে বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য চরিত্রগতভাবে **কসমোপলিটান** হয়ে উঠেছে। বিশ্বের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চারিত্র্য বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান। সংকীর্ণ জাতিপ্রেম ও নির্দিষ্ট ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে বাংলা সাহিত্য সর্বমানবিক ও বিশ্বজনীন চারিত্র্যে উত্তীর্ণ

হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠিত উচ্চারণে বলতে পারেন,

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তাব জাগিবে তখনি"—[২৭]

ছ. রেনেসাঁসের শিল্পী বলেন, মানুষকে অবশ্যই প্রকৃতির কাছ থেকে নিতে হবে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঠ। তাই জোত্তো থেকে জর্জিনো, বতিচেল্লি থেকে লিওনার্দো সকলেই মানুষকে স্থাপন করেছিলেন প্রকৃতির বিশাল-বিস্তৃত-জীবন-শৃঙ্খলের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে। প্রকৃতির রস-রহস্যে আকৃষ্ট দেবেন্দ্রনাথ অরণ্যে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন। এই **প্রকৃতিপ্রেম** রবীন্দ্রনাথে প্রসারিততর রূপ লাভ করেছিল। বিহারীলালের *'নিসর্গ-সন্দর্শন'* থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের *'কপালকুণ্ডলা'*; নবীনচন্দ্র সেনের *'অবকাশ রঞ্জিনী'* থেকে রবীন্দ্রনাথেব *'ছিন্নপত্র'*-এ নিসর্গের অন্তরঙ্গ উজ্জীবক উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যকে সত্যিই বিশালত্বের ব্যঞ্জনাযুক্ত করেছে। এই নিসর্গপ্রেম বিভূতিভূষণের *'আরণ্যক'*-এ জীবনানন্দের *'রূপসী বাংলা'*য় সৌন্দর্যঘন আকার লাভ করেছে। অক্ষয় দত্ত বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির সম্পর্ক সন্ধান করতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের সাহিত্যিক পুনর্বাসন ঘটিয়েছেন বহু গানে ও কবিতায়—

"আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥"[২৮]

জ. মধ্যযুগের গ্রন্থগুলি ছিল গুরুগম্ভীর। রেনেসাঁসে জীবন আবার সরস হয়ে ওঠে। মানুষ খুঁজে পায় হাসির খোরাক। ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা ('sharp eyes and bad tongue') ও নির্মল রসিকতা (যে রসিকতা শ্রোতার কান কামড়ায় 'not like dog but like sheep')-দু'রকম বসিকতারই বাড়বাড়ন্ত লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যেও আক্রমণাত্মক হাস্যরস ও সহানুভূতিমিশ্রিত নির্মল হাস্যরসের প্রবাহ যেন নতুন সংবেগ পেয়েছিল। ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যেমন উদ্‌ঘাটিত করছিলেন জীবনের গ্লানিময় অসংগতিগুলি ; তেমনি সহানুভূতি-সজল ও বিশুদ্ধ হাস্যরসের নির্মল রৌদ্র দিয়ে তাঁরা পরিশুদ্ধ করে দিচ্ছিলেন মানবিক পৃথিবীকে। মাইকেলের *'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'*, দীনবন্ধু মিত্রের *'সধবার একাদশী'*, বঙ্কিমের *'কমলাকান্তের দপ্তর'*, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'ভারত উদ্ধার'*, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, রাজশেখর বসুর *'চিকিৎসা সংকট'*, রবীন্দ্রনাথের *'চিরকুমার সভা'*, শরৎচন্দ্রের 'ছিনাথ বহুরূপী'র পরিকল্পনার মধ্যে কৌতুকমণ্ডিত সরস জীবনের নানা প্রত্যন্ত জেগে উঠেছে।

ঝ. রেনেসাঁসের চিত্রকলায় গ্রীক ও রোমান পুরাণের নানা কথিকা, খ্রীষ্টীয় মহিমার নানা প্রগল্ভ বর্ণবিভাবিত প্রকাশ লাভ করেছিল। সেখানে যেমন এসেছে *অ্যাপোলো-আফ্রোদিতি*, *'লেডা-সোয়ান'*, *'ভেনাস-কুপিডের'* গল্প ; তেমনি *'সেবাস্তিয়ান'*, *'আদমের জন্ম'*, *'রূপান্তরণ'*, *'শেষ ভোজ'* প্রভৃতি ধর্মীয় ও পৌরাণিক প্রসঙ্গ। বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে-নাটকে পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্র নতুন জীবন লাভ করেছে যেন। মাইকেলের *'শর্মিষ্ঠা'*, *'পদ্মাবতী'* নাটক, *'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'*, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'বৃত্রসংহার'*, নবীনচন্দ্র সেনের

'রৈবতক'. গিরিশচন্দ্র ঘোষের *'জনা'*, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের *'নরনারায়ণ'*, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *'সীতা'*, মন্মথ রায়ের *'কারাগার'*, রবীন্দ্রনাথের *'গান্ধারীর আবেদন'* বা *'কর্ণকুন্তীসংবাদ'*, *'চিত্রাঙ্গদা'* প্রভৃতি পুরাণমিশ্রিত নাট্য ও কাব্যগুলির কথা এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ইতালীয় রেনেসাঁসের শিল্পীরা পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও চরিত্রগুলিকে যেমন কালোচিত মানবিক ব্যাখ্যা দান করেছিলেন, এখানে পুরাণাশ্রিত সাহিত্যেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। মাইকেলের *'শর্মিষ্ঠা'*, ক্ষীরোদপ্রসাদের *'নরনারায়ণ'*, বা রবীন্দ্রনাথের *'কর্ণকুন্তীসংবাদ'*, পৌরাণিক কাহিনীর হুবহু প্রতিলিপি নয়। মানবিক আবেদন. নান্দনিক সূক্ষ্মতা ও চারিত্রিক ঐশ্বর্যে এগুলি আধুনিক সৃষ্টির গৌরব পাবার যোগ্য।

ঞ. ইতিহাস ছিল রেনেসাঁসের অন্যতম প্রিয় বিষয়। ইতিহাস হচ্ছে সত্যের আলোকশিখা তা মানুষকে অতীত ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে. জীবন চলার পথে দেয় সঠিক নির্দেশিকা— সিসেরোর এই ইতিহাস-দর্শন শিরোধার্য করে সালুতাতি থেকে গুইচারদিনি. লিওনার্দো ব্রুনি থেকে মেকিয়াভেলি বহু হিউম্যানিস্ট অনুসন্ধান ও গঠনমূলক ইতিহাস-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অতীতের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করার এই আবেগ বাংলাতেও দৃশ্যমান। বিদ্যাসাগরের *'বাঙ্গালার ইতিহাস'*, অক্ষয় দত্তের *'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'* প্রভৃতি অনুবাদমূলক রচনার পর্ব পেরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রে তীব্র হয়ে উঠেছিল ইতিহাস-চর্চার রেনেসাঁসোচিত আবেগ— 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।' রাজেন্দ্রলাল মিত্র. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রমুখের সৌজন্যে বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস-চর্চার দ্বার অবারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়. কাব্য-নাটকের জগতেও বাংলার কবি-নাট্যকাররা ইতিহাসকে সাদব অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় *'কাঞ্চী কাবেরী'*, মাইকেল *'কৃষ্ণকুমারী'*. ভূদেব মুখোপাধ্যায় *'অঙ্গুরীয় বিনিময়'*. বঙ্কিমচন্দ্র *'রাজসিংহ'*, গিরিশচন্দ্র ঘোষ *'সিরাজদৌল্লা'*. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় *'সাজাহান'*, *'মেবারপতন'*, শচীন সেনগুপ্ত *'গৈরিক পতাকা'*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *'পাষাণের কথা'* প্রভৃতি কাব্য-নাটক-উপন্যাসে ইতিহাসকে আশ্রয় করেছেন। দীন বর্তমানের প্রয়োজনে বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা প্রবেশ করেছেন ইতিহাসের ভাণ্ডারে। অতীতের উপাদান দিয়ে তাঁরা বর্তমান সাহিত্যের বিষয় ও আদর্শগত দুর্বলতা দূর করতে চেয়েছেন।

ট. রেনেসাঁসের সংস্কৃতি একদিকে যেমন 'self cultivation'-এর কথা বলেছিল, অপরদিকে তেমনি সকল মানুষের জন্য সক্রিয়. সামাজিক হয়ে ওঠার দীক্ষাও দিতে শুরু করছিল (Vita Activa)। পেত্রার্কা বলেছিলেন, 'If you know yourself that is enough.'[২৯] দেবেন্দ্রনাথ আত্মসমাহিত, আত্মোপলব্ধিময় জীবনের যাত্রী ছিলেন, বিদ্যাসাগর বরণ করেছিলেন সক্রিয় সমাজ-কল্যাণের পথ। বাংলা সাহিত্যে দেখি ব্যক্তিমুখীন, আত্মোপলব্ধিময়, মন্ময়তার পাশাপাশি সমাজ-সমস্যার সচেতন রূপায়ণ। বিহারীলাল যখন *'সারদামঙ্গল'*, *'সাধের আসন'* কাব্যে আত্মোপলব্ধির একান্ত বিশ্বরচনায় ব্যাপৃত, তখন দীনবন্ধু মিত্র *'নীলদর্পণ'* নাটকে রূপায়িত করেন বাংলার নীল বিদ্রোহের রক্তাশ্রুলাঞ্ছিত কাহিনী। বাংলা সাহিত্যের এই দ্বিমুখী অভিযাত্রার টানাপোড়েন এসে মিলেছে রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ নামক এক সৌন্দর্যপিপাসু কবির সাহিত্যে নিরুদ্দেশ যাত্রার সমান্তরালে 'ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন/কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন'—এই সামাজিক প্রার্থনাও যথেষ্ট বলবান। মঁতেন যে ব্যক্তিগত মন্ময় গদ্যের কথা বলেছিলেন, তার সাধনা প্রমথ চৌধুরীতে বিদ্যমান, কিন্তু সামাজিক সমস্যার তীব্র তীক্ষ্ণ রূপায়ণ থেকেও বাংলা সাহিত্য খুব পালিয়ে বেড়ায়নি। ডিরোজিওর *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'*তে যে সমাজমনস্কতা ছিল, মনে হতে পারে, রেনেসাঁসের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অতিমার্জিত বঙ্গীয় নায়করা নবকুমার বা অমরনাথ (বঙ্কিমচন্দ্র) রূপে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রণয়-বিরহের সমস্যায় গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু শরৎচন্দ্রের *'পল্লীসমাজ'*-এর রমেশের কথা স্মরণে রাখলে একথা স্বীকার করতেই হয়, শুধু আত্মোপলব্ধিময় লিরিক-যাত্রা নয়, সামাজিক বিশ্বের দিকে কল্যাণ-যাত্রার একটি সচেতন ধারাও রেনেসাঁসই আমাদের দিয়েছিল।

ঠ. রেনেসাঁস চরিত্রমুখ্য ও নায়কপ্রধান একটি সাংস্কৃতিক নাটকের নাম। রেনেসাঁসে ঘটেছিল **ব্যক্তিত্বের জাগরণ**। সমাজ ও জন্ম-পরিচয়ের বাঁধা গৎ ছিঁড়ে এসময় ব্যক্তিমানুষ হয়ে উঠেছিল মননশীল, সক্রিয়, সিসৃক্ষু ও প্রতিষ্ঠাকামী। ইতালীয় রেনেসাঁসের ভেরোচিও বা দোনাতেলো নির্মিত অশ্বারূঢ় সেনাপতির ভাস্কর্যে, কাস্তিলিয়নের *'কোর্টিয়ার'* বা মেকিয়াভেলির *'প্রিন্স'* চরিত্রের পরিকল্পনায় ; চিত্রকরদের অঙ্কিত পোট্রেট-জাতীয় ছবির মধ্যে যে-নায়ক বা নায়িকা-সন্ধানী অভিপ্রায় মূর্ত হয়েছিল, তা উত্তরকালে মিল্টনের কাব্যে, সেক্সপীয়রের নাটকে, বা গ্যেটের *'ফাউস্টে'* সুপরিণত রূপ লাভ করে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মেধাবী ইতিহাস রচিত হয়েছিল বহু মননশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের প্রতিভাক্ষেপে। বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে তারই অপরোক্ষ ছায়া। সেখানে পাওয়া যায় সংগ্রামী, সহৃদয়, রুচিশীল, বহুগুণান্বিত, সংবেদনশীল, ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ও সামাজিক নায়ক-নায়িকা চরিত্রের যত্নময় সংরচনা। মাইকেলের রাবণ, মেঘনাদ ; বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ, রাজসিংহ, অমরনাথ ; দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান, দুর্গাদাস ; রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ, গোরা ; শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, রমেশের পাশাপাশি নারীচরিত্র সৃষ্টিতেও বঙ্গীয় সাহিত্যিকরা সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যে সহৃদয় সংগ্রাম ও সক্রিয়তা দিয়ে নারীর জীবন ও মর্যাদা রক্ষা করেতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, ডিরোজিওর *'দ্য ফকির অব জঙ্গীরা'* থেকে শুরু হয়েছিল তার সাহিত্যিক পুনর্বাসন। মাইকেলের প্রমীলা, কৃষ্ণকুমারী, বীরাঙ্গনা ; বঙ্কিমের দেবীচৌধুরানী, কপালকুণ্ডলা, বিমলা, আয়েষা, ভ্রমর, রোহিনী; দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যবতী, জাহানারা ; রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরানী, বিমলা, কুমু, কেটি, লাবণ্য; শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, অচলা, কিরণময়ী, কমল চরিত্রে নারীত্বের যে বর্ণময় মেধাবী রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে তা রেনেসাঁসেরই দান। অশ্রুলেখায় রচিত *'বীরাঙ্গনা'*র পত্র-পরিকল্পনায় নবজাগ্রত নারীত্বের যে পাঠ আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথের *'মহুয়া'*র 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছে তারই বহু ধারাময়ী স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণময় বিস্তার। পুরাণ, ইতিহাস, সমকাল ও কল্পনার চতুর্দিক বিস্তারিত বলয় থেকে বাঙালী সাহিত্যিকরা যেভাবে তাদের মনোমত ব্যক্তিত্ব ঝঙ্কৃত নায়ক-নায়িকাদের বাংলার সাহিত্য-প্রাঙ্গণে অভিবাসিত বা পুনর্বাসিত করেছেন তা বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে আপূর্ণ।

প্রকাশগত বৈচিত্র্যের সমারোহ

৩. শুধু কনটেন্টের ক্ষেত্রেই নয়, রেনেসাঁসের ফলে বাংলা সাহিত্যের রূপ ও ক্ষেত্রেও আসে আমূল পরিবর্তন। মহাকাব্য, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, সনেট, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, জীবনী-সাহিত্য, পত্রসাহিত্য—সাহিত্যের নানা দরজা খুলে যায়। প্রকাশগত বৈচিত্র্যের এই সমারোহ বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অদম্য প্রাণশক্তির সত্যকেই সপ্রমাণ করে। অবস্থাটা রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বর্ণিত ব্যাকুলতার সঙ্গে তুলনীয়:

"যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল

তরুণ গরুড়সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা
অমর বিহঙ্গ শিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়।"[৩০]

শতধারায় উচ্ছ্বসিত এক ঝর্ণার মতো বাংলা সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে নানা রূপে। নবযুগের কবি মাইকেল নাটক থেকে আখ্যান কাব্য, গীতিকাব্য থেকে পত্রকাব্য, মহাকাব্য থেকে সনেট, ট্রাজেডি থেকে প্রহসনে তাঁর সৃজনময় সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকে বিস্ময়কর-ভাবে সম্প্রসারিত করেন। ইতালীয় রেনেসাঁসে দেখা যায় মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, আলবের্তি বা সেল্লিনি চিত্র থেকে ভাস্কর্য, ভাস্কর্য থেকে স্থাপত্য, স্থাপত্য থেকে সাহিত্যিক রচনাকর্মে অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। বাংলা সাহিত্যের এই বৈচিত্র্যময় প্রকাশগত ঐশ্বর্য রেনেসাঁসেরই লাক্ষণিক দিক। মাইকেল থেকে সূচিত বঙ্গসাহিত্যের বহুমুখী আত্মপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথে মহাসামুদ্রিক বিস্তার লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন প্রায় ছ'হাজারের উপর কবিতা, দু'হাজারের উপর গান, তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যাও হাজার দুই; লিখেছেন শতাধিক অবিস্মরণীয় ছোটগল্প, চোদ্দ খানি উপন্যাস ; নাটক প্রায় অর্ধশত। পঞ্চাঙ্ক সম্বলিত শেক্সপীয়রীয় নাটকের বাঁধা ছক ভেঙে তিনি কবিতার সঙ্গে নাটককে মিলিয়েছেন, নাটকের সঙ্গে গান ও নৃত্য। মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন প্রচুর, লিখেছেন অন্তত তিনখানি জীবনীগ্রন্থ, তিনখানি সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থ, হাস্যরসাত্মক প্রহসন, সনেট ও অজস্র চিঠিপত্র। এক মহাকাব্য বাদ দিলে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে যতরকম রূপ ও রীতির প্রবাহ শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র-প্রতিভার সমুদ্রে তাদের সবগুলিই এসে মিলেছে যেন।

মহাকাব্য

সভ্যতার সঙ্গে মহাকাব্যের সম্পর্ক অহি-নকুল। নবযুগের কবি মাইকেল বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য লিখে ভ্রান্তপথের যাত্রী হয়েছিলেন—এমন কথা বলা হয়েছে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন তাকে অনুসরণ করে খারাপতর দু'টি মহাকাব্য বাংলায় রচনা করেন,

তারপর তা মরুপথে চলে যাওয়া নদীর মতোই ধারা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মহাকাব্য রচনার ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় *রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসি* নামক 'এপিক অব গ্রোথ'-জাতীয় মহাকাব্য সভ্যতার আদি-পর্বে যেমন লেখা হয়েছিল, তেমনি 'লিটারারি এপিক' জাতীয় অন্য ধরনের মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত হয় রেনেসাঁসের যুগে। দান্তের *'ডিভাইন কমেডি'* থেকে এর সূচনা। দান্তের *'ডিভাইন কমেডি'* থেকে তাসোর *'জেরুজালেম দ্য লিবার্টি'* অতিক্রম করে মিল্টনের *'প্যারাডাইস লস্ট'* পর্যন্ত তার একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ করা যায়। আসলে রেনেসাঁস ছিল 'রিভাইভাল অব লার্নিং'—প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্বাসনপর্ব। সে সময় 'নিও-ক্লাসিক্যাল' সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। এই 'নিও-ক্লাসিক্যাল' সাংস্কৃতিক পর্বে দান্তে ভার্জিলের হাত ধরে প্রবেশ করেন *'ডিভাইন কমেডি'*র মহাকাব্যিক রচনা-পর্বে। বাল্মীকির রাম-কাহিনীর যুগোচিত পুনর্বাসনের কাজটি করে মাইকেল বঙ্গসাহিত্যে দান্তের ভূমিকাই পালন করেছিলেন। *'মেঘনাদবধ কাব্য'* রচনার মধ্যে দিয়ে বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্য রচনার যে সূচনা মাইকেল করেছিলেন, রেনেসাঁসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তা কোনও ভ্রান্ত যাত্রা নয়, রেনেসাঁসেরই অভ্রান্ত লক্ষণ। এই সূত্রে *'মেঘনাদবধ'* *'বৃত্রসংহার'* (২ খণ্ড), *'ত্রয়ী'* (৩ খণ্ড) নামে অন্তত তিনখানি মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে ; যার মধ্যে *'মেঘনাদবধ কাব্য'* অবশ্যই বিশ্বমানের 'লিটারারি এপিক'।

সনেট

ইতালিতে রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমের জনক পেত্রার্কা সনেটেরও জনক। চোদ্দ ছত্রের এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অতিনিরূপিত পদ্যবন্ধের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত আবেগ ও মননকে প্রকাশ করার যে-ধ্রুপদী অথচ আধুনিক রূপবন্ধটির সূচনা পেত্রার্কা করেছিলেন, পরবর্তীকালে ইংরাজি সাহিত্যে ওয়াটসন, সারে, শেক্সপীয়র ও ফরাসিতে দ্যুবেলে একে অন্যতর মাত্রা দান করেন। মাইকেল পেত্রার্কা ও সেক্সপীয়রীয় রীতির শতাধিক সনেট লিখে বাংলা সাহিত্যে সনেটকে অভ্যর্থনা জানান। পরবর্তীকালে বহু কবি এতে পদচারণা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ফরাসি রীতির সনেট রচনার জন্য *'সনেট পঞ্চাশৎ'* রচয়িতা প্রমথ চৌধুরী এবং *'নৈবেদ্য'* কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলায় সনেট লেখার প্রলোভন প্রায় কোন 'মেজর' কবিই সংবরণ করতে পারেননি।[৩১]

গীতিকবিতা

গানের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক-সূত্রে গ্রথিত ছিল গীতিকবিতার আদি ইতিহাস। ক্রমশ গানের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সে স্বাধীন কিন্তু ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাসের উপর নির্ভরশীল একটি মন্ময় সাহিত্য-রীতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইতালীয় রেনেসাঁসে 'ভিতা কনতেমপ্লেতিভা'র কথা বলেছিলেন পেত্রার্কা। আত্মসমাহিত, অন্তর্মুখী সেই জীবনবাদ থেকেই আধুনিক গীতিকবিতা উৎসরিত হয়েছে। ইতালীয় কবি বেম্বো মন্ময় ও মাধুর্যমণ্ডিত গীতিকবিতা রচনা করে ইতালীয় রেনেসাঁসের পৃষ্ঠপোষক ও রমণীদের হৃদয় হরণ করেছিলেন, সাননাজারার কাব্যকর্মের মধ্যে গীতিকাব্যিক মূর্ছনা শ্রুতিগোচর হয়। এছাড়া প্রকৃতি ও সুন্দরীদের চিত্রাঙ্কনে বতিচেল্লি, জর্জিনো, রাফায়েল, লিওনার্দো তো এক-একটি গীতিকাব্যিক

মুহূর্তকেই দৃশ্যমান করেছিলেন। *'ভেনাসের জন্ম'* বা *'মোনালিসা'* রঙে ও রেখায় রচিত কবিতা ছাড়া আর কি?

ইংরাজি সাহিত্যে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস. বায়রণ, জার্মান সাহিত্যে গ্যেটে. শীলার প্রমুখ কবিদের কাব্যচর্চায় এই মন্ময় সাহিত্যিক প্রবণতার শীর্ষরূপ মেলে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য যখন নবজন্ম লাভ করছিল তখন বিহারীলাল চক্রবর্তী মাইকেলের ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে এই মন্ময় গীতিকাব্যের সূত্রপাত করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্মানিত করেছেন 'ভোবের পাখি' আখ্যা দিয়ে। আবেগপ্রবণ বাঙালী জাতিব সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে এই গীতিকবিতার ধারা বিভিন্ন কবিব অবদানে পুষ্ট হতে হতে রবীন্দ্রনাথে এস সম্যক ও সর্বোচ্চ বিকাশ লাভ কবেছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার অফুরন্ত ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে 'হাজার গীতে'। গান ও কবিতার অজস্র বিস্তার দিয়ে তিনি ফুলে-ফুলে ভরিয়ে দিয়েছেন বাঙালীর জীবনকে জন্ম থেকে মৃত্যু. প্রভাত থেকে সন্ধ্যাতিক্রান্ত অন্যতর প্রভাত পর্যন্ত সমস্ত মুহূর্তগুলিকেই যেন তিনি প্রার্থনা ও প্রাপ্তি. প্রত্যাশা ও পরাজয়, বিষাদ ও আনন্দের গান দিয়ে নিশ্ছিদ্র ও ভরাট করে দিয়েছেন। লিখেছেন,

> "সব আমি জোগান দিয়ে গেলুম—ফাঁক নেই. এ না গেয়ে উপায় কি। আমার গান গাইতেই হবে সবকিছুতে।"[৩২]

উপন্যাস-ছোটগল্প

ইতালীয় রেনেসাঁসে 'লিটারারি হিউম্যানিজম'-এর হোতা বোক্কাচিও শুধু জীর্ণ পুঁথির বিশুদ্ধ পুনরুদ্ধার কর্মই সম্পাদন করেছিলেন তা নয়, সামাজিক জীবনের আঁকাবাঁকা পথে অর্জিত মানব-সম্পর্কেব জটিল ও চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতাগুলিকেও তুলে এনেছিলেন তাঁর *'ডেকামেরন'* প্রভৃতি 'নভেলিতা' অ্যাখ্যাত রচনাকর্মের মধ্যে। এই 'নভেলিতা' শব্দটি থেকেই নভেল (বা উপন্যাস) শব্দটি এসেছে। বোক্কাচিওর মধ্যে মানবসম্পর্কের জটিল গল্প বলার যে ঝোঁক ছিল পরবর্তীকালে তার থেকেই বিকশিত হয়েছে আধুনিক উপন্যাস। ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক উপন্যাস রচনার যে দীপ্তি স্কটে দেখা গিয়েছিল. বঙ্কিমচন্দ্রের *'দুর্গেশনন্দিনী'* থেকে *'রাজসিংহ'*-এ আছে তার অনির্বাণ উত্তরসূরিত্ব। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জীবন ও সমাজ-মনস্কতা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সূচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-মানিক-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্করের মধ্যে বিস্তারিত হয়েছে তার বলয়।

উপন্যাসে থাকে 'ক্রিটিসিজম অব লাইফ'। রেনেসাঁসের দু'টি মূলসূত্র ছিল 'ডিসকভারি অব ওয়ার্লড' ও 'ডিসকভারি অব ম্যান'।[৩৩]

> "সবচেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন-অন্তরালে,
> তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাইরের দেশে কালে।"[৩৪]

সেই মানুষকে আবিষ্কার করার দুর্গম অভিযাত্রা উপন্যাসে। মানুষের অস্তিত্ব দু'দিকে প্রসারিত। এক দিকে আছে মানুষের inner life—মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গভীরে নিমজ্জিত তার একরকম স্বরূপ ; অন্যদিকে social life—সামাজিক বাস্তবতার দিকে সম্প্রসারিত তার আর এক সত্তা। রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় উপন্যাসের অন্তর্যাত্রা ; শরৎচন্দ্রে (ডিকেন্সের মতো)

সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে ঘাতে-প্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষকে দেখানো। বলাবাহুল্য, উপন্যাস-ছোটগল্পের সৌজন্যে 'ডিসকভারি অব ম্যান' বঙ্গীয় রেনেসাঁসে যথার্থ গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেয়েছিল। শুধু উপন্যাস নয়, ছোটগল্পের মধ্যেও সচল সেই মানবাবিষ্কারের অভিযাত্রা রবীন্দ্রনাথে যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা পেয়েছে তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। 'ছুটি' 'অতিথি' 'শাস্তি' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

প্রস্তাব ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ

পুরাতন পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল রেনেসাঁসে। হিউম্যানিস্টদের রচিত প্রস্তাবগুলি ছিল উত্থিত ছুরিকার মতো। লরেঞ্জো ভাল্লা রচিত *'কনস্টানটাইনের দান'* সম্পর্কিত প্রস্তাব, পিকো রচিত *'অন দ্য ডিগনিটি অব ম্যান',* আলবের্তি রচিত 'পরিবার-জীবন' বিষয়ক প্রস্তাব, এরাজমুস রচিত *'অন দ্য প্রেইজ অব ফোলি'* প্রভৃতি প্রস্তাবে পুরাতন ধ্যান-ধারণা বাতিল করে নতুন ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। এগুলি যেমন ছিল বিতর্কমূলক তেমনি তথ্য ও তত্ত্বনিষ্ঠ। এ সময় জ্ঞানচর্চা যথার্থ গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেয়েছিল বলে মননশীল বা প্রবন্ধধর্মী রচনাও প্রচুর দেখা দেয়। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রথম থেকেই দেখা যায় বিতর্কসঞ্চারী প্রস্তাব ও পুস্তিকামূলক রচনার হাতিয়ারটির ব্যবহার। রামমোহন সতীদাহ-প্রথা রদ করার জন্য, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ চালু করার জন্য এই ধরনের প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। উতোর-চাপানমূলক বহু পুস্তিকাও তাঁদের লিখতে হয়েছিল। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রসঙ্গ নিয়ে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, শিক্ষা-বিষয়ক অজস্র মননশীল ও প্রবন্ধমূলক লেখা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে দেখা যায়। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত *('ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'),* বঙ্কিমচন্দ্র *('বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণচরিত্র')* অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথে মেলে এই মননশীল, পর্যালোচনামূলক, বিশ্লেষণধর্মী, তথ্য ও তত্ত্বনিষ্ঠ প্রবন্ধাদির অপরিমিত ঐশ্বর্য। রেনেসাঁসের সন্ধিৎসু ও গঠনধর্মী মননশীলতার পরিচয় এদের মধ্যে বিদ্যমান। বাংলা প্রবন্ধ সম্পর্কে মননশীলতাই শেষ কথা নয়। কারণ প্রবন্ধ একাধারে বিজ্ঞান ও সাহিত্য। যুক্তি ও তথ্যের পরস্পর-সহায়ক গাঁথনি দিয়ে বিজ্ঞানধর্মী প্রবন্ধের যে সূচনা রামমোহন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে তা বঙ্কিমচন্দ্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিণাম অর্জন করে। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সংবেদনশীলতা ছিল তা সৃজনশীল রচনাকারে উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করে রবীন্দ্রনাথে। তাঁর *'প্রাচীন সাহিত্যে'* রয়েছে সেই সৃজনশীল রচনার পরাকাষ্ঠা। তাঁরই *'কালান্তর', 'সভ্যতার সংকট'* প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকের পরিচয়।

নাটক

ইতালীয় রেনেসাঁসে 'ভিতা একতিভা' বা সক্রিয় মানুষের কথা বলা হয়েছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে সম্প্রসারণকামী, ক্রিয়াশীল মানুষের ব্যক্তিগত উদাহরণ ইতালিতে অসুলভ ছিল না। আলবের্তির মতো এমন মানুষ সেখানে ছিলেন, যার সক্ষমতা ও সক্রিয়তার পরিমাপ করা

প্রায় অসম্ভব ছিল। এই সক্রিয় মানুষের পরাকাষ্ঠা দেখা যায় ইংলন্ডে এলিজাবেথীয় যুগে। শেক্সপীয়র মানুষের দ্বিমুখী ক্রিয়াশীলতার রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য যে সাহিত্যিক রীতিটিকে আশ্রয় করেছিলেন তার নাম নাটক। শেক্সপীয়রের *'ওথেলো, 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট'* বা জার্মান নাট্যকার গ্যেটের *'ফাউস্টে'* আছে সেই ক্রিয়াশীল মানুষের চারিত্রিক ঐশ্বর্য ও তাদের বিয়োগান্তক বা মিলনান্তক জীবনের রূপ। বাংলাতে মাইকেলের *'কৃষ্ণকুমারী'*র মধ্যে সক্রিয় ও ভাগ্যাহত মানুষের দ্বন্দ্ব-সংকুল রূপ ফুটিয়ে তোলার যে নাট্যিক সূচনা, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে দিয়ে সেই নাট্যযাত্রা রবীন্দ্রনাথে এসে সমধিক ব্যাপ্তি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কর্মগুলির মধ্যে শুধু পরস্পর-বিপরীতের টানাপোড়েনই নেই, আছে উত্তীর্ণ এক পুষ্পিত ও ছন্দময জীবনেব স্বপ্নসম্ভব ব্যঞ্জনাও। কবি এবং নাট্যকার, গায়ক এবং নর্তকের এক সমবেত শিল্পকর্মের নাম রবীন্দ্রনাট্য। নাটকের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর তুলনা না চললেও, রবীন্দ্রনাথ যতরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, অপরাজেয় মানুষের চারিত্রিক ঐশ্বর্যকে দীপ্যমান ও দৃশ্য করার জন্য নাটককে যেভাবে রীতি ও প্রয়োগগত বৈচিত্র্য দান করেছেন, তার তুলনাও বিশ্বনাট্যের ইতিহাসে বিরল।

জীবনী-আত্মজীবনী

সমাজ বা শ্রেণীবদ্ধ জীবনের ঢালা প্রবাহ থেকে রেনেসাঁসে ব্যক্তিমানুষের উত্থান জীবনী ও আত্মজীবনী লেখার প্রবণতা সৃষ্টি করে। মধ্যযুগের জীবনীগুলিতে বংশলতিকার মহিমা কীর্তন করা হত। এখন স্বমহিমায় ব্যক্তিকে চিত্রিত করা হতে থাকে। বোকাচিও লেখেন দান্তের জীবনী, ভিল্লানি *'ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত মানুষ'* নামক রচনায় লেখেন সেকালে জীবিত বিখ্যাত সব কবি, চিকিৎসক, বিদ্বান, শিল্পী, রাজপুরুষদের জীবনী ; প্লাতিনা লেখেন পল-২য়র জীবনী; ভেসপাসিনো ও ভাসারি রচিত জীবনীগ্রন্থগুলিও সুবিখ্যাত। জীবনীর সঙ্গে লেখা হতে থাকে আত্মজীবনীও। পায়াস-২য়র আত্মজীবনী তাঁর জীবনের বহুতর কক্ষ উদঘাটন করে দেখায়, গিরলামো কারদানোর আত্মজৈবনিক রচনা বা সেল্লিনির অসমাপ্ত আত্মজীবনী আমাদের জানায় রেনেসাঁসের মানুষ দেবতার মতো মহানও নয়, শয়তানের মতো নিঃশেষে মন্দও নয়। শিল্পীরা পোর্ট্রেট জাতীয় ছবিগুলিতে এঁকেছেন সে সময়ের শ্রেষ্ঠ, কীর্তিমান, প্রতিষ্ঠিত পুরুষ ও কীর্তিময়ী রাজনন্দিনী ও সুন্দরীদের। বাংলা সাহিত্যে জীবনী ও আত্মজীবনী রচনার সবিশেষ প্রবণতা দেখা যায় উনিশ শতক থেকে। রামমোহন, দ্বারকানাথ ও ডিরোজিওর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের বঞ্চিত করেছে নাটকীয় উত্থান-পতন যুক্ত একাধিক আত্মজীবনীর সম্ভাবনা থেকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি অসাধারণ আত্মজীবনী লিখে সেদিক থেকে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছেন। ডিরোজিয়ানদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ারের জীবনী। বিদ্যাসাগর জীবনচরিত রচনার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের শিক্ষণীয় মহিমা তুলে আনতে চেয়েছেন। একটি অসম্পূর্ণ আত্মজীবনীও আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। মন্মথনাথ ঘোষ রচিত *'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী'*, লোকনাথ ঘোষের লেখা *'কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত'* (The Native Aristocracy & Gentry) প্রভৃতির পাশাপাশি শ্রীম কথিত *'রামকৃষ্ণকথামৃত'*, শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত *'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন*

বঙ্গসমাজ, রাজনারায়ণ বসু রচিত *'আত্মচরিত'* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনীর গুরুত্ব বুঝিয়ে লিখেছিলেন 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু কবিকে বুঝিতে পারিলে অধিকতর লাভ।'[৩৫] জীবনী, আত্মজীবনী ও চরিতকথা রচনার এই ধারা রবীন্দ্রনাথে এসে সমৃদ্ধ পরিণতি লাভ করেছে। তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অসাধারণ মূল্যায়নমূলক চরিতকথা লিখে বলেছেন—

"তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।"[৩৬]

'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি' ও *'আত্মপরিচয়'* নামে তিনখানি ত্রিমাত্রিক আত্মজীবনীও তিনি রচনা করেন। জীবনী ও আত্মজীবনী রচনার যে-ধারার উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের রূপকাররা স্বয়ং, তাঁদের ব্যক্তিপ্রতিভার উত্তুঙ্গতা বাংলার গবেষক ও জীবনীকারদের সামনে এক একটি স্বর্ণখনির ঐশ্বর্য খুলে দিয়েছে। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল, বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নজরুল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখন চলেছে অফুরান জীবনী রচনা-প্রকল্প।

পত্র ও পত্রসাহিত্য

জীবনী, আত্মজীবনী ছাড়াও রেনেসাঁসের সময় ও সম্পর্ক-সচেতন মানুষেরা ডায়েরী লিখতেন, আর লিখতেন প্রচুর চিঠিপত্র। ভাসারি রচিত *'শিল্পীদের জীবনী'*র মতোই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির নোটবই রেনেসাঁসের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মিলানের ডিউকের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠি আমাদের জানিয়ে দেয় কী অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রত্যয়সম্পন্ন ছিলেন রেনেসাঁসের মানুষ।[৩৭] ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর সালুতাতির চিঠি সম্পর্কে মিলানের ডিউক বলেছিলেন 'সালুতাতির একটি চিঠি সহস্র ফ্লোরেন্সীয় অশ্বারোহী সৈন্যের চেয়ে মারাত্মক।'[৩৮] 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' নামে খ্যাত এরাজমুসের বিপুল সংখ্যক চিঠিপত্র এ পর্যন্ত ১৫টি খণ্ডে সম্পাদিত প্রকাশ লাভ করেছে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষরা চিঠিপত্রে রেখেছেন তাঁদের চিন্তা-চেতনা-কর্মপ্রয়াসের লিখিত স্বাক্ষর।

রামমোহন তাঁর অনুবাদ ও উতোর-চাপানমূলক রচনাদির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর চিঠিপত্র লিখতেন দেশে-বিদেশে। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা একটি চিঠির দ্বারা একরকমভাবে নির্ধারিত হয়েছিল ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাগ্য।[৩৯] মিথ্যা অজুহাতে চাকুরীছেদের সংবাদ জেনে ডিরোজিও বেদনাকম্পিত অথচ স্থির অচঞ্চল ভাষায় উইলসনকে যে অসাধারণ চিঠি লিখেছিলেন তা ডিরোজিওর জীবনীকাররা আজও মুদ্রিত করার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না।[৪০] বিদ্যাসাগর সিসিলি বিডনকে লেখা একটি চিঠিতে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন পৌরুষ ব্যাপ্তিত ভারতীয়ত্বের অভিমান—'ইওরোপীয় অধ্যাপকের তুলনায় কম বেতন দিলে তাঁর পক্ষে সে চাকরি নেওয়া সম্ভব নয়।'[৪১] মাইকেলের চিঠিপত্রে আছে ঘটনালাঞ্ছিত স্পর্শকাতর এক মহাকবির সংবেদনশীল হৃদয়ের পরিচয়। ওভিদের অনুসরণে *'বীরাঙ্গনা'* পত্রকাব্যে তিনি দেখিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত পত্রের মধ্যে দিয়েও ফুটিয়ে তোলা যায় নারীত্বের ওজস্বী চরিত্র মহিমা। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন কত চিঠি লিখেছিলেন তার কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি। এক গবেষক *'রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী'* নামক একটি রচনায় ৩২১ জন প্রাপকের হদিশসহ

৪,০৯৭টি রবীন্দ্রপত্রের কথা বলেছেন। বলাবাহুল্য রবীন্দ্ররচিত পত্রের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি।[৪২] তাঁর *'ছিন্নপত্রাবলী', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'জাপান যাত্রী'*র ডায়েরী, *'ভানুসিংহের পত্রাবলী'* প্রভৃতি রচনা পত্রসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। *'ছিন্নপত্রে'* লিখেছেন,

> "কথায় যে-জিনিসটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে যে-জিনিসটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে, চিঠিতে সেইটে অতি সহজে আপনাকে ধরা দেয়। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই—এই চার পৃষ্ঠার চিঠি মনের ঠিক জায়গাটি দোহন করতে পারে।......প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সেই জায়গায় কখনো পৌঁছুতে পাবে না।"[৪৩]

ভাষা ও ছন্দ

পদ্যকে বাঁধা হয অতিনিরূপিত সময়গত শৃঙ্খলায়, যার পারিভাষিক নাম ছন্দ। ছন্দের কথা বলতে গেলে, বাংলা পদ্যে এসময় ঘটেছে তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রভূত সমুন্নতি। গেয় ছন্দে কবিরা নিয়ে এলেন পাঠ্যগুণ। যা ছিল গান করার জন্য রচিত, তাকে তাঁরা করে তুললেন বাক্‌স্পন্দিত। পয়ার-ত্রিপদীর বাঁধা ছক ভেঙে ছন্দকে প্রবহমান করে দিলেন মাইকেল। ছন্দোমুক্তির ইতিহাসে প্রথম দরজাটি তিনিই খুলেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করে। রবীন্দ্রনাথ *'মানসী'* কাব্যে এসে পয়ার বা তানপ্রধান ছন্দের সীমানা অতিক্রম করে প্রবেশ করলেন ধ্বনিপ্রধান ছন্দের প্রায়-নিরুদ্ধ উদ্যানে। যা ছিল লৌকিক সাহিত্যে অবজ্ঞাত, সেই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দকে নবরূপে পুনর্বাসিত করলেন রবীন্দ্রনাথ। *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'*-এ বা কৃত্তিবাসী *'রামায়ণ'*-এ যে বাঁধাগতের পয়ার ছন্দ ছিল, মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখে তাতে আধুনিকতার চারিত্র্য ও গতিশীলতা দান কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে তাকেই অন্যতর মাত্রা দান করলেন ; মাইকেলী প্রবহমানতা স্বীকার করেও ফিরিয়ে নিয়ে এলেন অন্ত্যমিলের চারুবন্ধন। ব্রজবুলি বা বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রাচীন ধরনের যে ধ্বনিপ্রধান ছন্দ ব্যবহৃত হত, রবীন্দ্রনাথ সেই তির্যক ধ্বনিপ্রধান ছন্দটিকে বাংলা পদ্য বহনের নবতর দায়িত্ব দিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বা নজরুলের আক্রমণাত্মক ও তেজস্বী কবিতাগুলি ধ্বনিপ্রধানে লেখা। শাক্তপদাবলী, মায়ের ঘুমপাড়ানি গান বা ছড়ার ছন্দের অবতল থেকে উত্তোলিত শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম ভাব ও ব্যথাহত চিত্তের প্রকাশনার দায়িত্ব দিয়েছেন ('নিষ্কৃতি')। পদ্যছন্দের যে বন্ধনগুলি কবিতাকে গৃহকন্যা করে রেখেছিল, গদ্যরীতির ছন্দে তিনি তাকে আহ্বান জানালেন বহির্পৃথিবীতে। ঘর ও বাহির দুই জগতের সঙ্গেই একটি সচল সম্পর্ক স্থাপিত হল। এইসব কারণেই প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁকে '*ছন্দোগুরু* রবীন্দ্রনাথ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৪]

সাধু ও চলিত

পদ্যে বন্ধন ও মুক্তির এই সংগ্রামের সমান্তরালে গদ্যে চলেছিল সাধুরীতি ও চলিতরীতির একটি শতবর্ষব্যাপী চারু-সংগ্রাম। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে তৎসম শব্দবহুল, সমস্তপদ ও সন্ধিপ্রবণ দুরান্বয় সিদ্ধ, আলঙ্কারিক

ও গুরুগম্ভীর সাধু ভাষার যে-রীতি পথ চলছিল, তারই পাশাপাশি লোকচলতি কথ্যভাষার সপক্ষে একটি রচনারীতি কেরী সংকলিত *'কথামালা', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা',* বিভিন্ন নাটকের সংলাপ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত *"সবুজপত্র"*-এ এসে ঘোষিত আন্দোলনের চেহারা নেয়। সাধু ও চলিতের এই দ্বিমুখী যাত্রার শ্রেষ্ঠ সারথিও রবীন্দ্রনাথ। সাধুরীতির গদ্য যে কত রাজসিক, কত আলঙ্কারিক ও কত সুললিত হতে পারে তার নিদর্শন আছে তাঁর 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে বা *'প্রাচীন সাহিত্য'* গ্রন্থে। অন্যপক্ষে চলিত রীতির গতি, সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য ও উজ্জ্বল অসির মত ঝলকিত তী্ক্ষ্নতা পাওয়া যায় তাঁর *'শেষের কবিতা'*র মধ্যে।[৪৫]

তুলি বনাম লেখনী

ইতালীয় রেনেসাঁসে চিত্রকলার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ইতিহাস রঙ ও রেখা, রূপ ও রীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস। যেখানে জর্জিনো বা টিশিয়ান ন্যাচারাল বা আর্কিটেকচারাল পারস্পেকটিভ ছাড়া আঁকতে পারতেন না তাদেব উপজীব্য চরিত্রের ছবি ; মাইকেল অ্যাঞ্জেলো তাঁর সিস্টিন চ্যাপেল ফ্রেস্কোমালায় সেখানে পরিপ্রেক্ষিতহীন মানুষের ছবিই এঁকেছেন শুধু। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছবির আগে আঁকতেন স্কেচ, জর্জিনো সেখানে রেখা না টেনেই চলে যেতেন রঙে ও তুলিতে। বতিচেল্লি বা করেরিজ্জোর ছবি যেন বাসন্তিক গীতিকবিতার মতো ছন্দস্পন্দিত, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বা তিনতরেত্তোর ছবি যেন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাযুক্ত বা 'thunder bolt of the Renaissance'. রাফায়েলের *'স্কুল অব এথেন্স',* অ্যাঞ্জেলোর *'আদমের জন্ম'* এবং লিওনার্দোর *'মোনালিসা'* ছবিগুলি পাশাপাশি স্থাপন করলে, বোঝা যায় তাঁদের জীবনবোধের বেধ, ব্যাপ্তি ও গভীরতা। লিওনার্দোর ছবিতে রেখা ও রূপের অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য, অ্যাঞ্জেলোর ছবিতে পেশল ভাস্কর্যের ছায়া, রাফায়েল বা জর্জিনোর ছবিতে সাঙ্গীতিক রঙের উৎসব। লিওনার্দোর ছবিতে আছে বিশ্বসৌন্দর্যের অপার রহস্য, অ্যাঞ্জেলোর ছবিতে 'terribelita' তিনতরেত্তোর ছবিতে আছে গর্জনশীল জনতার ঢেউ। লিওনার্দো এলিসাবেত্তার একটি পোর্ট্রেট এঁকে জয় করে নেন বিশ্বের হৃদয়, তিনতরেত্তোকে সেখানে একটি ছবিতে আঁকতে হয় প্রায় ৮০টি নর-নারীর মূর্তি। রূপ ও রীতি, বিষয় ও আবহ নিয়ে দ্বিশত বর্ষব্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারাবাহিক ও বহুমুখী ইতিহাস ইতালীয় চিত্রকলাকে যে বৈশ্বিকতা দান করেছিল, বঙ্গীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় সেই ব্যাপ্তি, সেই বেধ ও তুলনীয় বৈশ্বিক সমুচ্চতা। রামমোহন থেকে যে রেনেসাঁসের মাননিক সূচনা তার সাহিত্যিক সৃজনশীলতার সূত্রপাত ধরতে গেলে মাইকেল, বিদ্যাসাগর থেকে ; বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথে সেই বৌদ্ধিক ও নান্দনিক ঔৎকর্ষের চূড়ান্ত সাহিত্যিক প্রকাশ যেভাবে ঘটেছে তার কোন তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নেই। ন্যূনাধিক শতবর্ষের অতি-সংক্ষিপ্ত এই সময়কালে বাংলা সাহিত্যের এমন আশ্চর্য সিদ্ধির মর্মমূলে যে সাংস্কৃতিক রহস্য ক্রিয়াশীল ছিল তার নামই রেনেসাঁস।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. J. K. Majumder, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movement in India*, Rpt. in 1988, letter no. 142, pp. 250-252

২. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* ২য় খণ্ড, ১৯৫৮, পৃ. ১৩৬

৩. বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব,* মার্চ ১৮৫৩

৪. R. W. Hanning & D. Rosand, *Castiglione : The Ideal and the Real Renaissance Culture,* New Haven, Yale University, 1983

৫. দীননাথ সান্যাল (সম্পাদিত), *'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভূমিকা,* গৌরদাস বসাককে লেখা পত্র, বাংলা অনুবাদ দীননাথ সান্যাল-কৃত

৬. যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২, পৃ. ৮৬২

৭. যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *তদেব,* পৃ. ২৮১-২৮২

৮. যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *তদেব* পৃ. ২৮১-২৮২

৯. উদ্ধৃত অমিতাভ ঘোষ, *বিশ্ববিদ্যার আনন্দ-প্রাঙ্গণে,* ১৩৯৩, পৃ. ১১২

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছাত্র সম্ভাষণ', *শিক্ষা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, প. ব. সরকার, ১৯৯২, পৃ. ৪৩৪-৪৪০

১১. উদ্ধৃত অমিতাভ ঘোষ, *তদেব,* পৃ. ১৭৮

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বিকিরণ', (ভাষণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) *শিক্ষা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৪১৫

১৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাক্‌পতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ', *"কবিতা"* রবীন্দ্রসংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৮ ; বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), *বিশ্বমনা ঃ রবীন্দ্রনাথ,* ১৯৯১, পৃ. ১৩

১৪. J. A. Symonds, *Renaissance in Italy,* vol.3, Fine Arts, p. 23

১৫. I. A. Richter, *Selections from the Note Book of Leonardo Da Vinci,* G. B., 1953 ; শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ভাবনায় চিত্রকলা—একটি তৌলন আলোচনা ঃ চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্য ও ভাস্কর্য', *"চতুরঙ্গ",* বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৮, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৫৫২-৫৫৭

১৬. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), *তদেব,* পৃ. ১৯৪

১৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *রজনী,* বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, উপন্যাস খণ্ড, ১৯৭৪, পৃ. ৪৬৩

১৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'উত্তরচরিত', *বিবিধ প্রবন্ধ,* যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), *তদেব,* পৃ. ১৮৩

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'সৌন্দর্যবোধ', সাহিত্য,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, *তদেব,* মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৩৭১

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপানযাত্রী,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, *তদেব,* ডিসেম্বর ১৯৮৯

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', *সাহিত্য* (১৯০৭), রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৩০৪

২২. অরুণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *রবীন্দ্র-সংগীতের নানা দিক,* ১৯৬৮, পৃ. ২০
২৩. কিরণশশী দে, *রবীন্দ্র-সঙ্গীত সুষমা* (১৯৭৩), দ্বিতীয় সং ১৯৭৫, পৃ. ৫৪
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শান্তিনিকেতন* (১৯১৬), রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ৬৭৩-৬৭৪
২৫. উদ্ধৃত মনোরঞ্জন গুপ্ত, *রবীন্দ্র-চিত্রকলা,* ২য় সং ১৯৪৯, পৃ. ১৯ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ও রচিত *চিত্রলিপি,* বিশ্বভারতী, ১৯৪০
২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিজয়িনী', *চিত্রা,* (১২৯৯ চৈত্র-১৩০২ ফাল্গুন), সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, ১৩৮৯ সং, পৃ. ২৬৪-২৬৫
২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐকতান, *জন্মদিনে* (১৩৪৭), সঞ্চয়িতা, *তদেব,* পৃ. ৮২৩
২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান,* বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৮৬, পৃ. ৪৩০
২৯. F. Petrarcha, *Familiaries* (8.1.18) ; R. E. Proctor, 'The Studia Humanities : Contemporary Scholarship and Renaissance Ideals', "*R. Q.*", vol. XLIII, No. 4, 1990
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভাষা ও ছন্দ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, *তদেব,* ১৯৮৩, পৃ. ১২৮৫
৩১. উত্তম দাশ, *বাংলা সাহিত্যে সনেট,* ১৩৭৩
৩২. কিরণশশী দে, *তদেব,* পৃ. ১২৮
৩৩. J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (1860), London, 1945
৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐকতান, *তদেব*
৩৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধ খণ্ড, গোপাল হালদার সম্পাদিত *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ,* ১৯৭৩
৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতপথিক রামমোহন রায়,* ১৯৩৩, উৎসর্গ পত্র
৩৭. W. Durant, *The Story of Civilization,* vol. V, The Renaissance, N. Y. , 1953, pp. 202-203
৩৮. L. W. Spitz, *The Renaissance and Reformation Movement,* Chicago, 1971, p. 160
৩৯. J. Majumdar, *Ibid*
৪০. বিনয় ঘোষ, *বিদ্রোহী ডিরোজিও,* ১৯৬১ মার্চ ; পল্লব সেনগুপ্ত, *ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও,* ১৯৭৯ ; সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *অশান্তকাল : জিজ্ঞাসু যুবক,* মার্চ ১৯৮৮
৪১. উদ্ধৃত ইন্দ্র মিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* ১৯৬৯, পৃ. ৩৩০
৪২. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'চিঠিপত্রের রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্রের দূত কাছের মানুষ', উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত), *রাতের তারা দিনের রবি,* ১৯৮৭, পৃ. ৩৫৯
৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্র* (১৯১২), রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, *তদেব,* আগষ্ট ১৯৮৯, পৃ. ৩৮৩
৪৪. প্রবোধচন্দ্র সেন, *ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ* (১৯৪৫), ১৯৮৭ সং
৪৫. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ,* ২য় সং ১৩৭১ ; অবন্তীকুমার সান্যাল, *রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি,* কার্তিক ১৩৭৬

একাদশ অধ্যায়

উপসংহার ঃ "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?"

স্বাগতম ঃ তৃতীয় যুগ

রেনেসাঁস কথাটি উচ্চারিত হলেই যে-সব নেতিবায়ুগ্রস্ত বিদ্যাবাগীশ *'জীবনস্মৃতি'*তে রবীন্দ্র-অঙ্কিত বঙ্কিমী পলায়নদৃশ্য মঞ্চস্থ করে থাকেন তাঁদের পশ্চাৎগামী বীরত্বকে অনুসরণ করার আর প্রয়োজন নেই। কেননা রেনেসাঁস সংক্রান্ত গবেষণা এখন প্রথম-দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করে তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশোন্মুখ। প্রথম পর্যায়ে ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে গড়ে তোলা হয়েছিল একটি বিশুদ্ধ আলোকোজ্জ্বল ধারণা,[১] দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার নামে ভেঙে ফেলা হয়েছে তার অধিকাংশ মিথ। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে *'Darker Vision of the Renaissance'*-এর দিকে।[২] এখন রেনেসাঁস বিচারে শুরু হয়েছে তৃতীয় যুগ।[৩] স্থিতপ্রজ্ঞ ভাষ্যকারদের সৌজন্যে ইতালীয় রেনেসাঁস এখন রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মতো বলতে পারে—

> "আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী
> নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
> পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
> সে নহি নহি,
> হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
> সে নহি নহি।"

বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিচারে প্রথম যুগ বহু পূর্বেই অতিক্রান্ত। নেতিবাদী দ্বিতীয় যুগটিকে আর টেনে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন।[৪] এখন তৃতীয় যুগটিকে অভ্যর্থনা জানানোর সময়।

রেনেসাঁস বিপ্লব নয়

কী রেনেসাঁস?—রেনেসাঁস হচ্ছে পরিবর্তনের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে এর অবস্থান। বিপ্লব হচ্ছে দীর্ঘদিনের আটকে থাকা পরিবর্তনের একটি বিস্ফোরক রূপ। আর বিবর্তন হল দীর্ঘতর সময়ে বিস্তারিত বিপ্লব। রেনেসাঁস হচ্ছে বিবর্তনের থেকে হ্রস্বতর এবং বিপ্লবের থেকে দীর্ঘতর একটি পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার নাম। বিবর্তন হচ্ছে বিশ্ব-পরিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, বিপ্লব সমাজ-পরিবর্তনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, আর রেনেসাঁস সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। সামাজিক পরিবর্তন যখন রাজনৈতিক ক্ষিপ্রতাকে আশ্রয় করে তখন হয় বিপ্লব, আর সামাজিক পরিবর্তন যখন চেতনা ও নান্দনিকতা জড়ানো সাংস্কৃতিক পথ ধরে তখন হয় রেনেসাঁস। আবার সেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যখন নীতিশুদ্ধ ধর্মের পথ আঁকড়ে ধরতে চায় তখন সৃষ্টি হয় রিফরমেশনের সম্ভাবনা।

ক্রান্তিকালীন সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ

বিশ্বসভ্যতা তখন ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বাণিজ্য ও বৃহৎ উৎপাদন-নির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে পাশ ফিরছিল, সেই ক্রান্তিকালীন মুহূর্তে যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ ঘটে, তাকেই বলে রেনেসাঁস। ব্যাপারটা প্রথম ঘটে ইতালিতে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অচলায়তন ভেঙে, রেনেসাঁসের সংস্কৃতি জীবনকে নানাভাবে নতুন করে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে তোলার মননশীল ও সৃজনশীল-প্রকল্প হিসাবে দেখা দেয়। মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধ এবং আধুনিক যুগের চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধের তীব্র টানাপোড়েন দিয়ে বোনা হয়েছিল রেনেসাঁসের বস্ত্র। দু'টি যুগের পরস্পর-বিরোধী সংঘাতের কারণে রেনেসাঁস তাই অসম্ভব সচল ও গতিশীল একটি সাংস্কৃতিক পর্ব, অনেক দিনের নিশ্চলতার পর একটি সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের মতো। এই ধরনের সংঘাতময় ও আভিঘাতিক সময়ে উত্থান ঘটে বহু অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক ব্যক্তিপ্রতিভার। এঁরা 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে' ফেলে সাংস্কৃতিক যুগান্তর ঘটান। মননশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তিপ্রতিভার ধারাবাহিক ও সমবেত উত্থান ছাড়াও, রেনেসাঁসের আর একটি বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ হচ্ছে, অন্যতর জীবনবাদী বিদ্যা ও সংস্কৃতির নিবিড় কর্ষণের দ্বারা, এসময় ঘটানো হয় বহমান মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কাজটি।

ব্যক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণ

উনিশ শতকের বাংলার ধনবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে গতানুগতিকতার বাতাবরণ ভেঙে নতুন ধরনের যে সাংস্কৃতিক জাগরণ সূচিত হয়েছিল, তাতে ইতালীয় রেনেসাঁসের দু'টি মূল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এক, স্বল্পকালীন সময়পর্বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিপ্রতিভার উত্থান। দুই, জীবনবাদী অন্যতর সংস্কৃতির হাত ধরে জীর্ণপ্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলা ও নতুন মূল্যবোধযুক্ত মননশীল ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরী করা। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে মেলে রেনেসাঁস সুলভ নব-নব-উন্মেষশালিনী ব্যক্তিপ্রতিভার ধারাবাহিক সাক্ষাৎ, যাঁরা বঙ্গসংস্কৃতির নবায়ণে গ্রহণ করেছিলেন সংগ্রামী ও সৃজনময় ভূমিকা। ন্যূনাধিক শতবর্ষমাত্র সময়কালের মধ্যে যে মানের ও যত সংখ্যক মননশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তিপ্রতিভার সাক্ষাৎ এখানে মেলে, তা ইতালীয় রেনেসাঁসের কথা স্মরণ করায়। দ্বিতীয়ত, শত-শত বৎসরের গতানুগতিকতা অপসারিত করে যে বৌদ্ধিক সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক সৃজনময়তা এঁরা আমাদের উপহার দেন, তারও তুলনা মেলে ইতালীয় রেনেসাঁসেই।

তিন অনৈতিহাসিক অভিযোগ

উনিশ শতকের বাংলায় সূচিত এই জাগরণকে কেন রেনেসাঁস বলা যাবে না—সে বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। সেগুলি সূত্রাকারে বললে

এইরকম দাঁড়ায় ঃ

ক. কলকাতার বাইরে এই রেনেসাঁসের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। গ্রাম যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গিয়েছিল। দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে যার আলো পৌঁছয়নি, তাকে জাগরণ বা রেনেসাঁস বলা অর্থহীন।

খ. এখানে শিল্পীয় (industrial) সভ্যতার বিকাশ হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে উঠতি ধনিক-বণিকদের বাড়তি পুঁজি জমিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভাব্য বুর্জোয়ারা জমিদার হয়ে গিয়েছিল। 'Full blooded bourgeoise modernity' এখানে দেখা যায়নি। সুতরাং এখানে রেনেসাঁস হওয়া সম্ভব নয়।

গ. দেশ ছিল উপনিবেশবাদ কবলিত, পরাধীন। যে স্বাধীন নয়, তার রেনেসাঁস হবে কি করে?

ইতালীয় রেনেসাঁসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখিয়েছি, সেখানেও শহরের বাইরে রেনেসাঁসের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শতকরা তেরো ভাগ মানুষ মাত্র তখন থাকতেন শহরে। বাকি সাতাশি ভাগ মানুষ ছিলেন গ্রামে। তারা রেনেসাঁসের আলোকোজ্জ্বল অংশের অন্ধকার পশ্চাৎপট ছিলেন মাত্র। দ্বিতীয়ত, ইতালিতেও রেনেসাঁস সম্ভাবিত হয়েছিল শিল্পীয় ধনতন্ত্রের বিকাশের আগে। ভূমিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে সেখানকার শহুরে ধনিক-বণিকরা গাঁটছড়া বেঁধে চলতেন। তৃতীয়ত, এদেশের মতো উপনিবেশবাদ কবলিত না হলেও, স্বাধীন দেশ হিসাবে ইতালির অবস্থা খুব সুবিধাজনক ছিল না। রেনেসাঁসের কার্যকাল শেষ হবার আগেই ইতালি বৈদেশিক আক্রমণে পর্যুদস্ত ও বিদেশীদের দ্বারা আধা-পদানত হয়েছিল।

'দ্বিতীয় ধরনের রেনেসাঁস'

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের এক শ্রেণীর ভাষ্যকারদের মধ্যে চিন্তাধারার অস্বচ্ছতা আছে। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, রেনেসাঁস হচ্ছে আপামর জনসাধারণের জন্য সর্বোদয় জাতীয় একটি মুক্তি-প্রকল্প। কিন্তু ইওরোপীয় রেনেসাঁস কখনোই তা ছিল না। বিষয়টিকে বিশদ করার জন্য রুশ পণ্ডিত নিকোলাই কনরাড আনীত একটি অভিনব রেনেসাঁস-তত্ত্বের কথা এখানে আনব।[৫] কনরাডের মতে, এক সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য সমাজব্যবস্থার উত্তরণের ক্রান্তিকালীন মুহূর্তই রেনেসাঁসের জনক। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এ পর্যন্ত তিনটি রেনেসাঁস হয়েছে। আদিম সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের সময় ঘটে, তাঁর মতে, 'প্রথম-ধরনের রেনেসাঁস'। এর ঘটনাস্থান প্রাচীন ভারতবর্ষ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের সময় ঘটে 'দ্বিতীয়-ধরনের রেনেসাঁস'। এর ঘটনাস্থান ইওরোপ (ইতালীয় রেনেসাঁস নামে যাকে আমরা চিনি)। আর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের সময় ঘটে 'তৃতীয়-ধরনের রেনেসাঁস'। এটা ঘটেছে রাশিয়ায় ও চীনে। দ্বিতীয় রেনেসাঁসে প্রগতিশীলতার পক্ষে গুণগত উন্নতি যতটা হয়েছিল, তার সুফল সমস্ত মানুষের কাছে নিয়ে

যাওয়ার কর্মসূচি বা দর্শন ছিল না। তৃতীয় রেনেসাঁসেই প্রথম সমাজের সাধারণ মানুষকেও তার প্রগতিশীল জয়যাত্রার অংশীদার করা হয়। উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁস ছিল, কনরাডের ব্যাখ্যা মতে, 'দ্বিতীয়-ধরনের রেনেসাঁস'। মার্কসবাদ-চালিত সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধে (কনরাডের মতে 'তৃতীয়-ধরনের রেনেসাঁস') দীক্ষিত বঙ্গীয় ভাষ্যকাররা কনরাড কথিত 'দ্বিতীয় ধরনের রেনেসাঁস' থেকে প্রত্যাশা করেছেন 'তৃতীয়-ধরনের রেনেসাঁস'-এর আবশ্যক লক্ষণগুলি। না পেয়ে তাঁরা বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে নস্যাৎ করেছেন সোৎসাহে। বলাবাহুল্য, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এই প্রত্যাশা ও বিচার। রেনেসাঁস যদি বুর্জোয়া সংস্কৃতি হয়, তবে মনে রাখা উচিত, সেই সংস্কৃতির মধ্যে সমস্ত মানুষের মুক্তির কোনো সনদ ছিল না কোথাও, ছিল না ইতালিতেও। বিশিষ্ট রেনেসাঁস-ভাষ্যকার জে. এ. সাইমন্ডসের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক রেনেসাঁস, দ্বিতীয় অঙ্ক রিফরমেশন, তৃতীয় অঙ্ক বিপ্লব।

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বনাম 'মুক্তধারা'

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল-ভোগকারী, তার অকৃত্রিম হিতার্থী ও ভোক্তারা ছিলেন রেনেসাঁসের স্রষ্টা—এই বলে যে অতি সরল একটি অভিযোগ আনা হয়, তাও সর্বাংশে ঠিক নয়। ঠিক নয় এই কারণে, উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা, সাহিত্যাদি অনুধাবন করলে দেখা যায় জমিদারী স্বার্থরক্ষার সমান্তরালে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও কৃষক সাধারণের সপক্ষে বিবেককম্পিত সহমর্মিতার একটি ধারা সেখানে প্রথমাবধি প্রবহমান ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের 'প্রজাদিগের দুরবস্থা' থেকে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' ; বিলেতে পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে রামমোহনের সুপারিশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক'; নীলবিদ্রোহ, পাবনার প্রজাবিদ্রোহের সময় দীনবন্ধু মিত্র থেকে *"সাধারণী"*-র সম্পাদকীয়তে আছে শিক্ষিত বাঙালীর বিবেকী প্রজাপক্ষপাতের পরিচয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বন্ধন ও সেই বন্ধন থেকে মুক্তির একটি নিগূঢ় নাটক উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্তর্কক্ষে অভিনীত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্ধন ও তার থেকে মুক্তিযাত্রার এই রেনেসাঁসীয় নাটকের শেষ সংলাপটা রবীন্দ্রনাথ তাঁর *'মুক্তধারা'* নাটকে লুকিয়ে-চুরিয়ে পরিবেশন করে গেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইওরোপীয় ম্যানেজার রেখে বাণিজ্যিক কায়দায় জমিদারী পরিচালনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু মাত্র তিনপুরুষের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথে এসে জমিদারী পরিচালনা প্রজাসাধারণের হিতসাধন-প্রকল্পে পরিণত হয়। *'মুক্তধারা'* নাটকে দ্বারকানাথকে রণজিৎ সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে নিয়েছেন যুবরাজের পার্ট। রবীন্দ্রনাথের কাণ্ডকারখানা দেখে দ্বারকানাথ যা বলতে পারতেন, রণজিৎ তা বলেছেন অভিজিৎকে নিয়ে, 'ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে।.......পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে।' সঞ্জয় বলেছে, 'বুঝতে পারছিনে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?' অভিজিৎ বলেছে, 'সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার

জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।'[৬] ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ব্লু প্রিন্ট অনুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাথর দিয়ে কলকাতার 'অ্যাবসেন্টি ল্যান্ডলর্ডস'দের জন্য রাজবাড়ি বানানো হয়েছিল ঠিকই, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের রূপকার ও তাঁদের চেতনার স্রোত সেই রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে মুক্তধারার মতো প্রবাহিত হয়েছিল—এ সত্যও অনস্বীকার্য।

ঔপনিবেশিক পরিবেশের বৈপরীত্য

পরস্পর-বিবদমান নগর-রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে (সাইমন্ডস যাকে 'এজ অব ডিসপট' নামে অভিহিত করেছেন) ইতালিতে পেত্রার্কা থেকে এরাজমুস, লরেঞ্জো থেকে লোডোভিকো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো থেকে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল থেকে টিশিয়ান প্রমুখ বিশ্ববিমোহী ব্যক্তিপ্রতিভার উত্থান ঘটেছিল। পরিবেশ ও পরিস্থিতির বৈপ্যরীত্য যে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তে প্রতিভা বিকাশের গতি ও তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির পক্ষে পরোক্ষ সহায়কের ভূমিকা পালন করে, ইতালীয় রেনেসাঁসে তার প্রমাণ আছে। ঔপনিবেশিক পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা যে রামমোহন বা রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের মতো অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক ব্যক্তিপ্রতিভার উত্থানের পক্ষে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি তা তো দেখাই যায়।

চৈতন্য কি রেনেসাঁস-ম্যান?

উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের নাগরিক সীমাবদ্ধতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে 'চৈতন্য-রেনেসাঁস'-এর কথা তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, চৈতন্যের সময় বাংলাতে মহত্তর একটি রেনেসাঁস হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা বজায় রেখেই স্পষ্টভাবে আমরা বলতে চাই, চৈতন্যদেব মধ্যযুগীয় 'লিবারেটর' কিন্তু 'রেনেসাঁস-ম্যান' নন। মধ্যযুগের লিবারেটর ও 'রেনেসাঁস-ম্যানে'র মোদ্দা তফাৎ দু'টি। এক, 'রেনেসাঁস-ম্যান' কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করেন না। তার ভাষ্যকাররাও সে দাবি তোলেন না। মানুষ হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। দুই, বিশ্বাস নয় বিচার ; আনুগত্য নয়, জিজ্ঞাসাই তাঁর হাতিয়ার। চৈতন্যের সময় বাংলাতে রেনেসাঁস হয়েছিল বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা এই সত্যটা বিস্মৃত হয়ে যান। তৃতীয়ত, আরও একটা গুরুতর তফাৎ আছে। ধর্মগুরু জাতীয় 'লিবারেটর' তাঁর দেশে কালে পান 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর মর্যাদা। তাঁর ভাবনা-চিন্তা, তাঁর প্রদর্শিত পথেই জনমানস আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু রেনেসাঁসের কালে উদিত হয় বিভিন্ন ধরনের মননশীল ও সৃজনশীল প্রতিভা। বিভিন্ন দিক থেকে এখানে সমস্যাকে আক্রমণ করা হয়। জীবনকে বিভিন্নভাবে সংরচিত করার উদ্যম চলতে থাকে। চতুর্থত, দর্শনগত দিক থেকেও লক্ষণীয় তফাৎ বিদ্যমান। প্রাচীন শাস্ত্রকে রেনেসাঁস যুক্তিশোধিত করে না। প্রাচীন শাস্ত্র বা বিদ্যাকে সে ব্যবহার করে মানবিক কারণগুলিকে সমর্থন করার জন্য। প্রয়োজনে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সে প্রশ্ন তোলে।

প্রয়োজনে প্রাচীন শাস্ত্রকে ছেড়ে নতুন জ্ঞান ও ব্যবস্থার সঙ্গে হাত মেলায়। একেই বলে 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাকার রামমোহন চৈতন্যদেবের থেকে আলাদা ধরনের মানুষ। তিনি গ্যারিন কথিত 'নিউ টাইপ অব ম্যান'—'রেনেসাঁস ম্যান', ধর্মগুরু নন। তাঁকে ঘিরে সব কিছু আবর্তিত হবে এমন মত বা পথের প্রবর্তন তিনি করেননি। সম্ভাবনার নানা দরজা তিনি খুলে দিয়েছিলেন। বাংলার পরবর্তী রেনেসাঁস-পথিকরা যে যার মতো পথে চলেছিলেন। প্রত্যেকেই ছিলেন অনন্য ও স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারী। সকলের সপ্রতিভ দানে বেজে উঠেছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মহাসঙ্গীত।[৭]

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ঃ শস্যবীজ

অভিযোগ উঠেছে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুসরণ নিয়ে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জাড্য ভেঙে অধিকতর প্রগতিশীল মানবতাবাদী সংস্কৃতির সংরচনা কর্মে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের ধনবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে স্বাগত জানাতেই হয়েছিল। পশ্চিমী সভ্যতার কাছে হাত পেতে নেওয়া এই নতুন জীবনাদর্শ যে বাঙালীর জীবনে বাইরে থেকে পুঁতে দেওয়া গোঁজ হয়ে থেকে যায়নি. তা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে শস্যবীজের মতো অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলবান হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ মাইকেল-বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিকশিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দৃশ্যমান। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অমিত শক্তি ও ঐশ্বর্য দান করেছে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে যেমন সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি প্রাচ্য ঐশ্লামিক বিদ্যা ও সংস্কৃত উপনিষদাদির অনুবাদ করে সমৃদ্ধ করেছিলেন বাংলার সংস্কৃতিকে। ইয়ং বেঙ্গলরা পাশ্চাত্য শিক্ষার দিক থেকে, এবং বিদ্যাসাগর সংস্কৃত বিদ্যার দিক থেকে বাংলার সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্যশালী করার যে দ্বিমুখী প্রকল্প চালু করেছিলেন, তা মাইকেল-বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথে লাভ করেছিল ভারসাম্যযুক্ত সৃজনশীল বিকাশ। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলা ও নতুন মানবিক মূল্যবোধযুক্ত সাংস্কৃতিক বিশ্ব রচনা করার যে প্রক্রিয়া রামমোহন-ইয়ংবেঙ্গল-বিদ্যাসাগরের মধ্যে দিয়ে সচল হয়েছিল, তার সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক বিকাশ রবীন্দ্রনাথে দৃষ্টিগোচর হয়। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা নিয়েছিলেন বৌদ্ধিক পৃথিবীর দায়, আর শিল্পীরা গ্রহণ করেছিলেন নান্দনিক ভুবনের দায়িত্ব। মননশীলতা ও সৃজনশীলতার দ্বৈত যাত্রায় বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা-বিন্দুতে রামমোহনের অবস্থান, মধ্য-বিন্দুতে বঙ্কিমচন্দ্র ও সমাপ্তি-মুখে রবীন্দ্রনাথ।

দুই বিপরীত যাত্রার সংকট ও সংকটমুক্তি

জিজ্ঞাসা, বিতর্ক, প্রতিবাদ, সংগ্রাম-রুক্ষ প্রস্তাব, পুস্তিকা ও অনুবাদ কর্মের মধ্যে দিয়ে যার যাত্রা শুরু, রবীন্দ্রনাথের মতো সৃজনশীল সাহিত্যিক প্রতিভায় তার চূড়ান্ত সিদ্ধি।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাহিত বিজ্ঞানবাদী ও অধ্যাত্মবাদী জীবন ও বিশ্ব-চেতনার দু'টি ধারা শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথে এসে লাভ করেছে সমন্বয়িত বিকাশ। যাঁরা মনে করেন ইয়ংবেঙ্গলদের ইংরাজিয়ানা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পক্ষে বিভ্রান্তিজনক একটি পর্ব, আসলে বঙ্কিমচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে প্রতিষ্ঠিত নব্য-হিন্দুত্ববাদই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিজয়-বৈজয়ন্তী, তাঁরা রেনেসাঁসের সমগ্র প্রকল্পটির একাংশ মাত্র দেখতে পেয়েছেন। অপরপক্ষে, যাঁরা মনে করেন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনর্বাসনই রেনেসাঁসের আসল দিক, প্রাচীন প্রাচ্য-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার প্রয়াস তার পক্ষে ভ্রান্তযাত্রা মাত্র, তাঁরাও আরেক ধরনের ভ্রান্তির শিকার। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্বাসন বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে একটি নিখুঁত ভারসাম্য দান করেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রবল ছিল পশ্চিমিয়ানা, দ্বিতীয়ার্ধে প্রবল হয়ে ওঠে ভারতীয়ত্বের অভিমান। দু'দিকেই ছিল সম্পদ ও বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। অতি-পশ্চিমিয়ানার প্রবাসযাত্রা থেকে মাইকেলের প্রত্যাবর্তন সম্ভাব্য বিপদ থেকে সম্পদের বার্তা বহন করে আনে। অন্যদিকে, ভারতীয়ত্বের নামে বিশ্বের সমস্ত আলোকে বহিষ্কৃত করে নিজের ঘরের অন্ধকারকে পুজো করার যে আবহ দ্বিতীয়ার্ধে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিপদের ফাঁস কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্যকে সংকীর্ণতামুক্ত বৈশ্বিক চারিত্র্য দান করেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে একটিই অখণ্ড প্রক্রিয়া। মধ্যে দুই বিপরীত যাত্রার নাটকীয় সংকট। সংকট ও সংকটমুক্তির ধীরক্রিয় কিন্তু সুনিশ্চিত তালফেরতা কাহিনী দিয়ে সাজানো এ-রেনেসাঁসের ইতিহাস।

অসম্ভব একটি প্রাণচঞ্চল প্রহর

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার, উনিশ শতকে যা কিছু ঘটেছিল তার সবই রেনেসাঁস আখ্যা পাবার যোগ্য নয়। সেখানে অ্যান্টি-রেনেসাঁস ব্যাপারও প্রচুর ছিল। রামমোহন যখন সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য আন্দোলন করছিলেন, তখন সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 'ধর্মসভা'য় সমবেত হয়েছিলেন, দু'টোই কিন্তু রেনেসাঁস নয়। বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে নেমেছিলেন, তখন তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছিল প্রায় পঞ্চান্ন হাজারের উপর (বিদ্যাসাগর সংগৃহীত স্বাক্ষরের তুলনায় যা এগারো গুণ বেশি)। প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রগতিশীলতার সংগ্রাম একটি সমাজে সর্বদাই চলে। রেনেসাঁসের সময় প্রগতিশীলতার ধারা তীব্র ও গতিশীল আকার ধারণ করে। স্বল্প সময়কালের মধ্যে বিকশিত বহু মননশীল ও সৃজনশীল প্রতিভা সেই প্রগতিশীলতার ধারায় এমন শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চার করেন যে বহু শত বৎসরের কাজ সে-সময় সম্পন্ন হয়। জিজ্ঞাসায়, বিচারে, বিতর্কে, সক্রিয়তায়, সংরচনায় অসম্ভব গতিশীল ও প্রাণচঞ্চল একটি প্রহরের নামই রেনেসাঁস। এমন প্রহর একটি জাতির জীবনে কদাচ আসে। যখন আসে তখন পরিবর্তনকে সে নিয়ে আসে ঝড়ের পিঠে বহন করে। পুরাতনের আগল যায়

ভেঙে। প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠাগত ব্যাকুলতার বিপুল বৈভব দিয়ে সে সাজিয়ে দেয় সেই জাতির সাংস্কৃতিক সংসার। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অনিশ্চিত আবহ, উপনিবেশবাদের করাল ছায়া, বহিরাক্রমণের নিয়মিত আশঙ্কা, দু'ভাগে ভাঙা সমাজ-বিন্যাসের যন্ত্রণাময় ব্যবচ্ছেদের মধ্যেও তখন দেখা দেন পেত্রার্কা বা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো হিউম্যানিস্ট কবি ও চিত্রী ; রামমোহন থেকে অনন্য ব্যক্তিপ্রতিভার মিছিল চলতে থাকে যতদিন না রবীন্দ্রনাথের মতো মহা প্রতিভাধর হিউম্যানিস্ট কবি-সাহিত্যিক এসে জয় করে নেন বিশ্বনন্দিত স্বীকৃতি।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কয়েকজন মাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় রেনেসাঁস-পুরুষের মননশীল ও সৃজনশীল সক্রিয়তা ও অবদান বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি রেনেসাঁসের মূল সূত্রগুলি তাঁদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিল। মাত্র তিনপুরুষ সময়-সীমার মধ্যে বাংলাতে ব্যক্তিপ্রতিভার যে অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটেছে বা বঙ্গ-সংস্কৃতিতে যে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ নান্দনিক সংস্কৃতির বিচ্ছুরণ ঘটেছে, তাতে তাকে রেনেসাঁস হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তির কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

গুণগত বিচারে ন্যূন নয়

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির পথে বিশ্বসভ্যতা প্রথম পা বাড়িয়েছিল ইতালীয় রেনেসাঁসের মধ্যে দিয়ে। সেই কারণে আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় সে রেনেসাঁস বিশ্ববিখ্যাত। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মধ্যে দিয়ে বিশ্বসভ্যতার কোনো পালাবদল ঘটেনি, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার চার-পাঁচশো বছরের ভাবধারা ও ঐতিহ্যকে প্রেক্ষিত হিসাবে পেয়েছিল বলেই হয়তো গুণগত বিচারে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীদের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ইতালীয় রেনেসাঁসের মর্যাদা স্বীকার করেও বলা যায়, রামমোহনের মতো সংশ্লেষণ-রচনাকারী বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব, ডিরোজিওর মতো প্রাণোন্মাদনা সৃষ্টিকারী তরুণ শিক্ষক, বিদ্যাসাগরের মতো কর্মিষ্ঠ হৃদয়বান হিউম্যানিস্ট, মাইকেলের মতো বিদ্যুৎ ঝলকিত সাহিত্যিক প্রতিভা, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মননশীল ও সৃজনশীল প্রতিভার সব্যসাচী এবং রবীন্দ্রনাথের মতো সামঞ্জস্যের অধিরাজ ও নব-নব উন্মেষশালিনী নান্দনিক সৃজনপ্রতিভা সে-রেনেসাঁসে অদৃষ্ট ছিল। বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে 'প্রিন্স অব রেনেসাঁস' আখ্যাত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির তুলনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অবদান বেশি তো কম নয়। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা যতটা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, ব্যক্তিপ্রতিভার কর্ষণ দিয়ে ক্রয় করতে সচেষ্ট ছিলেন আত্মসুখ, ঠিক ততখানি বিবেকবান ও সমাজমনস্ক ছিলেন এমন প্রমাণ মেলে না। অন্যপক্ষে, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কৃতী নায়করা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতন ও বিবেকী ব্যক্তিত্ব ; স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নয়নী চেতনার সঙ্গে বিশ্বমানবতাবাদকে তাঁরা যেভাবে মিলিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর ঐশ্বর্যে অন্বিত।

ইতালীয় রেনেসাঁসের মতো বিশ্বসংস্কৃতির পালা-বদলের ঘটনা বঙ্গীয় রেনেসাঁসে ঘটেনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বঙ্গীয় ভূগোলের অতি ক্ষুদ্র অংশে এই রেনেসাঁসের উদয় ঘটলেও সমকালেই এর আলো সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশ্বের। এরাজমুস বা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যে বিশ্বের বাসিন্দা ছিলেন তা সীমাবদ্ধ ছিল ইওরোপের খণ্ড ভূগোলেই, পৃথিবীর কোনো সংকটই তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল না। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বকবি। তিনি বলতে পারতেন, 'যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি/আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনই।' ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিশ্বজোড়া সংকটের দিনে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মানবতাবাদের পক্ষে বিশ্ববিবেকের ভূমিকা। সভ্যতার আরেক পালাবদলের ইতিহাসকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে যান, ('*রাশিয়ার চিঠি*') তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

রেনেসাঁসের দুই প্রান্তে ইতালি ও বাংলা

ইতালীয় রেনেসাঁসে রচিত হয়েছিল উদীয়মান বুর্জোয়া সভ্যতার অভ্যর্থনাপত্র। বঙ্গীয় রেনেসাঁসে ঘোষিত হয় তার একরকম বিদায়-সম্ভাষণ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পটভূমিকায় রেনেসাঁস নামক চেতনা ও নান্দনিকতা জড়ানো বিশিষ্ট পরিবর্তন প্রক্রিয়াটির কোনো নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ইতিহাস যদি লেখা হয়, তাহলে তার একপ্রান্তে যেমন থাকবে দান্তে, পেত্রার্কা, এরাজমুস, লিওনার্দো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর কথা ; অন্যপ্রান্তে তেমনি থাকার কথা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের কথা।

রেনেসাঁস একটি অনির্বাণ আলোকশিখা

আরেতিনো একবার বলেছিলেন, 'জগতে অনেক রাজা আছে কিন্তু মাইকেল অ্যাঞ্জেলো মাত্র একজন।' একথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অনায়াসে বলা যেতে পারে। মানবমুক্তির অফুরান বিশ্ব-প্রকল্পে ইতালির মতো বঙ্গীয় রেনেসাঁসও যে একটি অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালিয়ে ধরেছিল—এই সত্যকে ভিত্তিহীন বিচারের ধূম্রজাল থেকে মুক্ত করার এই নিবিড় ও সদর্থক প্রয়াসের সমাপ্তিবিন্দুতে স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথেরই ক'টি অনিঃশেষ ছত্র—

"শেষ নাহি যে
শেষ কথা কে বলবে।
আঘাত হয়ে দেখা দিল,
আগুন হয়ে জ্বলবে।
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।"[৮]

উল্লেখপঞ্জী ও টীকাটীপ্পনী

১. J. Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (1860), Tran. London edition, 1945

২. R. S. Kinsman (ed), *The Darker Vision of the Renaissance Culture*, California, 1974

৩. "The Renaissance, it seems to me was essentially an age of transition containing much that was recognizably modern and also, much that of the mixture of medieval and modern elements, was peculiar to itself and was responsible for its contradiction and contrasts and its amazing vitality", W. K. Ferguson, 'The Reinterpretation of the Renaissance', *Facets of the Renaissance*, California, 1954, p. 16

৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার রেনেসাঁস বিচারের দুই মেরু', প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৯ম বার্ষিক অধিবেশন, উলুবেড়িয়া কলেজ, ৯ নভেম্বর ১৯৯২, আধুনিক ভারত বিভাগে পঠিত নিবন্ধ। প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *"ইতিহাস অনুসন্ধান-৮ম"* খণ্ডে সঙ্কলিত, ১৯৯৩

৫. N. Konrad, 'On the Epoch of Renaissance' 1965, *The East and The West* (Russian), Moscow, 1972 ; Dr. P. Ghosh, 'Some Aspects of Renaissance, Reformation and Religion in Modern India', (Paper)

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মুক্তধারা* (১৯২২), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, প. ব. সরকার, ১৯৮৪, পৃ. ৮৪৬

৭. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহনের মূল্যায়ন ঃ তৃতীয় পর্যায়—ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে', *"চতুরঙ্গ"*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪, পৃ. ১১৪-১২৯

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি*, (১৩২১), ৩৮ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প. ব. সরকার, মে ১৯৮২, পৃ. ৩৮৪

পরিশিষ্ট

রেনেসাঁস-বিতর্ক

[*"গণশক্তি"* পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার উৎপল দত্ত রচিত 'সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল?' প্রবন্ধটি থেকে রেনেসাঁস বিষয়ে যে বিতর্ক উত্থিত হয়েছিল তাতে যোগদান করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ও বিধানসভার স্পিকার সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ। উৎপল দত্তের রচনার প্রাসঙ্গিক অংশ ও বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের বাদ-প্রতিবাদ এখানে তুলে দেওয়া হলো।]

।। ক ।।

প্রবন্ধ ঃ 'সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল?'

—উৎপল দত্ত, *"গণশক্তি"*, ২৮ মে ১৯৯২

....ওঁরা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে লাগানোর মতো এখন দুটি লেবেল খুঁজে পেয়েছেন। এক, সত্যজিৎ রায় হলেন 'ভারতরত্ন' এবং দুই, তিনি একজন রেনেসাঁর (নবজাগরণ) মানুষ। কলকাতায় নন্দনে যখন তাঁর মরদেহ শায়িত ছিল, তখন দূরদর্শনের ধারাভাষ্যকার বারেবারে বলে যাচ্ছিলেন, সত্যজিৎ রায় হলেন ভারতীয় রেনেসাঁর প্রতিনিধি। আচ্ছা বলুন তো এই ভারতীয় রেনেসাঁ বস্তুটি কি? ইতিহাস কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।......

ঐতিহাসিকরা একটা সময় বাংলা রেনেসাঁর কথা বলতেন। সেটা হলো ১৮২৬ সালে শিক্ষক ডিরোজিও'র আবির্ভাব থেকে শুরু করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কীর্তি হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল পর্যন্ত। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এখন এই প্রগতিশীল ধারণার জোয়ার থেকে 'রেনেসাঁ' শব্দটি বাদ দিয়েছেন। তাঁরা এটিকে শুধুই বাংলার সংস্কার আন্দোলন বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এখন সঠিকভাবেই যুক্তি দেখান যে 'রেনেসাঁ' বলতে বোঝায় একটি বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব যাঁরা রেনেসাঁর মতবাদের জোয়ারে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে আনে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভবে বাধা দিতে পেরেছিল। সুতরাং ভারতে রেনেসাঁর কথা বলা অর্থহীন।

তবে সম্ভবত সরকার থেকে 'রেনেসাঁ' শব্দটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অন্য একটি উদ্দেশ্যে, তা হলো ভাসাভাসা ভাবে এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পের কিছু বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করা। ইতিহাস নিয়ে দিল্লির আমলাতন্ত্র সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন, একথা কখনই বলা যাবে না।

টিভিতে শুধু একটা কথাই শোনা গেছে তা হলো সত্যজিৎ রায় ছিলেন এক আশ্চর্য বহুমুখী প্রতিভা। অর্থাৎ একজন মানুষ একই সঙ্গে চলচ্চিত্র পরিচালক, ডিজাইনার, চিত্রশিল্পী,

সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার, বইয়ের চিত্রকর এবং মুদ্রণ-শিল্প ও তার ইতিহাস সম্পর্কে অথরিটি হতে পারেন এটা তাদের কাছে ব্যাখ্যার অতীত। সুতরাং এঁরা সত্যজিৎ রায়ের গায়ে এই বহুমুখীনতায় একটি লেবেল লাগিয়ে দিলেন। যেন রেনেসাঁর মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো তাঁদের বহুমুখী প্রতিভা। কিন্তু লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে বিশ্বের রেনেসাঁ প্রতিভার মডেল বলে মনে করা ভুল। বরং তিনি ছিলেন সে যুগের একটি ব্যতিক্রম। রেনেসাঁ মতবাদের অন্যান্য প্রবক্তারা সকলেই কেবলমাত্র একটি বিষয়েই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের সমকালে অন্যান্যদের ধারণাকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। কেউ কখনও শোনেননি যে, মাইকেল এঞ্জেলো ছবি আঁকা ও ভাস্কর্য ছাড়া অন্য কিছু করেছেন, অথবা শেক্সপীয়র নাটক লেখা ছাড়া অন্য কিছু করেছেন কিংবা মেকিয়াভেলি তাঁর রাজনৈতিক পুস্তিকা লেখা থেকে সময় বাঁচিয়ে বসে বসে হার্প নিয়ে গৎ তৈরি করেছেন। শিল্পের একটি দিক নিয়ে একাগ্র সাধনা করলেই কেউ রেনেসাঁ মানবের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়তে পারেন না।......

।। খ ।।

চিঠিপত্র ঃ সত্যজিৎ রায় এবং রেনেসাঁ

—*"গণশক্তি"*, ৯ জুন ১৯৯২

গত ২৮শে মে, *"গণশক্তি"*তে উৎপল দত্তের 'সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল?' নামক একটি প্রতিবাদী লেখা পড়লাম। সত্যজিৎ রায়কে সম্মানিত করার নামে ভারত সরকার যে সাংস্কৃতিক দেউলেপনার পরিচয় দিয়েছেন তা দত্ত দারুণভাবে বলেছেন। সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

কিন্তু রেনেসাঁস বিষয়ে তিনি কিছু বিভ্রান্তিকর বক্তব্য পেশ করেছেন। সে বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দত্তের বিক্ষিপ্ত বক্তব্য পড়ে মনে হয় তিনি রেনেসাঁসকে একটি মতবাদ বলে মনে করেন। কিন্তু রেনেসাঁস কোন মতবাদ নয়। রেনেসাঁস হচ্ছে ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ থেকে ধনতান্ত্রিক আধুনিক যুগে উত্তরণের একটি ক্রান্তিকালীন সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ। এ ব্যাপারটা প্রথমে হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালিতে।

উৎপল দত্ত বলেছেন, 'রেনেসাঁ বলতে বোঝায় একটি বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব যাঁরা রেনেসাঁর মতবাদের জোয়ারে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে আনে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়।' ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লবের সমকালীন ইউরোপের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য মিললেও রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালির সঙ্গে এই তাত্ত্বিক বক্তব্য খাপ খায় না। ইতালির রেনেসাঁসের সঠিক চরিত্র ও বাস্তবতার সঙ্গে যে বক্তব্য খাপ খায় না তাকে রেনেসাঁস বিচারের শুদ্ধ মানদণ্ড বলি কি করে? শিল্পীর ধনতন্ত্র নয়, ইতালীয় রেনেসাঁসের ভিত্তি ছিল বাণিজ্যিক ধনতন্ত্র। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের প্রাথমিক উদয়লগ্নে ইতালিতে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল দুর্বল ও অপরিণত। অভিজাততন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তার হাত তখনো মেলানো। বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কোন প্রশ্নই সেখানে আসতে পারে না। তখনো সেখানে

রাজত্ব করছেন প্রিন্সরা। জে এ. সাইমন্ডস তাঁর *'রেনেসাঁস ইন ইতালি'* গ্রন্থে ইতালির রাজনৈতিক অবস্থাকে 'এজ অব ডিসপট্' নামে অভিহিত করেছেন। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা তখনও সুস্পষ্ট নয়। নবোদ্ভূত ধনিক-বণিকরা বছরে অন্তত চার মাস গ্রামস্থিত ভিলাতে কাটাচ্ছেন। মার্টিন ভন তাঁর *'সোশিওলজি অব দ্য রেনেসাঁস'* নামক গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে করে দেখিয়েছেন, নবোত্থিত বুর্জোয়ারা সে-সময় কিভাবে উৎপাদনমুখী সক্রিয়তা থেকে সৌন্দর্য-বিলসিত আভিজাতিক নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তখনো পোপ রাজত্ব করছেন পূর্ণ বিক্রমে। বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা পোপ ও রাজন্যকের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করছেন। এই ধরনের অপরিণত ও বিমিশ্রিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক-ও সামাজিক-পরিস্থিতির ফসল ইতালীয় রেনেসাঁস। গলদটা গোড়ায়। আমাদের রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা রেনেসাঁসের আমলে ইতালির পরিস্থিতি কি ছিল তা খতিয়ে দেখেননি। ধরে নেওয়া হয়েছে, একটি পরিণত শক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণী রেনেসাঁস ঘটিয়েছিল। সত্তরের দশকে এই ভ্রান্ত মানদণ্ডটি রচিত হয়। একদল অতিবিপ্লবী এমনকি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মধ্যে খুঁজতে থাকেন প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের লক্ষণগুলিও। না পেয়ে প্রথমে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষদের মূর্তি ভাঙা, পরে নস্যাৎমূলক প্রবন্ধ ও তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করেন। উৎপল দত্তের রেনেসাঁস সম্পর্কিত বক্তব্যে সেই ভ্রান্ত মানদণ্ডটি কিয়ৎ-পরিমাণে গৃহীত । তিনি যে মডেল গ্রহণ করেছেন তাতে বাংলার রেনেসাঁস তো কোন ছার, খোদ ইতালীয় রেনেসাঁসই খারিজ হয়ে যাবে।

উৎপল দত্ত আর একটি উদ্ভট বক্তব্য রেখেছেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সম্পর্কে। তাঁর মতে, 'বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে বিশ্বের রেনেসাঁ প্রতিভার মডেল বলা ভুল। বরং তিনি ছিলেন সে যুগের একটি ব্যতিক্রম। রেনেসাঁ মতবাদের অন্যান্য প্রবক্তারা কেবলমাত্র একটি বিষয়েই বিশেষজ্ঞ ছিলেন।' সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বক্তব্য। ব্যক্তি-প্রতিভার বিস্ফোরণের সেই যুগে অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক—এই তিন ধরনের প্রতিভা দেখা দেয়। স্পেশালাইজেশনের যুগ তখনো দূর অস্ত। একজনকে তখন অনেক কিছু জানতে ও পারতে হতো। আলবের্তি নামে একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করি। তিনি পারতেন না এমন কাজ ছিল না। ঘোড়ায় চড়া, অসি-চালনা, সঙ্গীত-সাধনা, গ্রীক ও লাতিন-চর্চা, ইতালীয় ভাষায় আদর্শ গদ্য-রচনা, স্থাপত্যকর্ম, ভাস্কর্য, চিত্রকর্ম, যন্ত্রবিদ্যা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা বিষয়ে প্রস্তাব রচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে এমন পারদর্শী ছিলেন যে ল্যান্ডিনো বলেছিলেন, 'আলবের্তিকে কোন পর্যায়ে ফেলব?' মাইকেল অ্যাঞ্জেলো নাকি ছবি আঁকা ও ভাস্কর্য ছাড়া কিছু করেননি। যিনি *'ডেভিড'* বা *'মেদিচি ভল্টে'র* মতো ভাস্কর্য রচনা করেছেন, সেন্ট পিটার গির্জার গম্ভীর গম্বুজ বানাচ্ছেন, সিস্টিন চ্যাপেলের বিশ্ববিশ্রুত ফ্রেস্কোমালা সাজাচ্ছেন, আবার ভিত্তোরিনো কলোনার প্রেমে পড়ে ৭০ বছর বয়সে রচনা করছেন মধুর চিত্তদ্রাবী সনেট (দ্রঃ ওয়াল্টার পেটারের *'দ্য রেনেসাঁস',* পৃ. ৫৭)। তাকে কি একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলবো? এরকম বহু উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় রেনেসাঁসের যুগ বহুমুখী-প্রতিভার যুগ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সে-যুগের যথার্থ প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিভা। এ বিষয়ে *এঙ্গেলসের* কিছু অসাধারণ বক্তব্য আছে। তাঁর *'ডায়ালেকটিকস অব নেচার'* থেকে (পৃ. ১-৩) কিছুটা তুলে দিচ্ছি—"আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার

মধ্যে এটি হলো সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব, এ যুগের প্রয়োজন ছিল অসাধারণ মানুষের, তার সৃষ্টিও হয়েছিল—যাঁরা ছিলেন চিন্তাশক্তি, নিষ্ঠা, চরিত্র, সার্বজনীনতা এবং বিদ্যায় অসাধারণ......তখনকার দিনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে এমন লোক কমই ছিলেন, যাঁরা বহুদেশ ভ্রমণ করেননি।......মেকিয়াভেলি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, কবি এবং সেই সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রখ্যাত সামরিক বিদ্যার গ্রন্থকার......তদানীন্তন নায়করা তখনও শ্রমবিভাগের আয়ত্তাধীন হননি, যার সীমাবদ্ধকারী ফলাফল তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।"

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়
টিচার ফেলো, বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

।। গ ।।

চিঠিপত্র ঃ প্রসঙ্গ ঃ ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল

—*"গণশক্তি"*, ২৭ জুন ১৯৯২

২৮শে মে *"গণশক্তি"তে* প্রকাশিত উৎপল দত্ত মহাশয়ের 'সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁর *ফসল?*' নিবন্ধটি পড়লাম। এই নিবন্ধতে রেনেসাঁ সম্পর্কিত আলোচনাটা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ বিশেষ ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার তথা আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনকে অনেকেই আধুনিক বাংলার নবজাগবণ বা রেনেসাঁ বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তির প্রসারের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত কোনও আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। একটি পরাধীন জাতির বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম ছাড়া এবং স্বাধীনসত্তা ব্যতিরেকে রেনেসাঁ কি সম্ভব? ইতিহাস প্রমাণ করে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং নীলকর বিরোধী আন্দোলনের মত কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রামগুলিও মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছ থেকে কোন সমর্থন পায়নি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে বা ভারতের পরাধীনতামুক্তি প্রচেষ্টার প্রধান সংগ্রামে তখনকার বাঙালীবাবুরা প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন। এরপর কোন কৃষক সংগ্রামই তারা সমর্থন করেননিই বরং প্রয়োজনমতো প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮৭২ সালে পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুরে যে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয় যা 'পাবনা রেন্ট রাইট' নামে পরিচিত, সেই সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে আন্দোলনবিরোধী কার্যকলাপ চলতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত সমস্ত কৃষক বিদ্রোহ সঠিক পথেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পরিণত ছিল কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত নবজাতকেরা ক্রমশ কৃষক সংগ্রামের বিরোধিতা করে। বাঙালী জীবনের বর্তমান বেদনা ও দুঃখ এবং দেশবিভক্তির অন্যতম কারণ তাদের এই প্রত্যক্ষ বিরোধিতা।

অনেকে মনে করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শুরু হয়। অর্থাৎ পূর্বতন জমিদারদের হাত থেকে দশসালা বন্দোবস্তের

কার্যত নিলামী ডাকে নতুন জমিদাররা, যাদের মধ্যে অনেকেই কলকাতায় ছিলেন তাদের হাতে জমিদারী তুলে দিয়ে এবং নব্য জমিদারশ্রেণীর সাথে একটি আঁতাত বা সমঝোতা মারফত ইংরেজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করেন। আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে একটি 'স্বর্ণপ্রসবী মন্ত্র' ছিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছত্রছায়ায় প্রতি বছর অসংখ্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্ম হতে থাকে। আগে জমিদারী সেরেস্তার নায়েব গোমস্তা, তহশীলদার, পাইক, বরকন্দাজ ছিল যারা একটি পরভোজী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জমিদারের মতই অপরের পরিশ্রমের উপর জীবন ধারণ করত। কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল কম। লর্ড কর্নওয়ালিশ একদিকে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন, অন্যদিকে তেমনি নতুন প্রশাসনের ব্যবস্থা করলেন। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হলো। জমিদারের নিচে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সেরপত্তনিদার, খয়ের পত্তনিদার প্রমুখ এবং অকৃষক রাইয়ত যারা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নানান শর্তে কৃষকদের খাটিয়ে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করলেন। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাদের স্থানে উটবন্দী, ধানকরারী, কুদভাগ ও বর্গাদারী ব্যবস্থায় গতরখ'টা কৃষকে পরিণত করলেন। এদিকে ইংরেজ প্রশাসন মারফত হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হাইকোর্ট মারফত এদেরই উচ্চশ্রেণীকে পরভোজী নব্যজীবনের প্রতিষ্ঠার সহায়ক করা হল। কিন্তু এতেও সম্পূর্ণ কাজ হবে না বুঝে এবং কৃষকদের থেকে স্বাধীনতা প্রয়াসী অন্যান্য শ্রেণীকে আলাদা করার জন্য নরমপন্থী বা সংস্কার-পন্থীরা 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর স্থাপনা করলেন, যে আন্দোলন ছিল শিক্ষিত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন মাত্র। এককথায় বলা যায়, কৃষক সংগ্রামসমূহের বিরোধিতা করেই এই সংগঠনের উদ্ভব ও প্রসার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের লক্ষ্যই ছিল তাদের মদতপুষ্ট নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমির উপরে তার স্বত্বকে পোক্ত করে কৃষকসংগ্রাম থেকে জনসাধারণকে পৃথক করা। এই উদ্দেশ্য কর্নওয়ালিসের বংশধররা বিশেষ নিপুণতার সাথে কাজে লাগিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এমনকি যারা বিপ্লবী আন্দোলনে এসেছিলেন তারাও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করেননি। সেজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে তার শেষার্ধে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোন সংগ্রামে বাংলার ধর্মসংস্কারকরা নেতৃত্ব করেননি, বরং সেদিক দিয়ে ১৮৫৫-র (সাঁওতাল বিদ্রোহ) পর বা এমনকি ওয়াবী-ফরাজীর (১৮৩২) পর থেকেই সমস্ত কৃষক সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়। রেনেসাঁ যখন কোন একটি সমাজের সামগ্রিক পূর্ণতার প্রতিভূ, তখন আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনমুখী সংগ্রামে ক্ষান্ত থেকে এমনকি বিরোধিতা করে তাদের রেনেসাঁর দাবিদার হওয়া সঠিক নয়।

সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ
কলিকাতা-১৭

।। ঘ ।।

চিঠিপত্র ঃ প্রসঙ্গ ঃ রেনেসাঁ-বিতর্ক

—*"গণশক্তি"*, ১০ জুলাই ১৯৯২

উৎপল দত্ত সূচিত রেনেসাঁ-বিতর্কে সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহর যোগদান বিতর্ককে আকর্ষণীয় জায়গায় পৌঁছে দিল। হবিবুল্লাহ লিখিত চমৎকার তথ্যনিষ্ঠ চিঠি (২৭ জুন, *"গণশক্তি"*) থেকে পাঠক জানতে পারবেন, কৃষক আন্দোলনের দিক থেকে বিচার করলে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পাঠ কেমন দাঁড়ায়। তিনি দেখিয়েছেন, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষরা বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম করেনি। ইংরেজরা বুর্জোয়াদের জমিদার করে দিয়েছিল। নবসৃষ্ট মধ্যবিত্তরা ছিল পরভোজী সম্প্রদায়। তাদের স্বাধীন সত্তা ছিল না। কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তনের কোন সনদ রেনেসাঁস আনেনি। শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিল তাঁদের সংগ্রাম ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে। প্রকৃত রেনেসাঁসে এরকম হওয়ার কথা নয়। অতএব 'রেনেসাঁ যখন কোন একটি সমাজের সামগ্রিক পূর্ণতার প্রতিভূ তখন আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনমুখী সংগ্রামে ক্ষান্ত থেকে তাদের রেনেসাঁর দাবিদার হওয়া সম্ভব নয়।' বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নস্যাৎকারী ভাষ্যকাররা দীর্ঘদিন ধরে (ইতালীয়) রেনেসাঁস সম্পর্কে সর্বোদয় জাতীয় একটা ইউটোপীয় ধারণা তৈরী করে দিয়েছেন যা আদৌ বস্তুনিষ্ঠ নয়—তাঁরাই রেনেসাঁস সম্পর্কে এই ধরনের স্পর্শকাতর মনোভাবের জন্য দায়ী। ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে অল্পবিস্তর পড়াশুনার সূত্রে বলতে পারি, রেনেসাঁস আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনমুখী সংগ্রাম বা কোন কৃষক মুক্তির প্রকল্প ছিল না।

১. প্রসঙ্গ ঃ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

উনিশ শতকের পরাধীনতাগ্রস্ত বাংলার সঙ্গে রেনেসাঁসকালীন ইতালির হুবহু মিল না থাকলেও স্বাধীন দেশ হিসাবে তার অবস্থা খুব সুবিধাজনক ছিল না। উইল ডুরান্টের ভাষায় "ইতালি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐক্যের জন্য একজন বিজেতার অপেক্ষায় ছিল।" (*দি স্টোরি অব সিভিলাইজেশন,* ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৩)। মেকিয়াভেলি ইতালির রাজনৈতিক অবস্থা চিত্রিত করতে গিয়ে বলেছেন, "ইতালীয়দের অবস্থা হিব্রু-ভাষীদের চেয়ে দাসত্বপূর্ণ, পারসিকদের চেয়ে অত্যাচারিত ও এথেনীয়দের তুলনায় ছন্নছাড়া ও বিশৃঙ্খল।" ইতালি ছিল বিদেশের কাছে আধা পদানত। দক্ষিণ ইতালি হয়েছিল স্পেনের অধীন ও উত্তর ইতালি ফ্রান্সের। প্রখ্যাত রেনেসাঁস ঐতিহাসিক গুইচারদিনি (১৪৮৩-১৫৪০) মৃত্যুর আগে তিনটি জিনিস দেখে যেতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি 'বর্বর আক্রমণকারীদের হাত থেকে ইতালির মুক্তি'। বলাবাহুল্য, তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি। রেনেসাঁসের ইতালি ক্রমশ পদানতির দিকেই এগিয়ে গিয়েছিল। ইতালীয় রেনেসাঁসের ধারক-বাহকরা স্বাধীনতার জন্য সেই অর্থে কোন রাজনৈতিক বা আদর্শগত লড়াই করেছিলেন, এমন তথ্যপ্রমাণ আমার গোচরে আসেনি।

২. প্রসঙ্গ ঃ স্বাধীনচিত্ততা ও পরোপজীবী

ইতালীয় রেনেসাঁসের মুখ্য রূপকাব হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীর দল। তাঁরা আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন পরগাছা শ্রেণীর মানুষ। বুদ্ধি ও শৈল্পিক যোগ্যতার গুণে তাঁদের অধিকাংশই সমাজের নিম্নতল থেকে উঠে এসে পোপ বা প্রিন্সদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে তাদের উপগ্রহে পরিণত হয়েছিল। অর্থ ও যশেব কাঙাল হয়ে রেনেসাঁসের বিদ্বান ও শিল্পীরা পেট্রনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন এক সিটি-স্টেট থেকে অন্য সিটি-স্টেটে। খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের রাজমহলে প্রবেশ করে এঁরা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন স্বসমাজ বা সমাজের বাকি মানুষদের কথা। রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক হিসাবে খ্যাত পেত্রার্কা ১৩৫৩ সালে ফ্লোরেন্সের অধ্যাপনার পদ ও মিলানের সন্ত্রাসবাদী রাজন্যকের সভাসদপদের মধ্যে বেশি অর্থকরী বলে অত্যাচারীর দাসত্বই গ্রহণ করেছিলেন। বোক্কাচিও বারংবার চেষ্টা করেও তাকে নিরস্ত করতে পারেননি। একে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বলার বিশেষ কোন অবকাশ নেই। কেননা চরিত্রগতভাবে তাঁরা ছিলেন তোষামুদে ও স্বার্থসেবী।

৩. বুর্জোয়া-জমিদার প্রসঙ্গ

বুর্জোয়ারা জমিদার হয়ে গেলে রেনেসাঁসের রঙমহলে তাদের প্রবেশ নাকি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই যুক্তিতে রামমোহনকে কেউ কেউ কচুকাটা করতে চেয়েছেন। কিন্তু ইতালির ইতিহাসে দেখছি নবোদ্ভূত ধনিক-বণিকরা শিল্প, বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে 'invested a share of their capital in the agricultural exploitation of the land' (অ্যান্টনি মালহো সম্পাদিত '*সোস্যাল ইকনোমিক ফাউন্ডেশন অব ইটালিয়ান রেনেসাঁস*', পৃ. ৭) বিখ্যাত 'লোপেজ থিয়োরি'তে এ নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে। সে আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি। (দ্রঃ *"সমাজ সমীক্ষা"* পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেজ'-এর মুখপত্র ২৯-৩০ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯২)

৪. কৃষক প্রসঙ্গ

'*নো সিটি, নো রেনেসাঁস*' (*জে. আর. হেল. সম্পাদিত 'এ কনসাইজ এনসাইক্লোপেডিয়া অব দ্য ইটালিয়ান রেনেসাঁস'*)। শহরই রেনেসাঁসের প্রাণকেন্দ্র। রেনেসাঁস ইতালিতে শতকরা তেরো ভাগ মানুষ শহরে ও সাতাশি ভাগ মানুষ গ্রামে থাকতেন। গ্রামের মানুষরা মূলত ছিলেন কৃষিজীবী। রেনেসাঁসের সময় কেমন ছিলেন তাঁরা? ই. আর. চেম্বারলিন তাঁর '*এভরিডে লাইফ ইন রেনেসাঁস*' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে তার উত্তর দিয়েছেন। যে জমি তারা চাষ করত তাতে তাদের কোন স্বত্ব ছিল না। জমির মালিকানা নানা ভাগে-উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু করের বোঝা বইতে হতো তাদেরই। কৃষি-জমির মালিক হিসাবে নবোদ্ভূত ধনিক ও বণিকশ্রেণীর আবির্ভাব ও ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার শিকার হয়েছিল তারা। এরফলে 'ভ্যাগাবন্ড' ও 'ল্যান্ডলেস' মানুষের সংখ্যা সে-সময় বৃদ্ধি পায়। জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এদের অনেকে শহরের পথে পাড়ি জমালেও সেখানে তারা বস্তিজীবনে নতুন ধরনের দাসত্বের শিকার হতো। ভোর পাঁচটা

থেকে রাত আটটা পর্যন্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তারা পেটভরা রুটির সংস্থান করতে পারত না। রেনেসাঁসে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত মানুষরা যখন সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যবিলসিত জীবন যাপন করত, তখন কৃষক-সাধারণ কীভাবে দিন কাটাত সে-সম্পর্কে এল. এল. স্নাইডার লিখেছেন, 'Badly clothed, wretchedly fed, ill housed he lived in ignorance, squalor and misery' (*'দ্য মেকিং অব মডার্ন ম্যান'*, পৃ. ১১৫)। চেম্বারলিন লিখেছেন, "মধ্যযুগের সমাপ্তি ও (রেনেসাঁসের মধ্যে) আধুনিক যুগের সূচনাবর্ষগুলি নিচুতলার বিশাল সংখ্যক মানুষের বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের দ্বারাও চিহ্নিত হতে পারত।" (চেম্বারলিন, পৃঃ ৮৬) সাধারণ মানুষকে রেনেসাঁস প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

জনগণ সম্পর্কে রেনেসাঁসের ধারক-বাহকদের মনোভাব কেমন ছিল তা বোধহয় মেকিয়াভেলি ও গুইচারদিনির লেখায় ধরা পড়েছে। গুইচারদিনি তাঁর *'রিকর্ডি'*তে লিখেছেন, 'To speak of the people is in truth to speak of a beast ; mad, mistaken, perplexed, without taste, discernment, or stability.' সুতরাং কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, সমস্যা, সংগ্রামের. শরিক হওয়ার কোন ব্যাপার সেখানে ছিল না। সবিনয়ে জানাই আমাদের নস্যাৎবাদী রেনেসাঁস ভাষ্যকাররা ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, এমন প্রমাণ তাঁদের গ্রন্থে নেই। জে. এ. সাইমন্ডসের ভাষায় "রেনেসাঁস মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক।" সাধারণের অবস্থা পরিবর্তনের কোনও সনদ সে আনেনি। সেজন্য পৃথিবীকে আরো চার-পাঁচশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। সে সনদ এনেছে মার্কসবাদ। নস্যাৎবাদী রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা টমাস মোরের (ইংলন্ডের বিখ্যাত রেনেসাঁস-হিউম্যানিস্ট) *'ইউটোপীয়া'*র আদলে রেনেসাঁসের একটি কল্পভুবন বিনা কালিতে রচনা করে গেছেন মাত্র। তার বিরুদ্ধে সামান্য কিছু তথ্য পেশ করা গেল। এতদসত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রের জাড্য ভেঙে আধুনিক জীবনধারার প্রথম সূচনাকার হিসাবে এঙ্গেলসের বিচারে ইতালীয় রেনেসাঁস যদি 'সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল বিপ্লব' হতে পারে, তবে রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগর-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-পরিবৃত বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে আমরা সমগ্রত বাতিল করতে যাবো কিসের ভিত্তিতে?

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়
টিচার ফেলো, বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

অজয়েন্দ্রনাথ সবকাব — *উনিশ শতকের সমাজসংস্কার-আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক-রচনা*, ১৯৮২

অজিতকুমাব ঘোষ — *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, ৭ম পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৮৫

অন্নদাশঙ্কব রায় — *বাংলার রেনেসাঁস*, ১৯৭৪

অন্নপূর্ণা বিশ্বাস — *অক্ষয়কুমার দত্ত : সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তা*, ১৯৯৭

অবন্তীকুমার সান্যাল — *রবীন্দ্রনাথেব গদ্যরীতি*, কার্তিক ১৩৭৬

অমর দত্ত — *ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস্*, আগষ্ট ১৯৭৩

অমরেশ দাস — *রবীন্দ্রচিন্তায় সমাজতন্ত্র*, ১৩৯৪

অমল ঘোষ — *মূর্তিভাঙ্গার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর*, ১ অক্টোবব ১৯৭৯

অমলেন্দু দে — *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, ১৯৮৭

অমলেন্দু দে — *সমাজ ও সংস্কৃতি*, ১ নভেম্বর ১৯৮১

অমলেন্দু বসু — *সাহিত্যচিন্তা*, ১৩৭৯

অমিতাভ ঘোষ — *বিশ্ববিদ্যার আনন্দপ্রাঙ্গণে*, ১৩৯৩

অমিয়কুমার মজুমদার — *রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস*, ১৯৬৫

অরবিন্দ পোদ্দার — *বঙ্কিম-মানস*, ১৯৫১

অরবিন্দ পোদ্দার — *উনবিংশ শতাব্দীর পথিক*, ২য় পরিবর্ধিত সং, ১৯৭৩

অরবিন্দ পোদ্দার — *রামমোহন : উত্তরপক্ষ*, ১৬ই জুন ১৯৮২

অরবিন্দ পোদ্দার — *রেনেসাঁস ও সমাজমানস*, ১৯৮৩

শ্রীঅরবিন্দ — *ভারতের নবজন্ম*, ২য় সং, ১৩৩৯

অরুণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) — *রবীন্দ্র-সংগীতের নানাদিক*, ১৯৬৮

অরুণ নাগ (সম্পাদিত) — *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, ১৩৯৮

অলোক রায় (সম্পাদিত) — *সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়* (১ম খণ্ড,১৮৭৫; ২য় খণ্ড, ১৮৭৭), গ্রন্থন সং, ১৯৭৬

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — *উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় সং, ১৯৬৫

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — *বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা*, ১৯৮৩

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, একাদশ সং, ১৯৯১

অসিতকুমার ভট্টাচার্য — *বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা,* ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

অমলেশ ত্রিপাঠী — *ইতালীয় ব্যনেসাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি,* জানুয়ারি ১৯৯৪

আবদুর রউফ — *স্বাধীনতা উত্তরপর্বে পশ্চিমবাংলার মুসলমান,* কলিকাতা, ১৯৯২

আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) — *ইতিহাস অনুসন্ধান* ৬ষ্ঠ-১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯১-'৯৭

আজাহারউদ্দীন খান — *বাংলা সাহিত্যে নজরুল,* ৪র্থ সং, ১৯৬২

আনন্দ ঘোষহাজরা — *কবির দায় ঃ কবিতার বিষয়,* জুন ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান — *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৭৫৭-১৯১৮) কলিকাতা, ১৯৭১

আহমদ ছফা — *বাঙালী মুসলমানের মন,* ঢাকা, ১৯৮১

আহমদ শরীফ — *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য,* ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

ইন্দ্র মিত্র — *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* ১৯৬৯

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত) — *রাতের তারা দিনের রবি,* ১৯৮৭

উৎপল দত্ত — *আশার ছলনে ভুলি,* পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ৩১ আগস্ট, ১৯৯৩

উত্তম দাশ — *বাংলা সাহিত্যে সনেট,* সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

ওয়াকিল আহমদ — *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* (২ খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

কাজী নজরুল ইসলাম — *সঞ্চিতা* (১৯২৮), ত্রয়োত্রিংশ সং, ১৩৯১

কাজী আবদুল মান্নান — *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* ঢাকা, ১৯৬৯

কাজী আবদুল ওদুদ — *বাংলার জাগরণ,* ১৩৬৩ পৌষ

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় — *আত্মজীবনচরিত,* প্রজ্ঞা প্রকাশন সং, মোহিত রায় সম্পাদিত, ১৯৯০

কিশোরীচাঁদ মিত্র — *দ্বারকানাথ ঠাকুর* (১৮৭০), অনুবাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সম্পাদক ঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, জুন ১৯৬২

কিরণশশী দে — *রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা,* ২য় সং, ১৯৭৫

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য — *রামমোহন-ডিরোজিও মূল্যায়ন,* ২য় সং, ১৯৮৫

কে. এল আশরাফ — *হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবন-চর্যা* (লাইফ অ্যান্ড কন্ডিশনস্ অব দ্য পিপল অব হিন্দুস্তান), অনুবাদঃ তপতী সেনগুপ্ত, মার্চ ১৯২০

কৃষ্ণকলি বিশ্বাস — *ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোকে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,* ১৯৮৬

কৃষ্ণ কৃপালনী — *দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃৎ*, এন. বি. টি., নয়াদিল্লী, ১৯৮৪

কৃষ্ণ ধর, মিহির ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) — *বাংলার ক'জন সেরা সাংবাদিক,* গণমাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, মার্চ ১৯৯৩

ক্ষুদিরাম দাস — *রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়*, ২য় প্রকাশ, ১৩৬০

ক্ষুদিরাম দাস — *রবীন্দ্রকল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার*, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক — *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য*, ১৯৮০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র — *শতাব্দীর শিশু সাহিত্য* (১৮১৮-১৯১৮), ১ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

খোন্দকার সিরাজুল হক — *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা, ১৯৭৪

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী — *স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯

গীতা চট্টোপাধ্যায় — *বাংলা স্বদেশী গান*, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩

গোপাল হালদার — *বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি*, ১ম সং, ১৩৬৩

গোপাল হালদার — *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা* (২খণ্ড), ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৪

গোপাল হালদার — *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, ১৯৮৫

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য — *সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস* ২য় খণ্ড, ১৯৬১

গোলাম মুরশিদ — *আশার ছলনে ভুলি*, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫

গৌরচন্দ্র সাহা — *রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী*, জুন ১৯৮৪

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত — *বিদেশীয় ভারত-বিদ্যাপথিক*, ২য় সং, ১৯৭৭

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — *বিদ্যাসাগর*, আনন্দধারা সংস্করণ, ১৩৭৬

চিত্ত সিংহ — *বাঙালী অবক্ষয়ের উৎস সন্ধানে*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮১, শিকড়ের খোঁজে গ্রন্থমালা-১

জয়ন্তী ঘোষ — *বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৮৬

জওহরলাল নেহরু — *ভারত সন্ধানে* (ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া), অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়, ১ম সং, ১৩৫৩

জ্যোতির্ময় ঘোষ — *রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়*, ১৯৬৯

জ্যোতির্ময় ঘোষ — *নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ*, আগষ্ট ১৯৯৫

তপোবিজয় ঘোষ — *নীল আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র*, ১৯৮৩

তাহমিনা খাতুন — *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯২

দিলীপকুমাব বিশ্বাস — *রামমোহন সমীক্ষা*, মার্চ ১৯৮৩
দীপঙ্কর চক্রবর্তী — *বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন*, জুন ১৯৯০
দুলাল চৌধুরী — *আমি তোমাদেরই লোক*, ১৯৮১
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — *আত্মজীবনী* (১৮৯৮), সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, ৪র্থ সং, ১৯৬২
দেবীপদ ভট্টাচার্য — *বাংলা চরিত সাহিত্য*, জুন ১৯৮২
ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) — *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক* (৩ খণ্ড)
ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) — *বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা*, জানুয়ারি ১৯৯২
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে — *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, ১৯৭৬
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত* (১ম প্রকাশ, ১১ মাঘ ১২৮৮), ২য় সং, ১৩৮১
নগেন্দ্রনাথ সোম — *মধুস্মৃতি* (প্রথম প্রকাশ—"*ভারতবর্ষ*"১৩২১-১৩২৪), ২য় সং, ১৩৬১
নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত) — *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক*, ১৯৮৪
নমিতা চক্রবর্তী — *বঙ্গদেশে শিক্ষা-প্রসার*, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *সাহিত্যে ছোটগল্প*, ৫ম সং, ১৩৮৪
নেপাল মজুমদার — *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ* (১ম-ষষ্ঠ খণ্ড)
নীরেন্দ্রনাথ রায় — *সাহিত্য-বীক্ষা* (১ম প্রকাশ ১৯৫৫), প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ সং, ১৯৮৩
পবিত্রকুমার ঘোষ — *বাংলার রেনেসাঁস : স্বপ্ন মায়া না মতিভ্রম*, শিকড়ের খোঁজে গ্রন্থমালা-২, ১ম প্রকাশ, ৩০ জানুয়ারি ১৯৮১
পবিত্রকুমার ঘোষ — *মধুসূদন : ভ্রান্ত যাত্রা*, শিকড়ের খোঁজে গ্রন্থমালা-৪
পরেশচন্দ্র দাস — *বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
পল্লব সেনগুপ্ত — *ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও*, ১৯৭৯
পূর্ণেন্দু পত্রী — *বঙ্কিমযুগ*, ১ম খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৯৬
প্যারীচাঁদ মিত্র — *ডেভিড হেয়ার* (এ বায়োগ্রাফিকাল স্কেচ অব ডেভিড হেয়ার, ১৮৭৭), অনুবাদ : ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা : সুশীলকুমার গুপ্ত, ১৯৬৪
প্যারীচাঁদ মিত্র — *রামকমল সেন* (১৮৮০), মার্চ ১৯৬৪
প্রণবরঞ্জন ঘোষ — *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য*, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৫

প্রণব বসাক	*ভারতপথ ও দুই পথিকৃৎ*, ১৯৯১
প্রদীপ রায়	*উনিশ শতক : প্রথমার্ধ কলকাতা সমাজ—দ্বন্দ্ব ও মিলন*, ১৯৮২
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক* (৪খণ্ড), **বিশ্বভারতী**, ১৩৪০—
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র জীবনকথা*, আনন্দ সং, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	*রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*, ১৯৭২
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ*, মার্চ ১৯৬৩
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী*, ১৯৬২
প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	*আত্মীয়-সভার কথা*, ১ম সং, ১১ মাঘ ১৩৮১
প্রমথনাথ বিশী	*রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ* (অখণ্ড), ১৯৬৩
প্রমথনাথ বিশী	*রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ* (অখণ্ড), ১৩৭৩
প্রমথনাথ বিশী	*বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, জিজ্ঞাসা সং, ১৯৮৪
প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত (সম্পাদিত)	*বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক*, ফাল্গুন ১৩৬৭
প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত	*কালান্তরের পথিক : রম্যাঁ রলাঁ*, নভেম্বর ১৯৬৬
বদরুদ্দীন উমর	*ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, প্রথম ভারতীয় সং, মার্চ ১৯৮০
বদরুদ্দীন উমর	*চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, ১৯৭৩ সং
বদরুল হাসান	*উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস*, অক্টোবর ১৯৯০
বারিদবরণ ঘোষ	*রামগোপাল ঘোষ : জীবন ও সাধনা*, ১৯৮৫
বিনয় ঘোষ	*বাংলার নবজাগৃতি* (১৩৫৫), ওরিয়েন্ট লঙম্যান সংস্করণ, ১৯৭৯
বিনয় ঘোষ	*বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (৩ খণ্ড): ১ম খণ্ড-১৯৫৭ সেপ্টেম্বর ; ২য় খণ্ড-১৯৫৮ জানুয়ারি ; ৩য় খণ্ড-১৯৫৯ আগষ্ট
বিনয় ঘোষ	*বিদ্রোহী ডিরোজিও*, ১ম সং, মার্চ ১৯৬১
বিনয় ঘোষ	*সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (৪খণ্ড): ১ম খণ্ড-১৯৬২ ; ২য় খণ্ড-১৯৬৩ ; ৩য় খণ্ড-১৯৬৪ ; ৪র্থ খণ্ড-১৯৬৬

বিনয় ঘোষ — *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (১৮০০-১৯০০), নভেম্বর ১৯৬৮

বিনয় ঘোষ — *বাংলার বিদ্বৎসমাজ,* ১৯৭৩

বিনয় ঘোষ — *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব* , আশ্বিন ১৩৮৬

বিনয়কৃষ্ণ দত্ত — *'উনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ',* শিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত, *"গাঙ্গেয়পত্র সংকলন",* ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ পুনর্মুদ্রিত

বিনয়ভূষণ রায় — *উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা,* ১লা বৈশাখ ১৩৯৪

বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে — *স্বাধীনতা সংগ্রাম* (অনুবাদ), এন. বি. টি., নয়াদিল্লী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯১

বিপিনচন্দ্র পাল — *নবযুগের বাংলা,* ১৩৬২

বিপিনবিহারী গুপ্ত — *পুরাতন প্রসঙ্গ* (১ম পর্যায়), ১৩২০

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় — *রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব,* ১৯৮৫

বিমান বসু (সম্পাদিত) — *প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর,* বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, ১৯৯১

বিহারীলাল সরকার — *বিদ্যাসাগর,* ১৮৯৫

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য — *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ,* ২য় সং, নভেম্বর ১৯৭৮

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (২খণ্ড), ১৯৪৯

মনোরঞ্জন গুপ্ত — *রবীন্দ্র চিত্রকলা,* ২য় সং, ১৯৪৯

মন্মথনাথ ঘোষ — *রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়* (১৯১৭), ২য় সং, জুন ১৯৮২

মহম্মদ হাবিবুর রহমান — *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মহেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত (শ্রীম) — *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* রিফ্লেক্ট সং, ১৯৮৩

মীর মোশাররফ হোসেন — *বিষাদ সিন্ধু,* হরফ সং

মুজফ্‌ফর আহমদ — *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা,* সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

মুনতাসীর মামুন — *উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

মুহম্মদ শামসুল আলম — *রোখেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া — *রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ,* ১৯৯০

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) — *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) — *বাংলাদেশ বাঙালী : আত্মপরিচয়ের সন্ধানে,* ঢাকা ১৯৯০

মোতাহার হোসেন সুফী	*বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৬
মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল	*মীর মোশাররফের গদ্য রচনা*, **বাংলা একাডেমী**, ঢাকা, ১৯৭৫
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	*আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, **বাংলা একাডেমী**, ঢাকা, ২য় সং, ১৯৮৪
মোহিতলাল মজুমদার	*বাংলার নবযুগ*, ১৯৬৫
যোগীন্দ্রনাথ বসু	*মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, নতুন সংস্করণ, ১৯৭৮
যোগেশচন্দ্র বাগল	*ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা*, ১৯৪১
যোগেশচন্দ্র বাগল	*বঙ্গসংস্কৃতির কথা*, ১৯৭১
যোগেশচন্দ্র বাগল	*ডিরোজিও*, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৭৩
যোগেশচন্দ্র বাগল	*মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত*, ১৩৭৯
যোগেশচন্দ্র বাগল	*বেথুন সোসাইটি*, ৫ মাঘ ১৩৬৭
রণজিৎকুমার সমাদ্দার	*বাংলার গণসংগ্রামের পটভূমিকা*, এপ্রিল ১৯৯১
রঞ্জিৎ চক্রবর্তী	*দ্বারকানাথ ঠাকুর : ঐতিহাসিক সমীক্ষা*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
রফিকুল ইসলাম	*কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য*, ১ম ভারতীয় সং, ১৯৯১
রমেশচন্দ্র মজুমদার	*বাংলাদেশের ইতিহাস* (আধুনিক যুগ), ৩য় খণ্ড, ২য় সং, মাঘ ১৩৮১
রমেশচন্দ্র মজুমদার	*রাজা রামমোহন* (অনুবাদ : ছায়া বিশ্বাস), ১৯৭২
রশীদ আল ফারুকী	*মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া*, কলকাতা, ১৯৮১
রশীদ আল ফারুকী	*বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান*, কলকাতা, ১লা জানুয়ারি ১৯৮৪
রাখালচন্দ্র নাথ	*উনিশ শতক : ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়*, ১৯৮৮
রাজনারায়ণ বসু	*সেকাল ও একাল*, কলিকাতা, ১৩৫৮
রাজনারায়ণ বসু	*আত্মচরিত* (১৯০৯), ৪র্থ সং, ১৯৬১
রাধারমণ মিত্র	*কলিকাতা-দর্পণ*, ১ম পর্ব, ৩য় সং, জুন ১৯৮৮
রাধারমণ মিত্র	*কলিকাতায় বিদ্যাসাগর*, ১৯৭৭
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	*চরিতকথা*, ১৩২০
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও দিলীপকুমার বিশ্বাস (সম্পাদিত)	*রামমোহন স্মরণ*, **রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা সমিতি**, মার্চ ১৯৮৯

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	*বঙ্কিম জীবনী,* অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, ৪র্থ সং, ১৩৯৫
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	*বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ* (৭ খণ্ড) ঃ ১ম খণ্ড-১৩৮২ ; ২য় খণ্ড-১৩৮৩ ; ৩য় খণ্ড-১৩৮৫ ; ৪র্থ খণ্ড-১৩৮৭ ; ৫ম খণ্ড-১৯৮১ ; ৬ষ্ঠ খণ্ড-১৯৮৫ ; ৭ম খণ্ড-১৯৮৮
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন	*বিদ্যাসাগর জীবনচরিত,* ১৮৯১
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন	*বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ,* সনৎকুমার গুপ্ত সম্পাদিত, ১৯৬২
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	*উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস,* ২য় সং, ১৩৮১
শান্তিদেব ঘোষ	রবীন্দ্র সংগীত, ১৩৬৫ সং
শান্তিদেব ঘোষ	*গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য,* ১৩৯০
শিবনাথ শাস্ত্রী	*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৩), বিশ্ববাণী সং, ১৯৮৩
শিবনাথ শাস্ত্রী	*আত্মচরিত* (১৯১৮), মার্চ ১৯৮৩ সং
শিবনাথ শাস্ত্রী	*মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে* (*'মেন আই হ্যাভ সিন'*, ১৯০৯, মায়া রায় কৃত অনুবাদ), ২য় প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৩
শিবনারায়ণ রায়	*গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়,* এপ্রিল ১৯৮২
শিবনারায়ণ রায়	*কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা,* ১৯৭৩
শিবনারায়ণ রায়	*রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র ও নক্ষত্র সংকেত,* ১৯৮৩
শিবনারায়ণ রায়	*স্রোতের বিরুদ্ধে.* ১৯৮৪
শিবনারায়ণ রায়	*রেনেসাঁস,* ঢাকা, শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯৩
শিশিরকুমার দাশ	*বাংলা গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব,* কলিকাতা, ১৩৯২
শিশিরকুমার সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	*বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ,* ১৩৫২
শৈলেন চৌধুরী (সম্পাদিত)	*তীর্থদর্শন-এর পঞ্চাশ বছর,* ১৯৮০
শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়	*বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ,* ২য় সংস্করণ, ১৩৭১
শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ	*প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমকালীন বাংলা,* ১৩৯২
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	*বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* ৭ম মুদ্রণ, ১৯৮৫

সত্যনারায়ণ দাশ	*বঙ্গদর্শন ও বাঙ্গালীর মনন সাধনা*, ১৯৭৪
সন্তোষকুমার অধিকারী	*বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি*, ১৯৮৫
সফিউদ্দিন আহমদ	*ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫
সারোয়ার জাহান	*বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়নের পালাবদল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫
সুকুমার সেন	*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৪ খণ্ড
সুকুমার সেন	*পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ*, ১৯৬২
সুখময় ভট্টাচার্য	*সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৮৪
সুধাংশুবিমল বড়ুয়া	*রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*, ১ম প্রকাশ ১৩৭৪
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	*মনীষী-স্মরণে*, মার্চ ১৯৭২
সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী	*উনিশ শতকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক*, বৈশাখ ১৩৮৮
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	*বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজন*, ১৩৮১
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	*বঙ্গীয় রনেশাঁসে পাশ্চাত্যবিদ্যার ভূমিকা*, ১৩৮৬
সুপ্রকাশ রায়	*ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ১ম খণ্ড, জুলাই ১৯৬৬
সুবীর রায়চৌধুরী	*হেনরি ডিরোজিও : তাঁর জীবন ও সময়*, এন. বি. টি., নয়াদিল্লী, ১৯৯৩
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)	*বাংলার পত্র-সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬৩
সুরেশচন্দ্র মৈত্র	*অশান্ত কাল : জিজ্ঞাসু যুবক*, মার্চ ১৯৮৮
সুশীলকুমার গুপ্ত	*ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার জাগরণ*, ১৯৫৯
সুশীলকুমার গুপ্ত	*নজরুল চরিতমানস*, দে'জ সং, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪
সুশোভন সরকার	*প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ* (১৯৮২), ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৬
সুশোভন সরকার	*বাংলার রেনেসাঁস*, অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় অনূদিত, ১৯৯২
সুস্নাত দাশ	*ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা*, ১৯৮৯
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	*ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন*, ১৯৬৩
সোমেন্দ্রনাথ বসু	*রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৬
স্বপন বসু	*বাংলার নবচেতনার ইতিহাস*, ১৯৭৫
স্বপন বসু	*গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, মার্চ ১৯৮৪
স্বপন বসু	*সমকালে বিদ্যাসাগর*, ১৯৯০

রচনাবলী

রামমোহন গ্রন্থাবলী	**বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ** সংস্করণ, প্রথম-সপ্তম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৮০
রামমোহন রচনাবলী	হরফ সংস্করণ, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত (১৯৭৩), ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮
বিদ্যাসাগর রচনা-সংগ্রহ	**বিদ্যাসাগর জাতীয় স্মারক-সমিতি**, গোপাল হালদার সম্পাদিত, ৩ খণ্ড, ১৯৭২
বিদ্যাসাগর বচনাবলী	দেবকুমার বসু সম্পাদিত (৩ খণ্ড) ঃ ১ম খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৮১ ; ২য় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, ১৩৭৭ ; ৩য় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, ১৩৭৭
মধুসূদন রচনাবলী	সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭
মধুসূদন রচনাবলী	হরফ সংস্করণ, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৭৩
মধুসূদন গ্রন্থাবলী	**বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ** সংস্করণ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৬১
মাইকেল মধুসূদন-গ্রন্থাবলী	বসুমতী সংস্করণ (২ খণ্ড), একাদশ সংস্করণ ১৯৯৩, ১৯৯৫
বঙ্কিম রচনা-সংগ্রহ	**পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ-সমিতি**, গোপাল হালদার সম্পাদিত (৩ খণ্ড) ঃ সাহিত্য ও বিবিধ, ১৯৭২ ; প্রবন্ধ খণ্ড, ১৯৭৩ ; উপন্যাস খণ্ড, ১৯৭৪
বঙ্কিম রচনাবলী	সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, আশ্বিন ১৩৬০ ; দ্বিতীয় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২
কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী	**বাংলা একাডেমী**, ঢাকা, আবদুল হক সম্পাদিত (৩ খণ্ড), ১৯৯০
রচনা সংকলন ঃ রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন	**জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী**, ঢাকা, সম্পাদনা পরিষৎ ঃ নীলিমা ইব্রাহিম, রফিকুল ইসলাম, নূর-জাহান বেগম, আয়েশা খান, মফিদুল হক, জানুয়ারি ১৯৯৩

বিবেকানন্দ রচনা-সংগ্রহ (৮ খণ্ড)	বইপত্র সংস্করণ, গোপাল হালদার সম্পাদিত, ১৯৭৭—
রবীন্দ্র রচনাবলী (১৫ খণ্ড)	জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, **প. ব. সরকার**, ১৯৬১—
রবীন্দ্র রচনাবলী	**বিশ্বভারতী** সংস্করণ, ১৩৪৬
রবীন্দ্র রচনাবলী	**পশ্চিমবঙ্গ সরকার** প্রকাশিত, (১ম-১৫শ খণ্ড), ১৯৮০—
নজরুল রচনা-সম্ভার	হরফ সংস্করণ, আবদুল আজীজ আল্-আমান সম্পাদিত, ১৯৭৭
নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড)	আবদুল কাদির সম্পাদিত, **বাংলা একাডেমী**, ঢাকা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫
সাহিত্য সাধক চরিতমালা	**বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ** প্রকাশিত, (১ম-৯ম খণ্ড), ১৩৫৩

অন্যান্য রচনা

গোলাম মুরশিদ	'আশার ছলনে ভুলি', *"দেশ"*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯১, ৫৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা
জ্যোতির্ময় ঘোষ	'বাংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার', *"পরিচয়"*, গোপাল হালদার সংখ্যা, ১৯৯৪
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	'স্মৃতিকথা', *"এক্ষণ"*, শারদীয় ১৩৯৭
দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পাদিত)	*"অনীক"*, বাংলার রেনেসাঁস সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৮৩
নীহাররঞ্জন রায়	'উনিশ শতকীয় বাঙালীর পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পুনর্বিবেচনা', *"জিজ্ঞাসা"*, বৈশাখ ১৩৮৭
পরমেশ আচার্য	'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর', *"অনুষ্টুপ"*, একবিংশতি বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৬
বরুণ দে	'বাংলার পুনর্জন্ম', *"অনীক"*, এপ্রিল-মে ১৯৮৩
বিনয়ভূষণ রায়	'সমাজ বিজ্ঞানী জেমস লঙ্', *"এক্ষণ"*, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭
মানিক মুখোপাধ্যায়	'ভারতীয় রেনেসাঁ ও রামমোহন', *"পথিকৃৎ"*, এপ্রিল ১৯৮৪
মৃদুলকান্তি বসু	'বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র', *"আকাদেমি পত্রিকা"*, ৭ম সংখ্যা, **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি**, মার্চ ১৯৯৫
সুকান্ত চৌধুরী	'ইংরেজি সাহিত্য-সমালোচনা : পথের শেষ কোথায়', *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১, মে ১৯৯২
সৌমেন্দ্রনাথ গুপ্ত	'বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক : উৎসের সন্ধানে', *"অনীক"*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯০

শোভন সোম — 'বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র', *"দেশ"*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮

আনুষঙ্গিক রচনা

[বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত, গ্রন্থে সংকলিত, পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থকারের রেনেসাঁস বিষয়ক প্রবন্ধ, সমালোচনা-নিবন্ধ ও গবেষণামূলক আনুষঙ্গিক রচনা]

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'মার্কসবাদী মূল্যায়নের নামে রামমোহনের চরিত্র-হননই কি লেখকের উদ্দেশ্য ?' (সমালোচনা-নিবন্ধ), *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫১, সংখ্যা ১০, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'রেনেসাঁস ও বাংলার মুসলমান-সমাজ', **পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ**-এর ৭ম বার্ষিক অধিবেশনে আধুনিক ভারত বিভাগে (**বি. কে. সি. কলেজ**, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০) নিবন্ধটি পঠিত। প. ব. ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *"ইতিহাস অনুসন্ধান ৬"* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। *"সুন্দরম"* পত্রিকা, শরৎ-সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ভাদ্র-কার্তিক '৯৮, আগষ্ট-অক্টো '৯১, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'ইতালীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি মিথ', **প. ব. ইতিহাস সংসদ**-এর অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে বহির্ভারত-বিভাগে পঠিত গবেষণা-নিবন্ধ, **বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়**, ইতিহাস বিভাগ, ৭-৯ নভেম্বর ১৯৯১। প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *"ইতিহাস অনুসন্ধান ৭"* খণ্ডে সংকলিত।

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'চল্লিশের দশক : অন্য এক রেনেসাঁস', *"অনুষ্টুপ"*, রজত জয়ন্তী বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯১, *"বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা"* গ্রন্থে সংকলিত, সম্পাদনা ধনঞ্জয় দাশ, জানুয়ারি ১৯৯২

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি', *"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"*, ১৩৯৫, ৯৫ বর্ষ।। প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা ; বিমান বসু সম্পাদিত *"প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর"* গ্রন্থে সংকলিত, ১৯৯১

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'রামমোহন মিলনধর্মী মানব-সংস্কৃতির উদগাতা', *"গণশক্তি"*, ২ জুন ১৯৯১

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি', '**ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস**'-এর সেমিনারে পঠিত গবেষণা-নিবন্ধ, ৯ মার্চ ১৯৯১; *"সমাজ সমীক্ষা"* ২৯-৩০ পঞ্চম বর্ষ।। পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯২

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'বাংলার রেনেসাঁস বিচারের দুই মেরু', প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর ৯ম বার্ষিক অধিবেশন, উলুবেড়িয়া কলেজ, ৯ নভেম্বর ১৯৯২, আধুনিক ভারত বিভাগে পঠিত নিবন্ধ। প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *"ইতিহাস অনুসন্ধান ৮"* খণ্ডে সংকলিত, ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ভাবনায় চিত্রকলা'—একটি তৌলন আলোচনা : চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্য ও ভাস্কর্য, *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৮, ডিসেম্বর ১৯৯২

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের আলোকে বিদ্যাসাগর', *"গণশক্তি"*, ১৯ এপ্রিল ১৯৯২

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'রেনেসাঁসের আলোকে জীবনরস রসিক বিদ্যাসাগর', *"গণশক্তি"*, ২৭ জুলাই ১৯৯২

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'রেনেসাঁসের স্কুল ও হিন্দু কলেজ', *"গণশক্তি"*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯২

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'দুই রেনেসাঁসের দুই শিক্ষক : পিটার অ্যাবেলার ও ডিরোজিও', *"যুবমানস"*, ডিসেম্বর ১৯৯২

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'প্রবেশ ও প্রস্থান : দুই রেনেসাঁসের দুই শিক্ষক—ইগনাজিও ও ডিরোজিও', *"যুবমানস"*, মার্চ ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'কবি ডিরোজিও বাংলা সাহিত্যে তার উত্তরাধিকার', 'ডিরোজিও স্মরণ সমিতি' আয়োজিত সেমিনারে (মৌলালি যুবকেন্দ্র, ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৩) পঠিত নিবন্ধ ; *"গণশক্তি"*, ১৮ এপ্রিল ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'নারী : রেনেসাঁসের তুলি থেকে বঙ্কিমের লেখনীতে', *"গণশক্তি"*, ২৭ জুন ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'ইতালীয় রেনেসাঁসে সমাজচিত্র : সাধারণ মানুষ', ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস, কলিকাতা'র উদ্যোগে সংগঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত নিবন্ধ , ৭ আগষ্ট ১৯৯৩, *"সমাজ-সমীক্ষা"*, সপ্তম বর্ষ, ৪র্থ-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯৪

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'প্রবল ঝড়ের মুখেও দিশা হারাননি তিনি' (কাজী আবদুল ওদুদ), *"আনন্দবাজার"*, ৮ আগষ্ট ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি চরিত্র', *"ঐকতান"*, বঙ্গ-শতাব্দ স্বাগত সংখ্যা, ১৪০০

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'একুশে ফেব্রুয়ারি ঃ শিকড় থেকে কুসুমে', *"গণশক্তি"*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'হিন্দু কলেজ ঃ রক্ষণশীলদের দুর্গ দখলের লড়াই', *"গণশক্তি"*, ১৪ মার্চ ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'রাহুল সাংকৃত্যায়ন ঃ এক হিউম্যানিস্ট দুই রেনেসাঁস', অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত *"প্রগতিপথিক ঃ রাহুল সাংকৃত্যায়ন"*, ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম', *"সংস্কৃতি"*, গবেষণামূলক দ্বিভাষিক ষান্মাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৪

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'ইতালীয় রেনেসাঁসের শিল্পভুবন পরিক্রমা ঃ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা', *"যুবমানস"*, শারদ সংখ্যা ১৯৯৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'ডিরোজিও চর্চার অখণ্ড প্রবাহ'(সমালোচনা-নিবন্ধ), *"গণশক্তি"*, ১৯৮৯

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'বাংলা পাঠে সুশোভন সরকারের রেনেসাঁস-ভাবনা' (সমালোচনা নিবন্ধ), *"গণশক্তি"*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'শিবনারায়ণ রায়ের রেনেসাঁস-ভাবনা' (সমালোচনা নিবন্ধ), *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ১, বর্ষা ১৪০০

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'সমকালের নামে একালের বিদ্যাসাগর-বিচার', *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৪, চৈত্র ১৪০০

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'কী ধরনের কসমোপলিটান সমাজ আমাদের কাম্য?' (মতামত), *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ২, শরৎ ১৪০০

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'কাজী আবদুল ওদুদ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. বঙ্গ সরকার প্রকাশিত *"বাংলা আকাদেমি ৭"*, মার্চ ১৯৯৫, পৃ. ১৫২-১৬৯

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'হীরেন মুখার্জীর চোখে বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন', *"কোরক"*, হীরেন মুখার্জী সংখ্যা, ১৯৯৫

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'ইতালীয় রেনেসাঁসের পোপ', পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর দশম বার্ষিক অধিবেশন, বহির্ভারত বিভাগে পঠিত নিবন্ধ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ; প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *"ইতিহাস অনুসন্ধান ৯"* খণ্ডে সংকলিত, ১৯৯৪, পৃ. ৬৭১-৬৭৫

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — 'ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রিন্স (রাজন্যক)', পশ্চিমবঙ্গ

	ইতিহাস সংসদ-এর একাদশ বার্ষিক অধিবেশন, বহির্ভারত বিভাগে পঠিত গবেষণা-নিবন্ধ, **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,** ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯ নভেম্বর ১৯৯৪, প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *"ইতিহাস অনুসন্ধান ১০"* খণ্ডে সংকলিত, ১৯৯৫, পৃ ৭২১-৭২৪
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'মাতৃভাষার নবায়নে ইয়ংবেঙ্গলদের ভূমিকা', **পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর** দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন, আধুনিক ভারত বিভাগে পঠিত গবেষণা-নিবন্ধ, **প্রেসিডেন্সি কলেজ,** ৬ নভেম্বর ১৯৯৫ ; প বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *"ইতিহাস অনুসন্ধান ১১"* খণ্ডে সংকলিত, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩৭-৪৫৪
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও বাংলার নবজাগরণ', **বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি** আয়োজিত **বিদ্যাসাগর মেলায়** আলোচনাচক্রে পঠিত (কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৫)
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'অমলেশ ত্রিপাঠীর রেনেসাঁস-ভাবনা' (সমালোচনা-নিবন্ধ), *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৫, সংখ্যা ৩, মাঘ ১৪০১
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার নবজাগরণ', **বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ** আয়োজিত সেমিনারে পঠিত, **যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,** ইন্দুমতী সভাগৃহ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'রিফর্মেশনের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র', **পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর** ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন, বহির্ভারত বিভাগে পঠিত গবেষণা-নিবন্ধ, **বারাকপুর মন্মথনাথ নোনাচন্দনপুর বিদ্যালয়,** ১৯৯৬ ; প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত *"ইতিহাস অনুসন্ধান ১২"* খণ্ডে সংকলিত, ১৯৯৭
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'ভারতীয় নবজাগরণে ডিরোজিওর স্থান ও তাঁর উত্তরাধিকার', **বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি** আয়োজিত **বিদ্যাসাগর মেলা,** কলকাতার আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'নায়কের সন্ধান—ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' (সমালোচনা-নিবন্ধ), *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ২, ভাদ্র ১৪০৩

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'জাতীয় জাগরণে উনিশ শতকের বাংলা', স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে **তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার** আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত, ***পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,*** ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'ডিরোজিওর স্বদেশচিন্তার উৎস সন্ধানে', *"গণশক্তি"*, ২০ এপ্রিল ১৯৯৭
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'মৃত্যুর মিছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী ডিরোজিও', *"যুবমানস"*, এপ্রিল ১৯৯৭
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'নবজাগরণের প্রথম উপহার', *"গণশক্তি"*, ২৪ আগস্ট ১৯৯৭
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'রামমোহন মূল্যায়ন ঃ তৃতীয় পর্যায় ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে', *"চতুরঙ্গ"*, বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪, পৃ. ১১৪-১২৯
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা-বিন্দু', **পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ**-এর চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন, আধুনিক ভারত বিভাগে পঠিত গবেষণা-নিবন্ধ, **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,** ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

রেনেসাঁস-বিতর্ক

১. (ক) *"চতুরঙ্গ"* পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৮২১-৮৩৪, গ্রন্থ-সমালোচনা —শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

(খ) *"চতুরঙ্গ"* পত্রিকা, জুন ১৯৯১, পৃ. ১৭৬-১৮০, মতামত —নরেন সরকার

(গ) *"চতুরঙ্গ"* পত্রিকা, জুলাই ১৯৯১, পৃ. ২৫৭-২৬১, মতামত (জবাব) —শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

(ঘ) *"চতুরঙ্গ"* পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৯১, পৃ. ৫১৪-৫১৭, মতামত —সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

(ঙ) *"চতুরঙ্গ"* পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৭৬০-৭৬৫, মতামত (জবাব) —শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

২. (ক) *"গণশক্তি"*, ২৮ মে ১৯৯২ ঃ 'সত্যজিৎ রায় কি ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল?' —উৎপল দত্ত

(খ) *"গণশক্তি"*, ৯ জুন ১৯৯২ ঃ 'সত্যজিৎ রায় এবং রেনেসাঁ' (চিঠিপত্র) —শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

(গ) *"গণশক্তি"*, ২৭ জুন ১৯৯২ ঃ 'প্রসঙ্গ ঃ ভারতীয় রেনেসাঁর ফসল' (চিঠিপত্র) —সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ

(ঘ) *"গণশক্তি"*, ১০ জুলাই ১৯৯২ : 'প্রসঙ্গ : রেনেসাঁ বিতর্ক' (চিঠিপত্র)

—শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

English Books on Bengal Renaissance

A. C. Gupta (ed.)	*Studies in the Bengal Renaissance*, **Jadavpur University** (1958), 2nd edition, Revised by J. Chakraborty.
A. F. Salahuddin Ahmed	*Social Ideas and Social Changes in Bengal 1818-1835*, Calcutta, 1976.
A. F. Salahuddin Ahmed	*Bangladesh Tradition and Transformation*, Dacca University Press, 1987.
A. Roy (ed.)	*Nineteenth Century Studies*, 1973.
A. Roy (ed.)	*Society in Dilemma Nineteenth Century India*, 1979.
A. Ghosh	*The Renaissance in India*, 1927.
A. Guha	*Unpublished Letters of Vidyasagar*, 1977.
A. Mukherjee	*Reform and Regeneration in Bengal (1774-1823)* 1968.
A. Poddar	*Renaissance in Bengal : Quests and Confrontation (1800-1860)*, 1970.
A Poddar	*Renaissance in Bengal : Search for Identity*, 1977.
A. K. Dasgupta	*The Fakir & Sannyasi Uprisings*, Calcutta, 1992.
Amit Sen	*Notes on the Bengal Renaissance*, Calcutta, 1946.
A. K. Sen	*Tattwabodhini Sabha and the Bengal Renaissance*, **Sadharan Brahmo Samaj**, 1979.
A. Seal	*The Emergence of Indian Nationalism, Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century*, Cambridge, 1971.

A. Sen — *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestone*, 1977.

A. Tripathi — *Vidyasagar : The Traditional Moderniser*, 1974.

B. Bhattacharyya — *Socio-Political Currents in Bengal : A Nineteenth Century Perspective*, Delhi, 1980.

B. N. Dasgupta — *Raja Rammohan Roy : The Last Phase*, 1980.

Blair B. Kling — *Partner in Empire : Dwarakanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*, **University of California Press**, 1976.

B. N. Seal — *Rammohan : The Universal Man* (১৯২৪, ২৭ সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোরে রামমোহন জন্মবার্ষিকীতে প্রদত্ত বক্তৃতা)

B. P. Barua (ed.) — *Raja Rammohun Roy and the New Learning* (**Raja Rammohan Roy Memorial Lectures**), 1988.

B. S. Kesavan — *History of Printing and Publishing in India*, vol. I, *N. B. T.*, New Delhi, 1985.

C. E. Buckland — *Bengal Under Lieutenant Governors*, 2 vol., 1901.

C. Palit — *New Viewpoints on Nineteenth Century Bengal*, Sept. 1980.

D. Kopf — *Nineteenth Century Bengal and Fifteenth Century Europe*, Calcutta, 1963.

D. Kopf — *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Berkerley, 1969.

D. Kopf — *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, New Delhi, 1988.

D. K. Biswas (ed.) — *The Correspondence of Raja Rammohan Roy*, vol-1, 1992 ; vol-II, 1997.

D. K. Chattopadhyay	*Dynamics of Social Change in Bengal (1817-1851)*, 1990.
E. W. Madge	*Henry Derozio : The Poet and Reformer,* 1905.
F. B. Bradley-Birt	*Poems of Henry Louis Vivian Derozio : A Forgotten Anglo-Indian Poet (1923)*, R. K. Dasgupta Forworded edition, Calcutta, 1980.
G. Chattopadhyay (ed.)	*Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century*, Selected Documents, vol. I, 1965.
H. Mukherjee	*Indian Renaissance and Raja Rammohun Roy*, **Poona University**, 1973.
H. E. A. Cotton	*Calcutta : Old & New (1909)*, Edited by N. R. Roy, 1980.
H. C. E. Zacharias	*Renascent India from Rammohun Roy to Mohandas Gandhi*, London, 1933.
I. Singh	*Rammohun Roy*, 1958.
J. H. Broomfield	*Elite Conflict in Indian Plural Society*, California, 1968.
J. N. Sarkar	*History of Bengal,* vol. II, **Dacca University**, 1948.
J. K. Majumdar (ed.)	*Raja Rammohun Roy and Progressive Movement in India*, Rpt. 1988.
J. Maitra	*Muslim Politics in Bengal 1855-1905*, 1984.
K. K. Datta	*Dawn of Renascent India*, **Nagpur University**, 1950.
K. A. Panikkar	*Indian Renaissance*, 1983.
K. A. Wadud	*Creative Bengal*, 1950.
M. Carpenter	*The Last Days in England of Raja Rammohan Roy*, Calcutta (1915), S. Majumdar (ed.), 1976 edition.

M. C. Kotnala — *Raja Rammohan Roy and Indian Awakening*, Ist edition, New Delhi, July 1975.

M. N. Roy — *India in Transition*, Bombay edition, 1972.

M. N. Roy — *The Indian Renaissance Movement, Three Lectures*, Cal., 2nd edition, 1988.

N. S. Bose — *Indian Awakening and Bengal*, 1969.

N. C. Choudhury — *The Autobiography of an Unknown Indian*, N. Y., 1951.

N. Dhar — *Vedanta and the Bengal Renaissance*, 1977.

P. C. Joshi (ed.) — ·*Rammohun Roy and the Process of Modernisation in India*, **Nehru Memorial Museum and Library**, 1975.

P. C. Joshi (ed.) — *Rebellion 1857 : A Symposium* (*1957*) , Cal., Rpt. 1986.

P. K. Sen — *Biography of a New Faith*, vol. I, 1950.

P. R. Sen — *Western Influence in Bengali Literature*, 1932.

P. Sinha — *Nineteenth Century Bengal*, 1965.

R. C. Ghosha — *A Biographical Sketch of the (Rev.) K. M. Banerjea* (*1893*), Introduced with biographical notes by A. Dasgupta & P. Biswas, Rpt. Sept. 1980.

R. C. Majumdar — *Glimpses of Bengal in Nineteenth Century*, 1960.

R. C. Majumdar — *British Paramountcy and Indian Renaissance*, part-II, 1965.

R. C. Majumdar (Forworded) — *Renascent Bengal, 1817-1857*, **Asiatik Society**, 1972.

R. P. Dutta — *India Today* (*1940*), Rpt. Calcutta, 1979.

S. Chakraborty — *The Bengali Press 1818-1868, A Study in the Growth of Public Opinion*, 1976.

S. D. Collet — *The Life and Letters of Raja Rammohan Roy* (*1900*), D. K. Biswas & P. C. Ganguly edited, 1962.

S. K. De — *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, 1960.

S. Sinha — *The Quest for Modernity and the Bengali Muslims 1921-47*, 1995.

Sumit Sarkar — *A Critique of Colonial India*, 1985.

Susobhan Sarkar — *On the Bengal Renaissance*, Papyras edition, Cal., 1979.

T. S. Banerjee — *Various Bengal Aspects of Modern History*, 1985.

T. Edwards — *Henry Derozio : The Eurasian Poet, Teacher and Journalist* (*1884*), Cal., Riddhi edition 1980.

W. W. Hunter — *The Indian Musalmans*, 1876.

Works

The English Works of Raja Rammohan Roy (7 parts in one) — Edited by K. D. Nag and D. Burman, Calcutta, 1958.

The English Works of Raja Rammohan Roy — Introduction by R. Chatterjee, **Panini Office**, Allahabad, 1906.

English Books on Italian Renaissance

A. M. Von — *Soziologie der Renaissance (German), 1932. Sociology of the Renaissance* (Tran.), England, 1944.

A. Chastel — *Leonardo Da Vinci*, New York, 1961.

A. Malho (ed.) — *Social and Economic Foundation of the Italian Renaissance*, U. S. A., 1969.

A. Marlindale — *The Complete Paintings of Giotto*, Printed in Italy, 1966.

B. Castiglione — *The Book of Courtier* (Tran.), C. S. Singleton, Garden City, New York, 1959.

B. Weinberg — *A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance,* vol. I, Chicago Press, 1961.

B. Willey — *Tendencies in Renaissance Literary Theory* (*1921*), Norwood edition, 1977.

C. S. Singleton (ed.) — *Arts, Science and History in the Renaissance,* U. S. A., 1967.

D. Bush — *Renaissance and English Humanism,* Canada, 1939.

D. C. Allen — *The Star Crossed Renaissance,* 1941.

D. Coffin — *The Villa in the Life of Renaissance,* Rome, 1979.

D. Koenigsberger — *Renaissance Man and Creative Thinking : A History of Concepts of Harmony 1400-1700,* Sussex, 1979.

D. Rosand — *Titian,* New York, 1978.

D. Hay — *The Italian Renaissance in its Historical Background,* Cambridge, 1961.

E. Carli — *All the Paintings of Michelangelo,* Milan, 1963.

E. Cassirer — *The Philosophy of the Enlightenment* (Tran.), by Fritz. C. A. Koelln and James P. Pettegrove, **Princeton University Press,** 1951.

E. L. Eisentien — *The Printing Press as an Agent of Change,* vol. I, Cambridge, 1979.

E. Garin — *Science and Civic Life in the Italian Renaissance* (Tran.), by P. Munz, U. S. A., Anchor Books edition, 1969.

E. Garin — *Italian Humanism, Philosophy and Civic Life of the Renaissance* (Tran.), by P. Munz, Oxford, 1965.

E. Hutton — *Pietro Aretino, the Scourge of Prnces,* London, 1922.

E. R. Chamberlin — *Everyday Life in Renaissance Times,* G. B., 1965.

E. V. Beilin — *Redeeming Eve,* **Princeton University Press.**

F. Antal — *Florentine Paintings and its Social Background,* London, 1947.

F. Gilbert — *The Pope, his Bankar and Venice,* 1980.

F. Valconover — *All the Paintings of Titian,* London, 1965.

G. A. Brucker — *The Pattern of Social Change : The Florentine Politics and Society,* Princeton, 1962.

G. C. Sellery — *The Renaissance : Its Nature and Origin,* Wisconsin, 1950.

G. Ritter — *Luther, his Life and Work* (Tran.), by J. Riches, London (1959), 1963.

G. R. Pottor (ed.) — *The New Cambridge Modern History,* vol. I, The Renaissance, Cambridge, 1957.

G. Vasari — *Le Vite de' pia Eccellenti Architetti : Pittoriet Scultori Italiani da Cimabue in Sino a tempi nostri (1550), Artists of the Renaissance* (Tran.), 1965.

H. Baron — *The Crisis of the Early Italian Renaissance ; Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny,* Princeton, 1966.

H. Baron — *From Petrarch to Leonardo Bruni,* Chicago, 1968.

H. A. Oberman (ed.) — *Luther and the Dawn of the Modern Era,* Netherland, 1947.

H. H. Haydan — *The Counter Renaissance (1950),* Gloucester, 1960.

H. Levin — *The Myth of the Golden Age in the Renaissance*, N. Y., 1969.

H. O. Taylor — *Thought and Expression in the Sixteenth Century*, vol. I, N. Y., 1926.

I. A. Richter (ed.) — *Selection from the Note Books of Leonardo Da Vinci*, The World Classics, Oxford, 1953.

I. Galante — *Causes & Features of European Renaissance*, Delhi, 1956.

I. Origio — *The Marchent of Prats : The Life and Papers of Francesco De Marco Datini*, London, 1957.

J. A. Mazzeo — *Renaissance & Revolution*, London, 1967.

J. A. Symonds — *Renaissance in Italy*, vol. I, The Age of Despots, Gloucester, Mass, 1965.

J. A. Symonds — *Renaissance in Italy*, vol. 2, Revival of Learning, 1967.

J. A. Symonds — *Renaissance in Italy*, vol. 3, Fine Arts.

J. Atkinson (ed.) — *Luther's Works*, vol. 44, Philadelphia, 1969.

J. A. Molinaro (ed.) — *Petrarch to Pirandello*, **University of Toronto Press**, 1973.

J. Blum — *The European Peasantry from the Thirteenth to the Nineteenth Century*, Publication No. 33, Service Centre for Teachers of History, **The American Historical Association**, Washington, D. C. 1960.

J. Burckhardt — *Die Cultur der Renaissance in Italian* (Swiss), 1860, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (Tran.), London Edition, 1945.

J. E. Sandys — *History of Classical Scholarship*, vol. 2, Cambridge, 1908.

J. H. Beck — *Raphael*, New York, 1976.

J. H. Hexter — *More's Utopia : The Biography of an Idea*, Princeton, 1952.

J. Huizinga — *Erasmus*, New York, 1924.

J. Huizinga — *Men and Ideas, History, the Middle Ages, the Renaissance Essays* (Tran.), by J. S. Holmes & H. V. Marle, London, 1960.

J. Macy — *The Story of the World Literature*, London.

J. Michelet — *Histoire de France, VII, La Renaissance* (French), 1855.

J. Musgrove (ed.) — *A History of Architecture*, G. B., **The Royal Institute of British Architects and University of London**, 19th edition, 1987.

L. Colletti — *All the Paintings of Giorgione*, London, 1961.

L. L. Snyder — *The Making of Modern Man from Renaissance to the Present*, New York, 1967.

L. Martinez — *The Social World of the Florentine Humanist*, London.

L. Venturi — *Botticelli*, Britain.

L. W. Spitz — *The Renaissance & Reformation Movement*, Chicago, 1971.

M. Dobb — *Studies in the Development of Capitalism*, 1948.

M. Dobb — *Modern Capitalism : Its Origin and Growth*, London, 1928.

M. Germain — *The Bible in the Works of Thomas More*, vol. I, Niecekoop, 1969.

M. M. Checksfield — *Potraits of Renaissance Life and Thought*, London, 1964.

M. Mooney (ed.) — *Renaissance Thought and its Sources*, New York, 1979.

M. P. Gilmore	*Humanists and Jurists*, **Havard University**, G. B., 1972.
Nikolai Konrad	*The East and West* (Russian), Moscow, 1972.
O. Niccoli	*Prophecy and People in Renaissance Italy* (Tran.), by L. G. Cochrane, Princeton.
O. Prescott	*Princes of the Renaissance*, London, 1969.
P. Bondanella & M. Musa (ed.)	*The Portable Machiavelli* (Tran.), Viking Penguin, New York, 1979.
P. F. Grendler	*Schooling in Renaissance Italy Literacy and Learning 1300-1600*, Baltimore and London, 1989.
P. Murray	*The Architecture of the Italian Renaissance*, London, 1963.
P. O. Kristeller	*Renaissance Thought : The Classic, Scholastic and Humanist Stains*, New York, 1961.
P. S. Allen	*The Age of Erasmus*, Oxford, 1914.
P. Smith	*Erasmus, Study of his Life, Ideals and Place in History*, New York, 1923.
R. A. Myrons & D. F. S. Thompson (ed.)	*The Correspondence of Erasmus* Part-III (Tran.), Toronto, 1976.
R. D. Roover	*The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397-1494*, Cambridge, 1946.
R. H. Bainton	*Here I Stand : A Life of Martin Luther*, U. S. A., 1953.
R. H. Bainton	*Erasmus of Christendom*, New York, 1969.
R. S. Kinsman (ed.)	*The Darker Vision of the Renaissance*, California, 1974.
R. Lanciani	*The Golden Days of the Renaissance in Rome*, Boston, 1906.
R. Roberto	*The Life of Girolomo Savonarala*, New York, 1959.
R. Roberto	*The Life of Niccolo Machiavelli*, Chicago, 1963.

R. Roberto — *The Life of Francese Guicciardini*, New York, 1968.

R. W. Hanning & D. Rosand (ed.) — *Castiglione : The Ideal and The Real Renaissance Culture*, **Yale University Press**, London, 1983.

S. Davies — *Renaissance View of Man*, Manchester, 1978.

S. Dresden — *Humanism in the Renaissance*, London, 1968.

Vespasino Da Bisticci — *Le Vite d' Uomini illustri del secole XV* (Italian), *1480, Renaissance Princes, Popes & Prelates* (Tran.), W. George & E. Waters, N. Y., 1963.

V. Cronin — *The Flowering of the Renaissance*, London, 1969.

W. B. Parsons — *Engineers and Engineering in the Renaissance* (*1939*), England, 1968.

W. Durant — *The Story of Civilization*, vol. V, The Renaissance, New York, 1953.

W. H. Woodward — *Vittorino da Feltre and other Humanist Educators*, Cambridge (1897) Rpt, N. Y., 1963.

W. K. Ferguson — *Facets of the Renaissance*, California, 1954.

W. Pater — *The Renaissance*, New York, 1873.

W. Pater — *The Renaissance Studies in Art and Poetry 1893*, Text ed. by Donald L. Hill, California Press, 1980.

W. P. D. Wightman — *Science and the Renaissance*, vol. I, London, 1962.

W. Rospigliosi — *Writers in the Italian Renaissance*, London, 1978.

W. Roscoe — *Life of Lorenzo de' Medici called the Magnificient*, London, 1799.

W. Shepherd — *Life of Poggio Braciolini* (Florence, 1825), Liverpool, 1837.

W. Ullman — *Mediaval Foundations of the Renaissance Humanism*, London, 1977.

Encyclopaedia & Dictionaries

A Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance, J. R. Hale (ed.), Great Britain, 1981.

Encyclopaedia Britanica, vol. 19, U. S. A., 1973.

The New Century Italian Renaissance Encyclopaedia, C. B. Avery (ed.), N. Y., 1972.

Dictionary of the Renaissance, F. M. Schweitzer & H. E. Wedock, **British Commonwealth**, 1967.

Dictionary of Italian Painting, Methuen & Co. Ltd., London, 1964.

The Macmillan Dictionary of Italian Literature, P. Bondanella, J. Bondanella (ed.), London, 1979.

Journals

"Renaissance Quarterly"

The Renaissance Society of America, Inc.

1161 Amsterdam Ave., New York, 10027.

Volume	No.	Session	Year
XXVIII	4	Winter	1975
XXIX	4	Winter	1976
XXXI	4	Winter	1978
XXXVI	4	Winter	1984
XLII	1	Spring	1989
	3	Autumn	1989
	4	Winter	1990
XLIV	1	Spring	1991
	2	Summer	1991
	3	Autumn	1991
XLV	1	Spring	1992

নির্ঘণ্ট

১.খ গ্রন্থ-রচনাদির নাম : ইতালীয় রেনেসাঁস ও অন্যান্য

১.গ শিল্পভুবন ঃ ইতালীয় রেনেসাঁস

২.ক ব্যক্তিনাম : বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও অন্যান্য

২.খ গ্রন্থ-পত্রিকা-রচনাদির নাম ঃ বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও অন্যান্য

নির্ঘণ্ট

সংক্ষেপক

১ক ব্যক্তিনাম ঃ ইতালীয় রেনেসাঁস ও অন্যান্য

EC	Economist
EN	English
ENHU	English Humanist
ENKN	English King
ENPH	English Philosopher
ENSR	English Social Reformer
ENWR	English Writer
FR	French
FRPH	French Philosopher
FRKN	French King
FRWR	French Writer
GM	German
GMHU	German Humanist
GMOR	German Orientalist
GMPH	German Philosopher
GMPL	German Politician
GMSC	German Scientist
GMTH	German Theologist
GMWR	German Writer
GR	Greek
GRHU	Greek Humanist
GROR	Greek Orator
GRPH	Greek Philosopher
GRPHY	Greek Physician
GRSC	Greek Scientist
GRWR	Greek Writer
HU	Humanist
IT	Italian
ITAR	Italian Artist
ITCR	Italian Cardinal
ITEX	– Italian Explorer
ITHS	– Italian Historian
ITHR	– Italian Humanist
ITHU	– Italian Humanist
ITKN	— Italian King
ITMR	Italian Merchant
ITMU	– Italian Musician
ITPO	Italian Pope
ITPR	Italian Prince
ITTH	Italian Theologist
ITWO	Italian Woman
ITWR	Italian Writer
LT	Latin
LTWR	Latin Writer
PLPH	Polish Philosopher
PT	Portuguese
PTWR	Portugees Writer
RFHS	Reformation Historian
RMARC	Roman Architect
RMHS	Roman Historian
RMRT	Roman Rhetorician
RNHS	Renaissance Historian
SC	Scientist
SCH	Scholastic
SCHS	Science Historian

১খ গ্রন্থ-রচনাদির নাম ঃ ইতালীয় রেনেসাঁস ও অন্যান্য

A	Article
ARF	Article on Reformation
ARN	Article on Renaissance
B	Book
BSC	Book on Science
BRN	Book on Renaissance
CLEP	Classical Epic
D	Drama
EP	Epic
END	English Drama
ENP	English Poetry
ENPM	English Phamplet
GM	– German
GMD	German Drama
GR	Greek
GRPH	– Greek Philosophy

HS History
JW – Jewish
JWMY Jewish Mythology
LTTR – - Latin Treatise
O – – Oration
P — Poetry
RF – Reformation
RFTR — Reformation Treatise
RL — Religion
RN - Renaissance
RNB – Renaissance Book
RNBI - Renaissance Biography
RNCM Renaissance Commentaries
RNHS Renaissance History
RNL - Renaissance Letters
RNMY – Renaissance Mythology
RNN - Renaissance Novel
RNP Renaissance Poetry
RNPLPH - Renaissance Political Philosophy
RNTR - Renaissance Treatise
THRN – Theory on Renaissance

১.গ শিল্পভুবন ঃ ইতালীয় রেনেসাঁস

RNARC Renaissance Architecture
RNAS → Renaissance Architectural Sculpture
RNDARC – - Renaissance Decorative Architecture
RNDPN — Renaissance Decorative Painting
RNFR — Renaissance Fresco
RNPN – Renaissance Painting
RNPOT — Renaissance Potrait
RNSCL - Renaissance School
RNSCP Renaissance Sculpture

২.ক ব্যক্তিনাম ঃ বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও অন্যান্য

PRWR - Persian Writer